রাসায়েল ও মাসায়েল

৬ষ্ঠ খন্ড

জাস্টিস মালিক গোলাম আলী

রাসায়েল ও মাসায়েল

৬ষ্ঠ খণ্ড

বিচারপতি মালিক গোলাম আলী

অনুবাদ
আকরাম ফারূক
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

আমাদের কথা

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. এর বিখ্যাত গ্রন্থ রাসায়েল ও মাসায়েলের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। দেশ বিদেশের লোকেরা মাওলানাকে কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্দোলন, সংগঠনসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগের উপর অসংখ্য প্রশ্ন করেছেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ সকল প্রশ্নের প্রামাণ্য, যুক্তি ভিত্তিক ও সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন। পত্রিকায় এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই শিরোনামে মাওলানা যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেগুলো গ্রন্থাকারে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি খণ্ডই বাংলাভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণ, কারা নির্যাতন এবং অসুস্থতা ও ব্যস্ততাসহ বিভিন্ন কারণে তিনি নিজের কলমে উক্ত শিরোনামের সবগুলো প্রশ্নের জবাব দেবার সুযোগ পাননি। তাঁর সুযোগ্য বিশেষ সহকারী ছিলেন বিচারপতি মালিক গোলাম আলী। দীনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে মাওলানার সাথীত্বে থেকে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন একজন সেরা আলেমের মর্যাদায়। তিনিই রাসায়েল ও মাসায়েল শিরোনামের সেসব প্রশ্নের জবাব দেন।

তাঁর জবাব সম্বলিত রাসায়েল ও মাসায়েল এযাবত দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড। তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন। তাঁর নামে আরো খণ্ড প্রকাশ হবে বলে আমরা আশা করি।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী রাসায়েল ও মাসায়েল ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এ গ্রন্থকে তাঁর বান্দাদের সঠিক দীনি জ্ঞান লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খৃ.

বিষয়	সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইসলামী জ্ঞান হস্তান্তরের ধারাবাহিকতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তত্ত্বজ্ঞানের এতো বিপুল ভাণ্ডার উন্মোচন করেছিলেন যে, তাকে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুফাসসিররূপে অবিহিত করা হয়। তাঁর এই অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান পরবর্তীকালে তাঁর খ্যাতনামা শিষ্য ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদা প্রমুখ মুসলিম উম্মাহর কাছে হস্তান্তর করেন। এ ক্ষেত্রে উস্তাদ ও শিষ্য উভয়ের অবদানই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে মুসলিম সমাজে হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকাহ শাস্ত্রীয় ব্যুৎপত্তির প্রচারণও ব্যাপক প্রসার ঘটান তাঁরই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার রহ.। পরবর্তীকালে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি স্বয়ং ইসলামি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের এক অতলস্পর্শী সমুদ্র তো ছিলেনই। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইবনে কাইয়েম আল জাউদী রহ. স্বীয় উস্তাদের জ্ঞান প্রদীপকে শুধু প্রজ্জ্বলিত রাখেননি, অধিকন্তু তার ঔজ্জ্বল্য ও সুষমা আরো বর্ধিত করেছিলেন।

উপমহাদেশে ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রহ. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন, তা এতদঞ্চলের ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়।

তাঁর সেই কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রভাবকে অব্যাহত রাখা ও অধিকতর কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণের প্রচেষ্টাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নিকট অতীতে মাওলানা শিবলী নোমানীর শিষ্যগণ শিবলীর চিন্তাধারা যেভাবে চালু রেখেছেন তা জ্ঞানীগণের অজানা নয়। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী এঁদের অন্যতম।

বর্তমান যুগের চলমান ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ ধরনের একাধিক দৃষ্টান্ত মেলে। আলজেরিয়ায় শেখ আব্দুল হামিদ বিন বাদীসের পরবর্তীকালে তার ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মদ আল বশীর আল ইবরাহিমী তার কাঙ্ক্ষিত কাজকে বিদ্যাগত ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি দাওয়াতী ময়দানেও অব্যাহত রাখেন। মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের আদর্শ ও চিন্তাধারার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল কাদের আওদা, অধ্যাপক আল বাহী আল খাওলী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ ডক্টর ইউসুফ আল কারজাভী, ডক্টর আহমদ আল আবছাল, ইউসুফ আল আজম এবং সাঈদ হাওয়া অন্যতম। এই মনীষীগণ যদিও ইমাম হাসানুল

বান্নার প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না। তবে তারা ইমাম হাসানুল বান্নার চিন্তাধারা দ্বারা এতো বেশি প্রভাবিত ছিলেন যে, সঠিক অর্থেই তাদেরকে তাঁর আদর্শিক উত্তরাধিকারীরূপে আখ্যায়িত করা যায়।

মাওলানা মওদূদী রহ. এ যুগের চিন্তা ও কর্মের জগতে যে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার প্রভাবও সীমাহীন। এই উভয় ময়দানে তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছে এক সর্বাত্মক ইসলামি আন্দোলন। এ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের এবং দুনিয়ার অন্যান্য দেশে তাঁর আধ্যাত্মিক শিষ্যদের নেতৃত্বে চালু রয়েছে। প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এমনও রয়েছে, যারা বহু বছর যাবত দিবারাত্র মাওলানার তত্ত্বাবধানে থেকেছেন। এদের মধ্যে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, জনাব নঈম সিদ্দিকী, মরহুম আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী ও মাওলানা মালিক গোলাম আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ তো পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মরহুম মাওলানা এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তাঁকে বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। জনাব নঈম সিদ্দিকী এবং অধ্যাপক আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী মরহুম মাওলানার দাওয়াত, চিন্তাধারা ও ইসলামি আন্দোলনের দার্শনিক দিক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। উভয়ে সাংবাদিকতার জগতেও মাওলানার অনুসৃত নতুন ধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

মাওলানা মালিক গোলাম আলী সাহেব এঁদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই মাওলানা মওদূদীর রহ. সাহচর্যে আসেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, মালিক সাহেব মরহুম মাওলানার সাহচর্যে জীবনের সুদীর্ঘ স্বর্ণপ্রসূ অংশ অতিবাহিত করে শুধু যে মাওলানার চিন্তাধারা ও অন্তর্দৃষ্টিকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন তাই নয়, বরং ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর পাণ্ডিত্যও অর্জন করেছেন। বস্তুত: মালিক সাহেব পরিভাষা অনুসারে যথার্থভাবেই একজন 'ইসামী' অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভু' ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রাথমিক জীবন

মালিক সাহেব নিরেট পল্লি সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন, যদিও পল্লি সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার সীমিত হয়ে থাকে। তবে সেখানে এমন কিছু গুণাবলীরও বিকাশ ঘটতে দেখা যায়, যা ভবিষ্যত জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তম ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যেমন, সরল সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন, অল্পে তুষ্টি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, জ্ঞানী গুণীদের প্রতি আন্তরিক টান ও ভালোবাসা। মালিক সাহেব এসব গুণে সমৃদ্ধ হয়েই শহরে পদার্পণ করেন। তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তার নিজের বর্ণনা নিম্নরূপ : "সারগোধা জেলার উত্তরাঞ্চলে সোন

সেকসর নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানেই আমার জন্ম। আমি একটা ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধ্যমত নামায, রোযা ও যাবতীয় সৎ কাজে উৎসাহ দেয়া তাঁর স্বভাব ছিলো। আমি শিশুকাল থেকেই লেখাপড়ায় খুবই আগ্রহী ছিলাম। স্কুলে একজন ভালো ছাত্র হিসেবে গণ্য ছিলাম। প্রাইমারীর উর্ধে প্রত্যেক শ্রেণীতে ভালো ফলাফলের জন্য বৃত্তি পেতাম। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা বলতেন ঐ গ্রামের ইতিহাসে আমিই প্রথম বৃত্তি পেয়েছি।"

পিতামাতার দেয়া প্রাথমিক শিক্ষা মানুষের স্বভাবে গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে। মালিক সাহেবের ব্যক্তিত্বে এই শিক্ষার প্রভাব ও আলামত তার সাথে দেখা করতে গেলে প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। বিশেষতঃ দুটো গুণ অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে, সাদাসিধে জীবন ও ধর্মভীরুতা। এ দুটো গুণ মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম ভূষণ বিবেচিত হয়ে থাকে। ইসলামি জ্ঞান ও ইসলামি দাওয়াতের অঙ্গনে ইপ্সিত স্তর অতিক্রম করার সৌভাগ্য যার প্রাপ্য, সে এই দুটো উপাদানে ভূষিত না হয়ে ঐ স্তরসমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম নয়।

লাহোর আগমন

গ্রামীণ জীবনের সব মহৎ গুণে ভূষিত হয়ে মালিক সাহেব নগর জীবনে পদার্পণ করলেন। তিনি বলেন "আমাদের এলাকায় 'নও শহরা' একটা ছোট খাট কেন্দ্রীয় শহর। সেখানে হাইস্কুল, থানা ও বেসামরিক হাসপাতাল রয়েছে। আমি এই স্কুলেই শিক্ষা লাভ করেছিলাম। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা ও মান তেমন ভালো ছিলনা। এই স্কুলের জনৈক শিক্ষক আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে আমি বললাম লাহোরে গিয়ে লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ যদি পাই, তবে খুবই ভালো হয়। আমার প্রস্তাবটা তাঁরও মনোপূত হলো। বিএবিএড এই শিক্ষকের নাম ছিলো মাওলানা আব্দুল গফুর। তার বাড়ি ছিলো কাবুলি মহল্লায়। তিনি সৎ ও দীনদার ছিলেন। তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহ চাহে তো তোমার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করে দেবো। সত্যিই ব্যবস্থা করে দিলেন। আঞ্জুমানে হেদায়াতে ইসলামের পরিচালনাধীন শেরানওয়ালা হাইস্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন এবং উক্ত স্কুলের সবচেয়ে ভালো সেকশনটির অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।"

এভাবে মালিক সাহেব সোন সেকসর গ্রামের সরল ও সীমিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আকস্মিকভাবে জীবনের প্রথম প্রহরেই লাহোরের মতো শহরে চলে এলেন। এই নতুন পরিবেশে সব কিছুই তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হওয়ার কথা। শিক্ষাঙ্গনে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার কথা। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে রকমারি রাজনৈতিক বিতর্ক প্রত্যক্ষ করে থাকবেন নিশ্চয়ই। সভ্যতার উপকরণসমূহ নিত্য নতুন চমক ও চাকচিক্য নিয়ে তাঁর সামনে প্রতিভাত

হয়ে থাকবে। আল্লাহর বিশেষ রহমত না থাকলে এসব উপকরণ মানুষকে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্তও করে দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা মালিক সাহেবকে এখানেও তাঁর সাবেক সৎ গুণাবলী সংরক্ষণ করার ও তাকে আরো উৎকর্ষ দানের সুযোগ করে দিলেন। তিনি বলেন শেরানওয়ালা ইসলামিয়া হাইস্কুলে সকল শ্রেণীর এবং সকল শিক্ষকের রীতি ছিলো যে, নামাযের সময় হলে আমাদের সকল শিক্ষক নিজ নিজ ছাত্রদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে চলে যেতেন। সেখানে তারা নিজেরাও নামায পড়তেন, আর ছাত্রদেরকেও পড়াতেন। কোনো কোনো ছাত্র বলতো শেরানওয়ালা মসজিদ যখন নিকটেই তখন আমরা ঐ মসজিদেই নামায পড়বো। সুতরাং ঐ মসিজদেই নামায পড়তে গিয়ে আমি মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের দারস ও খুৎবা শোনার সৌভাগ্য লাভ করতে থাকি এবং তাঁর পেছনে নামায পড়তে থাকি। ঐ মসজিদটিতে দীর্ঘদিনব্যাপী নামায পড়ি। সেখানে তৎকালে প্রচুর দারস ও ওয়ায নসীহত ইত্যাদি হতো এবং সেখানকার পরিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামি ভাবধারা বিরাজ করতো।

কলেজ জীবন

স্কুলের শিক্ষা জীবন শেষে মালিক সাহেব কলেজে ভর্তি হন। সে যুগে কলেজে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা দোর্দণ্ড প্রতাপে চালু ছিলো। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়বাদী দর্শনের শিক্ষা এতো বেশি দেয়া হতো যে, ইসলামি আকীদা বিশ্বাস ও নৈতিকতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যেতো। একারণেই বৃটিশ ব্যবস্থার দরুন মুসলিম সমাজে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে মুসলিম যুবসমাজে নানা রকমের অনৈসলামিক মতবাদ ও চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এককথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিন্তার নৈরাজ্য দেখা দেয়। এখানেও মালিক সাহেব আল্লাহর অসাধারণ অনুগ্রহে সিক্ত থাকেন। তিনি এমন কয়েকজন শিক্ষকের তদারকি লাভ করেন, যারা তাকে মহৎ থেকে মহত্তর হতে সাহায্য করতে থাকেন। মালিক সাহেব ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে তিনি যেসব অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা আলীমুদ্দীন সালেক মরহুম। তার কাছ থেকে মালিক সাহেব ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা অর্জন করেন। মরহুম সালেক সাহেবের ধর্মানুরাগী স্বভাব ও মেজাজ সম্পর্কে মালিক সাহেব বলেন : তাঁর শ্রেণীতে কোনো ছাত্র খালি মাথায় বসবে, এটা ছিলো অসম্ভব। প্রত্যেক ছাত্র টুপি নিয়ে আসতো। অন্যান্য পিরিয়ডে তা কোথাও রেখে দিতো ফার্সির পিরিয়ডে টুপি পরতেই হতো। শার্টের বোতাম খোলা থাকলে তিনি আপত্তি জানাতেন এবং বলতেন, 'বোতাম আটকাও।' কারো মাথা খালি থাকলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : 'তোমার নাম কি?' যদি কেউ জবাব দিতো যে, জনাব আমার নাম গোলাম আলী কিংবা গোলাম মুহাম্মদ তাহলে তিনি বলতেন, "না না তোমার অন্নপ্রাসন কোন্ গীর্জায় হয়েছে? তোমার খৃষ্টান নাম কি?"

প্রশিক্ষণের এ পদ্ধতির উপর এ যুগের মনোবিজ্ঞানীরা নানারকম আপত্তি তুলে থাকেন। তবে আমরা মনে করি, মুসলিম যুবকদের প্রশিক্ষণ যেমন তাদের চিন্তাচেতনার সংশোধনের জন্য জরুরি। তেমনি তাদের বাহ্যিক বেশভুষা সংশোধনের জন্যও অপরিহার্য। বাহ্যিক পরিশুদ্ধি আভ্যন্তরীন অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মাওলানা আলীমুদ্দীন সালেক ছাড়া মালিক সাহেব কলেজ জীবনে আরো কয়েকজন মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁরা তার সহজাত প্রতিভা, ইসলামি চেতনা এবং সত্যানুসন্ধানের মনোবৃত্তিকে দমন করার পরিবর্তে আরো উজ্জীবিত করেন। ঘটনাক্রমে এই কলেজেই কিছুদিনের জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানদান করেন এবং তাঁর সাথে মালিক সাহেবের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমার মতে, পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের এই ধারাবাহিকতাকে নিছক আকস্মিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা যায়না। বরঞ্চ সত্যের সন্ধ্যানে ব্যাপৃত মানুষের জন্য সত্যের পথ সুগম করে দেয়ার মানসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, সেটাই এই পুরো ঘটনা প্রবাহের পেছনে সক্রিয়।

মাওলানা মওদূদীর শিষ্যত্বের যুগ

মাওলানা মওদূদী কিভাবে ইসলামিয়া কলেজের সাথে জড়িত হলেন, সেই পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে মালিক সাহেব বলেন :

আমরা জানতে পারলাম এখন থেকে মাওলানা মওদূদী সাহেব ইসলামিয়াত পড়াবেন। মাওলানার আগে এ বিষয়টি পড়াতেন টুনকের মাওলানা ওমর খান। তিনি অত্যন্ত নেককার ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনি অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় মাওলানা মওদূদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন মাওলানার সাথে আলাপ করেন তখন মাওলানা বলেন "আমি অবৈতনিক পড়াবো। কোনো পারিশ্রমিক নেবোনা। আমার কাজে তথা শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আপনারা কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না। আপনারা কোনো বিধিনিষেধ বা কড়াকড়ি আরোপ করবেন না। আমি নিজে খুবই ব্যস্ত মানুষ। তা সত্ত্বেও আপনারা যখন প্রস্তাব দিয়েছেন, তখন এ সুযোগকে কাজে লাগাবো। এভাবে নতুন শিক্ষিত বংশধরের কাছে আমার আহ্বান পৌছে যাবে।"

এই শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা মওদুদী রহ. ইসলামিয়া কলেজে ইসলামিয়াত বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করে দেন। মাওলানার হাতে সময় কম থাকতো এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে গিয়ে লেকচার দেয়া দুরূহ ছিলো। তাই তাঁর পরামর্শ অনুসারে সকল ছাত্রকে একটি বড় কক্ষে সমবেত করা হতো এবং তিনি একই সময়ে সকলের সামনে ভাষণ দিতেন। মালিক সাহেব বলেন "এখানেই

আমি মাওলানাকে প্রথম দেখলাম। তখন তাঁর চুল একেবারেই কালো ছিলো। কালো টুপি পরতেন। কখনো কখনো রুমী টুপিও পরে আসতেন।"

"মাওলানা স্বীয় ভাষণের মধ্য দিয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করতেন। তিনি বলতেন, ইসলাম কোনো পূজাসর্বস্ব বা নিছক ইবাদত আরাধনার ধর্ম নয়। ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো আসলে মানুষকে একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করে থাকে এবং এসব ইবাদত সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের একটা ব্যাপক সর্বাত্মক সামষ্টিক বিধান রয়েছে, যা জীবনের প্রতিটি অংশের সাথে সম্পৃক্ত। এতে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে। এককথায়, জীবনের সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতি এর আওতা বহির্ভুত নয়।

মাওলানার অনুসৃত ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এই ধারা দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর কিছু নয়। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি লাভের এবং স্বেচ্ছাচারী খোদাদ্রোহী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে পৃথিবীতে আল্লাহর সত্য দীনকে বিজয়ী করার আহ্বান ছিলো। এ ধরনের আহ্বান প্রত্যেক যুগেই প্রত্যেকে কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিকে উদ্বিগ্ন করেছে। যে সময়ে মাওলানা ইসলামিয়া কলেজে নতুন প্রজন্মের তরুণদের সামনে ইসলামের এই ব্যাখ্যা পেশ করছিলেন, সেটি ছিলো ইংরেজদের যুগ। ঐ কলেজ শাসকদের আর্থিক সাহায্য নিয়েই চলতো। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করলেন, মাওলানার এই শিক্ষা কার্যক্রমের দরুণ তাদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। তারা মাওলানাকে নিছক ধর্মীয় শিক্ষার ভেতরে আপন অধ্যাপনা সীমিত রাখতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ মাওলানার মনপূত ছিলোনা। তিনি যখন বুঝতে পারলেন কর্তৃপক্ষ তার অধ্যাপনায় শংকিত হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি স্বত:প্রবৃত্ত হয়ই ঐ কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন।

মাওলানা মওদুদীর সাথে ঘনিষ্ঠতা

মাওলানা মওদুদীর সাথে মালিক সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিলো। মালিক সাহেব বলেন : "মাওলানার এক আধটা বক্তৃতা শুনেই আমরা তাকে মন উজাড় করে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।"

মাওলানা যখন কলেজ ছেড়ে দিলেন, তখন মালিক সাহেব নিজের লেখাপড়া মাঝপথেই বন্ধ করে দিলেন এবং মাওলানার সাহচর্যে থাকতে আরম্ভ করলেন। এই সাহচর্য নেহায়েত আবেগ বা অন্ধ ভক্তিনির্ভর ছিলোনা। তিনি সচেতনভাবে মাওলানার দাওয়াতকে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁর সাথে বহু বিষয়ে আলোচনা করেন, অত:পর নিজের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি সহকারে মাওলানার সহযাত্রী হয়ে যান। মালিক সাহেবের কতিপয় শিক্ষক তাঁকে এ

পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন এবং সেটা তারা ভালো মনে করেই করেন। কিন্তু মালিক সাহেব নিজের মন ও চেতনার আলোকে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, তা অপরিবর্তিত থাকে এবং আল্লাহর ইচ্ছাও তার পেছনে সক্রিয় ছিলো।

লেখাপড়া বাদ দেয়ার পর মালিক সাহেব দীন প্রতিষ্ঠাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে এটা এমন একটা মৌলিক বিপ্লব ছিলো, যাকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একজন তরুণ শিক্ষার্থী, যার উপর তার পিতামাতার হাজারো আশা ভরসা এবং পার্থিব দৃষ্টিতে যার নিজের সামনেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি বিদ্যমান, সে যদি এমন সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে পিতামাতার আশা ভরসাও পূর্ণ হয়না এবং নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ারও অবকাশ থাকেনা, তা হলে ঐ সিদ্ধান্তকে নিশ্চিতভাবেই কোনো উচ্চতর ঈমানী প্রেরণার অভিব্যক্তি মনে করতে হবে। ইকামতে দীনের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে মালিক সাহেব মাওলানার কাছে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন "আমি নিজের পরাজয় স্বীকার করছি। আমি মনে করি, এটাই একজন মুসলমানের প্রকৃত করণীয় কাজ। আল্লাহ্ অবশ্যই কোনো মুসলমানকে এমন কাজের নির্দেশ দেননি, যা তার পক্ষে অসম্ভব। আমরা সে কাজকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি কিনা, সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।"

জবাবে মাওলানা রহ. এই প্রতিভাধর তরুণের কাছে যে বক্তব্য তুলে ধরেন, তা ইসলামের মহান আহ্বায়ক হিসেবে তাঁর বক্তিত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে "বস্তুত: মুসলমানের করণীয় কাজ এটাই। মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া এবং দীনকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের দায়িত্ব। চাই তাতে সফলতা লাভ হোক বা না হোক। ফলাফল তো আল্লাহর হাতেই। বহুসংখ্যক নবী এমন অতিবাহিত হয়েছেন যে, কেউবা একজন অনুসারী পেয়েছেন, কেউবা দু'জন পেয়েছেন। কেয়ামতের দিন কোনো কোনো নবী মাত্র একজন বা দু'জন করে সাথি নিয়ে আসবেন। কোনো কোনো নবীকে তো পরিবারের লোকেরাও মান্য করেনি। কাজেই এ জিনিসের তোয়াক্কা না করা চাই। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে। তারা চাইলে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কেন সম্ভব হবে না?"

মাওলানা সাহেব বললেন : "কমুনিজমকে যখন নিছক একটা মতবাদের আকারে পেশ করা হয়, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে, মানব প্রকৃতির প্রতিকূল এই মতবাদ এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলবে। কিছু লোক ময়দানে নেমে পড়লো, কম্যুনিজমের জন্য তৎপরতা চালালো এবং তারা সফলতা লাভ করলো। যেসব দেশে কম্যুনিজম বাস্তবায়িত হবে বলে তারা ভেবেছিলো, সেখানে হলোনা। সুসভ্য ও উন্নত দেশগুলোতে কম্যুনিজম চালু করা গেলোনা। রাশিয়াতে গিয়ে চালু হয়ে

গেলো। সম্ভব আর অসম্ভব কথাটা তো আপেক্ষিক পরিভাষা। যে উদ্দেশ্যের জন্য মানুষ প্রাণপণ সংগ্রাম করে এবং তার পক্ষে আল্লাহর মঞ্জুরী থাকে, তা সফলতা অর্জন করে। ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত হয়ে যাবো এবং বলতে পারবো, হে আল্লাহ! আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।"

মাওলানা মওদূদীর রহ. এই আবেগময় ও প্রেরণাদায়ক জবাবের পর মালিক সাহেব যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাও চমকপ্রদ বটে। মালিক সাহেব বললেন : "বাতাস অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক, আমরা পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছি। আমিও আপনার সাথি। আমি বয়সে তরুণ। ইসলামি শিক্ষা আমার তেমন বেশি নেই, তবে একেবারে অকাট মূর্খও নই। যা হোক, আমি আপনার সাথে যুক্ত হলাম। এই মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করলাম।"

দৃঢ়তা ও অবিচলতা

এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মালিক সাহেব লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখে দিলেন। আগেই বলেছি মালিক সাহেব লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখে দেয়ার পর তার সুযোগ্য শিক্ষকগণ তাকে অনেক বোঝালেন যে, এটা নিতান্তই আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত। শিক্ষা সম্পূর্ণ না করা কোনো বুদ্ধিমানসুলভ পদক্ষেপ নয়। কিন্তু মালিক সাহেব স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং ঐসব বিদ্বান ব্যক্তির এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো যে, মালিক সাহেব নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মালিক সাহেব এ সিদ্ধান্তটা খুব জেনে বুঝেই নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যে ফায়সালাকে লোকেরা শিক্ষার অপরিপক্কতা থেকে উদ্ভূত বলে ভেবেছেন, সেটা মালিক সাহেবের জন্য শুধু যে শিক্ষার উন্নতির সোপান সাব্যস্ত হয়েছিল তা নয়, বরং তার কর্মের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়েছিল।

এবার মালিক সাহেব মাওলানার সার্বক্ষণিক সহযোগী ও সহকর্মী হয়ে গেলেন। নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে পরিবারের উপর বোঝা চাপানোর পরিবর্তে লাহোরের অভ্যন্তরেই কয়েকটা টিউশন যোগাড় করে নিজের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিলেন। বাদ বাকি সময় মাওলানার সাথে কাটিয়ে তাঁর বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে লাগলেন। ক্রমে টিউশনের পেশার প্রতিও তার বিতৃষ্ণা ধরে গেলো। কেননা দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি সহায়ক যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো এ কাজটা তারই এক ধরনের সেবা ছাড়া কিছু নয়। তাই তিনি প্রাইভেট পড়ানোর কাজটাও ছেড়ে দিলেন এবং একেবারেই বেকার হয়ে গেলেন। মালিক সাহেবের এ সিদ্ধান্তে মাওলানা বেশ খানিকটা ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, এখন কি হবে। কারণ মাওলানা নিজেও তখন খুবই অনটনের মধ্যে ছিলেন এবং মালিক সাহেবের জন্য জীবিকার সংস্থান হতে পারে এমন কোনো কাজ তাঁর হাতে ছিলনা। মালিক সাহেব নিজেও কাজকর্ম না করে মাওলানার উপর আর্থিক বোঝা হয়ে বসতে চাইছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি এটাও অনুভব করলেন যে, তিনি মাওলানাকে

ভাবনায় ফেলে দিয়েছেন। তবে তিনি মাওলানার উদ্বেগ এই বলে নিরসন করলেন যে, "আল্লাহ্ একটা না একটা উপায় বের করে দেবেন। তিনিই উপায় উপকরণের সংগ্রাহক ও নিয়ামক।"

কথাটা খুবই সাদামাটা এবং সংক্ষিপ্ত বটে। তবে এর ভেতর দিয়ে সেই শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছিল, যা মাওলানা মওদূদী রহ. বিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী মানুষকে বিতরণ করেছিলেন।

জলন্ধরে এক 'বিরল পণ্যের' আবির্ভাব

মালিক সাহেবের নবোদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মাওলানা নিজের এক বন্ধু আব্দুল আযীয শারক্কীকে জলন্ধরে চিঠি লিখে পাঠালেন যে, এই সত্যনিষ্ঠ যুবকটির একটা কিছু কর্মসংস্থান করুন। শারক্কী সাহেব মালিক সাহেবকে জলন্ধর ডেকে নিলেন এবং সেখানে ছোট একটা লাইব্রেরি খুলে সেটি তার দায়িত্বে সমর্পণ করলেন। এই লাইব্রেরির অবস্থা কি ছিলো, তা লাইব্রেরির সাইন বোর্ডে মালিক সাহেবের নিজে লিখে টানানো নিম্নো পংক্তিটি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় : "একটা বিরল পণ্যের আবির্ভাব ঘটেছে, যদিও অধিকাংশ খরিদ্দার এ সম্পর্কে অজ্ঞ। আমরা এ শহরে সবার চেয়ে ভিন্ন ধরনের দোকান খুলেছি।"

এহেন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তার দিনরাত অতিবাহিত হতে থাকে। দোকান থেকে কোনো আয় রোজগার হতো না। জীবিকা উপার্জনের সকল পথ রুদ্ধ ছিলো। এমন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে। আল্লাহ যাদের বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া এ পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না। বস্তুত মালিক সাহেব এই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের মধ্যেই গণ্য।

জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগদান

১৯৪১ সালে যখন মাওলানা মওদূদী রহ. জামায়াত প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন, তখন যেসব সমমনা ব্যক্তিকে চিঠি লিখে লাহোরে ডেকে আনেন, তাদের মধ্যে মালিক সাহেবও ছিলেন। তিনি জলন্ধর থেকে এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মালিক সাহেব জামায়াতের সেইসব সদস্যের অন্যতম, যাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর 'আস সাবেকুন আল আউয়ালুন' (সর্বপ্রথম দলভুক্ত) সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা যায়।

দারুল ইসলামে অবস্থান

জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা রহ. যখন পুনরায় পাঠানকোর্টস্থ দারুল ইসলামে গিয়ে বসবাস করা শুরু করলেন, তখন মালিক সাহেবকে জলন্ধর থেকে নিজের

কাছে ডেকে আনেন এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনীর দায়িত্ব তার হাতে সমর্পণ করেন। মালিক সাহেব 'মাকতাবায়ে জামায়াতে ইসলামী'র পরিচালক ছিলেন বটে, তবে বইপুস্তকের প্যাকিং করা ও পোস্ট অফিসে পৌছানোর কাজ পর্যন্ত তিনি নিজেই করতেন। এক অনাবিল সম্মোহনে তিনি এ কাজ সমাধা করতে থাকেন। এতে তার না ছিলো গৌরবের প্রতি কোনো আগ্রহ, না ছিলো ধন সম্পদের কোনো মোহ আর না ছিলো নিজের দারিদ্র্য নিয়ে কোনো উদ্বেগ।

মালিক সাহেব আজন্ম জ্ঞানপিপাসু। দারুল ইসলামে তিনি পেয়েও গেলেন জ্ঞানার্জনের পরিবেশ। এই পরিবেশ সম্পর্কে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন "এই জায়গায় আমার মন বসে গেলো। এমন পরিবেশ আর কখনো পাইনি। সেখানে আমাদের নিজস্ব একটা বসত ছিলো। নিজস্ব পরিবেশ ছিলো। খুবই নিয়মিতভাবে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাদান করা হতো। মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী দারসে কুরআন এবং মাওলানা মওদূদী রহ. দারসে হাদিস দিতেন। মাওলানা রহ. সেখানে সমগ্র মিশকাত শরিফ পড়িয়েছেন।" 'দারুল ইসলামের জীবন ছিলো অত্যন্ত সহজ সরল। সব কাজ আমরা নিজ হাতে করতাম। নিজেরাই পানি উঠাতাম। জ্বালানী কাঠ নিজেরাই কেটে আনতাম এবং রাতে নিজেরাই নিজেদের পাহারা দিতাম।"

এই সময় মালিক সাহেব আরবি ভাষায় নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। বিশ্রাম ও বিনোদনের সময়টায় তিনি দারুল ইসলামের নিকটবর্তী আপারবারী নদীর কিনারে গিয়ে বসতেন এবং আরবি ব্যাকরণ ও রচনা রপ্ত করার সাধনায় নিয়োজিত হতেন। শুরুতে লাহোরে থাকাকালে তিনি বক্তিগতভাবে আরবি ভাষা শেখার সূচনা করেছিলেন। দারুল ইসলামে অবস্থানকালে তাতে উন্নতি সাধন করেন। বর্তমানে মালিক সাহেব পাণ্ডিত্যের যে উঁচু মর্যাদায় আসীন, তা তার সেই নিয়মিত অধ্যবসায়ের বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে, যাকে তিনি নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন।

লাহোরে মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দারুল ইসলামের গোটা কাফেলা লাহোর চলে আসে। এখানে পৌছার পর মাওলানা রহ. আর তাকে প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বে রাখেননি। তার পরিবর্তে এই অসাধারণ প্রতিভাকে তিনি নিজের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করে অধিকতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। এভাবে মৌলিক গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়ে তাকে সর্বাত্মক জ্ঞান চর্চার অঙ্গনে স্থানান্তরিত করেন। এরপর মালিক সাহেবের জন্য জ্ঞানের ভূবনে ক্রমোন্নতির দুয়ার খুলে যায়। এই দুয়ার খোলার কাজে মাওলানার সযত্ন তত্ত্বাবধান যেমন অবদান রাখে, তেমনি স্বয়ং মালিক সাহেবের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা এবং দুনিয়ার মোহবর্জিত নিরাসক্ত জীবনও পদে পদে তাকে সহায়তা দেয়। উস্তাদের উদার দান এবং শাগরিদের

একনিষ্ঠ সাধনা এ দুই উপাদান মিলিত হয়ে জ্ঞানের সুবিশাল রাজ্যে সন্ধানীর অবাধ পদচারণার পথ সুগম করে তোলে। মালিক সাহেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাওলানার বিশেষ সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। "বস্তুত: এটা একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত পরম সৌভাগ্য, যে তিনি নিজের মনোনীত লোকদেরকেই দিয়ে থাকেন।" (আল কুরআন) এই তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মালিক সাহেব একজন কর্মী হিসেবে আন্দোলনের অন্যান্য খিদমত যথারীতি চালিয়ে যান। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন মসজিদে জুমার খুৎবা দান, প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে ভাষণ ও দারস দান ইত্যাদি।

মালিক সাহেবের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ১৯৫৫ সালে। আমি জামায়াতের আরবি বিভাগ 'দারুল আরুবাতে' যোগ দিই ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে। সে সময় মালিক সাহেবের পরিচালিত 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' সরাসরি মাওলানার রহ. সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। কাজের দিক দিয়েও এই দুই বিভাগের পারস্পরিক সাদৃশ্য ছিলো। একটির সম্পর্ক পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ এবং অপরটির সম্পর্ক পাকিস্তান বহির্ভূত জগতের সাথে ছিলো। এভাবে বহু বছর যাবত এ দুটো বিভাগ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে থাকে। কোনো মানুষকে জানা ও চেনার জন্য এতোটুকু ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া আমি ও মালিক সাহেব কমপক্ষে চৌদ্দ বছর ইসরাতে প্রতিবেশি হিসেবে বসবাস করেছি। উভয়ের বাসগৃহের সাথে মামুলি একটা দেয়ালের ব্যবধান ছিলো। এই দীর্ঘ প্রতিবেশিত্বের বিবরণ এক কথায় দিতে গেলে বলতে পারি যে, "মালিক সাহেব একজন সহনশীল ও সহানুভূতিশীল প্রতিবেশি।"

মালিক সাহেবের পাণ্ডিত্য ও মনীষা

জ্ঞানগত দিক দিয়ে মালিক সাহেব একজন বর্ণাঢ্য ও বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। যদিও তিনি কলেজের পড়াশুনা অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তার অসাধারণ দখল রয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে তার পড়াশুনা অত্যন্ত ব্যাপক। এ কারণেই বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি এবং আদর্শিক ও তাত্ত্বিক আন্দোলনগুলো সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল। মরহুম মাওলানার ইংরেজি পত্রালাপে মালিক সাহেবের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মালিক সাহেবের দক্ষতার একটা উদাহরণ এই যে, অধ্যাপক আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী ইংরেজি ভাষায় যেসব রচনা লিখে থাকেন, তা তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করে মালিক সাহেবকে দিয়ে যাঁচাই বাছাই করিয়ে নেন। বিশেষত 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সা. পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ এবং সহীহ মুসলিমের ইংরেজি অনুবাদ মালিক সাহেবের নজর বুলানো গ্রন্থ। ইংরেজি থেকে উর্দূতে মালিক সাহেব যে অনুবাদ কর্মগুলো সম্পাদন করেছেন তাতেও তাঁর ভাষাগত দক্ষতা ও পরিপক্কতার প্রতিফলন ঘটে। আরবি ভাষায় তো মালিক সাহেবের দখল তার স্বকীয় চেষ্টারই ফসল। প্রাচীন ও আধুনিক

উভয় ধরনের আরবি সাহিত্যে তিনি সুদক্ষ। হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের জটিলতম ও সূক্ষ্মতম বিষয়গুলোতে মালিক সাহেবের যে সুগভীর পাণ্ডিত্য, তা পাকিস্তানে অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। ফেকাহ শাস্ত্রে সাধারণ মাসয়ালা থেকে শুরু করে, পারিবারিক বিধান ও পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিধি এবং রসূল সা.-এর জীবনেতিহাস ও সমরবৃত্তান্তের যে সব বিষয় মাদরাসাগুলোতেও কদাচিত পড়ানো হয়ে থাকে, সেসব বিষয় মালিক সাহেবের কণ্ঠস্থ। এই জ্ঞান মাওলানার রহ. সাথে দৈনন্দিন মাসয়ালাগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণের বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে। সাধারণভাবে মালিক সাহেবের বেশ কয়েকটা লেখাই অত্যন্ত উঁচু জ্ঞানের গবেষণা ও যুক্তিবুদ্ধি সমৃদ্ধ। তবে তার জ্ঞানের গভীরতার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'খেলাফত ও মুলকিয়াত পর ইতিরাযাত কা এলমী জায়েযা' (খেলাফত ও রাজতন্ত্র সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা) এ গ্রন্থটি পড়লে বুঝা যাবে তিনি একদিকে যেমন একজন ফেকাহ ও হাদিস বিশারদ, অপরদিকে তেমনি ইতিহাস ও ইসলামি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

আধুনিক আরবি সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। এ যুগের বিশিষ্ট সিরিয় আলেম মরহুম ডক্টর মোস্তফা সাব্বায়ীর লেখা হাদিস বিষয়ক নিবন্ধ সমষ্টি, (যা উর্দুতে 'সুন্নাতে রসূল' নামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে) এবং মিসরের ইখওয়ান নেতা শহীদ আব্দুল কাদের আওদার প্রণীত গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া আওযাউনাল কানুনিয়াহ' এর উর্দু অনুবাদ 'ইসলাম কা নিযামে কানুন' (ইসলামের আইন ব্যবস্থা) মালিক সাহেবের আরবি ভাষায় পারদর্শীতার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।

উর্দুতেও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল বাচনভঙ্গীর অধিকারী করেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গীতে স্বয়ং মাওলানা মওদূদীর বাকরীতির প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। মাওলানার রচনার দুটো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হলো চমকপ্রদ বর্ণনাভঙ্গী আর অপরটি ক্ষুরধার যুক্তি।

মালিক সাহেবের লেখাতেও এ দুটো বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে বিদ্যমান। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মালিক সাহেব মাওলানার সাহচর্য থেকে তাঁর গুণাবলী আয়ত্ত করার ব্যাপারে এতোটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে, কোনো কোনো লেখায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ যেন ফুলের সাহচর্যে মাটির সুরভিত হয়ে যাওয়ার আরেক জ্বলন্ত উদাহরণ।

ব্যক্তিত্ব

মালিক সাহেবের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও স্বভাব চরিত্রে অতীতের মহান মনীষীদের ছাপ লক্ষ্যণীয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব আপাদমস্তক বিনয়ে মণ্ডিত। আত্ম প্রশংসার প্রবণতা নামমাত্রও নেই। মেজাজের দিক দিয়ে একেবারেই মাটির মানুষ। কথাবার্তায়

কোমলতা, প্রয়োজন ছাড়া নীরবতা পালন, বৈঠকাদিতে মাপজোখ কথা বলে ক্ষান্ত থাকা, বেশভূষা ও চালচলনে একেবারেই সাদাসিধে, বিদ্যার অতলান্ত সাগর অথচ বিদ্যার গর্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, জ্ঞানের অন্বেষায় সাহসী ও সংকোচহীন, আর মুখে সব সময় একই কথা যে, আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র।

মালিক সাহেব ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত মনোনয়নক্রমে ফেডারেল ইসলামি আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। চার বছর এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৮৫ সালে আদালত থেকে অব্যাহতি পান। বর্তমানে তিনি মানসূরায় ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আগের মতই গবেষণা কর্মে নিয়োজিত।

১৯২০ সালে মালিক সাহেবের জন্ম। আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন। সৎকর্মে নিয়োজিত রাখুন।

বক্ষমান গ্রন্থ রাসায়েল ও মাসয়েল ৬ষ্ঠ খণ্ড মালিক সাহেবের বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি। এর অধিকাংশ প্রশ্নোত্তর স্বয়ং মাওলানা মওদূদীর রহ. জীবদ্দশায় তিনি লিখেছিলেন। তার উপর মাওলানার এতোটা আস্থা জন্মে গিয়েছিল যে, একসময় তাঁর লেখা জবাবগুলো মাওলানা আর পড়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। এ যাবত আমরা কেবল মাওলানা মওদূদীর রহ. রচনাবলীই পাঠকবর্গের সামনে হাজির করেছি। এবার তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্যের রচনা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

খলিল হামেদী
ডাইরেক্টর
ইদারায়ে মা'আরেফে ইসলামি
মানুসূরা, লাহোর
১৫ নভেম্বর ১৯৮৬ ঈসায়ী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

১. আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় নিরসন

প্রশ্ন : আমি একজন গুনাহ্‌গার মুসলমান। দীর্ঘকাল অনৈসলামিক জীবন যাপন করেছি। কিছুদিন যাবত আমি ইবাদত ও কুরআন পাঠের আগ্রহ অনুভব করছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এর সাথে সাথেই আমার মনে নানা রকম সন্দেহ সংশয় জন্ম নিচ্ছে। আমি এগুলোকে চাপা দিতে চেষ্টা করছি। কিন্তু আশংকা হয় যে, এ সব সংশয় দূর করা না হলে এই বার্ধক্যে এসেও আবার আমার ইবাদত পরিত্যক্ত হয়ে যেতে পারে এবং পুনরায় আমি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে বসতে পারি। যে সংশয়টি বারবার আমার মনে জাগে, তা আমি মুখে উচ্চারণ করতে চাইনে। কিন্তু সেটি শুধু এ জন্য আপনার কাছে পেশ করছি, যেন আপনি আমাকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করতে পারেন। যে প্রশ্নটি থেকে থেকে আমার মনে জাগে, তা এই যে, আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছে? তিনি কিভাবে পয়দা হলেন? আল্লাহর দোহাই, আপনি আমার এই সংশয় দূর করে দিন, যাতে আমি এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে নিস্কৃতি পাই।

জবাব : আপনি যে প্রশ্ন ও সংশয়ের কথা স্বীয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, এ ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনে জাগা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আপনি যদি সামান্য একটু চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, এ ধরনের সন্দেহ সংশয় শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের মনেই জন্মে না, বরং যে কোনো নাস্তিক সংশয়বাদী ও খোদাদ্রোহীর মনেও এ ধরনের প্রশ্নাবলী জন্ম নিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দৃশ্যমান বিশ্বজগতের উর্ধে বা বাইরে এর কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব মানে না, অথবা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, তাকে কয়েকটা প্রশ্ন অত্যন্ত প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং জবাব দেবার দাবি জানায়। যেমন, এই সৃষ্টি জগতের প্রথম উদ্ভব কিভাবে হয়, এর আবির্ভাবের আসল কারণ বা উৎস কি, জীবন, শক্তি, পদার্থ ও বিবর্তনের যে অসংখ্য প্রতীক বা বাহন আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, সে সবের সূচনা কবে ও কিভাবে হয়েছিল এবং কে করেছিল? এ ধরনের প্রশ্ন কোনো না কোনোভাবে প্রত্যেক মানুষকেই বিব্রত করে থাকে– তা সে বিশ্বাসীই হোক, সংশয়বাদী হোক অথবা নাস্তিক হোক।

এরপর আরো একটু চিন্তাভাবনা করলে এ ব্যাপারেও সহজেই ধারণা লাভ করা যায় যে, বিশ্ব প্রকৃতির আবির্ভাব ও তার স্রষ্টা সংক্রান্ত এ ধরনের যাবতীয় প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব নিছক নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা, চেষ্টা সাধনা ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা লাভ করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্ব স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলীর কল্পনা করাটা অবশ্য অনেক উর্ধের ব্যাপার। তথাপি আমরা যদি ক্ষণকালের জন্য মহাবিশ্বের বাইরেও তার চেয়ে উচ্চতর ও ক্ষমতাধর কোনো শক্তি বা সত্তা এর স্রষ্টা হিসেবে বিদ্যমান আছে কিনা সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাই এবং শুধুমাত্র সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব মেনে নিয়েই ভাবতে শুরু করি, তাহলেও স্থান ও কালের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বাস্তব ও কাল্পনিক বিষয় এমন রয়েছে, যা পুরোপুরিভাবে আমাদের বোধশক্তির নাগালে আসতে অক্ষম। এ সব জিনিসের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি এতো বেশি যে, তা আয়ত্তে আনা তো দূরের কথা, একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তার কল্পনা করতেও আমরা অপারগ। উদাহরণস্বরূপ, কালের আদি অন্ত সম্পর্কে আমরা কি ভাবতে পারি যে, তার সূচনা কিভাবে ও কখন হয়েছে এবং তা কোথায় গিয়ে কিভাবে সমাপ্ত হবে? সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এবং অন্তরীক্ষের অন্যান্য বস্তু যে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে মহাশূন্যের সীমা সরহদ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, এই মহাশূন্যের সীমার ওপারে কোন্ জগত বিরাজ করছে, কল্পনার চোখ দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেও কি তা দেখার সাধ্য কারো আছে? এ ধরনের দু'একটা উদাহরণ দ্বারাই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির ক্ষমতা খুবই সীমিত। আমাদের চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির স্বাভাবিক পরিধিই এতো সংকীর্ণ ও সংকুচিত যে, একটা নির্দিষ্ট স্তর পেরিয়ে কোনো কিছু কল্পনা করাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি যখন এতোই অক্ষম ও সীমাবদ্ধ যে, সে সৃষ্টির রহস্যও পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেনা। তখন সে স্রষ্টার আদি অন্ত কিভাবে উপলব্ধি করতে পারবে?

বিশ্বস্রষ্টা সংক্রান্ত সংশয় যদি নিছুক ব্যাকুলতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে যা অনিচ্ছা বশতই অন্তরে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তবে তা থেকে কোনো ঈমানদার মুক্ত থাকতে পারে না। বরঞ্চ রসূল সা. একে ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। চোর দস্যু সেই গৃহেই হানা দেয়, যেখানে ধনসম্পদ বিদ্যমান। কাজেই ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ যে হৃদয়, তাকে এ ধরনের আক্রমণের শিকার হতেই হবে। তাই এ ধরণের চিন্তাভাবনা যদি অন্তরে শুধু আসা যাওয়া করে তবে সেটা তেমন উদ্বেগজনক ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক ও শাস্তিযোগ্য হবে তখনই, যখন মুমিন এসব কুপ্ররোচনাকে গুরুত্ব দেবে এবং একে অন্তরে প্রশ্রয় দিয়ে বদ্ধমূল করে লালন করবে ও ফলবান হবার সুযোগ দেবে। অথবা সচেতনভাবে এ প্রশ্নগুলোকে সমাধানযোগ্য মনে করে এর জবাব লাভের ব্যর্থ চেষ্টায় নিয়োজিত হবে এবং তার চর্চা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করবে। শেষোক্ত কর্মপন্থা একজন

মুসলমানের পক্ষে মোটেই সঙ্গত নয়। ইসলাম আমাদেরকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে, সেটা মনে বদ্ধমূল রাখলে আমরা এ কর্মপন্থা কখনো অবলম্বন করতে পারিনা। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর গুণাবলীকে অনুরূপ মানবীয় গুণাবলীর সাথে তুলনা করা সম্ভব নয়। উভয়ের মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনো সাদৃশ্যও নেই। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে যে, ليس كمثله شيئ 'তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই।' মানবীয় গুণাবলী সীমাবদ্ধ এবং বহিরাগত ও বস্তুগত সহায়ের মুখাপেক্ষী। আবার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তা বাধাবন্ধনহীন ও বহিরাগত সহায়ের ধার ধারেনা। দৃষ্টিশক্তি আমাদেরও আছে। তবে তা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। তাছাড়া আমাদের দৃষ্টিশক্তির কার্যকারিতার জন্য চোখ ও আলো অপরিহার্য। পক্ষান্তরে আল্লাহর দৃষ্টিশক্তি এসব সীমা ও বাধার ঊর্ধে। আমরাও শ্রবণ করি। কিন্তু আমাদের শ্রবণের জন্য কান ও বাতাসের সহায়তা প্রয়োজন। অথচ আল্লাহর শ্রবণের জন্য এসব মাধ্যমের কোনো প্রয়োজন নেই। জীবন ও অস্তিত্ব আমাদেরও আছে, তবে তা বহিরাগত সহায়ক শক্তি ও বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আল্লাহর জীবন ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। তিনি এমন চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা, যিনি আপন শক্তিতেই বহাল আছেন এবং সব কিছুতেই বহাল রেখেছেন। এভাবে চিন্তা গবেষণা চালালে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সঠিক ও প্রকৃত অর্থেই অনাদি ও অনন্ত। চিরস্থায়ী জীবন ও নিরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব তাঁর অমর, অক্ষয় ও অবিনশ্বর সত্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর জন্ম ও আবির্ভাবের প্রশ্ন তোলা দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিসের একত্র সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি নিজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আরেক স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হন, তিনি আবার কেমন স্রষ্টা?

এই দিব্য সত্যকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

هو الاول والاخر والظاهر والباطن

কুরআনের এ উক্তির অত্যন্ত চমকপ্রদ ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা রসূল সা. এভাবে করেছেন :

هو الاول ليس قبله شيئ هو الاخر ليس بعده شيئ هو الظاهر ليس فوقه شيئ هو الباطن ليس دونه شيئ -

"তিনি প্রথম। তাঁর পূর্বে কিছু নেই, তিনি শেষ তাঁর পরে কিছু নেই। তিনিই প্রকাশ্য। তাঁর ঊর্ধ্বে কিছু নেই। তিনিই গোপন, তাঁর কাছে গোপনীয় কিছু নেই।"

সর্বশেষে, অন্তরে অনুপ্রবেশকারী কু-প্ররোচনা সম্পর্কে রসূল সা.-এর কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করছি। আল্লাহ চাহে তো এতে আপনার সকল দুশ্চিন্তা ও সংশয়ের অবসান ঘটবে :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتى ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به اوتتكلم -

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে রসূল সা. বলেছেন আল্লাহ আমার উম্মতের মনের যাবতীয় কুচিন্তা ও সন্দেহ সংশয়কে মাফ করে দিয়েছেন, যদি না সে তা কার্যে পরিণত করে কিংবা কারো সাথে আলোচনা করে।"

عن ابن عباس رضى عن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال انى احدث نفسى بالشيئ لان اكون حممة احب الى من ان اتكلم به قال الحمد لله الذى رد امره الى الوسوسة -

"ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো আমার মনে মাঝে মাঝে এমন সব কুচিন্তা আসে, যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে আমি পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া অধিকতর পছন্দ করি। রসূল সা. বললেন আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারটিকে কেবল কুচিন্তার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।"

عن ابى هريرة رضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله ورسوله -

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূল সা. বলেছেন মানুষ নানা রকমের প্রশ্নোত্তর করতে থাকবে। এমনকি এক সময় এ প্রশ্নও তোলা হবে যে, আল্লাহ তো এই গোটা জগতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যে ব্যক্তির সামনে এ জাতীয় কথাবার্তা উচ্চারিত হবে সে যেনো বলে আমি শুধু এটুকুই যথেষ্ট মনে করি যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের উপর ঈমান এনেছি।"

আর একবার রসূল সা. বলেন এ ধরণের কুচিন্তার উদ্ভবকালে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে এবং ওখানেই থেমে থাকবে। যে ব্যক্তি এখানে থামবেনা এবং কল্পনার লাগাম টেনে ধরবেনা, তার গোমরাহীর সীমাহীন প্রান্তরে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো লাভ হবেনা। *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৫৪]*

২. প্রশ্ন : আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। এখন আমি জীবনের এমন একটা সময় অতিক্রম করছি, যখন মানসপটে যে ছবিই অংকিত হয়, তা হয় আনন্দ ও তৃপ্তির উৎস, নয় মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এক সময় ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনে বিশ্বাসের পরিবর্তে নানা রকমের সন্দেহ সংশয় জন্ম নিতে শুরু করেছে। আমি নামাজও পড়ি। তবে তা নিতান্তই প্রথাসিদ্ধ কাজ হিসেবে। আমার মনে যেসব ধ্যান ধারণার উদ্ভব হয়, তা আপনার কাছে তুলে ধরছি।

আল্লাহর অস্তিত্বকে বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর আলোকে কিভাবে প্রমাণ করা যায়? এমনটি হওয়া কি সম্ভব নয় যে, আদিম যুগের মানুষ এ ধারণাটা উদ্ভাবন করে নিয়েছিল এবং তার পর এটা পুরুষানুক্রমে আমাদের পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়েছে? সে সময় মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ও বিশ্বজগতের বস্তু নিচয়ের রহস্য জানতো না। কিন্তু আজ সে বিশ্বচরাচরের যাবতীয় রহস্য জেনে ফেলেছে এবং স্রষ্টার বিশ্বাসের প্রয়োজন কি, তা অনেকের বুঝে আসেনা। আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নিলেও কিছু কিছু তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য মনে হয়। রসূল সা.-এর মিরাজ শারীরিকভাবে হয়েছিল এ কথাই এ যাবত শুনে এসেছি। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাশূন্য সংক্রান্ত অন্য যেসব নিয়ম চালু রয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে এ ঘটনা বুঝে আসেনা। অন্যান্য মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনার ক্ষেত্রেও একই জটিলতা দেখা দেয় যে, প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন না করে ঐ ঘটনাগুলো ঘটতে পারেনা। অথচ আল্লাহ তার নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন ঘটান না। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হলে কি পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে পারে?

জবাব : আপনার মনে যে প্রশ্নগুলোর উদ্ভব হচ্ছে, তা কোনো তাজ্জবের ব্যাপার নয়। যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের মনে এ ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করা কোনো মানুষেরই উচিত নয়, যাতে তার লাগামহীন প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ হয় এবং যা তাকে জড় পদার্থ, গাছপালা কিংবা পশুপাখির মতো নৈতিক চেতনাহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বানিয়ে দেয়। এ ধরণের উত্তর অনুসন্ধান থেকে নিবৃত্ত থাকাতেই তার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে তাদের অধিকাংশেরই অস্বীকৃতির একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহকে মেনে নিলে তাদেরকে কতিপয় বিধিনিষেধের অধীন জীবনযাপন করতে হয়। তা না হলে আপনি ভেবে দেখুন তো, একজন বিজ্ঞানীর কাছে আল্লাহকে অস্বীকার করার পক্ষে কি যুক্তি প্রমাণ থাকতে পারে? বিজ্ঞান তো শুধু পার্থিব জগত নিয়েই আলোচনা গবেষণা করে, যা বস্তু ও শক্তি নিয়েই গঠিত অথচ এই বিজ্ঞানই স্বীকার করে যে, এই বস্তু জগৎ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয়, আপনা আপনিও গঠিত হয়নি এবং তা অনন্তকাল স্থায়ী হতেও সক্ষম নয়, তেমনি কিভাবে নির্জীব পদার্থের জীবনের আবির্ভাব ঘটে এবং কিভাবেই বা তা বিলুপ্ত হয়, সে কথাও বলতে পারে না। মহাবিশ্বের এমন কোনো সীমাপরিসীমা নেই এবং তার সীমানার এমন কোনো প্রথম প্রান্ত ও শেষ প্রান্ত নেই, যা মানুষের নাগালে আসতে পারে। এমতাবস্থায় মহাবিশ্বের এমন একজন সৃষ্টিকর্তা ও নির্মাতার অস্তিত্ব মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যিনি গোটা বিশ্বের চেয়েও বিরাট ও বিশাল এবং যার অবস্থান বিশ্বজগতের ঊর্ধে ও নেপথ্যে। এছাড়া রহস্যের উন্মোচন আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অন্তত: এটুকু যুক্তির আওতায় এবং এই ব্যাখ্যার আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীই স্বীকার করে

থাকেন এবং কোনো বিজ্ঞানীই আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারেন না।

১. কয়েক বছর আগে আমেরিকায় দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নামকরা চল্লিশজন বিজ্ঞানীর নিবন্ধন সম্বলিত একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। 'খুদা মওজুদ হায়' এই শীরোনামে লাহোরের প্রাংকলিন প্রকাশনী উর্দুতে এবং 'চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব' এই শীরোনামে ঢাকায় একটি প্রকাশনী বাংলায় পুস্তকটি প্রকাশ করে। এরপর যে প্রশ্ন বাকি থাকে তা হলো, আল্লাহ যদি থেকে থাকেন তবে তিনি কেমন সত্তা ও গুণাবলীর অধিকারি? তাঁর ইচ্ছে ও মর্জি কি এবং মানুষের কাছে তিনি কি চান? এসব প্রশ্নের জবাব কেউ নিজস্ব বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে দিতে পারেন না– তা তিনি বিজ্ঞানীই হোন বা অবিজ্ঞানীই হোন। এর জবাব শুধু আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূলই দিতে পারেন এবং তাঁর জবাব যে অকাট্য সত্য, সে ব্যাপারে তাঁর নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রই সাক্ষী।

২. ধর্ম ও আল্লাহ সংক্রান্ত বিশ্বাস নিছক মানবীয় মস্তিষ্কের আবিষ্কার এ কথা যদিও সঠিক নয়, তবু প্রশ্ন এই যে, একটি ধারণা বিশ্বাস মানবীয় মনমস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত বলেই কি বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকতে পারেনা? মানুষের মস্তিষ্কজাত হওয়াই কি অবাস্তব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে? এমন কি হতে পারেনা যে, আল্লাহর অস্তিত্ব আসলেই একটা জ্বলন্ত সত্য এবং মানুষের মনে তারই প্রতিবিম্ব রেখাপাত করে? মানুষের মনমস্তিষ্ক যে আবহমানকাল ধরে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণা পোষণ করে আসছে, এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ নেই? এটা তো বরং আল্লাহর অস্তিত্বেরই একটি প্রমাণ।

এ যুক্তিটাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, প্রকৃতির নিয়ম আগেকার যুগের মানুষের জানা ছিলনা বলেই তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। প্রশ্ন এই যে, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক রীতি সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত রহস্য ও বিস্তৃত তত্ত্ব তথ্য কি মানুষ ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, কিংবা কখনো তা জানতে পারবে? আপনি কি আমাকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন যে, অসংখ্য জ্যোতিষ্কপিন্ডে ভরপুর এই মহাবিশ্বের শেষ কোথায় এবং সেই শেষ প্রান্তের ওপারে কি আছে? ধরে নিলাম, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম আপনি রপ্ত করে ফেলেছেন। তথাপি আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন এই রহস্যঘেরা নীরব নিঝুম প্রকৃতির এসব নিয়ম রীতি কার তৈরি এবং প্রকৃতির এই সব উপাদানকে ঐ নিয়ম রীতি মেনে চলতে কে বাধ্য ও বশীভূত করে রেখেছে?

৩. মিরাজ শারীরিক না আত্মিকভাবে হয়েছিল, তা নিয়ে যদিও পূর্বতন মুসলিম মনীষীদের মধ্যে কিছু মতভেদ হয়েছে, তবে আমাদের মতে, সঠিক তথ্য এই যে,

এটা একসাথে শারীরিক ও আত্মিক উভয়ভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন কেবল তখনই জন্মে, যখন মানুষ তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দিয়ে প্রতিটি বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। সে মনে করে, এই বিশ্বপ্রকৃতি যেমন কতিপয় আইন কানুনের অধীন, তেমনি এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাও এসব আইন কানুনের অনুগত ভৃত্য এবং নিজের তৈরি নিয়মবিধির শৃংখলে তিনি নিজেও বাঁধা। অথচ ও ধারণাটা মূলতই ভুল ও বাতিল। আল্লাহ যখন ইচ্ছে নিজের আইন-কানুন ও নিয়ম রীতিতে রদবদল ঘটাতে পারেন এবং সেই রদবদলও তাঁর আইন অনুসারেই হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত নিয়ম এই যে, আল্লাহ নর ও নারীর মিলনক্রমে মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু নর ও নারীর এই মিলন মানব সৃষ্টির কোনো চিরন্তন ও অলংঘনীয় বিধান হতে পারেনা। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ ছাড়াও মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ইচ্ছে করলে মধ্যাকর্ষণের বিধানকে নিষ্ক্রীয় করে দিতে পারেন এবং স্বীয় বান্দাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে তাঁর জ্যোতি বিচ্ছুরিত ও কেন্দ্রিভূত। আল্লাহ ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণের জন্য চাঁদকে দু'টুকরো করে দিতে এবং পৃথিবী ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পিণ্ডকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারেন। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আল্লাহর বিধান অটল ও তাঁর সিদ্ধান্ত অকাট্য। তিনি এগুলোর রদবদল করেন না। কিন্তু আল্লাহর বিধান কি এবং তাঁর সিদ্ধান্তগুলোই বা কি, সেটা আমরা কেমন করে জানবো। আল্লাহ যে জিনিসকে নিজের বিধান বলে মনে করেন, তা অবশ্যই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যে জিনিসকে আমরা আল্লাহর বিধান বলে মনে করি, তাতে সব সময়ই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। যেমন এক ব্যক্তি মনে করে যে, সূর্য সব সময় পূর্ব দিক থেকে উঠবে বা উঠতে দেখা যাবে এটাই আল্লাহর বিধান। কিন্তু আল্লাহর বিধান এমনও হতে পারে যে, এক দিন তার গতিবিধি পাল্টে দেয়া হবে কিংবা তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত করা হবে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, কুরআনে 'সুন্নাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর বিধান' কথাটি দ্বারা সর্বোতভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম রীতিকে বুঝানো হয়নি, বরং নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবীর জাতিসমূহের ও মানব সভ্যতার উত্থান পতন অথবা বিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত। আর এটাও এমন কোনো ধরাবাধা একক বিধান নয়, বরং অত্যন্ত ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত এক নীতিমালা, যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে চালু ও কার্যকর রয়েছে। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৭৪]*

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করা

প্রশ্ন ১৯৫৫ সালের এপ্রিল সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর প্রবন্ধের একটি অংশ মে ১৯৫৫ সংখ্যা মাসিক তুলুয়ে

ইসলাম পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশটি নিম্নে প্রদত্ত হলো "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মধ্যে যেমন পার্থক্য ও ভেদাভেদ করা চলেনা, তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেও ভেদাভেদ করার অবকাশ নেই।"

অতপর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে মাওলানা ইসলাহী সাহেবকে সম্বোধন করে 'তুলুয়ে ইসলাম' লিখেছেন "এক রসূলের সাথে অন্যান্য রসূলের ভেদাভেদ করা যাবে না– এ কথা তো কুরআনে আছে। কিন্তু এ কথা কোথাও বলা হয়নি যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের মধ্যে পার্থক্য করা চলবেনা। ...দাস ও মনিবের মধ্যে পার্থক্য না করা সুস্পষ্ট শিরক। আপনার এ বক্তব্যের পেছনে কোনো প্রমাণ থেকে থাকলে জানাবেন কি?"

এ কথা ঠিক যে, মাওলানার উক্তির পূর্বাপর বিবেচনা করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মধ্যে বৈষম্য না করার এই নির্দেশ কেবল হুকুমদাতা ও আইন প্রণেতা হিসেবে উভয়ের অস্তিত্ব মর্যাদার ভিত্তিতেই দেয়া হয়েছে। তথাপি তরজমানুল কুরআনের বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়।

জবাব সোজা কথায় যে ব্যক্তি বক্রতা খোঁজে এবং বক্রতা খুঁজে বের করার চেষ্টায় লেগে থাকে, পৃথিবীতে তার রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। স্বয়ং কুরআন সাক্ষী রয়েছে যে, বিকৃত স্বভাবের লোকেরা আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলোতেও বক্রতার সন্ধান করা ও অবান্তর তর্ক জুড়ে দেয়া থেকে কখনো বিরত থাকতে পারেনি। এ ধরনের লোকেরা কোনো মানুষের কথাবার্তায় সামান্যতম ভাষাগত জটিলতা থাকলে তা থেকে কুফরি এবং শিরক উদঘাটন করবে, তাতে আর অসুবিধা কোথায়? যা হোক, এসব লোকের জবাব দেয়ার জন্য নয়, বরং আপনার পরিতৃপ্তির জন্য একটু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

'আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ করা।' এক রসূলের সাথে আর এক রসূলের প্রভেদ করা কুরআনের একটা বিশেষ পরিভাষা। কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ভীতি সহকারে ও বুঝে শুনে সমগ্র কুরআন জীবনে একবারও পড়ে, তবে সে এই পরিভাষার সঠিক ও কুরআন সমর্থিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করে পারেনা। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য করার অর্থ হলো, আল্লাহর উপর ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর হুকুমকে ইসলামের উৎস ও অকাট্য দলীল হিসেবে স্বীকার করার দাবি করা হবে। কিন্তু রসূলের উপর ঈমান আনা হবেনা। তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ অনুসরণের অঙ্গীকার করা হবেনা, এবং তাঁর নির্দেশকে ইসলামের উৎস ও অকাট্য মৌল দলীল হিসেবেও মানা হবেনা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা বলতে উভয়ের সত্তায় যে বিভিন্নতা রয়েছে তা বুঝানো হয়নি। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মধ্যে প্রভেদ করা যাবেনা বলে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার তাৎপর্য এই যে, উভয়ের

উপর ঈমান আনতে হবে, উভয়ের আনুগত্য করতে হবে এবং উভয়ের নির্দেশাবলীকে ইসলামের উৎস ও চূড়ান্ত দলীল বলে মানতে হবে। ঐ নির্দেশ দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, উভয়ের সত্তাকে অভিন্ন সত্তা মনে করতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে প্রভেদ করা চলবেনা। বস্তুত: এই প্রভেদ করা বা না করা আল্লাহ ও রসূলের সত্তার স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়ে নয়, বরং উভয়ের উপর ঈমান আনা ও উভয়ের আনুগত্যের দিক দিয়ে।

অনুরূপভাবে রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ করার অর্থ হলো নবী ও রসূলগণের মধ্যে কোনো একজন বা কয়েকজনের উপর ঈমান আনার দাবি করা এবং অন্য কোনো রসূল বা রসূলদের উপর ঈমান না আনা। রসূলদের মধ্যে যে ভেদাভেদ ও বৈষম্য করার সমালোচনা করা হয়েছে, তাঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার তারতম্যকে স্বীকার করা তার আওতায় আসেনা। এধরনের পার্থক্যকে কে অস্বীকার করতে পারে? আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন যে, আমি তাঁদের কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাগত তারতম্যটাও মূল রিসালাতের পদের দিক দিয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত গুণ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নির্ণিত হয়েছে। বস্তুত: এ বিষয়টার ব্যাখ্যা সাথে সাথেই দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ ও বৈষম্য না করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার অর্থ এই যে, সকল নবী ও রসূলের উপর ঈমান আনতে হবে। তবে এর দ্বারা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে হবে এটা কখনো বুঝানো হয়নি।

কুরআন আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে ভেদাভেদ এবং রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ না করাকে ঈমানের আলামত ও ভেদাভেদ করাকে কুফরির আলামত বলা হয়েছে। আপনি মাসিক তুলুয়ে ইসলামের এ কথাটিকে এক পাশে রাখুন যে, "কুরআনে এক রসূলের সাথে অন্য রসূলের পার্থক্য করতে তো নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য করতে নিষেধ করা হয়নি।" অত:পর নিম্নের আয়াত কয়টি পড়ুন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً • أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا • وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء ١٥٠-١٥٢)

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তাঁর রসূলদের প্রতি কুফরিতে লিপ্ত হয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ভেদাভেদ করতে চায়, কাউকে মানি ও কাউকে মানিনা বলে ঘোষণা করে এবং একটা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই আসল

কাফির। আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এঁদের কারো মধ্যে ভেদাভেদ করেনি। তাদেরকে আল্লাহ অচিরেই পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" *(সূরা আন নিস, আয়াত : ১৫০-১৫২)*

এবার আয়াত ক'টিতে যে বক্তব্য বিধৃত হয়েছে, তা কি মাওলানা ইসলাহীর উদ্ধৃত বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করছে না এবং তুলুয়ে ইসলামের উল্লিখিত আপত্তিতে সর্বোতভাবে খণ্ডন করছে না? তুলুয়ে ইসলামের আশ্রয়পুষ্ট হাদিস বিরোধী মহলটির হাদিসের উপর হস্তক্ষেপ করতে করতে এতোই কি ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে এবং এতোটাই কি হাত পেকে গেছে যে, এখন তারা কুরআনের উপরও হাত সাফাই করা শুরু করে দিয়েছে। কুরআনের এ আয়াতগুলোর আয়নায় তুলুয়ে ইসলামের নিজের চেহারা বা তদ্‌সদৃশ চেহারা ভেসে ওঠে বলেই কি তারা এ আয়াতগুলোকে উপেক্ষা করতে উদ্যত। *(তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৫৫)*

৩. জীবজন্তুর উপর দয়া

প্রশ্ন : আমি পশু চিকিৎসা বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং 'জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ' কার্যক্রমে নিবেদিত। ইসলামের সেই সব নির্দেশ ও হেদায়াত আমার প্রয়োজন, যা থেকে বুঝা যায় যে, জীব জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা মানুষের কর্তব্য। কুরআনে এ বিষয়ে আভাস ইঙ্গিত তো রয়েছে। যেমন জীব জানোয়ারের কান ছিদ্র করাকে শয়তানি কুকর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে আমি আরো কিছু বিস্তারিত নির্দেশাবলী চাই। সম্ভবত হাদিসেও এ ধরণের নির্দেশ থাকতে পারে। তাই আমাকে সেই হাদিসগুলো জানাবেন। লন্ডনে এ উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে যে, আমি অন্তত সেখানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে একটি নিবন্ধ পেশ করি।

জবাব : জীবজন্তুর ব্যাপারে আপনার আগ্রহ ও সহানুভূতি ইসলামি শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে আপনি একটি নিবন্ধের মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাও অত্যন্ত মহৎ ও অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ। এ বিষয়ে বহু হাদিস রয়েছে। স্বল্প অবকাশে বেশি সংখ্যক হাদিস যোগাড় করা ও উদ্ধৃত করা তো সহজ নয়। তথাপি আপাততঃ হাদিসের অনুবাদ দিচ্ছি। এই সাথে সূত্রের উল্লেখ করা হলো। প্রয়োজন হলে আপনি মূল হাদিসগ্রন্থ থেকে আরবি হাদিসসমূহও পড়ে দেখতে পারেন :

১. রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে, তোমরা যখন কোনো পশুর উপর সওয়ার হয়ে শস্য শ্যামল এলাকা দিয়ে যাও তখন উক্ত জানোয়ারকে সেখানকার ঘাসপাতা খেয়ে নিজের অধিকার আদায় করতে দাও। আর যখন ঘাস পানিহীন শুষ্ক জায়গায়

উপনীত হও, তখন ঐ জায়গাটা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে যাও। *(সহীহ মুসলিম, শাসন সংক্রান্ত অধ্যায়, জীবজন্তুর স্বার্থ ও অধিকার বিষয়ক বিধিসমূহ)।*

২. একবার রসূলুল্লাহ সা. ভ্রমণরত ছিলেন। ঐ কাফেলায় এক মহিলাও একটি উষ্ট্রীর আরোহিনী ছিলো। এক জায়গায় উষ্ট্রীটি লাফালাফি করলে মহিলা তাকে অভিসম্পাত দিতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : তুমি ওর পিঠের উপর থেকে নেমে যাও এবং নিজের জিনিসপত্রও নামিয়ে নাও। কারণ তুমি ওকে অভিশাপ দিয়েছো। *(সহীহ মুসলিম, সৌজন্য ও সদাচার সংক্রান্ত অধ্যায়, জীবজন্তুকে অভিসম্পাত করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা)।*

৩. রসূলুল্লাহ সা. বলেন এক পিপাসার্ত পথচারি একটি কূয়ায় নেমে পানি পান করলো। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো একটি কুকুর ছটফট করছে এবং পিপাসার চোটে কাদা মাটি খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে বললো, আমার যে দুর্গতি হয়েছিল এই কুকুরটার তো তাই হয়েছে। তাই সে নিজের জুতায় করে কূয়া থেকে পানি এনে কুকুরকে খাওয়ালো। আল্লাহ তার এই কাজটিকে কবুল করে নিলেন এবং তার গুণাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ বললেন হে রসূল! জীবজন্তুর উপকার করলেও কি সওয়াব হয়? তিনি বললেন : হৃদপিণ্ড ও কলিজার আর্দ্রতার অধিকারি যে কোনো জীবন্ত সৃষ্টির উপকার করলে সওয়াব পাওয়া যায়। *(বুখারি, পান সংক্রান্ত অধ্যায়, পানি পান করানোর ফজিলত)।*

৪. একবার স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সা. এমন এক মহিলাকে দেখতে পান, যাকে একটি বিড়াল আপন নখর দিয়ে আঁচড়াচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই মহিলার কি হয়েছে? তাঁকে জানানো হলো যে, সে ঐ বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো। ফলে সে ক্ষুধায় মারা গিয়েছিলো। *(বুখারি, পান সংক্রান্ত অধ্যায়, পানি পান করানোর ফজিলত)*

৫. একবার কোথাও যাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সা. একটি উটকে দেখলেন, (অনাহারের দরুন) তার পেট ও পিঠ এক সাথে লেগে গেছে। তিনি (সমবেত লোকদেরকে) বললেন এই অবলা প্রাণীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুস্থ অবস্থায় তাদের উপর আরোহন করো এবং সুস্থ অবস্থায় রেখেই তাদের উপর থেকে নেমে যেও। *(আবু দাউদ, জিহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়, জন্তুর পিঠে আরোহণকালে যা যা করণীয়)।*

৬. একবার রসূলুল্লাহ সা. আনসারদের এক বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটা উট ছিলো। রসূলুল্লাহ সা.-কে দেখে উটটি একটি আক্ষেপসূচক ধ্বনি তুললো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি উটের কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং 'এই উটের মালিক কে, এই উটের মালিক কে' বলে হাকডাক করলেন।

জনৈক আনসার যুবক হাজির হয়ে বললো! 'হে রসূল! এটা আমার।' তিনি বললেন: "এই যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো তোমাদের মালিকানায় দেয়া হয়েছে, এদের

ব্যাপারে কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করোনা? এই জন্তুটি তো আমার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে যে, তুমি তাকে ভুখা রাখ এবং কঠোর খাটনি খাটাও।" *(আবু দাউদ, উপরোক্ত অধ্যায়)।*

৭. রসূলুল্লাহ সা. জীবজন্তুর লড়াই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছেন।

৮. রসূলুল্লাহ সা. একবার পথিপার্শ্বে একটা গাধা দেখলেন, যার মুখমণ্ডলে চিহ্ন খোদিত করা হয়েছে। তিনি বললেন জানোয়ারের মুখ খোদাইকারি ও মুখে প্রহারকারিকে যে আমি অভিশাপ দিয়েছি, তা তোমরা জান না? *(আবু দাউদ, ঐ)।*

৯. রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন সাবধান, জীবজন্তুর পিঠকে যাবতীয় কাজকর্মের আখড়া বানিও না। আল্লাহ যে এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করেছেন, সেটা শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা যেনো তোমাদের সেই সব গন্তব্যস্থলে যেতে পারো যেখানে বিনা যানবাহনে পৌঁছাতে তোমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যমিন বানিয়েছেন। তোমাদের অন্যান্য কাজ সেই যমিনের উপর বসে সম্পন্ন করো। *(আবু দাউদ, ঐ)।*

১০. রসূলুল্লাহ সা. পিঁপড়ে ও মৌমাছিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসনাদে আহমদ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৪৭)।*

১১. একবার রসূলুল্লাহ সা. সফরে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেন। জনৈক সাহাবি জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে একটি পাখির ডিম নিয়ে এলেন। পাখিটি এসে রসূলুল্লাহ সা. ও ঐ সাহাবির মাথার উপর উড়তে ও পাখা ঝাপটাতে লাগলো। তিনি বললেন তোমরা কেউ ওকে কষ্ট দিয়েছো নাকি? সাহাবি বললেন আমি ওর ডিম নিয়ে এসেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এসো। *(মুসনাদে আহমদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০৪)।*

১২. একবার রসূলুল্লাহ সা. এক পিঁপড়ের ঢিবির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢিবিটা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন "কাউকে এমন শাস্তি দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে বৈধ নয়, যে শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" *(মুসনাদে আহমাদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৩) [তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৫৫]*

৪. পাঁচ ওয়াক্ত ও পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায

প্রশ্ন : মিরাজ সংক্রান্ত যে হাদিসটিতে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত এবং পরে হযরত মূসার আ. পরামর্শক্রমে সর্বশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার উল্লেখ রয়েছে, হাদিস বিরোধীরা সেই হাদিসটির উপর নানা রকমের বিদ্রূপমিশ্রিত আপত্তি তুলে থাকে। তারা বলে আল্লাহ যখন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন, তখন কি তিনি বুঝতে পারেননি যে, আমি একটা অসাধ্য কাজের হুকুম দিচ্ছি? কেবল হযরত মূসার পরামর্শ এবং হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবেদন পাওয়ার পরই কি তিনি নিজের বাড়াবাড়ি টের পেলেন? হযরত মূসা কি (নাউজুবিল্লাহ) স্বয়ং আল্লাহ

ও মুহাম্মদ সা.-এর চেয়েও বেশি জ্ঞানী যে, যে কথা হযরত মূসা আ. তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারলেন, তা আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবীর মাথায় সময়মত এলোইনা? ইসলামের অকাট্য বিধানগুলো কি আল্লাহ এভাবেই নির্ধারণ করেন যে, পঞ্চাশ থেকে শুরু করেন এবং পাঁচ পর্যন্ত পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান? হাদিস বিরোধীদের ধারণা, এ হাদিস কোনো ইহুদির মনগড়া যাতে তাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তারা বলে, নামায যদি প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয করা হয়েও থাকে, তথাপি পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আবার পঞ্চাশ ওয়াক্তের উল্লেখ করার কি দরকার ছিলো। এতে কি অকারণ একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়না এবং এ ধরনের হাদিসগুলো কি অমুসলিমদের হরেক রকম প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দেয়না? কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা এসব হাদিসকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। এ হাদিসটি কতখানি শুদ্ধ অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করবেন, যাতে হাদিস বিরোধীদের আপত্তি নিরসন হয়ে যায়।

জবাব : এ হাদিস সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও নির্ভুল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে সংখ্যার দিক থেকে বেশি নয়, তাই হাদিস বিরোধীদের মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে একটা প্রাণান্তকর বোঝা মনে করে এর সংখ্যা কমানো, তাৎপর্যকে বিকৃত করা এবং মনগড়াভাবে কিছু রহিত করা ও কিছু রদবদল করার অপচেষ্টা করা উচিত নয়, এটা বুঝানোই এ হাদিসের উদ্দেশ্য। এ হাদিস দ্বারা মুসলমানদেরকে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, নামায অতি নিম্ন সংখ্যক রাখা হয়েছে এবং তা আসলে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই স্থলাভিষিক্ত। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। নচেত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযও যদি ফরয হতো, তবু তা অন্যায় হতোনা।

আমরা যদি হেদায়াত অন্বেষণের মনোভাব নিয়ে এ হাদিস অধ্যয়ন করি তাহলে তা থেকে উপরোক্ত শিক্ষাই অর্জিত হয়। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান, অজ্ঞতা ও উপহাসের মনোভাব নিয়ে এ হাদিসকে দেখি, তাহলে আপনি যে সব আপত্তি ও প্রশ্ন উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলো অবশ্যই জন্মে। আর শুধু এই হাদিস কেন, এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা চালানো হলে অন্যান্য বহু সংখ্যক হাদিস, এমনকি বহুসংখ্যক আয়াতের উপরও এ রকম অনেক আপত্তি তোলা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, জিহাদের নির্দেশ দিতে গিয়ে সূরা আনফালের এক জায়গায় আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (الانفال ٦٥)

"হে নবী! মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের পক্ষে বিশজন ধৈর্যশীল লোক হলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর একশ' জন হলে তারা এক

হাজার জন কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কেননা তারা নির্বোধ।"*(সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৬৫)*

এখানে স্পষ্টতই কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয়ী হবার জন্য আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ও কাফেরদের শক্তি অনুপাত যথাক্রমে এক ও দশ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অব্যবহিত অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (سورة الانفال ۶۶)

"এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দায় দায়িত্ব আরো হালকা করে দিলেন এবং তোমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা তিনি অবহিত আছেন। অতএব, এখন তোমাদের পক্ষে একশ' জন ধৈর্যশীল লোক হলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের পক্ষে এক হাজার জন হলে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় দু'হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" *(সূরা আল আনফাল, আয়াত: ৬৬)*

এখানে লক্ষ্য করুন বিজয় নিশ্চিত করার জন্য দু'পক্ষের সংখ্যানুপাতকে ১:১০ থেকে কমিয়ে ১:২ করা হয়েছে। এখন যদি সাময়িকভাবে হাদিস অমান্যকারীদের মানসিকতা অবলম্বন করা হয়, তা হলে পূর্বোল্লিখিত হাদিসটিতে যে ধরণের আপত্তি তোলা হয়েছে, এখানেও তা তোলা যায়। যেমন বলা যায় প্রথম আয়াতটি নাযিল করার সময় কি মুসলমানদের দুর্বলতার কথা আল্লাহর জানা ছিলো না যে, খামোখাই এক ও দশের অনুপাত ঘোষণা করে দিলেন। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আসল অনুপাতটার উল্লেখ বাদই পড়ে গেলো এবং একই নিঃশ্বাসে অনুপাতটা পাল্টে দেয়া হলো, তখন পেছনের অনুপাতটা বর্ণনা করে আমাদেরকে অনর্থক ঝামেলায় ফেলা হলো কেন? অনুরূপভাবে সূরা মুযযাম্মিলে প্রথমে বললেন :

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۰ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا ۰ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۰ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

"ওহে কম্বল মুড়ি দেয়া ব্যক্তি! রাত জাগো। তবে বেশি রাত জেগোনা। রাতের অর্ধেক কিংবা কিছু কম, অথবা কিছু বাড়িয়ে নাও। আর ধীরে ধীরে কুরআন অধ্যায়ন করো।" সূরা আল মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ১-৪ পরক্ষণে আবার বললেন :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ

الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ •

"তোমার প্রভু জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অর্ধাংশ এবং এক তৃতীয়াংশ জেগে কাটাও। তোমার সহচরদের একটি দলও এরূপ করে থাকে। দিন ও রাতের পরিমাণ তো আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেন। আল্লাহ অবগত হয়েছেন যে, তোমরা এ কাজে সক্ষম হবেনা। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতোটা সহজসাধ্য হয় ততোটা পড়। আল্লাহ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ থাকবে, অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করবে, আবার কতোক লোক আল্লাহর পক্ষে লড়াই করবে। সুতরাং কুরআন থেকে যতোটুকু হয় পড়।" *(সূরা আল মুজ্জাম্মিল, আয়াতাংশ : ২০)*

এখানেও আপত্তি তোলার অবকাশ রয়েছে যে, নির্দেশ জারি করার এ-তো ভারি অদ্ভুত নিয়ম! প্রথমে তো রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম বেশি জাগার হুকুম দেয়া হলো। তারপর আবার বলা হলো যে, আল্লাহ অবগত হয়েছেন তোমরা এ নির্দেশ পালন করতে পারবেনা। তিনি এ কথাও জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের কারো অসুখ বিসুখ হবে। কেউ সফরে বা প্রবাসে থাকবে এবং কেউ আল্লাহর পথে লড়াইতে লিপ্ত হবে। তাই এখন রাতের অর্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ ও দুই তৃতীয়াংশ সংক্রান্ত কড়াকড়ি রহিত করা হলো। তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হলো যে, সহজে যতোটুকু কুরআন পড়তে পারো পড়। এখানে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার কি পরে হুশ হলো যে, আমি একটা অসম্ভব কাজের হুকুম দিয়ে ফেলেছি (নাউজুবিল্লাহ) এবং এখন বলছেন "তিনি জানতে পেরেছেন যে, তোমরা এ নির্দেশ পালন করতে পারবে না।" আমাদের কতোক অসুখে ভুগবে, সফর করবে, লড়াইও করবে, তা কি তিনি এখন টের পেলেন যে, রাত জাগরণের আগের নির্ধারিত পরিমাণকে একটা বাড়াবাড়ি মনে করে তা পাল্টানো হচ্ছে। আরো একটা উদাহরণ নিন। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"যখন আমি মূসার আ. কাছ থেকে চল্লিশ রাত অবস্থানের অঙ্গিকার গ্রহণ করলাম।" *(সূরা আল বাকারা, আয়াতাংশ : ৫১)* অপর জায়গায় বলা হয়েছে :

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ

"আমি মূসার আ. কাছ থেকে ত্রিশ রাত অবস্থানের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম এবং আরো দশরাত তাতে যোগ করেছিলাম।" *(সূরা আল আ'রাফ, আয়াতাংশ : ১৪২)*

অর্থাৎ এক জায়গায় বলা হয়েছে আমি চল্লিশ দিন ঠিক করেছিলাম। অন্যত্র বলা হয় আমি প্রথমে ত্রিশ দিন ঠিক করেছিলাম এবং পরে আরো দশ দিন বাড়িয়ে

চল্লিশ দিন পূর্ণ করি। একজন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোক এখানেও প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এটা কি ধরনের বর্ণনাভঙ্গি যে, এক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে চল্লিশ দিনের মেয়াদ উল্লেখ করা হলো, আর অন্যত্র বলা হলো ত্রিশ দিন। অত:পর তার সাথে দশ দিন বাড়িয়ে পূর্ণ করা হলো। এই কৃত্রিমতার কারণ কি?

এই দু'তিনটি উদাহরণ থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, সমালোচনা ও খুঁত ধরার প্রবণতা থাকলে হাদিস দূরে থাক, স্বয়ং কুরআনের এক একটি আয়াতের উপরও আপত্তির স্তূপ লাগিয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু মানুষ যদি শিক্ষা, উপদেশ, হেদায়াত ও পথনির্দেশ খোঁজে, তবে সে বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে পারেনা এবং যা অপেক্ষাকৃত উত্তম ও কল্যাণকর, তাই অনুসরণ করে থাকে। আলোচ্য হাদিসটির ব্যাপারেও এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের অবকাশ রয়েছে। এক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ হাদিসকে অধ্যয়ন করলে পাঁচ ও পঞ্চাশের বিভ্রাটে আটকা পড়ে যেতে হবে, অথবা এরূপ অবাঞ্ছিত বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যেতে হবে যে, যে নবী পরামর্শ দিলেন, যে নবী পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং যে আল্লাহ পরামর্শ অনুমোদন করলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকতর বিজ্ঞ, অধিকতর প্রাজ্ঞ ও ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কে?

পক্ষান্তরে অপর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদিসটি অধ্যয়ন করলে এতে ইসলামের একটি অতীব মহান মূলনীতির মনোজ্ঞ চিত্র পাঠকের সামনে ভেসে উঠবে। এই মূলনীতিটি হলো দায়িত্বের বোঝা অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজতর করা। এতে একদিকে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে দিনে রাতে পঞ্চাশবার তার আনুগত্যের অঙ্গিকার করা ও তাঁর দরবারে সিজদা করার আদেশ দেন, তবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'জুলুম' হিসেবে কিছুতেই গণ্য হবেনা। পক্ষান্তরে তিনি যদি নিজের দু'জন প্রিয় রসূলের আবেদন ও সুপারিশক্রমে মাত্র পাঁচবার ঐ কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর অর্থ এ নয় যে, এই মাত্র নতুন একটা তথ্য তাঁর কাছে উদঘাটিত হলো, যা তিনি ইতিপূর্বে টেরও পাননি, জানতেও পারেননি। ব্যাপারটা কক্ষনো তেমন নয়। বরঞ্চ এভাবে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ কথাই উপলব্ধি করাতে চান যে, তাদের উপর তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ কি অপার এবং কি অপরিসীম তার দয়া ও ভালোবাসা! নামাযের ওয়াক্ত পঞ্চাশ থেকে পাঁচে নামিয়ে তিনি যে বান্দার দায়িত্ব হালকা করার বিরাট মহানুভবতা দেখালেন, এ জন্য তিনি দু'জন নবীকে উপলক্ষ বা মাধ্যম বানালেন, যাতে তাঁদের সম্মান ও গৌরব বাড়ে, আমাদের মনে তাদের মহব্বত বদ্ধমূল হয় এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের কতো কদর ও মর্যাদা, তা আমরা বুঝতে পারি। এ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যখন আমরা উল্লেখিত মি'রাজের হাদিস বিবেচনা করি, তখন আমাদের মন আপত্তির কন্টকমুক্ত এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় ভরে উঠে।

এ হাদিস প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্নও অবান্তর যে, এটি হযরত মূসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে কোনো ইহুদির মনগড়া কিনা। শুধুমাত্র কুটবুদ্ধিসম্পন্ন বিকৃত রুচি ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন লোকের পক্ষেই এরূপ প্রশ্ন তোলা সম্ভব। কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলগণের মধ্যে একজনের চেয়ে আরেকজন শ্রেষ্ঠ। কারো ব্যক্তিত্বে একটা গুণ প্রাধান্য পেয়ে থাকলে অপর জনের মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। আমরা তাদের ব্যক্তিগত গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের বর্ণনা এমন হওয়া চাইনা যাতে কোনো বিশেষ নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। আলোচ্য হাদিসে কোনো নবীর অবমাননা হতে পারে এমন ভাষায় অন্য কোনো নবীর তুলনা করা বা শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়নি। হাদিস অমান্যকারিদের চমকপ্রদ যুক্তি প্রদর্শনে প্রভাবিত হয়ে যদি এ কথা মেনেও নেই যে, এই তুখোড় ভাষাবিদরা আলোচ্য হাদিস থেকে পরামর্শ গ্রহীতার চেয়ে পরামর্শ দাতার শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞান বুদ্ধির আধিক্য প্রমাণিত হয় বলে যে তত্ত্ব হাজির করছেন তা সঠিক, তা হলে তো স্বয়ং আল্লাহর চেয়েও হযরত মূসার শ্রেষ্ঠত্ব কুরআন থেকেই প্রমাণ করা যায়। কুরআনে একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ হযরত মূসা আ. কে ফিরাউন ও তার জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত মূসা বললেন যে, আমি ভালো বক্তা নই, আমার আশংকা যে, আমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাই আপনি হারুনকে আমার উপদেষ্টা ও সহকর্মী বানিয়ে দিন। এ ঘটনা থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা আ. আল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞানী? এ কাজের জন্য মূসা আ. যে একা যথেষ্ট নন, তা আল্লাহ বুঝতেই পারলেন না। বুঝলেন শুধু মূসা আর তার কথা শুনে আল্লাহ বুঝলেন যে, তাই তো, কথাটা তো ঠিকই। একাকী মূসার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া অন্যায়। আল্লাহ তায়ালা কি এমন একজন 'অবুঝ' সম্রাট যে, অমুক কাজের জন্য কি ধরনের ও কতজন কর্মী দরকার, সে ব্যাপারে তাঁর কোনো জ্ঞানই নেই? হাদিস আমান্যকারী গোষ্ঠি যেমন প্রশ্ন করে থাকে যে, নামাযের ন্যায় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিধানও কি এরূপ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো? তেমনিভাবে এ ক্ষেত্রে কি এমন প্রশ্ন তোলা যায় না যে, নবুওয়তের মতো সুমহান দায়িত্বে নিয়োগের জন্যও কি এভাবে পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে লোক নির্বাচন করা হতো? কুরআনের যে সব আয়াতে আল্লাহর সাথে হযরত মূসার আ. কথোপকথনের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাও কি কোনো ইহুদির মনগড়া?

সব শেষে বলা দরকার মনে করি যে, মিরাজ সংক্রান্ত যে বিস্তৃত বিবরণ কুরআন অথবা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা অনেকাংশেই 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ 'মানবীয় বুদ্ধির অগম্য' বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং এর মধ্যে থেকে যা কিছু উপদেশ ও শিক্ষণীয় পাওয়া যায় তার উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। অন্যথায় এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা কুটলে

বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছাড়া আর কোনো লাভ হবেনা। যেমন হাদিসে এসেছে যে, রসূল সা.-কে বিভিন্ন আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, ভালো কাজগুলোকে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত আকারে ও ঘটনাবলীর রূপ দিয়ে রূপকভাবে দেখানো হয়। বেহেশত দোজখ এবং আযাব ও সওয়াব দেখানো হয়, সাবেক নবীদের সাথে সাক্ষাত করানো হয়। আলোচ্য হাদিসটিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, রসূল সা.-কে আল্লাহর দরবারে একাধিকবার একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হবার গৌরবে ভূষিত করা হয়। কারো যদি মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে এর প্রতিটি কথা নিয়ে বিপুল সংখ্যক আপত্তি তুলতে পারে। এ জন্যই হাদিস অমান্যকারীরা এইসব হাদিস নিয়ে উপহাস-বিদ্রুপে লিপ্ত হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য এই হাদিসগুলো থেকে দৃষ্টিভঙ্গি সরিয়ে রেখে আমরা যদি মিরাজ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে কি দেখতে পাইনা যে, সেখানেও এ ধরণের রহস্য ঘেরা দুর্বোধ্য তথ্য রয়েছে, যার সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন বলে ক্ষান্ত থাকতে হয়। কুরআনে কি একই রাতের মধ্যে আপন বান্দাকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী দেখানোর কথা বলা হয়নি? "দুই ধনুকের জ্যার সমান বা তার চেয়েও ঘনিষ্ঠ হওয়ার" কথা কি কুরআনে বর্ণিত হয়নি? যদি কেউ প্রশ্ন তুলতে চায় তবে তার পক্ষে কি এখানেও এরূপ প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয় যে, দুই ধনুকের জ্যার বলতে কি বুঝায় এবং দূরত্ব যদি দুই ধনুকের জ্যার সমানই হয়ে থাকে তা হলে আবার তার চেয়েও ঘনিষ্ঠ বলার তাৎপর্য কি?

তাছাড়া কুরআনে যে, 'সিদরাতুল মুনতাহার' উল্লেখ রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, এটা কি সেই সুপরিচিত 'সিদরা' বা কুল গাছ? যদি তাই হয় তা হলে 'সিদরাতুল মুনতাহা' অর্থাৎ শেষ প্রান্তের কুল গাছ অর্থ কি? আর এই কুল গাছটাকে যে জিনিস আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো বলা হয়েছে, সে জিনিসটি কি? এসব জিনিস নিয়ে আপত্তি তোলার সুযোগ কি অমুসলিমরা অতীতে কখনো পায়নি বা আজও পেতে পারেনা? তা হলে হাদিস অমান্যকারী কুরআনের এ আয়াতগুলোকে বুকে জড়িয়ে রাখছে কি কারণে? কুরআনের উপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর জন্য পরিবেশ এখনো অনুকূল নয় বলে আপাততঃ হাদিসের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাটি তৈরিতে নিয়োজিত থাকাই এর কারণ নয় তো? *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৫৬]*

৫. হানাফি মাযহাবে কি কিছু কিছু মাদক দ্রব্য হালাল?

প্রশ্ন : হেদায়া তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড অধ্যয়নরত জনৈক ছাত্র কয়েকদিন আগে আমার কাছে আসে এবং ঐ কিতাবের এক জায়গা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। আমি একটু সময় চেয়ে নিয়ে বললাম, জায়গাটা আমি আগে পড়ে দেখি তারপর বুঝিয়ে দেবো। দু:খের বিষয়, আমি নিজে এখনো ঐ জায়গাটা বুঁঝতে

পারিনি। আর সে জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। লক্ষ্য করুণ, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত অধ্যয় :

"উল্লেখিত বক্তব্যটি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফার মতে গম, জব, মধু ও ভুট্টা দিয়ে যে উত্তেজক পানীয় তৈরি করা হয়, তা যদি মাদকতা আনে, তবুও তা হালাল এবং তা পানকারি নেশাগ্রস্ত হলেও মদখোরের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে সে দণ্ডিত হবেনা। এবং ঘুমন্ত লোকের তালাক যেমন স্ত্রীর উপর কার্যকর হয়না, এই মাদক সেবির প্রদত্ত তালাকও কার্যকর হবেনা।" অথচ আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন :

كل مسكر حرام وحرم الخمر وكل مسكر خمر

"প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম। মদ হারাম করা হয়েছে, আর যে জিনিস মাদকতা আনে, সেটাই মদ।"

বস্তুত, এই কারণেই যারা কুরআন ও হাদিসের প্রকাশ্য বক্তব্য অনুসরণের পক্ষপাতি এবং কোনো মাযহাবের ধার ধারেননা, সেই 'আসহাবুজ জাওয়াহের' গোষ্ঠির লেখকগণ লিখেছেন যে, হানাফি মাযহাবে মদ হালাল। (নাউজুবিল্লাহ) অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন।

জবাব : হেদায়া থেকে আপনি যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে পুরো বক্তব্য স্পষ্ট হয়না। বক্তব্যটি শুরু থেকে এ রকম :

"জামে সগির গ্রন্থের মূল বক্তব্য এতোটুকুই যে, ইমাম আবু হানিফার মতে আঙ্গুর ও খেজুর দিয়ে যে মাদক তৈরি করা হয়, তা ছাড়া অন্যান্য পানীয় দ্রব্যে আপত্তি নেই।" এর পরের যে অংশটুকু আপনি উদ্ধৃত ও অনুবাদ করেছেন, তা ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য নয়। ওটা অন্যান্য লোকদের নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত বক্তব্য। বিশেষত: 'তা পানকারি নেশাগ্রস্ত হ'লেও শাস্তিযোগ্য নয়।'

এই উক্তিটাতো জামে সগিরেও নেই, আর ইমাম সাহেবের বক্তব্যের এরূপ মর্ম উদ্ধার করারও কোনো অবকাশ নেই। কিছু দূরে গিয়ে হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে :

وعن محمد انه حرام ويحد شاربه ويقع طلاقه اذا سكرمنه كما فى سائر الا شربة المحرمة

অর্থাৎ জামে সগির গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, গম, জব, মধু, চাল ইত্যাদি থেকে যে মাদক পানীয় তৈরি হয়, তাও হারাম এবং তা খেয়ে যে ব্যক্তি মাতাল হবে সেও অন্যান্য হারাম মাদক সেবির মতোই শাস্তিযোগ্য হবে। পরবর্তীতে আরো বলা হয়েছে?

ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله اذا كان من غير لهو وطرب   وهل يحد فى المتخذ من الحبوب اذا

سكر منه قبل لا يحد والاصح انه يحد فانه روى عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه فى زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك–

উপরোক্ত অংশ থেকে বুঝা গেলো বিবিধ রকমের নির্যাসও ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে কেবল তখনই হালাল, যখন তা কোনো প্রমোদ ফূর্তির উদ্দেশ্যে সেবন করা হবেনা, (বরং কোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র পুষ্টি ও শক্তি আহরণের জন্য সেবন করা হবে)। এখান থেকে এ কথাও জানা গেলো যে, ইমাম মুহাম্মদ সব ধরনের মাদক সেবনকেই শাস্তিযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন এবং খাদ্যশস্য থেকে নির্যাসকৃত ও জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত করা মাদক পানীয়কেও মদ বলে গণ্য করেছেন। কেননা সুস্পষ্ট ও পাপাচারী লোকেরা এগুলোর কাছে ব্যাপকভাবে ভিড় জমায়। দুররুল মুখতার গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় :

نبيذ التمر والزبيب ان طبخ ادنى طبخة يحل شربه وان اشتد وهذا اذا شرب منه بلا لهو وطرب فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ومالم يسكر فلو شرب ما يغلب على ظنه انه يسكر فيحرم–

"খেজুর ও কিসমিসের নির্যাস সামান্য আঁচে জ্বাল দিলে যদি ঘন হয়ে যায়, তবুও তা সেবন করা বৈধ, যদি তা আমোদ ফূর্তির উদ্দেশ্যে পান না করা হয় এবং যদি তা মাদকতা না আনে। কিন্তু যদি আমোদ ফূর্তির উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়, তবে তা কম বা বেশি যা-ই খাওয়া হোক, হারাম। আর যে পরিমাণ খেলে মাদকতা আসবে বলে প্রবল ধারণা জন্মে তা হারাম হবে।"

মধু, গম, জব ইত্যাদির ব্যাপারেও একই মত ব্যক্ত করার পর ঐ গ্রন্থে বলা হয় :

اذ قصد به استمراد الطعام والتداوى والتقوى على طاعة الله ولو للهو لا يحل اجماعا

"অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে বা ওষুধ হিসেবে ছাড়া নিছক সখের বশে খাওয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম।" ইমাম আবু হানিফার এই অভিমত বিশ্লেষণ করার পর এতে আরো বলা হয় :

وحرمها محمد مطلقا قليلها وكثيرها وبه يفتى وذكرها الزيلعى وغيره واختاره شارح الرهبانية وذكرانه مروى عن الكل–

"এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ ধরণের সকল মাদক পানীয় পরিমাণ নির্বিশেষে সম্পূর্ণরূপে হারাম।"

এই সমগ্র আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ইমাম আবু হানিফা বা হানাফি ফকীহগণের মধ্য হতে কেউ কেউ এ ব্যাপারে কোনো তারতম্য করে

থাকলেও তার উদ্দেশ্য অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ মদের সাথে ইজতিহাদি প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের পার্থক্য ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যান্য মাদক দ্রব্য যতোক্ষণ অনাচার ও দুষ্কর্মের প্ররোচনা না দেয়, ততোক্ষণ তারা তাকে হালাল ও নির্দোষ আখ্যায়িত করেছেন। এটা কেবল একটা আইনগত ব্যবধান ছিলো এবং এটাই তারা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। নচেত তারা এক বা দু'ধরণের মদ বাদে আর সকল মাদক দ্রব্যকে হালাল করে দেবেন এমন উদ্দেশ্য তাদের কখনো ছিলো না। ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির একমাত্র কারণ হলো, জামে সগিরের উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হেদায়ার গ্রন্থকার وان سكر منه "যদিও তাতে মাদকতা আসে" এই কথাটা লিখে দিয়েছেন। এ কথাটা তিনি কিসের ভিত্তিতে লিখলেন তা অজ্ঞাত। তাছাড়া قالوا এবং قيل ('তারা বলেছেন' এবং 'বলা হয়েছে') কথাটা দ্বারা হেদায়াতে কাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাও বুঝা যায়না।

সার কথা এই যে, ইমাম আবু হানিফা বা হানাফি ইমামদের বরাত দিয়ে এ কথা বলা কোনোক্রমেই সঠিক নয় যে, তারা শুধু আঙ্গুর বা খেজুরজাত মদকেই হারাম বলে রায় দিতেন আর বাদ বাকী সকল মাদক দ্রব্যকে শর্তহীনভাবে ও সর্বোতভাবে হালাল বলে অভিহিত করতেন। *[তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৫৮]*

৬. আদালতের রায় কি শুধু জাহেরীভাবেই কার্যকর, নাকি বাতেনীভাবেও কার্যকর?

প্রশ্ন : শরহে বেকায়া তৃতীয় খণ্ডের 'আদালতের কার্য প্রণালী' এবং হেদায়া তৃতীয় খণ্ডের 'কাযীর নিকট কাযীর পত্র' অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

وكل شيء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريمه فى الظاهر هو فى الباطن كذلك عند ابى حنيفة وكذا اذا قضى باحلال -

"কাযী কোনো জিনিসকে জাহেরিভাবে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিলে প্রকৃতভাবেও তা অবৈধ। অনুরূপভাবে কোনো কিছুকে বৈধ ঘোষণা করলে সেটা প্রকৃতভাবেও বৈধ।"

কিন্তু কুরআন এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করোনা এবং জেনেশুনে মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট মামলা রুজু করোনা।" *(সূরা আল বাকার, আয়াত : ১৮৮)*

فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب عنه انه صدق فانما قطعة من النار

"তোমাদের একজন আরেকজনের চেয়ে অধিকতর বাকপটু হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত হও যে সে সত্য বললো কিনা, অন্যথায় (অসত্য কথা বলে যা অর্জন করবে) তা আগুনের টুকরো মাত্র।"

এভাবে কুরআন ও হাদিস থেকে উপরোক্ত অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় এবং উল্লেখিত উক্তি স্পষ্টতই কুরআন ও হাদিসের বিপরীত মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারছিনা। উক্ত বক্তব্যের কোনো সঠিক ব্যাখ্যা থাকলে লিখুন।

জবাব : আপনি ইমাম আবু হানিফার রহ. যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার মর্ম উদ্ধারে যে কিছু জটিলতা দেখা দেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং অন্যান্য ফকীহগণ, এমনকি ইমাম আবু হানিফার দুই শিষ্য (ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিধি প্রণয়নে স্বীয় উস্তাদের এই মূলনীতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে ইমাম আবু হানিফার উক্ত মূলনীতি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় এবং স্থান বিশেষে তার এমন ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, যাতে সকল জটিলতার নিরসন ঘটে। ইমাম সাহেবের বক্তব্য, কাযীর বিচারের রায় জাহেরি ও বাতেনি উভয় দিক দিয়েই কার্যকর হয়ে যায়। অর্থাৎ তিনি যে জিনিসকে অবৈধ ও অচল ঘোষণা করবেন, তা অবৈধ গণ্য হবে এবং যে জিনিসকে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত ঘোষণা করবেন, তা বৈধ বা হালাল সাব্যস্ত হবে, চাই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হওয়ায় তা মূলত ভ্রান্ত রায়ই হোক না কেন। এ উক্তির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে মনে রাখা দরকার হানাফি ফকীহদের সর্বসম্মত বিঘোষিত মূলনীতি অনুসারে, এটা সব রকমের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং শুধুমাত্র বিয়ে তালাক ও ক্রয় বিক্রয়ের শুদ্ধাশুদ্ধতা অথবা মালিকানা সংক্রান্ত এমন বিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে মালিকানা নির্ণয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ, যথা ক্রয় বিক্রয় অথবা উত্তরাধিকারের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত: 'জাহেরী' ও 'বাতেনী' শব্দদ্বয়ের সঠিক মর্ম ও অর্থ চিহ্নিত করতে হবে। কেননা এটা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ছাড়া মূল বক্তব্যের যথাযথ তাৎপর্য বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

আদালতের রায় জাহেরীভাবে কার্যকর হওয়ার অর্থ তো একেবারেই স্পষ্ট যে, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে। উভয় পক্ষ তা মানতে বাধ্য ও জনসাধারণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বাতেনিভাবে কার্যকর হওয়ার বিষয়টা কিছুটা বিচার বিবেচনা ও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে বিশেষত, যখন আদালতের রায় মিথ্যা কিংবা ক্রটিপূর্ণ সাক্ষ্যের কারণে বাস্তবানুগ হয় না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, এই বাস্তব ক্রটিসত্ত্বেও আদালতের রায় জাহেরী ও বাতেনিভাবে কার্যকর হবে। বাতেনিভাবে কার্যকর হওয়ার ব্যাখ্যা কেউ কেউ

এভাবে দিয়ে থাকেন যে, এই রায় আল্লাহর কাছেও কার্যকর হয়ে গেছে ধরে নেয়া হবে। ফলে এই ভ্রান্ত রায়ের সুযোগ নিয়ে কেউ যদি নিজের জন্য হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে নিয়ে থাকে, তবে তার কোনো গুণাহ হয়নি এবং আখেরাতেও তার কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবেনা। কিন্তু ইমাম সাহেবের বক্তব্যের এই ব্যাখ্যা তার সমালোচকরা বা সমর্থকরা যারাই মনগড়াভাবে করে থাকুক না কেন, আমার জানা মতে ও ধারণামতে এ ব্যাখ্যা স্বয়ং ইমাম সাহেবের বরাতে যেমন কোথাও বর্ণিত হয়নি, তেমনি এটা সঠিক এবং সমীচিনও মনে হয়না, আর ইমাম সাহেবের মূল বক্তব্যের আলোকেও এটা অপরিহার্য সাব্যস্ত হয়না। ইমাম আবু হানিফার উপর তার বক্তব্যের এ ব্যাখ্যার কোনো দায়দায়িত্ব বর্তায় না। এতো বড় একজন মর্যাদাবান ধর্মীয় নেতা ও ইমামের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করা কিভাবে সমীচীন হতে পারে যে, হালাল হারাম নির্ধারণের যে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, তা তিনি এ অর্থে আদালতের বিচারকদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন এবং জনসাধারণের বিবেক থেকে গুণাহের অনুভূতি ও হালাল হারাম বাছ বিচারের মনোভাব নির্মূল করার পথ এভাবে খুলে দেবেন?

ব্যাপারটা যদি সে রকম না হয়ে থাকে এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সে রকম নয়, তাহলে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, এ উক্তির প্রকৃত মর্ম কি? আমার জ্ঞানমতে এ উক্তির সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য নৈতিকভাবে এবং পরকালীন ফলাফল বিবেচনায় না এনে আদালতের রায়ের নিছক পার্থিব ফলাফলও আইনগত দিক যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, এসব রায়ের কোনো কোনো বক্তব্য আমাদের বাহ্যিক ও বস্তুগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, আর কোনো বক্তব্য আমাদের অন্তর্নিহিত জীবনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুভূতি এবং নিরেট ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও ধ্যান ধারণার সাথে জড়িত। এ দিক থেকে পর্যাবেক্ষণ করলে নিছক পার্থিব নিয়ম শৃংখলা ও আইনগত দিক দিয়ে আদালতের রায়ের একটা দিক জাহেরি তথা বাহ্যিক ও বস্তুগত এবং আরেকটা দিক বাতেনি তথা আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক হয়ে থাকে। আমার মতে, ইমাম আবু হানিফার প্রবর্তিত জাহেরি ও বাতেনি এই দু'প্রকারের কার্যকারিতা উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

আমি একটি উদাহরণ দ্বারা জাহের ও বাতেনের এই সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করে দিতে চাই। মনে করুন, সেলিম ও রোকেয়ার মধ্যে বৈবাহিক দাম্পত্য সম্পর্ক বিদ্যমান কিনা, সেটা বিতর্কিত। ধরে নেয়া যাক আসলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু রোকেয়া তা অস্বীকার করছে, অথবা তালাকের মাধ্যমে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে বলে দাবি করছে। আর নিজের দাবির সপক্ষে সে মিথ্যা সাক্ষীও হাজির

করে দিচ্ছে। অপরদিকে সেলিম বিয়ে বহাল থাকার সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য পেশ করতে পারছেনা। আদালত বিয়ে বহাল নেই অথবা তালাক দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে বলে রায় দিয়ে দিলো। এক্ষণে এ রায়ের একটা দিক তো স্পষ্টতই জাহেরি বা বাহ্যিক, যা বাস্তব জগতের সাথে সম্পৃক্ত। সেটি এই যে, এখন আর সেলিম রোকেয়ার ভরণ পোষণ ও আবাসনের জন্য দায়ি নয় এবং রোকেয়াও তা দাবি করার অধিকার রাখেনা। কিন্তু এ বিষয়টার আরো একটা দিক রয়েছে, যার সম্পর্ক অন্তর্নিহিত জগতের সাথে এবং যাকে ইমাম সাহেবের ভাষায় বাতেনি দিক বলেও অভিহিত করা চলে। এ দিকটা হলো রোকেয়ার সতীত্বকে সেলিমের স্পর্শ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখার বৈধতা ও অবৈধতার এবং বিয়ে ও দাম্পত্য সম্পর্ক কার্যত বহাল থাকা না থাকার। রোকেয়া তার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্যকে যেভাবে প্রয়োগ করেছে তা যে মহাপাপ এবং তার জন্য সে যে আখেরাতে আযাব ভোগ করতে বাধ্য, সে ব্যাপারে তো আদৌ কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে হুমাম স্বীয় গ্রন্থ 'ফাতহুল ক্বাদীরে' বলেন :

على المبتدى بالدعوى الباطلة واثباتها بالطريق الباطل اثم يا له من اثم -

"একটা অন্যায় দাবি উত্থাপন ও অন্যায়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করার কাজ যে করে, সে এতো বড় গুণাহ্ করে, যার চেয়ে বড় আর কোনো গুণাহ্ হতে পারে না।"

কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই বলেছি আখেরাতে কি পরিণতি হবে, না হবে, তা বাদ দিলেও, এখানে ইহলৌকিক বিচার বিবেচনার দিক দিয়েও হালাল হারাম সংক্রান্ত এমন কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়, যার সমাধান না করে উপায় থাকেনা। যেমন, সেলিম ও রোকেয়ার বৈবাহিক সম্পর্কচ্ছেদের পক্ষে আদালত যে রায় দিয়েছে (চাই বাস্তবে সে রায় ভ্রান্তই হোক না কেন, তার পরে সেলিম রোকেয়ার সাথে স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে কিনা? যদি রাখে তবে আদালত তাকে ব্যভিচারি সাব্যস্ত করে তাকে ব্যভিচারের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি দিতে পারবে কিনা? সেলিম যদি এখন রোকেয়ার আপন বোনকে বিয়ে করে, তাহলে এক সাথে দুই সহোদরাকে বিয়ে করার দায়ে সে দোষি হবে কিনা? রোকেয়ার অন্য কারো সাথে বা অন্য কারো রোকেয়ার সাথে বৈবাহিক ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন আইনত ও শরিয়ত মোতাবেক অনুমোদিত কিনা? যদি অনুমোদিত হয়ে থাকে তবে কেন অনুমোদিত এবং না হয়ে থাকলে কেন নয়? তাছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিয়ের বৈধতা ও অবৈধতার কোনো প্রভাব পূর্ববর্তী বিয়ের উপর পড়বে কিনা?

সেলিম ও রোকেয়ার মধ্যে বিয়ের বিচ্ছেদ সংঘটনকারি আদালতের রায় বাস্তবিক পক্ষে ভ্রান্ত হলেও যেহেতু সেটা আদালতের সিদ্ধান্ত, তাই অন্তত:পক্ষে বাহ্যিকভাবে তা কার্যকর না হয়ে পারেনা। এখন যদি সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের অথবা

জনগণের মধ্য থেকে কেউ এই রায়ের আইনগত ও রাজনৈতিক কার্যকারিতাকেই চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে শুধু বিচার বিভাগ নয়, বরং গোটা প্রশাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেবে এবং এমন বিশৃংখল অবস্থার উদ্ভব ঘটবে, যেখানে কোনো সিদ্ধান্ত, নির্দেশ বা আইনই কার্যকর হওয়া সম্ভব হবেনা। আর যদি কেউ আদালতের সিদ্ধান্তটির বাহ্যিক কার্যকারিতা মেনে নেয়, কিন্তু বাতেনি তথা আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক কার্যকারিতা না মানে এবং বিয়ে ভঙ্গের রায় বৃথা ও বাস্তবে অকার্যকর বলে আপন মনে ভাবতে ও প্রচার করতে থাকে, তা হলে সেই ব্যক্তি উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর কি সন্তোষজনক জবাব দেবে তা আমার বুঝে আসেনা। এরূপ ব্যক্তি যদি সেলিম হয় বা দ্বিতীয় স্বামীর পর্যায়ে থাকে, তাহলে সে বিবিধ জটিলতা থেকে মুক্ত কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে, তাও আমার অজানা। আমার মতে, এই সকল জটিলতার চূড়ান্ত সমাধান এবং সকল বিতর্ক অবসানের সর্বশেষ উপায় হলো ইমাম আবু হানিফার মূলনীতি অনুসরণ করা এবং আদালতের রায়কে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ-উভয়ভাবে কার্যকর মেনে নেয়া। এরপর আমরা সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারবো যে রোকেয়ার বৈবাহিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক এখন সেলিমের সাথে সর্বোতভাবে বিচ্ছিন্ন এবং অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হওয়া সম্পূর্ণ বৈধ। রোকেয়া যদি গুণাহ্ করে থাকে তবে তার পরিণাম সে আখেরাতে অবশ্যই ভোগ করবে। ইমাম সাহেবের উক্তির দরুন তার পাপের বা পারলৌকিক শাস্তির কিছুমাত্র লাঘব হওয়া প্রমাণিত হয়না।

ইমাম আবু হানিফার নীতির যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, তার আলোকে দেখলে এই নীতি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হবে। এটি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও কল্যাণময় মূলনীতি। শরিয়তের আইন বিধি ও নির্দেশমালার বাস্তব প্রয়োগে যেসব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তা বহুলাংশে এর দ্বারা নিরসন করা সম্ভব। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্টোক্তি বা কোনো মূলনীতির সাথে এর কোনো বৈসাদৃশ্য বা বিরোধও নেই। বরঞ্চ হযরত আলীর একটি রায় থেকে এ নীতির পক্ষে অধিকতর সমর্থন পাওয়া যায়। রায়টি নিম্নরূপ :

এক ব্যক্তি জনৈকা মহিলাকে নিজের স্ত্রী দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করলো এবং স্বীয় দাবির সপক্ষে সাক্ষীও পেশ করলো। বিচারক হযরত আলী রা. সাক্ষী সাবুদের উপর নির্ভর করে পুরুষটির পক্ষে রায় দিলেন এবং তার দাবি সঠিক বলে মেনে নিলেন। মহিলাটি বললো : আমি আসলে তো তার স্ত্রী ছিলামনা কিন্তু আপনি যখন রায় দিয়ে দিয়েছেন তখন ঐ পুরুষটির সাথে আমার বিয়েও সম্পন্ন করুন, যাতে আমি তার জন্য বৈধ হয়ে যাই। হযরত আলী রা. বললেন, شاهداك زوجاك অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে যে দু'ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে, তারাই তো ঐ পুরুষটির সাথে তোমার বিয়ে সম্পন্ন করে দিয়েছে। এখন আর আনুষ্ঠানিক বিয়ের

কোনো প্রয়োজন নেই। এই মামলায় হযরত আলীর রা. কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আদালতের রায় জাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়ে যায়। আর এখান থেকেই ইমাম আবু হানিফার 'জাহেরি ও বাতেনি কার্যকারিতা'র তাৎপর্যও বুঝা যায়।

মোটকথা, এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম আবু হানিফার ঘোষিত নীতিতে বিরোধ ও বৈপরিত্যের প্রশ্ন তোলার কারণ ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে ইমাম সাহেবের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার স্বীকৃতি না দিয়ে পারা যায়না। *[তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৫৮]*

৭. সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা

প্রশ্ন : মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো, রসূল সা.-এর উপর কুরআন ছাড়াও ওহী নাযিল হতো। সেই ওহীই আমাদের কাছে রসূলের সা. হুকুম ও বাণী হিসেবে বিদ্যমান। কিন্তু আজকাল কেউ কেউ বলছেন, কুরআন ছাড়া আর কোনো ওহী আসতোনা। তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, রসূল সা.-এর প্রত্যেকটি কথাই যদি ওহীভিত্তিক হতো, তা হলে তাঁর কোনো কোনো কথায় কুরআনের সমালোচনা করা হয়েছে কেন এবং অন্যদের কথায় তিনি নিজের কোনো কোনো মত পরিবর্তন করেছেন কেন? কোনো কোনো হাদিসে তো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 'মাকামে সুন্নাত' (সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পুস্তকে কুরআন ছাড়া আর কোনো ওহী আসতো না– এই মতের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উল্লেখিত যুক্তির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু গ্রন্থকার এটিকে একটি অকাট্য যুক্তি হিসেবে পেশ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হাদিসে কুদসী (যে হাদিসে স্বয়ং আল্লাহর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে) এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে রসূল সা.-এর কথা ও কাজ ওহী নয়। তাই ওগুলোতে রদবদল চলতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুণ যে, ওহীকে কুরআনের মধ্যে এবং নবী জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ মনে করার এই মতবাদ কতখানি সঠিক?

'মাকামে সুন্নাত' নামক বইটির আরো কয়েকটি বিষয় গভীর বিচার বিবেচনার দাবি রাখে। জানিনা আপনি ওটা পড়ে দেখেছেন কিনা। এক জায়গায় তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন বুখারি ও মুসলিম শরিফে এই মর্মে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, পানির অভাব দেখা দিলে সহবাসজনিত অপবিত্রতা দুরিকরণে তায়াম্মুম গোসলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কিনা সে ব্যাপারে হজরত ওমর রা. ও হযরত আম্মার রা.-এর মধ্যে আজীবন মতবিরোধ চলছিলো। অথচ কুরআনে দুই জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে

তায়াম্মুম করে নাও। এ দ্বারা কি বুঝা যায় যে, উভয় সাহাবি কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদেরকে কুরআনের উক্ত বক্তব্য অবহিত করারও কেউ ছিলোনা? অথবা কুরআন সাহাবাদের নিকট চূড়ান্ত দলিল ছিলোনা? আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, হযরত আম্মার তায়াম্মুমের পক্ষে এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে, রসূল সা.-এর অনমুতি দিয়েছেন। অথচ তাতেও হযরত ওমর রা. আশ্বস্ত হতে পারেননি। তবে পরবর্তী কালের লোকেরা আশ্বস্ত হয়ে গেছে এবং তাও হয়েছে কুরআন দ্বারা নয় বরং এই হাদিস দ্বারা। কারণ তাদের কাছেও কুরআনের চেয়ে হাদিস অগ্রগণ্য। মোটকথা, এই সর্বসম্মত হাদিসের উপর অনেক লম্বা চওড়া আপত্তি তোলা হয়েছে এবং ইচ্ছেমত উপহাস করা হয়েছে। এতে আমার মন নিদারুণভাবে ক্ষুব্ধ। প্রশ্ন হলো, এ হাদিসটি কি শুদ্ধ? এর তাৎপর্য কি?

জবাব : রিসালাতের পদটির মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন করা, রসূলের সুন্নাহর সাথে উম্মাতের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সুন্নাহর আইনগত মর্যাদাকে জনসাধারণের চোখে সংশয়পূর্ণ ও গুরুত্বহীন করে তোলার দুরভিসন্ধি নিয়ে এ যাবত যে কয়টি মতবাদ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি মতবাদ এইযে, রসূল সা.-এর নিকট মাত্র এক ধরনের ওহী নাযিল হয়েছে, যা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে আর কোনো ওহীর কথা স্বীকার করা ইহুদীদের কুসংস্কার, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সুন্নাহর অতীব মহান ও পবিত্র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ছাড়াও এই মতবাদ দ্বারা আরো একটি যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সেটি হলো সুন্নাহ যেহেতু ওহীভিত্তিক নয়, তাই ওটা কেবল রসূল সা.-এর ব্যক্তিগত চিন্তা গবেষণা প্রসূত অভিমত মাত্র। এটি কোনো সর্বজন মান্য আইনের মর্যাদা রাখেনা। বরঞ্চ মুসলমানরা নিজস্ব চিন্তা গবেষণার ভিত্তিতে এর বিপরীত সিদ্ধান্তও নিতে পারে। এটা যে কতদুর ভ্রান্ত মতবাদ, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা খোদ কুরআন থেকেই প্রমাণিত যা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত পঠিত ও লিখিত ওহী ছাড়াও এমন বহু ওহী শুধু মুহাম্মদ সা. নয় বরং আল্লাহর প্রত্যেক নবীর কাছেই নাযিল হতো, যার উপর নিজের আমল করা এবং গোটা উম্মতকে দিয়ে আমল করানো সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সব ওহীকে এরূপ মনে করারও অবকাশ ছিলোনা যে, তা হয়তো মৌমাছির নিকট অবচেতনভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রেরিত প্রত্যাদেশের মতো হবে। অথবা আকাশ ও পৃথিবীর নিষ্প্রাণ পদার্থের নিকট অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ওহীর মতো হবে। তথাপি হাদিস বিরোধীদের কর্মপন্থা এই যে, যে জিনিস তাদের কাছে ভালো লাগে ও তাদের স্বার্থের অনুকূল হয়, সেটা হাদিস হলেও সানন্দে মেনে নিতে রাজি। আর যেটা খারাপ লাগে এবং স্বার্থ উদ্ধারের পথে অন্তরায় হয়, তা কুরআনে যে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, এই গোষ্ঠি ভুলেও তার কথা মুখে আনেনা। কিন্তু কুরআন ছাড়া রসূল সা.-এর নিকট আর কোনো ওহী আসতোনা এই মর্মে কোনো যুক্তি প্রমাণ কোথাও

পাওয়া যায় কিনা, তার অন্বেষণে তারা হাদিস কুরআন দুটোই চষে ফেলতে ভীষণ তৎপর। এ ধরণের কোনো প্রমাণ উদ্ধার করা তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কুরআন ও হাদিসে এরূপ মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি ঘটনা তাদের হস্তগত হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল সা.-এর কোনো কাজে ওহী দ্বারা সাবধান করা হয়েছে, অথবা রসূল সা. কারো পরামর্শে নিজের মত পরিবর্তন করেছেন। আর এইটুকু মাল-মশলা হাতে পেয়েই তা দিয়ে তারা নিজেদের মনগড়া মতবাদের সপক্ষে যুক্তিতর্কের এক বিরাট প্রাসাদ গড়ে তুলেছে।

এই যুক্তিতর্ক নিয়ে যদি সামান্যতম চিন্তাভাবনাও করা হয়, তা হলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এতে যে ঘটনাগুলোকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, তা দ্বারা কুরআন বহির্ভুত ওহীর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের বক্তব্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়না, তেমনি তা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের দাবিও অসত্য প্রমাণিত হয়না। অস্বীকারকারীদের বক্তব্য হলো, রসূল সা.-এর উপর কুরআন ব্যতীত আর কোনো ওহী কোনো ব্যাপারেই নাযিল হয়নি। উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা শুধু এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, কিছু কিছু ব্যাপারে এমনও রয়েছে যাতে ওহী অবতীর্ণ হয়নি কিংবা যাতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কিছুটা বিরতি ঘটেছিলো। অস্বীকারকারীদের বক্তব্যের যথার্ততা প্রমাণের জন্য এটা যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে সাধারণ মুসলিম জনতার বক্তব্য ও বিশ্বাস হলো, রসূল সা-এর কথা ও কাজ হয় অবিকল ওহীভিত্তিক, নতুবা ওহীর নির্দেশে সম্পাদিত হয়েছে। তাই তা আল্লাহর ইচ্ছে ও সন্তোষের সর্বোত্তম প্রতীক। আর যদি কোনো কাজ ওহীর নির্দেশিত পথ থেকে সামান্য পরিমাণেও সরে গিয়ে থাকে, তবে ওহীর মাধ্যমেই তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নবীদের নিষ্প্রাণ হওয়ার যে তত্ত্ব প্রমাণিত তা এটাই। কেবল গুটিকয়েক ঘটনা ও কার্যকলাপ ছাড়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘটনা ও কার্যকলাপ এমনি ধরনের যে, তাতে রসূল সা.-এর কর্মপদ্ধতি হয় হুবহু ওহীভিত্তিক, নচেত তা ওহীর দাবি ও আল্লাহর ইচ্ছাকে এমন নিখুঁতভাবে ও ইঙ্গিত মানে পূর্ণ করতো যে, তাতে আর ওহীর মাধ্যমে সংশোধনের প্রয়োজনই থাকতোনা। সে ক্ষেত্রে ওহীর নিরবতা বা নাযিল না হওয়াটাও মূলত সম্মতি ও অনুমোদনেরই পর্যায়ভুক্ত। অন্যথায় যে নবীর উপর ওহীর এমন কঠোর তদারকী বিরাজ করতো যে, তিনি শুধু ঠোঁট নাড়লেই لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ (তুমি জিভ নেড়ো না) বলে সতর্ক করে দেয়া হতো, এবং যিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেই সূরা নাযিল হয়ে যেতো, সেই নবী নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সন্তুষ্টি চুল পরিমাণ লংঘন করবেন অথচ ওহী এসে তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধরে দেবেন না, এটা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে? কাজেই গুটিকয়েক ঘটনাকে বেছে বেছে দেখালেই আমাদের এ বক্তব্য খণ্ডিত হয়না যে, মোটামুটিভাবে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা নবী জীবন ওহীর পথনির্দেশনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বরঞ্চ সতর্কীকরণ ও

সংশোধনের উদ্দেশ্যে ওহী নাযিল হওয়ার মাত্র গুটিকয় ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা আমাদের বক্তব্যকে আরো মজবুত করে।

বিরোধী পক্ষ এখানে এই বলে আপত্তি জানাতে পারে যে, রসূল সা.-এর নির্মল জীবন ও মহৎ চরিত্রের অধিকাংশ ওহীভিত্তিক বলে সাধারণ মুসলমানগণ বিশ্বাস পোষণ করে এ কথা ঠিক নয়। কেননা তাদের অনেকেই মনে করে রসূলের প্রতিটি তৎপরতাই ওহী। এ দাবির সপক্ষে তারা وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ (তিনি মনগড়াভাবে কোনো কথাই বলেন না। তিনি যাই বলেন তা ওহী ছাড়া আর কিছু নয়।) এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে। আমি এর জবাবে বলতে চাই, আসলে এই দু'টো বক্তব্যের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে যে হাজারো কথা, কাজ, আদেশ ও নিষেধ জারি হয়েছে তার মধ্যে অতি নগণ্য ও বিরল সংখ্যকই এমন রয়েছে, যা ওহীভিত্তিক নয়। এগুলো সংখ্যায় এতো অল্প যে তা হিসেবে ধরার মতোই নয় এবং তাতে إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ "তিনি যাই বলেন তা ওহী ছাড়া কিছু নয়" উক্তিটি থেকে যে মূলনীতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, (অর্থাৎ রসূলের জীবন ও কর্ম সামগ্রিকভাবে ওহীভিত্তিক) তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনা। যে বক্তব্য শতকরা ৯৯ বা তার চেয়েও বেশি অংশের ব্যাপারে সঠিক ও প্রযোজ্য, তাকে যদি মূলনীতির আকারে বর্ণনা করা হয়, তবে এই বচনভঙ্গিটি মোটেই অসত্য ও অশুদ্ধ নয়। সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার বেলায় অধিকাংশের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থাটাই সব সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে। এ সত্যটাই একটি ইংরেজি প্রবাদে এই বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু কিছু ব্যতিক্রমি ব্যাপারে এমন হয়ে থাকে যে, তাতে সংশ্লিষ্ট মূলনীতির খণ্ডন তো হয়ই না, অধিকন্তু তা আরো সংহত অকাট্য হয়।

"There are some exeptions which prove the Rule".

যাহোক, প্রকৃত ব্যাপার হলো, কুরআন ছাড়াও রসূল সা.-এর উপর বহু ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। আর যেসব ক্ষেত্রে ওহী আসেনি, অথচ ব্যাপারটি রিসালাত বা নবুওয়াতের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে ক্ষেত্রে ওহী নাযিল না হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, ঘটনা ও কার্যকলাপ যাই ঘটে থাকুক না কেন, হুবহু আল্লাহর ইচ্ছে ও সম্মতি অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য পালনীয় ও অবশ্য কর্তব্য হবার ব্যাপারে ওহীভিত্তিক নির্দেশের সাথে তার কোনোই পার্থক্য নেই। সুতরাং সেইসব ক্ষেত্রে কোনো মুসলমানেরই নবীর হুকুমের আনুগত্য পরিত্যাগ করার জন্য এই ওজুহাত দাঁড় করানো বৈধ নয় যে, নবীর কোনো বিশেষ নির্দেশ ওহীভিত্তিক নয় বা তা ওহীভিত্তিক হবার কোনো প্রমাণ সে পায়নি।

এবার 'এদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত 'মাকামে সুন্নাত' নামক গ্রন্থটির প্রসঙ্গে আসা যাক। এ বই আমিও পড়ে ফেলেছি। বইটা পড়লে মনে হয়, লেখক 'মানিও না অমান্যও করি না' ধরনের নীতির অনুসারী। প্রথমে তো তিনি স্বকল্পিতভাবে হাদিসপন্থী ও হাদিস বিরোধীদের শিবির থেকে সরে গিয়ে উভয় শিবির থেকে সম দূরত্বে অবস্থিত সত্যাশ্রয়ী তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিজের একটি আলাদা শিবির স্থাপন করেছেন। কিন্তু পাঠক যখন বইটি অধ্যয়ন করতে করতে ক্রমশ সামনে অগ্রসর হয়, তখন দেখা যায়, তিনি হাদিস বিরোধীদের শিবিরের দিকে ঘনিষ্ঠতর হতে যাচ্ছেন। এমনকি কোথাও কোথাও আমাদের মতো হাদিসপন্থীদের দৃষ্টিতে এমনও মনে হয় যে, লেখকের সাথে হাদিস বিরোধীদের অতি সামান্যই দূরত্ব বজায় রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও তাকে হাদিস বিরোধীদের অস্ত্র ধার করে হাদিসপন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দেখা যায়। তার যে উক্তিগুলোর আপনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেই দেখা যায়, তিনি সূচনা করেছেন এই বলে যে, রসূল সা.-এর সকল কার্যকলাপ ও কথাবার্তা ওহীর সাথে সামঞ্জস্যশীল, কিন্তু অবিকল ওহী নয়। তবে তার অল্প কিছু অংশ ইল্‌হাম। (অবচেতনভাবে অন্তরে আবির্ভূত ঐশী আভাস ইঙ্গিত, ধ্যান-ধারণা বা প্রজ্ঞা, যা নবীদের বেলায় ওহীর পর্যায়ভুক্ত-অনুবাদক) কিন্তু আলোচনার সমাপ্তি টানেন এই বলে যে, বড়জোর দু'তিনটি ক্ষেত্রে রসূলের হাদিসকে ইল্‌হামভিত্তিক বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে যেহেতু প্রেক্ষাপটটি পরিবর্তনশীল, তাই নবীর আমলের অনেক ব্যাপার অন্য যুগে রদবদলের যোগ্যও হতে পারে।

বুখারি ও মুসলিম শরিফের তায়াম্মুম সংক্রান্ত হাদিস প্রসঙ্গে যে বক্তব্য বিশ্লেষণ বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাও পড়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি নিদারুণভাবে বিস্মিত ও বেদনাহত হয়েছি এই ভেবে যে লেখক নিজে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন হোন, তা বলে অন্যকেও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলেন কেন, আর কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা ও বিচারবিবেচনা ছাড়াই সাহাবা ও হাদিসবেত্তাগণ সমেত সকল আধুনিক ও প্রাচীন মনীষীকে উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার ঔদ্ধত্য কিভাবে দেখালেন?

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো, গোসল ও তায়াম্মুম সংক্রান্ত আলোচনা কুরআনে দু'জায়গায় এসেছে। একটি সূরা আন নেসায়, অপরটি সূরা মায়েদায়। যথা :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا

جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না, যতোক্ষণ না মুখে কি বলছো টের পাও। প্রবাসে থাকা অবস্থায় ছাড়া বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতা নিয়েও নামাযের কাছে যেয়ো না যতোক্ষণ না গোসল করে নাও। তবে তোমরা রুগ্ন ও সফররত থাকলে কিংবা পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার পর পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নিও।" *(সূরা আন নিসা, আয়াত : ৪৩)*

وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

"আর যদি তোমরা বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র হয়ে থাক তবে পবিত্র হয়ে নাও। যদি রুগ্ন কিংবা সফররত থাক, অথবা যদি তোমাদের কেউ পেশাব পায়খানা কিংবা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার পর পানি না পায়, তাহলে তায়াম্মুম করে নাও।" *(সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ০৬)*

উভয় স্থানে যেখানে, প্রথমে 'জুনুবান' (বীর্যপাতজনিত অপবিত্রাবস্থার) উল্লেখ রয়েছে সেখানে 'গোসল করা' বা 'পবিত্র হওয়া'র নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যেখানে পানি না পাওয়া যায়, সেখানে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে لامستم (স্ত্রীর সাথে মেলামেশার) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এ শব্দটি যদিও প্রতীকী অর্থে সঙ্গম বুঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে এর প্রত্যক্ষ অর্থ তা নয়। 'লাম্‌স' শব্দের আসল অর্থ যে 'স্পর্শ করা' তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই এ আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য নিরূপণে সাহাবা, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে।' لامستم النساء 'এর অর্থ কারো মতে স্ত্রীদেরকে নিছক স্পর্শ করা, কারো মতে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা আবার কারো মতে সঙ্গম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর, হযরত ইবনে ওমর, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে মাসউদের মতে এ আয়াতে সঙ্গম নয় শুধু স্পর্শ করার কথা বলা হয়েছে। এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম জুহরী, ইমাম নাখয়ী এবং আরো কয়েকজন ইমাম। পক্ষান্তরে হযরত আলী এবং আরো কয়েকজন সাহাবির মতে এখানে স্পর্শ দ্বারা সঙ্গমই বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও অন্য কয়েকজন ফেকাহবিদ এই মতের অনুসারী। এখন আয়াতটিতে দু'রকম অর্থেরই অবকাশ যখন রয়েছে, তখন হযরত ওমর ও অন্য কতিপয় সাহাবি لامستم শব্দটিকে সঙ্গম অর্থে গ্রহণ না করলে তাদেরকে এ আয়াতের ভিত্তিতে দোষারোপ করা যায় কিভাবে? তারা যদি মনে করেন, এ আয়াত থেকে সঙ্গমজনিত অপবিত্রতা দূর করার জন্য তায়াম্মুমের বৈধতা প্রমাণিত হয়না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ বা কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার মতো ভয়ংকর অভিযোগ আরোপ করা কিভাবে সমীচীন হয়? অনুরূপভাবে, যে মনীষীগণ এই মতের অনুসারি, তাদের কাছে সঙ্গমজনিত

অপবিত্রতা দূর করতে তায়াম্মুম জায়েয– এই মর্মে কোনো হাদিস যদি না পৌঁছে থাকে কিংবা তারা তেমন কোনো হাদিসকে গ্রহণযোগ্য মনে না করে থাকেন, তাহলে সেজন্য তাদেরকে দোষারোপ করাই বা হবে কেন?

হযরত ওমরের উপর যেহেতু হযরত আম্মারের বর্ণিত হাদিস অগ্রাহ্য করার অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাই এ হাদিসটির বিশদ বিবরণ দিচ্ছি।

আসল ব্যাপার হলো, সফরে থাকা অবস্থায় হযরত আম্মারের যখন গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলো এবং পানি না পাওয়ায় কি করা যায় তা জিজ্ঞেস করলে রসূল সা. তাঁকে বললেন যে, তায়াম্মুম করলেই চলবে, কিন্তু হযরত ওমর এই সমগ্র ঘটনা ভুলে যান। এমনকি পরে হযরত আম্মার তাঁকে মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে পড়েনি। এখন বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হযরত আম্মার যখন হযরত ওমরকে বললেন যে, এ ঘটনা আপনার সামনেই ঘটেছিলো, তখন হযরত ওমর হয়তো আরো অবাক হয়েছেন এবং ভেবেছেন যে, যে ঘটনায় তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন, তা যদি হযরত আম্মারের মনে থেকে থাকে, তাহলে তিনি ভুলে যেতে পারলেন কিভাবে? সম্ভবত, এজন্যই তিনি হযরত আম্মারের কথা মেনে নিতে ইতস্তত করেছেন এবং নিজের এই মতে অটল থেকেছেন যে, তায়াম্মুম দ্বারা গোসলের কাজ হয়না এবং বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতা থেকে গোসল ছাড়া পবিত্র হওয়া যায়না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত ওমর যে হাদিস গ্রহণ করেননি তা অন্যেরা কিভাবে গ্রহণ করলো! এর দুটো জবাব রয়েছে। প্রথমত: হযরত ওমর স্বভাবতই মনে করে থাকতে পারেন যে, একই ঘটনাকে তিনি নিজে ভুলে যাবেন অথচ আম্মার ভুলবেননা, তা হতে পারেনা। কিন্তু হযরত আম্মারের বর্ণনাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে হযরত ওমরের সামনে যেসব মনস্তাত্ত্বিক বাধা ছিলো, অন্যদের সামনে তা থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় জবাব এই যে, পানি না পাওয়া গেলে যে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা চলে সে মর্মে রসূল সা.-এর অনুমতি অন্য কয়েকজন সাহাবি থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ, বুখারি ও মুসলিম শরিফেই হযরত ইমরানের হাদিস দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক নয় যে, হাদিসবেত্তাগণ যখন এ বিষয়ে বিভিন্ন সনদের হাদিস সংগ্রহ করেছেন, তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ ব্যাপারে হযরত ওমর হয়তো মানসিক দুর্বলতাবশত বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন। আসলে হযরত আম্মার ও অন্যান্য সাহাবির বর্ণনাই সঠিক।

পরিতাপের বিষয়, বুখারি ও মুসলিমের উল্লেখিত হাদিসের বিরুদ্ধে এতো সব আপত্তি উত্থাপন ও এমন আজগুবি ও উদ্ভট তত্ত্ব উদ্ভাবনের আগে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি যেমন খেয়াল করা হয়নি, তেমনি তাফসির, হাদিস ও ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে, তা পড়ে

দেখার কষ্টটুকুও স্বীকার করা হয়নি। কেবল 'হুজ্জাতুল্লাহ' গ্রন্থের একটি উক্তি দেখেই লেখক টিটকারি উপহাস ও ব্যাঙ্গ বিদ্রুপের উদ্যম উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন এবং হযরত ওমর থেকে শুরু করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ পর্যন্ত সকলেরই সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় তিনি হুজ্জাতুল্লাহ গ্রন্থখানিও পুরোপুরি পড়ে দেখেননি। নচেত এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, لا مستم النساء এর অর্থ ও মর্ম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াত হযরত ওমরের অজানা ছিলো না। বরং তিনি এর শাব্দিক অর্থের উপরই নির্ভর করেছেন। হুজ্জাতুল্লাহ প্রথম খণ্ডের তায়াম্মুম সংক্রান্ত অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

كان عمر وابن مسعود رضى الله عنهما لا يريان التيمم عن الجنابة حملا الاية على اللمس وانه ينقض الوضوء

"হযরত ওমর ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবার জন্য তায়াম্মুমকে যথেষ্ট মনে করতেন না। তারা এ সংক্রান্ত আয়াতের لامستم শব্দটিকে নিছক স্পর্শ অর্থেই গ্রহণ করতেন। তবে এ দ্বারা তারা নারীকে স্পর্শ করতেই ওজু ভেঙ্গে যায় মনে করতেন।"

ভাবতে অবাক লাগে, ইসলামি বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন ও তত্ত্বানুসন্ধানের দায়িত্ব পালনে যারা এমন দু:খজনক শৈথিল্যে আক্রান্ত, তারা আবার 'সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা' নিরূপণের কাজেও আত্মনিয়োগ করে। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৫৯]*

৮. সাহ্‌রির শেষ সময় কোনটি?

প্রশ্ন : কিছু লোক অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে, মাওলানা মওদূদী রা. সাহরির শেষ সময় সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন, তা কুরআন হাদিসের বক্তব্যের খেলাফ। বলা হয়, তিনি একটি হাদিসের আলোকে আযানের পরও কিছু পানাহার করে নেয়াকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এই হাদিসে উল্লেখিত আযানকে বেলালের রা. আযান বলেছেন। তিনি ফজরের সময় হবার আগে রাত থাকতেই আযান দিতেন। বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

জবাব : আসলে এ বিষয়ে যারা অভিযোগ করছেন, তাদের অভিযোগ মূলত তাফহিমুল কুরআন সূরা আল বাকারা ১৯৪ টীকার নিম্নোক্ত বাক্যগুলো সম্পর্কে :

"আজকাল লোকেরা সাহরি ও ইফতার উভয় ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্কতার কারণে কিছু অযথা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরিয়ত এ দু'টি সময়ের এমন কোনো সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে, তা থেকে কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাতকালে রাত্রির বুক

চিরে সাদা রেখা ফুটে উঠার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ রয়েছে। ঠিক প্রভাতের উদয়মুহূর্তে যদি কোনো ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গে তাহলে সঙ্গতভাবেই সে উঠে তাড়াহুড়া করে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যদি তোমাদের কেউ সাহরি খাচ্ছে এমন সময় আযানের আওয়াজ কানে এসে গিয়ে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আহার ছেড়ে না দেয়, বরং সে যেনো পেট ভরে পানাহার করে নেয়।"

এ বাক্য কয়টির উপরই বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগসমূহের সারকথা হলো, এ বাক্যগুলোতে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা এই আয়াতাংশের সাথে সাংঘর্ষিক: "আর পানাহার করো, যতোক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়।" (সূরা আল বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭) আর উপরোল্লেখিত হাদিসে মূলত বেলালের রা. আযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি প্রভাত শুরু হবার অনেক আগে লোকদেরকে সাহরির জন্যে উঠাতে আযান দিতেন।

রাতের কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা পরিষ্কার হয়ে না উঠা পর্যন্ত পানাহার করা যে জায়েয, কুরআন মজিদের এ বক্তব্য সম্পর্কে কোনো মুসলমানই অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সন্ধ্যার লাল রেখার মতোই সাহরির শেষ সময় সম্পর্কে প্রাচীন আলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের লোক ছিলেন। তাঁদের মতামতসমূহ প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তাঁদের কারো মতে প্রভাতের একেবারে প্রাথমিক রেখা সূচিত হবার সাথে সাথেই পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করেন, প্রভাতের সাদা রেখা উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত পানাহারের অবকাশ থাকে। এই মতভেদ স্বয়ং হানাফি ফকীহগণের মধ্যেও রয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. নিজেও তাঁর 'আল মুসাবভা' গ্রন্থে ফতোয়ায়ে আলমগীরীর সূত্রে লিখেছেন :

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ হয়েছে, (রোযার ব্যাপারে সাহরির শেষ সময়) প্রভাতের সূচনালগ্ন থেকে ধরা হবে, নাকি চতুর্দিকে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়লে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম মতটি সতর্কতামূলক আর দ্বিতীয় মতটি প্রশস্ত ও সহজ। অধিকাংশ ওলামা দ্বিতীয় মতের সমর্থক।

বিভিন্ন হাদিস থেকে দ্বিতীয় মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, সুনানে নাসায়ির 'সাহরি' অধ্যায়ে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে :

যায়িদ থেকে বর্ণিত। "আমরা হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহর সাথে আপনি কোন্ সময়ে খেতেন? তিনি বললেন আমরা যখন সাহরি খেতাম, তখন দিনের আলো ছড়িয়ে পড়তো, কেবল সূর্য উঠার বাকি থাকতো।"

আবু দাউদের সেই হাদিসটির কথাই ধরুন, যেটি তাফহিমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিসে বর্ণিত আযানের অর্থ মাগরিবের আযান। কেউ কেউ বলেছেন, ফজর সূচনার আযান। কিন্তু হাদিসটিতে পানাহার বিষয়ক যে আলোচনা হয়েছে, তা কেবল তখনই অর্থবহ হতে পারে, যখন রোযাদারের নিজের ভোর হয়ে গেছে বলে একিন না হবে। তা না হলে এ প্রসঙ্গে এ হাদিস অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাও হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা। তার বিবরণ হলো : রমযানে হযরত বেলাল লোকদের ঘুম থেকে উঠানোর জন্যে একটি আযান দিতেন প্রভাত সূচনার পূর্বে আর প্রভাত সূচনার সময় আরেকটি আযান দিতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. শাহ ওয়ালীউল্লাহর রা. বক্তব্য হলো, আবু দাউদের হাদিসে যে আযানের পর পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেটি বেলালের রা. এই আযান যা প্রভাত হবার পূর্বেই তিনি রাত থাকতে দিতেন।

শাহ্ সাহেবের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কেউ যেনো এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না হন যে, তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা, অথবা সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ব্যাখ্যা, কিংবা সেই ব্যাখ্যার সপক্ষে কোনো মজবুত সমর্থন আছে। আসলে ব্যাপার 'মুযালিমুস্ সুনান' এবং 'মিরকাত' প্রভৃতি গ্রন্থে উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যাই বর্তমান আছে। কিন্তু সবগুলো মতই 'বলা হয়েছে' অথবা 'এরূপ হতে পারে' এর সাথে বলা হয়েছে। কোনো একটি মতকেও অকাট্যভাবে এবং আস্থার সাথে গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কিছু না কিছু সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে এইসব ব্যাখ্যার পরিবর্তে মাওলানা মওদূদী যে সরল সোজা ব্যাখ্যা করেছেন, তা কেবল সন্দেহ সংশয় থেকেই মুক্ত নয়, বরঞ্চ অপর একটি হাদিস সরাসরি এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। সে হাদিসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মুসনাদে আবু হুরাইরায় বিশুদ্ধ এবং মুত্তাসিল সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসটি নিম্নরূপ :

"তোমাদের কেউ যখন (সাহরি) খাবার অবস্থায় আযান শুনে, তখন সে যেনো খাবার শেষ না করে বরতন (প্লেট) রেখে না দেয়। মুয়াযযিন এই আযান তখন দিতো যখন প্রভাত সূচিত হয়ে যেতো।"

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমদের এই দু'টি হাদিসেরই রাবী হলেন আবু হুরাইরা রা. উভয় হাদিসই একই শিরোনামের অধিনে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, শেষোক্ত হাদিসটি প্রথমোক্ত হাসিটির ব্যাখ্যা বর্ণনা করছে। এ শেষোক্ত হাদিসটির বিবরণ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, হাদিসে যে আযানের সময় পানাহার শেষ করার কথা আলোচিত হয়েছে, তা রাতের আযান

নয়, বরং প্রভাত সূচনার আযান। সে আযান দিতেন সাধারণত ইবনে উম্মে মাকতুম রা. এখানে একথাও প্রমাণ হলো যে, মাওলানা মওদূদীর এই বক্তব্য হুবহু হাদিসের অনুরূপ যে : "ঠিক প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কোনো ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গে তাহলে সঙ্গতভাবেই সে উঠে তাড়াহুড়া করে কিছু পানাহার করে নিতে পারে।" এটা আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে একটি সহজতর বিধান। আল্লাহর কোনো বান্দাহ যদি এর সুবিধা গ্রহণ করে, তবে অপর কারো থলে থেকে কিছু কমে যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে মনে সংকীর্ণতা বোধ করার কি প্রয়োজন আছে?

এবার দেখা যাক, কোনো কোনো বুযর্গ এখানে আযানের অর্থ যে বেলালের আযান করেছেন, তার হেতু কি? তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তরে রেখেই বলছি, তাঁদের এ ব্যাখ্যা কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। কারণ বেলাল তো লোকদেরকে সাহরি খাবার জন্যে উঠাতেই আযান দিতেন। সুতরাং তাঁর আযানের সময় খাবার অবস্থায় থাকা এবং আযান শুনে তাড়াহুড়া করে খেয়ে নেয়ার অনুমতি একেবারেই অবান্তর। তাঁর আযানের পর ঘুম থেকে উঠে তো লোকেরা ধীরে সুস্থে সাহরি খেতো। তাড়াহুড়া করে কিছু খেয়ে নেবার অনুমতির প্রশ্ন তো কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন দ্বিতীয় আযানের সময় কারো ঘুম ভাঙ্গবে, কিংবা এটা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যে খুব দেরিতে সাহরি খেতে শুরু করেছে এবং তার খাবার শেষ না হতেই দ্বিতীয় আযান পড়েছে। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬২]*

৯. একটি হাদিস থেকে সুদের বৈধতা প্রমাণের অপচেষ্টা

প্রশ্ন : সরকার যে প্রভিডেন্ট ফান্ড কেটে রাখে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ঐ ফান্ড থেকে সুদ গ্রহণ করা ও না করার এখতিয়ার দেয়া হয়। সেভিং সার্টিফিকেটের ব্যাপারও তদ্রুপ। জনৈক আলেম আমাকে বলেছেন, সরকার যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু দিতে চায়, চাই তা সুদের নামে হোক বা অন্য কোনো নামে হোক এবং তার হার নির্ধারিত হোক বা না হোক, তা গ্রহণ করা জায়েয। এটা সুদ নয়। তিনি একটা হাদিসের উল্লেখ করেছেন যে, রসূল সা. এক যুদ্ধের সময় প্রতিটি উটের বদলায় দুটো করে উট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকে নাকি ইজতিহাদ করা চলে যে, সরকার ইচ্ছে করলে প্রয়োজনের সময় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়তি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারে। এভাবে যে বাড়তি টাকা দেয়া হয়, তা জায়েয। প্রমাণ চাইলে তিনি বুলুগুল মুরাম গ্রন্থের কিতাবুল বুয়ূ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়) এর একটি হাদিসের উল্লেখ করেন। হাদিসটি হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স বর্ণনা করেন যে :

ان النبى صلى الله عليه وسلم أمره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين (رواه الحاكم و البيهقى ورجاله ثقات)

অনুগ্রহপূর্বক উক্ত আলেম এই হাদিস থেকে যেভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, সে সম্পর্কে আলোকপাত করুন। উল্লেখিত মাসয়ালাটি সঠিক কিনা জানাবেন।

জবাব : আপনার উদ্ধৃত হাদিস দ্বারা যদি কোনো আলেম অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন, যা আপনার প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন, তাহলে তার সাথে একমত হওয়া সম্ভব নয়। তার যুক্তিতর্ক একাধিক ত্রুটি ও ভুল বুঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ। সতর্কভাবে হাদিসটির শাব্দিক অনুবাদ করলে এ রকম দাঁড়ায় :

"হযরত আমর ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত, রসূল সা. তাঁকে একটা যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরির নির্দেশ দেন। অতঃপর উট শেষ হয়ে গেলে রসূল সা. যাকাতের উষ্ট্রীসমূহের বিনিময়ে উট সংগ্রহ করতে বলেন। অতঃপর আমি দুই উটের বিনিময়ে একটা উট নিচ্ছিলাম যতোক্ষণ না যাকাতের উট আদায় হয়ে যায়।"

এখানে প্রথম যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়, তা হলো, এক উটের বদলে দুই উট পাওয়া যাবে-এই মর্মে কোনো শর্ত স্বয়ং রসূল সা. আরোপ বা গ্রহণ করেছেন বলে এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়না। এটা হযরত আমর ইবনুল আ'সের নিজস্ব উক্তি। রসূল সা. তাঁর এ কার্যক্রমের কথা জানতেন কিনা এবং তিনি তা বহাল রেখেছেন কিনা, সে সম্পর্কে এতে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। এমনকি স্বয়ং হযরত আমর যাকাতের উট সংগৃহীত হবার পর এক উটের বদলে দুই উট দিয়েছিলেন কিনা, সে কথাও স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়তঃ রেওয়ায়েতটির ভাষা থেকে সুস্পষ্টভাবে এ কথাও জানা যায়না যে, এ ঘটনাটা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ছিলো, না ঋণ সংক্রান্ত। টীকাকারদের কেউ কেউ এটাকে ক্রয় বিক্রয় অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন ঋণ অর্থে। অর্থাৎ কারো ধারণা, উটগুলোকে কিনে নেয়া হয়েছিলো এবং তার দাম হিসেবে অন্য উট দেয়ার কথা ছিলো। আর অন্যদের মতে উটগুলো ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছিলো।

'বুলুগুল মুরাম'-এর গ্রন্থকার এ হাদিসকে হাকেম ও বায়হাকীর বরাতে উদ্ধৃত করে এর বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন, সে কথা সত্য, তবে ইমাম বায়হাকী ও ইমাম হাকেমের বর্ণিত প্রত্যেক হাদিস এমন নয় যে, একটা সাধারণ বিশ্বস্ততার সার্টিফিটের উপর নির্ভর করেই তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়। বিশেষত, যখন তার মূল ভাষ্যে জটিলতা ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান এবং তার প্রতিপাদ্য বিষয় বিপুল সংখ্যক বিশ্বস্ত হাদিসের পরিপন্থী। বুলুগুল মুরামের বিশিষ্ট টীকাকার নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান স্বীয় গ্রন্থ 'মিসকুল খিতামে' এই হাদিসকে দুর্বল প্রতিপন্নকারী একাধিক মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং নিজের অভিমত নিম্নরূপ ব্যক্ত করেছেন :

"আমার মতে এ হাদিসের দুর্বলতার কারণ, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন, যিনি বিতর্কিত।"

তাছাড়া এ হাদিসে কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা যেমন হাদিসটির মূল ভাষ্য থেকে জানা যায়না, তেমনি টীকাকারদের বক্তব্য থেকেও তার সন্ধান মেলেনা। সুদ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়টি সংক্রান্ত বিস্তৃত ও চূড়ান্ত বিধিমালা নবুওয়াতের শেষদিকে প্রবর্তিত হয়েছিলো। হয়তো বা এ ঘটনা তার আগেকার। তা যদি হয়ে থাকে তা হলে এ ধরনের লেনদেন বাতিল বলেই সাব্যস্ত হবার কথা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ ও সবচাইতে লক্ষ্যণীয় কথা এই যে, এ হাদিস জীবজন্তুর লেনদেন ও বিনিময় সংক্রান্ত। আর এ ব্যাপারটা নগদ টাকাকড়ি ও জিনিসপত্রের লেনদেন থেকে একেবারেই আলাদা। গবাদিপশুর কোনো নির্ধারিত বাজার দর বা রেট নেই। এগুলোকে মাপা ও ওজন করা যায়না এবং বয়স প্রজাতি কর্মক্ষমতা উপকারিতার বিচারে একই শ্রেণীর এক জানোয়ারের সাথে আরেক জানোয়ারের অনেক পার্থক্য থাকে। এজন্য বিশেষভাবে জীবজন্তুর ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি তেমন কড়া ও চূড়ান্ত নয়। এ কারণেই ফেকাহবিদ ও হাদিসবেত্তাদের এ বিষয়ে বিস্তর মতান্তর ঘটেছে যে, যখন নগদে অথবা বাকিতে জীবজন্তুর বিনিময় করা হবে, অথবা জীবজন্তু ঋণ হিসেবে দিয়ে জীবজন্তুই ফেরত নেয়া হবে, তখন সেক্ষেত্রে কমবেশি করা জায়েয কিনা। কারো কারো মতে, জীবজন্তুর বয়স ও সংখ্যা ইত্যাদির দিক দিয়ে কমবেশি করলেও ব্যাপারটা যদি বেচাকেনা সংক্রান্ত হয় ও নগদ বিনিময় হয়, তাহলে সেটা জায়েয। কিন্তু জীবজন্তুর বিনিময়ে জীবজন্তুর ঋণের আদান প্রদান জায়েয নেই। এ মতের পক্ষে একটি হাদিস বুলুগুল মুরামের এই অধ্যায়েই রয়েছে :

عن سمرة بن جندب ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

"হযরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে বর্ণিত, রসূল সা. জীবজন্তুর বিনিময়ে জীবজন্তুর বাকি বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেছেন।"

এই মতেরই অনুসারিদের দৃষ্টিতে হযরত আমর ইবনুল আ'সের বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কেননা জীবজন্তুর বিনিময়ে জীবজন্তুর বাকি কেনাবেচা যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে জীবজন্তুর ঋণ হিসেবে দিয়ে পরে আবার জীবজন্তুর আদায় করা কিভাবে জায়েয হয়?

কোনো কোনো ফেকাহবিদ জীবজন্তুর বিনিময় আদৌ জায়েয মনে করেননা। চাই তা নগদে হোক বা বাকিতে হোক, কিংবা লেনদেনটা ঋণের হোক বা কেনাবেচার হোক।

কিন্তু আপনার ও উক্ত আলেম সাহেবের যিনি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সেভিং সার্টিফিকেট (অথবা অন্যান্য ঋণ) এর ক্ষেত্রে সুদকে নিছক একটি দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন– উভয়েরই এ কথা পুনরায় ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, বিনিময়ে কমবেশি করা জায়েয কি নাজায়েয, তা নিয়ে যে মতভেদের কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হলো, সেটা সোনারূপা বা টাকাকড়ির সাথে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়। ওটার সম্পর্ক শুধুমাত্র জীবজন্তু কিংবা অন্য কিছু দ্রব্যাদির সাথে। নচেত ১৪০০ বছরব্যাপী প্রাচীন ও আধুনিক মুসলিম আলেমদের সকলে এ ব্যাপারে পূর্ণ একমত যে, টাকা পয়সার নগদ অথবা ঋণ আদান-প্রদানে বাড়তি প্রদানের অগ্রিম শর্ত আরোপ করা নি:সন্দেহে সুদ এবং অকাট্যভাবে হারাম। এই সর্বসম্মত নীতির ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ও চিরন্তন ঘোষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্বল অস্ত্র দিয়ে এই ভিত্তিকে বিধ্বস্ত বা নড়বড়ে করার সাধ্য কারো নেই। *[তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৬৩]*

১০. মুসলিম উম্মাহর বহু গোষ্ঠিতে বিভক্তি এবং মুক্তি লাভকারি গোষ্ঠি

প্রশ্ন : একটি হাদিসে আছে, মুসলিম উম্মাহ বাহাত্তর গোষ্ঠিতে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে একটি মাত্র গোষ্ঠি বা ফের্কা পরকালে মুক্তি লাভ করবে। আর বাদ বাকি সকল গোষ্ঠি হবে দোযখবাসি। আমি এই হাদিসটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ইচ্ছুক। এ হাদিসটি কি সহীহ ও প্রামাণ্য, না দুর্বল ও মনগড়া? যদি হাদিসটি সহীহ হয় তাহলে মুক্তি লাভকারী ফের্কা কোন্‌টি? সেই ফের্কাটি ছাড়া সকল ফের্কা কি স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে দোযখে যাবে? বাহ্যত এ ব্যাপারটা বড়ই উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ যে, উম্মতের বেশিরভাগ লোকই আগুনের শাস্তি থেকে নিস্তার পাবেনা এবং দোযখের যোগ্য হবে।

জবাব : মুসলিম উম্মাহর বহুধা বিভক্তির ব্যাপারে যে হাদিস সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন, ওটা সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে তো নেই। তবে আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে আছে। আবু দাউদের 'কিতাবুস সুন্নাহ' (সুন্নাহ সংক্রান্ত অধ্যায়) তে বর্ণিত একটি হাদিসের ভাষা নিম্নরূপঃ

افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة –

অন্য একটি বর্ণনায় নিম্নের কথাটি সংযোজিত হয়েছে :

ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة

এর অনুবাদ হলো, "ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে ৭১ বা ৭২ ফের্কা জন্মেছে। আর আমার উম্মাতের ৭৩টি ফের্কা জন্ম নেবে, তন্মধ্যে ৭২টি ফের্কা দোযখে যাবে আর একটি ফের্কা বেহেশতে যাবে। বেহেশতে যে ফের্কাটি যাবে সেটি হলো

'আল-জামায়াত' তিরমিযীর হাদিসে আল জামায়াত শব্দটির পরিবর্তে ما انا عليه واصحابى কথাটি রয়েছে অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবিগণ যে আদর্শের অনুসারি।"

ইমাম তিরমিযী এ হাদিসকে 'হাসান গরিব' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যার তাৎপর্য হলো এটি পুরোপুরি সহীহ্‌র পর্যায়ে পড়েনা। কারণ এ হাদিস একজন একক বর্ণনাকারীর সূত্রে প্রাপ্ত। তথাপি অন্যান্য শর্তাবলীর বিচারে হাদিসটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং এর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা চলে। হাদিস শাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক কোনো হাদিসকে 'সহীহ নয়' বলে মন্তব্য করা একটা বিশেষ পারিভাষিক ও কৌশলগত তাৎপর্য বহন করে। এর দ্বারা শুধু এতোটুকুই বুঝায় যে, হাদিসটির সনদ বা বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ মানে উত্তীর্ণ নয়। কিন্তু এতে হাদিসটি দুর্বল বা মনগড়া হতেই হবে তা বুঝায়না।

হাদিসটির মূল ভাষ্যের প্রথমাংশে কোনো জটিলতা নেই। কুরআন, হাদিস ও প্রচলিত আরবি বাকরীতিতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সত্তর বা তার সামান্য উচ্চতর সংখ্যা আসলে সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্য প্রচলিত বাকধারা বা প্রবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বুঝায়না। রসূল সা.-এর বক্তব্যের মর্ম ছিলো এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বহু ফের্কা ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু তোমরা মুসলিম জাতি তাদেরকেও হার মানাবে। বলাবাহুল্য, যে জাতি পৃথিবীর সর্বশেষ উম্মাহ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যার বংশধর টিকে থাকবে, তাতে যদি পূর্বতন জাতিগুলোর চেয়ে কিছু বেশি ফের্কার আবির্ভাব ঘটে। তবে সেটা কোনো অসম্ভব বা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তবে তার অর্থ এও নয় যে, প্রত্যেক যুগেই এতোগুলো ফের্কার অস্তিত্ব থাকবে। আসলে এর তাৎপর্য হলো, বিপুল সংখ্যক ফের্কার আবির্ভাব ও তীরোভাব ঘটতেই থাকবে।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে অবশ্য দুটো প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রথমত যে ফের্কার জন্য বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেটি কোন্ ফের্কা? দ্বিতীয়ত উম্মাতে মুহম্মাদির অবশিষ্টাংশ যা বাহ্যত বিরাট অংশ, এ সুসংবাদের অধিকারী হবে না কেন? এ দুটো প্রশ্নের জবাব হলো, যে ফের্কাকে হাদিসে বেহেশ্‌তবাসী বলা হয়েছে, তা কোনো বিশেষ পরিচিত নামে আখ্যায়িত ও বর্তমানের বা অতীতের কোন্ যুগে বিদ্যমান তা কোনো বিশেষ ফের্কার ব্যাপারে একচেটিয়াভাবে প্রযোজ্য নয় এবং গুণমান নির্বিশেষে কোনো ফের্কার সকল সদস্যের জন্যও নয়। এসব ফের্কার কোনো একটি ফের্কাও স্বীয় যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে রসূল সা. জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলোনা। কেননা সেই সৌভাগ্যমণ্ডিত যুগে সেই সব রাজনৈতিক, চিন্তাগত ও ইজতিহাদ প্রসূত মতবিরোধের সূত্রপাতই হয়নি, যার দরুন পরবর্তীকালে রকমারি ফের্কা ও গোষ্ঠির উদ্ভব ঘটেছে। তাই সাহাবায়ে কেরাম এবং স্বয়ং রসূল সা. পূতপবিত্র সত্তা সম্পর্কেও এ কথা বলা যে, তাঁরাও একটি বিশেষ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অনভিপ্রেত।

এ ব্যাপারে একেবারে নিরেট ও নিখুঁত সত্য তো একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন। তবে আমার ধারণা, মুক্তি লাভকারী এই গোষ্ঠিতে উম্মাতে মুহম্মাদীর সকল ফের্কা ও শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটি কেয়ামতের দিনই গঠন করা হবে। এই জান্নাতবাসী গোষ্ঠির নির্দিষ্ট গুণ বৈশিষ্ট্য হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গুণ বৈশিষ্ট্য হলো, যে মহান আদর্শ ও পদ্ধতিকে 'আল জামায়াত' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং যার কেয়ামত পর্যন্ত সগৌরবে ও বিজয়ীর বেশে টিকে থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এই গোষ্ঠির লোকেরা সেই 'আল জামায়াত' এর নীতি ও আদর্শের আনুগত্য ও অনুসরণে অটল থাকবে এবং তার প্রতিষ্ঠার ও স্থিতির জন্য সদা সচেষ্ট থাকবে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নির্ভুল জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হাশরের দিন সমগ্র উম্মত থেকে বাছাই করে এই জান্নাতি গোষ্ঠি সংগঠিত করবেন। এই গোষ্ঠিতে আল্লাহর নবীগণ, নবীসহচরগণ, এই উম্মতের সকল নিষ্ঠাবান অনুসারি, সকল সত্যনিষ্ঠ ও নেককার বান্দা এবং উম্মাতের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই সে দুনিয়াতে হানাফি, শাফেয়ী, আহলে হাদিস প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত হোক কিংবা কোনো পরিচিত গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত না হোক। প্রত্যেক মুমিনের এরূপ দোয়া করা উচিত যেনো আল্লাহ তাকে এই গোষ্ঠির মধ্যে শামিল হবার সৌভাগ্য দান করেন।

একাত্তর বা বাহাত্তর গোষ্ঠি দোযখে যাবে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরাই দোযখবাসী হবে মনে করা ঠিক নয়। মনে করুন, মুসলমানদের সংখাগুরু অংশ সত্যাশ্রয়ী হলে এবং অসংখ্য ছোট ছোট ফের্কা বাতিল ও গোমরাহীর ভিত্তিতে গড়তে ও ভাঙ্গতে থাকলে এইসব বাতিল সামগ্রিক লোকসংখ্যা সংখ্যাগুরু সত্যনিষ্ঠ গোষ্ঠির লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম থাকবে। তাই কেবল ফের্কার সংখ্যা দেখে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্পষ্টতই ভুল। কোটি কোটি মানুষের সত্যনিষ্ঠ দল যদি একদিকে থাকে, আর অনেকগুলো গোমরাহ ফের্কা-যার লোকসংখ্যা কয়েক লাখের বেশি নয়- অপরদিকে থাকে, তাহলে মুক্তিপ্রাপ্তরা যে সংখ্যালঘু নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। *[তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৬৩]*

১১. কালো খেজাব লাগানো কি বৈধ?-১

প্রশ্ন : শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে খেজাব বা অনুরূপ অন্যকিছু দ্বারা দাড়ি কিংবা মাথার চুল রং করা কি বৈধ্য? যদি বৈধ হয়ে থাকে তবে তার প্রমাণ কি? আর যদি নাজায়েয হয়ে থাকে, তবে তারই বা প্রমাণ কি? বিষয়টি নিয়ে আমাদের এখানে বেশ বাহাছ চলছে। কেউ বলছে বৈধ। কেউ বলছে অবৈধ। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

জবাব : আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি। দাড়ি বা চুলে কালো ছাড়া অন্য যে কোনো রং লাগানো বৈধ হবার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, এর বৈধতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-এর বক্তব্য রয়েছে। অবশ্য কালো রং এর খেজাব লাগানোর বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

খেজাব সম্পর্কে ইমাম মুসলিম প্রমুখ একটি সহীহ্ হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে হাদিসে আবু বকর রা. এর পিতা আবু কোহাফা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-এর এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, তার চুলে রং লাগাও, তবে কালো রং লাগাবেনা। খেজাব সংক্রান্ত এছাড়াও কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায়। তবে সনদের দিক থেকে সেগুলোর মর্যাদা এই হাদিসটির সমতুল্য নয়। তাছাড়া সেগুলোর বক্তব্যেও বিরোধপূর্ণ। কোনোটিতে কালো খেজাব ব্যবহারকারীদের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। আবার কোনো কোনোটি থেকে কালো খেজাবের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। *[যেমন, ইবনে মাজহা'র পোশাক অধ্যায়ে উদ্বৃত এ সংক্রান্ত হাদিসটি।]*

মুসলিমের হাদিসটিতে যে কালো খেজাব লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই নিষেধাজ্ঞাকে যদি মাক্রূহ্ তাহরীমীর পরিবর্তে মাক্রূহ তানযীহী ধরা হয়, তবে ইবনে মাজাহর হাদিসের সাথে সে হাদিসের আর কোনো বিরোধ থাকবেনা। এরূপ সামঞ্জস্য বিধানের সপক্ষে যুক্তি সহীহ্ মুসলিমেই পাওয়া যায়। তাহলো চুল রং করার হুকুমটিও ওয়াজিব কিংবা তাকীদ নয়, বরং মুস্তাহাব বলেই প্রমাণ হয়। কারণ, তা না হলে চুল বা দাড়ি সাদা রাখাটাও মাক্রূহ তাহ্রীমীর পর্যায়ে পড়তে বাধ্য। অথচ কেউই এরূপ মত ব্যক্ত করেননি।

একদল ইমাম ও ফকীহ্ কালো খেজাবকে মাকরূহ তাহরীমী বলেছেন। কালো খেজাব ব্যবহার না করতে তাকীদ করেছেন। অপরদল কালো খেজাবকে মাকরূহ তানযীহী বলেছেন। এর ব্যবহার না করাকে অপরিহার্য মনে করেননি। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যুহরী কালো খেজাবের ব্যবহারকে জায়েয মনে করতেন। নিজেও ব্যবহার করতেন।

যাই হোক, কালো খেজাবের ব্যাপারে অতীতে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ ছিলো। উভয়পক্ষের মতই দলিল প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই, এ ব্যাপারে কোনো একটি মতের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন না করাই ভালো। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪]*

১২. কালো খেজাব কি বৈধ?-২

প্রশ্ন : সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালের 'তরজমানুল কুরআনে' খেজাবের বৈধতা অবৈধতা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে জটিলতা নিরসন হয়নি। হাদিসে কালো খেজাবের ব্যবহার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কেমন করে তা বৈধ হবার অবকাশ থাকতে পারে? হানাফি ফকীহ্গণ ও তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ্ হাদিসে চুল কালো করার বিপক্ষে নির্দেশ রয়েছে এবং মেহেদী

লাগানোর সপক্ষে নির্দেশ রয়েছে। এ হাদিসের ভিত্তিতেই হযরত আবু বকরের রা. পিতাকে মেহেদী লাগানো হয়েছিলো। আমাদেরও হাদিসের উপরই আমল করা উচিত।

জবাব খেজাব সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে সনদগত দিক থেকে সেটিই সহীহ হাদিস, যেটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হলো, হযরত আবু কোহাফাকে যখন নবী করীম সা.-এর সম্মুখে আনা হলো, তখন তিনি তার সাদা দাড়ি দেখে বলেছিলেন "গাইয়িরু হাযা বিশাইয়িন ওয়া জান্নিবুহুস সাওয়াদ" "তার চুল (দাড়ি) গুলোকে রং করে দাও। তবে কালো রং লাগাবেনা।"

এ হাদিসে মেহেন্দী লাগানোর কথা উল্লেখ নেই। অবশ্য অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবু কোহাফাকে রা. লাল খেজাব লাগানো হয়েছিলো।

ইবনে মাযাহর 'পোশাক অধ্যায়ে' বর্ণিত একটি হাদিসের বক্তব্য এর বিপরীত। তাতে বলা হয়েছে "তোমরা যে খেজাব ব্যবহার করো তন্মধ্যে কালো রং সবচেয়ে সুন্দর।"

এ হাদিস কালো খেজাবের ব্যবহার বৈধ হবার প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদিসটির সনদকে জয়ীফ বলেছেন। পূর্বে প্রকাশিত জবাবে আমি উভয় মতকেই অপরিহার্য ধরে নেয়ার পরিবর্তে তানযীহী বা মুস্তাহাব পর্যায়ে ধরে উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলাম। মুসলিমের হাদিসে অবশ্যি কালো রং এর খেজাব ব্যবহার না করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আমি সেই নিষেধকে তাহরীমীর পরিবর্তে তানযীহী মনে করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কারণ এই নিষেধকে যদি অপরিহার্য (ফরয) পর্যায়ের ধরে নেয়া হয়, তবে সাদা চুল বা দাড়িতে খেজাব লাগানোর নির্দেশকেও অপরিহার্য ধরে নিতে হয় এবং সে অবস্থায় চুল বা দাড়ি সাদা রাখাও নিষেধ হয়ে পড়ে। অথচ কেউই এ ধরনের মত পোষণ করেননা। এমনটি কিছুতেই সঠিক হতে পারেনা। এ উদাহরণের ভিত্তিতে মুসলিমের হাদিসে কালো খেজাবের ব্যবহার সম্পর্কে যে নিষেধ এসেছে, সেটাকে অকাট্য নিষেধ (হারাম) মনে না করাই উচিত।

অতীত মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ এভাবেই এ বিষয়টির জটিলতা নিরসন করেছেন। ইমাম নববী সহীহ মুসলিমের উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় তাবরানীর এ মতটি উল্লেখ করেছেন :

"এখানে নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞার অপরিহার্যতা বুঝায় না। এটাই সর্বসম্মত মত। এ কারণেই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীর একে অপরের সমালোচনা করেননি।"

ইমাম নববী আরো বলেছেন, ইমাম যুহরী ছাড়াও অতীতের অনেক বুযুর্গই কালো খেজাব লাগিয়েছেন। যেমন আবু হুরাইয়া রা. উসমান রা. হাসান রা. হুসাইন রা. উকবা ইবনে আমের রা. ইবনে সীরীন রা.. এবং অন্যান্য বুযুর্গ। হানাফীগণের

দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে নিষেধাজ্ঞার দিকে। কিন্তু তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালো খেজাবের ব্যবহার বৈধ হবার সপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন যেমন, সৈনিকদের জন্যে। অথচ অকাট্য হারাম জিনিস তো কেবল তখনই বৈধ হতে পারে, যখন তা অকাট্য দলিল দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত হবে, কিংবা বাধ্য হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, অথবা সহজতরটি গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দেবে। এ কারণে এ বিষয়ে হানাফি ফকীহগণের না জায়েযের দৃষ্টিভঙ্গি মাকরূহ তানযীহি পর্যায়ের বলেই প্রমাণিত হয়।

আপনি যদি কালো খেজাবের ব্যবহারকে নিষেধ বলে মনে করেন, তবে নিজে অবশ্যি সে অনুযায়ী আমল করুন। আমি নিজেও এটা ব্যবহার করিনা। প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিনা। কিন্তু শরিয়ত যে বিষয়ে প্রশস্ত মতামতের অবকাশ রেখেছে, সে বিষয়ে অন্যদের মতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা এবং তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা ঠিক নয়। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৭]*

১৩. তাকদীর প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক অদ্ভুত আপত্তি তুলেছে। তার বক্তব্য হলো, ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই সময়ের আগ-পাছ হওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। অথচ আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের জাতিগুলো স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিমালা মেনে চলা ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের গড় আয়ু বৃদ্ধি ও মৃত্যুর হার হ্রাস করে ফেলেছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, আয়ু কমানো বাড়ানো যায় এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত করা মানুষের আয়ত্তের ভেতরে। এই দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক জানাবেন। আয়ুষ্কালও মৃত্যুর সময় কি নির্দিষ্ট, না তাতে রদবদল করার ক্ষমতা মানুষের আছে?

জবাব আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা আসলে একটা বৃহৎ মৌলিক প্রশ্নের অংশবিশেষ। মৌলিক প্রশ্নটি হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও অদৃষ্টের অধীন মানুষ কতোখানি অক্ষম ও অসহায়, কোন্ সীমানা পর্যন্ত তাকে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং চেষ্টার দ্বারা ইপ্সিত ফলাফল অর্জন করা কতোদুর তার ক্ষমতা ও সাধ্যের আওতাধীন? এ প্রশ্নটি এমন নয় যে, সংক্ষেপে ও অনায়াসে তার জবাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক পন্থায় দেয়া যেতে পারে। জবাবে যদি বলা হয়, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে সক্ষম এবং কোনো উচ্চতর শক্তি তার কার্যকলাপ ও তার ফলাফলের উপর প্রভাবশালী ও আধিপত্যশীল নয়, তাহলে এ বক্তব্য হবে স্পষ্টতই ভ্রান্ত। মানুষ যখন নিজেকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, তখন তার কৃতকর্মের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সে কি করে হতে পারে? আবার যদি বলা হয়, সে একেবারেই অক্ষম ও অসহায় এবং তার কোনোই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নেই, তবে সে কথাও স্পষ্টতই অসত্য, বিবেক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপন্থী এবং ইসলামি শিক্ষারও বিপরীত।

প্রকৃত সত্য এই উভয় প্রান্তিক বক্তব্যের মাঝখানে অবস্থিত। একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মানুষ সীমিত স্বাধীনতার অধিকারী এবং এ স্বাধীনতা মানুষ ও বিশ্বজগতের স্রষ্টারই দান। সেই গণ্ডির বাইরে যাওয়ামাত্র মানুষের সকল স্বাধীনতা বিলুপ্ত ও নি:শেষ হয়ে যায় এবং তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা ও তার ফলাফল শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছার অধীন হয়ে যায়। নিজের স্বাধীনতা ও অধীনতার সীমানা কতোদুর তা মাপার চেষ্টা করা এবং এই ক্ষমতা ও অক্ষমতার সমন্বয় কিভাবে করা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামানো মানুষের কর্তব্য নয়। মানুষ যতোক্ষণ আপন মানবীয় বলয়ে আবদ্ধ এবং যতোক্ষণ সে সৃষ্টির স্থলে স্রষ্টায় পরিণত হতে না পারছে, ততোক্ষণ সে এই জটিল সমস্যার গভীরতম প্রকোষ্ঠে ও নিগুঢ়তম সমাধানে উপনীত হতে সক্ষম নয়। তার কর্তব্য শুধু এতোটুকুই, যে সীমানা পর্যন্ত তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সেই সীমানার ভেতরে থেকে তার স্বাধীনতা স্বীয় স্রষ্টার ইচ্ছে ও অভিলাষ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে। আর যে সীমারেখার ওপারে তার স্বাধীনতা নেই, সেখানে সে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর হবার দাবি করতে পারবেনা।

এই মৌলিক তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর আপনি আয়ুষ্কালের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়টা নিজেই ভেবে দেখুন। আল্লাহ কার মৃত্যুর জন্য কোন্ সময়টা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং একটা বিশেষ যুগে ও সময়ে কোনো বিশেষ জাতির জন্য কি হারে গড় আয়ু নির্ধারণ করেছিলেন, তা কে জানে? এটা যদি কারো জানা না-ই থাকে, তবে অমুক ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে মরার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে, কিংবা সে নিজে বা অন্য কেউ তার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে এমন দাবি করাটা আপনা থেকেই নিরর্থক হয়ে যায়। এসব আসলে কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তা। অনেকে না বুঝেসুজেই এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন তা কাজে লাগিয়ে যতোদুর সম্ভব রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য রক্ষার সর্বোত্তম উপায় উপকরণ সংগ্রহ করাই আমাদের একমাত্র করণীয়। সেটা সংগৃহীত হলে আল্লাহর শোকর করা কর্তব্য। এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু আমাদের এখতিয়ারে নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে আমরা কাউকে রোগে ভুগতেও দিতামনা, মরতেও দিতামনা। কিন্তু রোগ মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে রোধ করা আদিম যুগের মানুষেরও সাধ্য ছিলোনা, আজকের কোনো মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়, তা সে যতোবড় চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিকই হোক না কেন। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪]*

১৪. গোমরাহী ও হেদায়াত

প্রশ্ন : সতের বছর বয়স থেকেই আপনার লেখা বইপুস্তক পড়তে শুরু করি। ১৯৫২ সাল নাগাদ প্রায় সকল বই কিনে পড়ে ফেলি। ১৯৫১ সালে করাচিতে জামায়াতের যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতেও যোগদান করি। তারপর

জামায়াতের সহযোগী সদস্য হয়ে যাই এবং যথাসাধ্য আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে চেষ্টা করি।

কিন্তু ১৯৫৩ বা ১৯৫৪ সালে মাসিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি সংখ্যা পড়ে এমন গোমরাহ হয়ে যাই যে, প্রায় কুফরির পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হই। কয়েকবার আপনার পুস্তক তাফহীমাত (নির্বাচিত রচনাবলী) পড়া সত্ত্বেও সংশয় দুর হয়নি। শেষ পর্যন্ত সকল ইসলামি বই পুস্তক পড়া ছেড়ে দেই।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে আপনার লেখা 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়ত' (সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা) বইখানা হস্তগত হয়। ওটি পড়ার পর অনেক সন্দেহ সংশয় দুর হয়ে যায়। এখন আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামি বিধান অনুসরণ করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। এখন আমার জানতে ইচ্ছে করে :

১. জীবনের যে অংশটি আমি প্রথমে ইসলামি বিধান অনুসারে অতিবাহিত করেছি, আমি কি তার কোনো প্রতিদান পাবো, না কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে তা বৃথা যাবে?

২. মানুষ যখন বিপদগামী হয়, তখন সময় সময় সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েও তেমনটি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবে যে, সে সঠিক পথে আছে কি নেই? সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার সঠিক পন্থা কি?

৩. ইসলামের কোনো কোনো বিষয় যদি বিবেক গ্রহণ না করে, তা হলে কি করা উচিত? আমরা ঈমান তো আনতে পারি এবং সে অনুসারে আমলও করতে পারি। কিন্তু মন যদি তাতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে কি করা যাবে?

জবাব : হাদিস অমান্য করার মতো কুফরি মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছেন, সে কথা জেনে খুবই খুশি হলাম। দোয়া করছি, যেনো আল্লাহ আপনাকে সত্য দীনের উপর অবিচল রাখেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো আপনি পদস্খলনের শিকার না হন। আপনার প্রশ্ন কয়টির সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে দেয়া হলো :

১. আপনি যদি হাদিস অমান্য করার কুফরি মতবাদে বহাল থাকতেন তাহলে তো নিঃসন্দেহে আপনার অতীত ইসলামি জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বৃথা হয়ে যেতো। কিন্তু এখন যেহেতু গোমরাহীর অবস্থাটা স্থায়ী হয়নি বরং আপনি ইসলামের দিকে ফিরে এসেছেন, তাই আল্লাহ আপনাকে পূর্ববর্তী সৎকর্মের পুরস্কারও দেবেন। খোদার কুরআন থেকেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা হাদিদের শেষাংশে একদল লোককে ঈমান আনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো তফসিরকারের মতে এ দলটি দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তো মুসলমানই ছিলো। কিন্তু তাঁর নবুওয়ত

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঈমান না আনায় তারা কাফের হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি এখনও মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা প্রথমে যে ইসলামি জীবনযাপন করেছো, তার প্রতিদান বাতিল হবেনা। কতিপয় সহীহ্ হাদিস থেকেও জানা যায় যে, এ ধরনের আহলে কিতাব দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।

২. মানুষ যে কখনো কখনো সদুদ্দেশ্য নিয়েও গোমরাহীর পথে চলে যায় তা অস্বীকার করা যায়না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলে সাধারণ স্বীয় গোমরাহী উপলব্ধি করতে তার বিলম্ব ঘটেনা। প্রথমত, নিজের চোখ কান ও মনমগজকে অর্গলবদ্ধ করে না রাখা, যাতে তার সামনে যা-ই আসুক সে যেনো তা খোলা চোখ ও মুক্ত মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, চাই সে জিনিস তার রুচি ও মেজাজ মর্জির পরিপন্থীই হোক না কেনো। দ্বিতীয়ত, মানুষ যে মতই নির্ধারণ করে, তা যেনো সে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে এবং নি:স্বার্থভাবে করে, আর বিবেকের স্বতস্ফূর্ত দাবিকে দমিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে। অনেক সময় এমন হয় যে, অন্যায় পথে চলাটা প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করার সহায়ক এবং তার সাথে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত বলেই মানুষ তা ভালোবাসে এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর তাকে অগ্রাধিকার দেয়। তৃতীয়ত, সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা যেনো তিনি তাকে সরল ও সঠিক পথ দেখান ও গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এটা খুবই জরুরি জিনিস। নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার সময় আমরা এই দোয়াই করে থাকি। বস্তুতঃ গোমরাহী ও সুপথ প্রাপ্তির আসল উৎস আল্লাহ্ তায়ালাই। তাই তাঁর কাছে প্রেরণা ও শক্তি প্রার্থনা করা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য।

৩. ইসলাম যে আল্লাহরই প্রেরিত দীন এবং তার যাবতীয় শিক্ষা ও বিধান যে সর্বোতভাবে হীতকর বিজ্ঞানসম্মত, সে সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ আস্থা ও সন্তোষ লাভ করাই যথেষ্ট। এর পর ইসলামের প্রতিটি বিধি ও প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিবেকের পূর্ণ তৃপ্তি অর্জন করা জরুরিও নয়, সম্ভবও নয়। *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৬]*

১৫. সূরা আন্ নাজমের প্রাথমিক আয়াত কয়টির ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : সূরা আন্ নাজমের নিম্নের আয়াত দু'টির প্রতি দু'টি আকর্ষণ করছি :

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ • فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

"অত:পর সে নিকটে এলো এবং ঝুঁকে পড়লো, এমনকি দুই ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়েও কিছু কম দুরত্ব থেকে গেলো।" *(সূরা আন্ নাজম, আয়াত : ৮-৯)*

এখানে دَنَا فَتَدَلّٰى নিকটে এলো এবং উপরে ঝুলে রইলো এই ক্রিয়া দু'টির কর্তা জিবরাঈল, এই ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত। অথচ বুখারি শরিফের মিরাজ সংক্রান্ত হাদিসে বলা হয়েছে :

حتى جاء سدرة المنتهى دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى

"অবশেষে রসূল সা. 'সিদরাতুল মুনতাহা'তে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন মহাপরাক্রান্ত প্রভু রসূল সা.-এর কাছে এগিয়ে এলেন, অত:পর এরা ঘনিষ্ঠ হলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রসূল সা.-এর দুই ধনুক পরিমাণ বা তার চেয়েও নিকটবর্তী হলেন।"

এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, রসূল সা. পবিত্র চেহারা চর্মচক্ষু দিয়েই দেখেছেন। রসূল সা. বলেছেন:

رئيت ربى عزوجل فى احسن صورة

"আমি আমার প্রভুকে সর্বোত্তম আকৃতিতে দেখেছি।"

এর পরবর্তী আয়াতে রয়েছে : فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

"অত:পর তিনি স্বীয় বান্দার নিকট যা ওহী করার ছিলো করলেন ।" *(সূরা আন্ নাজম, আয়াত : ১০)*

এর দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়, নিকটে আসা, ঝুলে থাকা, দুই ধনুক বা তার চেয়ে নিকটে আসা-এসব ক্রিয়ার কর্তা জিবরাঈল নয় বরং আল্লাহ তায়ালা। নচেত রসূল সা. জিবরাঈলের বান্দাহ সাব্যস্ত হন (নাউযুবিল্লাহ)।

আমার বুঝে আসেনা, বুখারি এই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদিস থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যাখ্যা করা কিভাবে সঙ্গত হতে পারে, যাতে আল্লাহর পরিবর্তে জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাত ও জিবরাঈলের ঘনিষ্ঠ হওয়া বুঝায়? রসূল সা. যে চর্মচক্ষু দিয়েই আল্লাহর সত্তাকে দেখেছেন এবং অতি নিকট থেকেই দেখেছেন, সে কথা অস্বীকার করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

জবাব : সূরা আন্ নাজম, বিশেষত তার প্রথম রুকু কুরআনের জটিল স্থানসমূহের অন্যতম। এর বেশির ভাগ আয়াত 'মুতাশাবিহাত' (রূপক অর্থবোধক) এর অন্তর্ভুক্ত, যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তথাপি সুদক্ষ আলেমগণ নিজ নিজ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে সাধ্যমত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এ সূরাটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন জাগে তা হলো, এটি কখন নাযিল হয় এবং এতে যে গুরুত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে, রসূল সা.-এর জীবনের কোন্ পর্যায়ে সংঘটিত হয়? সূরা আন নাজমকে সাধারণত মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগের সূরা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং অন্য কয়েকজন সাহাবি থেকে বুখারি ও অন্যান্য সহীহ হাদিসগ্রন্থে

বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদিস থেকে জানা যায় যে, সূরা নাজমই সেই প্রথম সূরা, যার শেষ আয়াত থেকে তেলাওয়াতে সিজদার সূচনা হয়। এখন সমগ্র সূরাটি যদি মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রথম রুকু সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত মিরাজের ঘটনার সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে? মি'রাজ তো প্রামাণ্যতম হাদিস অনুসারে হিজরতের মাত্র এক বা দেড় বছর আগের ঘটনা।

এই জটিলতা নিরসনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজের ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, এ সূরার প্রথমাংশে মক্কী যুগের প্রথম দিকে এবং পরবর্তী অংশ মক্কী যুগের শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় :

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ • ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ

'তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে; অত:পর সে এগিয়ে এলো এবং ঘনিষ্ঠতর হলো।' এ আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা মি'রাজের আগের ব্যাপার। আর وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ 'নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরো একবার দেখেছেন।' এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে যা বর্ণিত হয়েছে তা মি'রাজ রজনীর ঘটনা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস থেকেও এরূপ তথ্য পেশ করা হয় যে, মি'রাজের আগেও হেরা গুহায়, আবতাহ উপত্যকায় বা অন্য কোনো স্থানে রসূল সা. কর্তৃক জিবরাঈলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের ঘটনা ঘটেছিলো যা دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মি'রাজের চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাথে সূরা নাজমের কোনো একটি অংশ জুড়ে দিলে যে জটিলতার উদ্ভব হয়, এসব মতামত ও ব্যাখ্যা দ্বারা তা পুরোপুরি নিরসন হয়না। সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভুল অভিমত সম্ভবত এই যে, এই সূরার কোনো অংশকেই মি'রাজের সাথে জড়িত করা ঠিক নয়। এর প্রথম রুকুতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাকে নবুওয়াতের সূচনাকালে রসূল সা.-কে যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তারই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে গণ্য করতে হবে। রসূল সা.-এর মধ্যে ওহীর গুরুভার গ্রহণ ও বহনের ক্ষমতা এবং জিবরাঈল ও ফেরেশতা জগতের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতার মানসিকতা গড়ে তোলাই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিলো। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ নেই।

তথাপি যদি নাযিলের পটভূমির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে এ সূরার সম্পর্ক মি'রাজের সাথে মেনেও নেয়া হয়, তাহলেও আরেকটা প্রশ্ন মাথা তুলে দাড়ায়। সেটি হলো, এর প্রথম আয়াত কয়টির নিগুঢ় মর্ম কি? 'শক্তিধর শিক্ষক' কে ছিলেন, উর্ধ্ব দিগন্তে বিরাজমান সত্তাটির পরিচয় কি, কে কার কাছে ঘনিষ্ঠ হলো, কে ঝুঁকে পড়লো, কে ওহী করলো এবং কে কাকে পুনরায় সিদরাতুল মুন্তাহাতে আবির্ভুত

হতে দেখলো? প্রাচীন ইমামদের কেউ কেউ বলেন, পুরো ঘটনাটিই স্বয়ং আল্লাহ ও রসূল সা.-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, ঊর্ধ দিগন্তে স্বয়ং আল্লাহই বিরাজিত হয়েছিলেন, আল্লাহই স্বীয় নবীর অথবা নবী আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য তাঁদের মতে স্থানভিত্তিক ব্যাপার ছিলনা। ওটা ছিলো আত্মিক নৈকট্য। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে :

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ   عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ

"তিনি চক্ষু দিয়ে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি তিনি তাঁকে সিদরাতুল মুন্তাহাতে আরো একবার দেখেছেন।"

এসব উক্তিতে যে দর্শকের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা রসূল সা. কর্তৃক আল্লাহকে সরাসরিভাবে দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন বুঝানো হয়েছে। তবে এই দর্শন চর্মচক্ষুর দর্শন, না অন্তর দিয়ে দর্শন এবং স্বয়ং আল্লাহর সত্তার দর্শন, না শুধু তাঁর জ্যোতি দর্শন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

এ মতের সপক্ষে যেসব প্রমাণ দর্শানো হয়, বুখারি শরিফের আলোচ্য হাদিসটি তার অন্যতম। কিন্তু এ হাদিস থেকে প্রমাণ দর্শানো জটিলতা থেকে মুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে সূরা আন নাজমের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার জন্য আলোচ্য হাদিসটির উপর নির্ভর করাও সঙ্গত নয়। প্রথমত, এ হাদিসে "মহা পরাক্রান্ত মহিমান্বিত প্রভু এগিয়ে এলেন এবং এতো ঘনিষ্ঠ হলেন যে, তাঁর (রসূলের) কাছ থেকে তার ব্যবধান দুই ধনুকের সমান বা তার চেয়েও কম রইলো" এ কথাগুলো রয়েছে। ইমাম বুখারি এটি কিতাবুত তাওহীদে 'হযরত মূসার সাথে আল্লাহর প্রত্যক্ষ কথোপকথন' শীর্ষক অধ্যায়ের বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। হাদিসটির সূত্র পরম্পরা হযরত আনাস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। বুখারির অন্য কয়েকটি অধ্যায়ে মি'রাজ সম্পর্কে একাধিক 'মারফু' (অর্থাৎ যা উপরোক্ত হাদিসের ন্যায় কোনো সাহাবি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়নি বরং তার সূত্র পরম্পরা খোদ রসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। এরূপ হাদিস উপরোক্ত হাদিসের চেয়ে উন্নতমানের ও বিশ্বস্ততর অনুবাদক) হাদিস রয়েছে, যা হযরত আনাস ও অন্যান্য সাহাবি কর্তৃক সরাসরি রসূল সা. থেকে বর্ণিত। সে সব হাদিসে সূরা আন নাজমের এ শব্দগুলো এরূপ ব্যাখ্যা সমেত বর্ণিত হয়নি। বরঞ্চ এ হাদিসটি একাধিক দিক গিয়ে ঐসব মারফু হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।

আলোচ্য হাদিসটি সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কথা হলো, এর সনদ বা বর্ণনাসূত্র এবং মূল হাদিসের ভাষা সম্পর্কে হাদিস বিশেষজ্ঞগণ তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে একাধিক আপত্তি তুলেছেন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে শরিক বিন আব্দুল্লাহ নামে এক বিতর্কিত ব্যক্তি বিদ্যমান। বুখারি শরিফের একাধিক টীকাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুরধার

সমালোচনা চালিয়েছেন। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম মুসলিম স্বীয় গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানের মি'রাজ অধ্যায়ে শরিকের এই রেওয়ায়েতটি সনদ বর্ণনা করার পর মূল হাদিসের একটিমাত্র অংশ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। অত:পর এই বর্ণনাকারীর সমালোচনা ও তার সম্পর্কে পাঠককে সতর্ক করার লক্ষ্যে নিজস্ব মন্তব্য হিসেবে নিম্নোক্ত বাক্যটি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

قدم فيه شيئا واخر و زاد ونقص

"এই ব্যক্তি এ হাদিসটির কিছু বক্তব্যকে আগ-পাছ করে দিয়েছেন। এবং কিছু কম বেশিও করেছেন।"

বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের তাফসির সংক্রান্ত অংশে (কিতাবুত তাফসির) এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়নি।

উল্লেখিত হাদিসটির ভাষা, বক্তব্য ও বিষয়ের উপর তত্ত্বগতভাবেও বহু বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। ইমাম খাত্তাবি ও যে ভাষায় সমালোচনা করেছেন, তা ফাতহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী উভয় গ্রন্থে লক্ষ্যণীয়। دنا الجبار رب العزة فتدلى "মহাপরাক্রান্ত মহিমান্বিত প্রভু কাছে এগিয়ে গেলেন এবং ঘনিষ্ঠতর হলেন", (বা ঝুঁকে পড়লেন) এই ব্যাখ্যাসূচক বক্তব্যে সম্ভাব্য আপত্তি ও তার জবাব খোদ ইমাম খাত্তাবীর ভাষায় আল্লামা ইবনে হাজর বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবি এবং স্বয়ং ইবনে হাজর এ আপত্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, আসলে এটা ছিলো একটা স্বপ্ন। কেউ যদি স্বপ্নযোগে দেখতে পায় যে আল্লাহ তার কাছে এগিয়ে গেলেন, ঘনিষ্ঠতর হলেন অথবা কোনো বিশেষ জায়গায় হঠাৎ আবির্ভূত বা অবতীর্ণ হলেন তাহলে সেটা তেমন আপত্তিকরণ বা অভাবনীয় ব্যাপার নয়। তথাপি উল্লেখিত বাচনভঙ্গির আলোকে অর্থাৎ دنا الجبار رب العزة فتدلى (মহাপরাক্রান্ত মহিমান্বিত প্রভু এগিয়ে গেলেন ও ঘনিষ্ঠতর হলেন) সমগ্র আয়াত সমষ্টির যে ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর সত্তার যে ভাবমূর্তি ও চিত্রকল্প প্রকাশ পায় তা কোনো অতি প্রাকৃতিক জগতে বা স্বপ্নে সংঘটিত হওয়াও আপত্তিজনক অযৌক্তিক।

আসলে শরীকের বর্ণিত এক হাদিসটিতে আরো বহু আপত্তির বিষয় রয়েছে। সে সবের বিশত বিবরণ দেয়া এখানে নিস্প্রয়োজন এবং তাতে অযথা আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। হাফেয ইবনে হাজর (বুখারির ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীর রচয়িতা) স্বয়ং এগারোটা বা তার চেয়েও বেশি আপত্তির উল্লেখ করেছেন এবং তা নিরসনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কয়েকটি জবাব পুরোপুরি সন্তোষজনক হয়নি। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য হাদিসটির সূচনা এভাবে হয়েছে :

ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاءه ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه

"এক রজনীতে রসূল সা.-কে কা'বা শরিফ সংলগ্ন মসজিদ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর নিকট ওহী আসার আগে তাঁর কাছে তিনজন আগন্তুক এসেছিলো।"

এখানে উল্লেখিত রাত্রিকালীন ভ্রমণ দৃশ্যত ওহী শুরুর আগেকার ঘটনা। আর এর অব্যবহিত পরেই হাদিসের মূল ভাষ্যে যে বিবরণ তা থেকে মনে হয়, তিনি মসজিদে হারামে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তিনজন ফেরেশতা আসেন। তাদের একজন বললেন এই তিনজনের মধ্যে মুহাম্মদ সা.-কে? দ্বিতীয়জন তাঁকে দেখিয়ে দিলে তৃতীয়জন বললেন : তাঁকে নিয়ে চলো। ঐ রাতে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। এমনকি রসূল সা. আগন্তুক ফেরেশতাদেরকেও দেখেননি। হাদিসের পরবর্তী অংশে অন্য ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে, তা অন্য কোনো রাতে সংঘটিত হয়েছে। এখন মাত্র তিনজন ফেরেশতার আগমনকে 'ইসরা' (রাত্রিকালীন ভ্রমণ, নামে আখ্যায়িত করা উপরন্তু তাকে প্রাক্-ওহীর ঘটনা বলে অভিহিত করা একটা জটিল ধাঁধা ছাড়া কিছু নয়। এই জট খোলার জন্য ইমাম ইবনে হাজর বলেন :

لعله أراد ان يقول بعد ان اوحى اليه فقال قبل ان يوحى اليه

"হাদিসটির বর্ণনাকারী হয়তো বলতে চেয়েছেন, এটা ওহীর পরের ঘটনা কিন্তু বলে ফেলেছেন ওহীর আগের ঘটনা।"

যাই হোক, একদিকে রয়েছে এই হাদিস। অপরদিকে বুখারি ও মুসলিমের অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষত বুখারির কিতাবুত তাফসিরের সূরা আন নাজমে বর্ণিত একাধিক হাদিস থেকে জানা যায় যে, সূরা আন নাজমে সাক্ষাত ও সান্নিধ্য লাভের যে বিবরণ রয়েছে, তা মুহাম্মদ সা. ও জিবরাঈলের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইমাম বুখারি যে সূরা আন নাজমের তাফসিরে এই শেষোক্ত হাদিসসমূহের উল্লেখ করলেন এবং শরিকের বর্ণিত হাদিসের উল্লেখ করলেননা, তা থেকেই বুঝা যায় যে, তার ব্যক্তিগত মতে এই সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলীতে দ্বিতীয়পক্ষ আল্লাহ নন, জিবরাঈল।

যেমন 'দুই ধনুকের সমান ব্যবধান বা তার চেয়েও কম' এই কথাটার তাফসির সংক্রান্ত অধ্যায়ে তিনি হযরত ইবনে মাসউদের বর্ণিত এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন :

انه رأى جبريل له ستمائة جناح

"রসূল সা. ছয়শো ডানা বিশিষ্ট জিবরাঈলকে দেখতে পেলেন।" মুসলিম শরিফেও কিতাবুল ঈমানে "তিনি তাকে আরো একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আবির্ভুত হতে দেখছেন" এ আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইবনে মাসউদের এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে আরো কিছু পরে মাসরুক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা বলেন : 'তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যার একটিও কেউ বললে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপকারী হিসেবে গণ্য হবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন: সেই তিনটি জিনিস কি কি? হযরত আয়েশা বললেন:

যে ব্যক্তি বলবে যে মুহাম্মদ সা. স্বীয় প্রভুকে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপকারী। বর্ণনাকারী বলেন এই সময় আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তৎক্ষণাৎ উঠে সোজা হয়ে বসলাম। বললাম: "উম্মুল মুমিনীন! একটু থামুন। তাড়াহুড়া করবেননা।।"

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالاُفُقِ الْمُبِيْنِ

"নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে দেখেছেন মুক্ত দিগন্তে।"

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى

"নিশ্চয় তিনি তাকে আরো একবার দেখেছেন।"

এ কথা দুটো কি আল্লাহ বলেননি? হযরত আয়েশা বললেন : এই উম্মতের মধ্যে আমিই প্রথম এ দুটো আয়াত সম্পর্কে রসূল সা. -কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন "সে তো জিবরাঈল আমি তাকে তার আসল আকৃতিতে ঐ দুবার দেখেছি।" অত:পর হযরত আয়েশা রা. বললেন : তুমি আল্লাহর এ উক্তি শোনোনি?

لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَار

"আল্লাহকে চোখ দিয়ে দেখা যায়না, অথচ সকল চোখ তার দৃষ্টির আওতাধীন"। *(সূরা আল আনয়াম, আয়াতাংশ : ১০৩)* এবং

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ الاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً

"কোনো মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেনা পর্দার অন্তরাল থেকে ব্যতীত অথবা তিনি নিজে যে প্রতিনিধি পাঠান তার মাধ্যমে ব্যতীত।" *(সূরা আল শূরা, আয়াতাংশ : ৫১)*

উল্লেখিত হাদিসে হযরত আয়েশা রা. নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু বলেছেন তা নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ থাক বা না থাক, তিনি রসূল সা.-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা মারফু (প্রত্যক্ষভাবে রসূল সা. থেকে শ্রুত) হাদিসের মর্যাদা রাখে। তাই এই ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এ হাদিস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, সূরা আন নাজমের আয়াতগুলোতে রসূল সা. ছাড়া দ্বিতীয় যে সত্তার উল্লেখ রয়েছে, তিনি জিবরাঈল ছাড়া আর কেউ নন।

বুখারির ব্যাখ্যাতা হাফেয ইবনে হাজর বা আল্লামা আইনীর এমন কোনো উক্তি আমি তাদের প্রণীত গ্রন্থ দু'টির কোথাও দেখিনি যে, রসূল সা. মি'রাজের সময় বা অন্য কোনো সময় চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখেছেন। বরঞ্চ এর বিপরীত উক্তি অনেক রয়েছে। বুখারির কিতাবুত তাফসিরের সূরা আন নাজমের আয়াত فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِه এর তাফসির সম্বলিত অধ্যায়ে টীকাকার ইবনে হাজর বলেন: রসূলুল্লাহ সা. যাকে দেখেছেন তিনি যে জিবরাঈল, আয়াতগুলো থেকে সেটাই অধিকতর

স্পষ্ট। কিতাবুত তাওহীদেও তিনি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, নশ্বর জগতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ "আমার প্রভুকে আমি সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি" এ উক্তি সম্বলিত হাদিসের মূল ভাষ্যটি থেকে সামগ্রিকভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে স্বপ্নযোগে দেখার কথা বলা হয়েছে। কাজেই এ হাদিস থেকে চাক্ষুস দর্শন বুঝা ঠিক নয়। এ হাদিসটি আহমাদ ও তিরমিযির বরাত দিয়ে মিশকাতের নামায ও নামাযের স্থান সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কয়েকটি হাদিসেও আল্লাহর দর্শন লাভের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোতেও চাক্ষুস দর্শনের স্পষ্টোক্তি নেই।

সর্বশেষে যে আপত্তিটি মীমাংসার অপেক্ষায়, তাহলো এই যে : فكان قاب قوسين (তিনি দুই ধনুকের সমান বা তার চেয়েও কম ব্যবধানে রইলেন) এ আয়াতে ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ না হয়ে জিবরাঈল হন, তা হলে এর ঠিক পরবর্তী আয়াতে শব্দটির সর্বনাম দ্বারা যাকে বুঝানো হবে, পূর্ববর্তী বাক্যে তার উল্লেখ থাকা চাই। পক্ষান্তরে সর্বনাম দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝালে মুহাম্মদ সা. -কে জিবরাঈলের বান্দাহ ধরা হয় –অনুবাদক) এ আপত্তিটা খুব গুরুতর নয়। কারণ সর্বনামের অভিষ্ট ব্যক্তির নাম পূর্ববর্তী বাক্যেই থাকা সব সময় জরুরি নয়। কুরআন এবং প্রচলিত আরব বাকরীতিতে তা পরবর্তী বা দুরবর্তী কোনো বাক্যে বিদ্যমান থাকা বা উহ্য থাকার প্রচুর দৃষ্টান্ত থাকে। যে সকল আলেম ও তাফসিরকারের মতে সূরা আন নাজমের আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত দ্বিতীয় পক্ষ হচ্ছেন জিবরাঈল, তারা সকলেই عبده শব্দের সর্বনামের অর্থ আল্লাহ বলেই স্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য এই যে, اوحى এবং عبد শব্দ ছুটির উপস্থিতিই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৬]*

১৬. যাকাতকে প্রচলিত করের সাথে যুক্ত করা যায়না

দৈনিক পাকিস্তান টাইমসের ৭ই জুন ১৯৬৬ এবং দৈনিক মাশরিকের ৮ই জুন ১৯৬৬ সংখ্যায় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ফজলুর রহমানের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠিটিতে বেশ কয়েকটি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি সংক্ষেপে সেগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করা জরুরি মনে করছি।

ডক্টর সাহেব বলেন "কুরআন কিংবা রসূল সা. যাকাত ছাড়া আর কোনো কর আরোপ করেননি। এছাড়া কোনো কর আরোপ করতে হলে তা যাকাতের সাথেই যুক্ত করতে হবে। এর প্রমাণ হলো, রসূল সা.-এর ঘোড়ার বাবদে যাকাত আদায় করা হতোনা। কিন্তু হযরত ওমর সে বাবদে যাকাত আদায় করেন অর্থাৎ তিনি কিনা একটা নতুন জিনিসকে যাকাতের আওতাভুক্ত করলেন।"

ডক্টর সাহেব এখানে মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে অন্য অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে এমন তিনটি উদ্ভট তত্ত্বের জগাখিচুড়ি হাজির করেছেন, যার

প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব। ডক্টর সাহেবের প্রথম মনগড়া তত্ত্বটি হলো, যাকাত এক ধরনের কর। এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ কর তো এমন একটি সরকারি রাজস্ব, যা সকল ধর্মমতের লোকের কাছ থেকে আদায় করা যায় এবং প্রত্যেক ধনী ও নির্ধন নাগরিক তার সুফল ভোগ করার সমান অধিকারি। এর সম্পূর্ণ বিপরীত যাকাত একটা ইবাদত বিশেষ। শুধুমাত্র মুসলমানদের উপরই যাকাত ফরয। তারা এটা নামাযের মতোই ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে সম্পাদন করে থাকেন। অমুসলিমরা যেমন নামায আদায় করতে বাধ্য নয়, তেমনি যাকাত দিতেও বাধ্য নয়। যাকাত ও করে যদি পার্থক্য না থাকে, তাহলে অমুসলিমদের তো আনন্দে বগল বাজানোর কথা। ইসলামি সরকার যেই তাদের উপর কোনো কর আরোপ করবে, অমুনি তারা এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে যে, এটা তো যাকাত। এটা আমাদের উপর নয় মুসলমানদের উপর আরোপিত।

ডক্টর সাহেবের দ্বিতীয় উদ্ভট তত্ত্ব হলো, ইসলাম যাকাত ছাড়া আর কোনো কর আরোপের অনুমতি দেয়না। এ তত্ত্বটিও ভুল যেহেতু যাকাত সাধারণ কর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, তাই যাকাত অন্যান্য করের অন্তরায় নয়। হাদিসে বলা হয়েছে :

فی ملك حق سوی الزكوة

অর্থাৎ 'তোমার সম্পদে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রয়েছে।'

হযরত ওমরের আমলে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির উপর কর বসানো হয়েছিল এবং তাকে যাকাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে 'ফায়' তথা সরকারি তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ভাষ্য থেকে এ কথা প্রমাণ করা যাবেনা যে, সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বা জনস্বার্থে কোনো কর আরোপ করতে পারবেনা, আর যদি পারে তবে তাকে যাকাতের সাথে যুক্ত করতে হবে। বিগত চৌদ্দশ বছরে কোনো একজন উল্লেখযোগ্য ফেকাহবিদ বা মুজতাহিদও ডক্টর সাহেবের এই উদ্ভট তত্ত্ব মেনে নেননি। কোনো কোনো ফেকাহবিদ যদি কখনো কর আরোপের বিরোধিতা করে থাকেন তবে সেটা শুধু নিপীড়নমূলক করের ক্ষেত্রেই করেছেন। নচেৎ রাজস্ব বিভাগ সব সময় সরকারের রাষ্ট্রীয় অর্থ বিভাগের একটা অংশ হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

ডক্টর সাহেবের তৃতীয় দাবি এই যে, রসূল সা.-এর যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপর যাকাত আরোপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার তালিকায় আরো সংযোজন ঘটে। যেমন হযরত ওমর নতুন করে ঘোড়ার উপর যাকাত বসিয়েছিলেন। ডক্টর সাহেবের এ বক্তব্যটিও সঠিক নয়। তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা দ্বারাও এ তত্ত্ব সমর্থিত হয়না। রসূল সা.-এর পরে যদি অতিরিক্ত দু'একটা জিনিসের উপর

যাকাত আরোপিত হয়েও থাকে, তবে পূর্বতন তালিকার সাথে সেই অতিরিক্ত জিনিসের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। রসূল সা. যেসব জিনিসকে যাকাতযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন, তারই কোনো একটির সাথে কোনো ধরনের সাদৃশ্য থাকার কারণে কিয়াসের মাধ্যমে আরেকটি জিনিসের উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে। এমন নয় যে, খেয়াল খুশি মতোই এক একটা জিনিসের উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে। জীবজন্তুর ক্ষেত্রে আসলে যেসব পালিত জন্তু সাধারণভাবে চারণভূমিতে চরে জীবন ধারণ করে এবং বিপুলভাবে বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরাট বিরাট পালের আকারে লালন পালন করা হয়, সেগুলোর উপরই যাকাত ধার্য করা হয়। যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া। এসব জন্তুর সাথে সাদৃশ্য থাকার ভিত্তিতেই হযরত ওমর কিয়াসের রীতি প্রয়োগ করে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও হযরত আলী রা. বলেছিলেন এটা পরবর্তী বংশধরদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নজির নয়। বস্তুত হানাফি মযহাবের সাধারণ ফতোয়া অনুসারে ঘোড়া কোনো যাকাতযোগ্য জন্তু নয়।

ডক্টর সাহেব কিছুদুর অগ্রসর হয়ে বলেন কুরআনে বর্ণিত যাকাতের খাতগুলো নিষ্ঠার সাথে ও পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন এর আওতাধীন।

তিনি কুরআনের এই খাতগুলোর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা লক্ষ্যণীয়। 'আমিলীনা আলাইহা' দ্বারা আসলে তো যাকাত আদায় ও বন্টনকার্যে নিয়োজিত লোকজনকে বুঝায়। কিন্তু ডক্টর সাহেবের মতে এর দ্বারা সকল সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে বুঝায় 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' দ্বারা মূলত সেইসব নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়, যাদের মনে মুসলমান সমাজের প্রতি প্রীতি মুহব্বত জন্মানো কাঙ্খিত। অথচ ডক্টর ফজলুর রহমান সাহেব এটিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির তহবিল' বলে আখ্যায়িত করেন। আজকাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে কি কি জিনিস বুঝায় তা কারো অজানা নেই। তিনি 'গারিমীন' ও 'রিক্কাব' এর অনুবাদ করেছেন ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা ও দাসমুক্ত করা। কিন্তু ব্রাকেটের মধ্যে তার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: (জাতীয় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা)। ইংরেজিতে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন জাতীয় ঋণ পরিশোধ বলে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোনো দুর্নীতি পরায়ণ ও স্বৈরাচারী শাসক যেমন খুশি ঋণ গ্রহণ করতে ও যতো খুশি তার উপর সুদ দিতে পারবে আর এসব যাকাত তহবিল থেকে দিতে পারবে। 'ইবনুস সাবীল' শব্দটি দ্বারা আসলে এমন পর্যটককে বুঝানো হয়েছে, যে প্রবাসে আর্থিক সংকটে পতিত। কিন্তু ডক্টর সাহেব গোটা 'পরিবহন ব্যবস্থা' কে এর আওতাধীন করার পক্ষপাতী। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, উচ্চ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণী ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যাতায়াতও যাকাতের অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা যাবে। শুধু হেঁটে চলা ও খালি পায়ে চলা পথিক এই সুবিধা ভোগ করবে তা

নয়। কুরআনের এরূপ 'নিষ্ঠাবান ও পক্ষপাতমুক্ত' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কেই আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেছিলেন "এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখে আল্লাহ, রসূল সা. ও জিবরীল পর্যন্ত হতবাক।"

ফেকাহ বিশেষজ্ঞগণ ইবাদত ও সাধারণ আর্থ সামাজিক তৎপরতার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, ডক্টর সাহেব তাতেও আপত্তি তুলেছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদের সমগ্র জীবনই ইবাদত। এখানে তিনি অনাবশ্যকভাবে মাওলানা মওদূদীর প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন যে, আগে তিনিও এই বিভেদের পক্ষপাতী ছিলেননা। এটাও একটা তাত্ত্বিক বিভ্রাট। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে একজন খাঁটি মুসলমানের সমগ্র জীবনই ইবাদতের শামিল। কিন্তু তাই বলে ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ যথা-নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যে বিশেষ অর্থে ইবাদত নামে পরিচিত এবং এগুলোর শরিয়ত নির্ধারিত নিয়মাবলী ও কাঠামো যে অকাট্য ও অপরিবর্তনীয়। সেই চিরস্বীকৃত মূলনীতি মাওলানা মওদূদী বা অন্য কোনো মুসলমান অস্বীকার করেননা, কখনো করেননি। যাকাত সম্পর্কে হযরত আবু বকরের দ্ব্যর্থহীন ফরমান হাদিস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যাকাতের যে হার আল্লাহর রসূল সা. ধার্য করেছেন, তার চেয়ে বেশি কেউ দাবি করলে তার দাবি মানা যাবেনা। ডক্টর ফজলুর রহমান এই মৌলিক পার্থক্য বিলোপ করে এ যুগের শাসকদেরকে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মতো ইবাদতগুলো বিকৃত করার অবাধ অধিকার দিতে চান। ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহে সামান্যতম পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা যদি রসূল সা.-এর প্রথম খলিফার না থেকে থাকে, তাহলে এখন এগুলোতে রদবদল ঘটানো এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য বিকৃত করার অধিকার অন্য কাউকে কিভাবে দেয়া যেতে পারে?

ডক্টর সাহেব সবশেষে ফেকাহ শাস্ত্রকারদের মতভেদের উল্লেখ করেছেন। এ মতভেদের উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, এ বিষয়ে চিন্তাগবেষণার দ্বার রুদ্ধ করা হয়নি। মতভেদের কথা তো আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু প্রথমত, এই মতবিরোধের তুলনায় মতৈক্যের দিকটা অনেক বেশি লক্ষ্যণীয় ও বলিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, এই মতবিরোধের কোনো না কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান। যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট ও অকাট্য সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, সে বিষয়ে ভিন্ন মতের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো জিনিসের নিসাব অর্থাৎ যাকাতযোগ্য ন্যূনতম ধার্যকৃত পরিমাণে মতভেদ রয়েছে। তার কারণ হলো ঐ ব্যাপারে যে হাদিস রয়েছে, তার বিশুদ্ধতা ও প্রামান্যতা বিতর্কিত। কিন্তু যাকাতের হার নিসাবের চেয়েও অধিকতর মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার। এই হার সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। বিভিন্ন দ্রব্যে যাকাতের যে হার রসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত বলে হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর পক্ষে কোনো একজন ফেকাহ শাস্ত্রবিদের

অভিমতও কি ডক্টর সাহেব তুলে ধরতে পারবেন? যেমন, যেসব দ্রব্যে রসূল সা. শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত ধার্য করেছেন, কোনো একজন ফকীহও কি বলেছেন যে, ঐ সব দ্রব্যে এর চেয়ে কম বা বেশি যাকাত আরোপ করা যায়?

[২]

ডক্টর ফজলুর রহমান সাহেবের বক্তব্যের জবাবে ১৯৬৬ সালের ১২ জুন তারিখের দৈনিক মাশরিকে আমার যে চিঠিখানি ছাপা হয়, ২২ জুনের মাশরিকে সেই চিঠির উপর জনৈক আব্দুর রশিদের একটি পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই পর্যালোচনার আলোকে আমি আরো কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আমি লিখেছিলাম "সকল ধর্মাবলম্বীর কাছ থেকে আদায় করা যায় এমন রাজস্বকেই কর বলা হয়।"

এ ব্যাপারে আব্দুর রশিদ সাহেবের মন্তব্য হলো "এতে করে তো একই দেশে দুটো অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং দুটো সরকার চালু হওয়া অবধারিত হয়ে যাবে। একটা সরকার কর ধার্য করবে, আর ঐ সরকারের অধীন আর একটা সরকার ব্যাপৃত থাকবে যাকাত আদায়ের কাজে।"

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা বোধগম্য হয়নি যে, আব্দুর রশিদ সাহেব আমার বক্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন, তা কিভাবে যুক্তিসিদ্ধ হয়। আমি তো আমার চিঠিতে বা আর কোথাও বলিনি যে, ইসলামি সরকার তো কর আদায় করবে, কিন্তু যাকাত আদায় করবে ঐ সরকারের অধীন আরেক সরকার। ইসলামি সরকার করও ধার্য করবে, যাকাতও আদায় করবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। রসূল সা.-এর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত শুধু মুসলিম বিত্তশালীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং দুস্থ মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হবে। এ জন্য তার হিসাব-নিকাশ এবং আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা 'বায়তুলমাল' বা সরকারি কোষাগারের অন্যান্য তহবিল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে।

তবে কোনো ইসলামি সরকার যদি বিদ্যমান না থাকে, কিংবা থাকলেও কোনো কারণে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা না করে, কিংবা শরিয়তের বিধান মোতাবেক তা আদায় বন্টনের ব্যবস্থা না করে, অথবা মুসলমানরা কোনো অনৈসলামিক সরকারের অধীন বসবাস করে, তাহলে যাকাত মাফ হয়ে যাবেনা। কেননা, তা সরকারি কর নয়, নামাযের মতো একটা ফরয ইবাদত। এ ধরনের সকল পরিস্থিতিতে জাগ্রত ঈমানী চেতনাসম্পন্ন মুসলমানরা কোনো আদেশ আ অনুরোধ ছাড়াই স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত দিয়ে থাকে এবং সম্ভব হলে যাকাতের আদায় ও বন্টনের জন্য কোনো বেসরকারি সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যাকাতের ফরয ইবাদকে বাস্তবায়িত করার এসব স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগ কার্যক্রমে আনন্দবোধ করা অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে একে 'সরকারের অধীন

সরকার ও দ্বৈত তৎপরতা' বলে যে টিপ্পনী কাটা হয়েছে, বিবেক, প্রজ্ঞা এবং ইসলামি চেতনা ও মর্যাদাবোধের প্রতি এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হতে পারে?

আব্দুর রশিদ সাহেব বলেন, "যাকাত যদি সরকারি করই না হয় তবে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে হযরত আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করলেন কেন? কই কোনো বেনামাযীর বিরুদ্ধে তো জেহাদ করার আদেশ দেয়া হয়নি?" এ প্রশ্নের জবাবে শুধু এতোটুকুই বলবো যে, যে গৌরবময় যুগের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে, সে যুগের বাস্তব নমুনা আমাদের জন্য চূড়ান্ত দলিল ও সনদস্বরূপ। সে যুগে মুসলমানদের কোনো দল বা গোষ্ঠির নামায বা রোযা নীতিগতভাবে অস্বীকার করা বা কার্যত বর্জন করা একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার ছিলো আর বাস্তবেও তা কখনো সংঘটিত হয়নি। সে যুগে মুনাফিকরাও নামায পড়তো এবং রোযা রাখতো। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের আমলে সর্বপ্রথম এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে একটি গোষ্ঠি যাকাত দিতে অস্বীকার করলো এবং ব্যাপারটা সাহাবাদের গোচরে আনা হলো। এ বিষয়ে যথেষ্ট পরামর্শ হয়, মতভেদও ঘটে। অবশেষে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তা কার্যকরও করা হয়। যাকাত ছাড়া ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এগুলো যে ফরয, এ কথা যে ব্যক্তি মনে ও মুখে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিতভাবে মুরতাদ তথা ধর্মচ্যুত ও কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এগুলোকে ফরয বলে মানবে এবং কার্যত বর্জন করবে, তাকে ধর্মচ্যুতির শাস্তি দেয়া চলেনা। তবে ইসলামি সরকার তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে, জ্ঞান ও শিক্ষা দান করে এমনকি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে পথে আনার চেষ্টা করতে পারে এবং সর্বশেষ উপায় হিসেবে তাকে শাস্তিও দিতে পারে।

আব্দুর রশিদ সাহেব আরো লিখেছেন : "যাকাত আর্থিক ও সামাজিক ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই হজ্জের মতো এটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা অধিক সংখ্যক লোককে হজ্জের অনুমতি দেয়ার অনুকূল ছিলোনা বলে সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে।"

এখানে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, তা এতো নির্বোধসুলভ ও নিম্নমানের এবং সেই সাথে এতো বেদনাদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ যে, এ যুগের সরকারগুলো এবং তাদের তৈরি করা ও পোষা তথাকথিত ইসলামি গবেষক ও চিন্তাবিদদের হাতে ইসলামের যে মৌলিক ইবাদতসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও রদবদলের ক্ষমতা ন্যস্ত হলে ইসলামকে যে কিভাবে বিকৃত করা হবে, এ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, আলোচ্য যুক্তিতর্ক দেখে তা সত্য বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রশ্ন হলো– কুরআনের আলোকে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য সৃষ্টি হলেই যখন হজ্জ ফরয হয়ে যায়, তখন

সরকার তাকে বিধিনিষেধ আরোপের অধিকার পায় কোত্থেকে? বিশেষত, শুধুমাত্র গত দু'বছরেই নয় লাখ গ্যালন দেশি মদ উৎপাদন এবং তিন লাখ একচল্লিশ হাজার দু'শ সতেরো গ্যালন বিদেশি মদ আমদানি করতে যে সরকারের টাকার অভাব হয়নি, কয়েক হাজার হাজীর হজ্জের বন্দোবস্ত করতে সে সরকারের অর্থাভাব হবে কেন?

হযরত ওমরের খেলাফত আমলে ঘোড়ার যাকাত আদায়ের বিষয়টি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলাম। সেই বর্ণনা থেকেই আব্দুর রশিদ সাহেব 'যাকাতের কিছু না কিছু কেয়াসের সুযোগ আছে' বলার অজুহাত পেয়ে গেছেন। "কিছু না কিছু সুযোগ কথাটা দ্বারা আসলে তিনি এই দরজা পুরোপুরি খুলে দেয়ার ইচ্ছেই ব্যক্ত করেছেন, যাতে সরকার খেয়াল খুশি মতো যে কোনো জিনিসের উপর যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিমাণে যাকাতের নাম দিয়ে কর বসাতে পারে এবং কেউ তাতে টুশব্দটি না করতে পারে। তাই আমি ঘোড়ার যাকাতের ব্যাপারটি আরো একটু খোলাসা করে দিচ্ছি।

'মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা' নামক হাদিস গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, হযরত ওমর রা. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঘোড়ার উপর যাকাত আরোপ করেননি। সিরিয়ার একশ্রেণীর মানুষ অত্যাধিক সংখ্যক ঘোড়া পুষতো। তারা নিজেরাই প্রথমে হযরত আবু ওবায়দাকে অনুরোধ করে তাদের কাছ থেকে যাকাত নিতে। তিনি অস্বীকার করেন। তারপর তারা হযরত ওমর রা. কে চিঠি লিখে একই অনুরোধ জানালো। তিনিও এড়িয়ে গেলেন। অবশেষে নছোড়বান্দা হয়ে তারা সশরীরে হযরত ওমরের কাছে হাজির হলো এবং যাকাত আরোপ করার দাবি জানালো। তিনি বললেন :

اما انا فلا افرض ذالك عليكم

"এ যাকাত আরোপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তারা সিরিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার লিখলো, "ঘোড়ার উপর যাকাত দিয়ে আমাদের সম্পদকে পবিত্র করি, এটাই আমাদের কাম্য।" অগত্যা হযরত ওমর সিরিয়ার গভর্নরকে লিখলেন "ওখানকার ঘোড়ার মালিকরা চাইলে ওদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নাও এবং ওখানকার গরিবদের মধ্যেই তা বন্টন করে দাও।" এ বিষয়ে অন্যান্য সাহাবিরাও দ্বিধান্বিত ছিলেন। হযরত আলীর রা. বক্তব্য তো আগেই উল্লেখ করেছি। সাহাবিদের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, রসূল সা. স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে ঘোড়ার উপর যাকাত আরোপের কোনো নির্দেশ দেননি। এ জন্যই হযরত ওমরের রা. এই বাস্তব উদাহরণ সত্ত্বেও হাম্বলি, শাফেয়ি, হানাফি ও মালেকি এই চারটি মযহাবেরই অনুসৃত নীতি এই যে, বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ঘোড়া পালন করা হয় এবং যে ঘোড়া মাঠে চরে বেড়ায়,

তাতে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' (চার মযহাবের ফেকাহ)তে বলা হয়েছে لا زكوة في الخيل ঘোড়ার কোনো যাকাত নেই এবং এটা সকল মযহাবের সর্বসম্মত রায়।

ইমাম আবু উবাইদ স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়ালে' লিখেছেন যে, ইরাক, হেযায ও সিরিয়ার মুসলমানগণের সর্বসম্মত রায় হলো, ঘোড়ার যাকাত নেই। অত:পর তিনি বলেন :

لا اعلم بينهم في هذا اختلافا

"এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আদৌ কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।"

আব্দুর রশিদ সাহেব যুক্তির তুবড়ি ছুটিয়েছেন এই বলে যে মক্কী যুগে যাকাতের কোনো ধরাবাধা হার ছিলোনা। তাই যাকাতের হার ও ধরন কোনো চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। আব্দুর রশিদ সাহেবের যদি জানা না থাকে বা ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে আমি তার গোচরে আনতে ও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শুধু যাকাত নয়, বরং নামায, রোযা এবং ইসলামের বহু বিধানও নির্দেশ পর্যায়ক্রমেই নাযিল ও কার্যকরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নামায আগে মাত্র দু'রাকাত ছিলো আর রোযাও মাত্র কয়েকদিন ছিলো। বর্তমান আকারে নামায মি'রাজের পর এবং রমযানের রোযা বদর যুদ্ধের সময় ফরয হয়। এই সকল বিধানের সর্বশেষ প্রবর্তিত রীতিই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। এখন জানতে ইচ্ছে করে, আব্দুর রশিদ সাহেব মক্কী যুগের অজুহাত তুলে নামায রোযার মতো অকাট্য ফরয কাজকেও নিস্প্রয়োজন সাব্যস্ত করার দুরভিসন্ধি পোষণ করেন কিনা?

প্রথমে যাকাতের কথায় আসা যাক। এ কথা সবার জানা যে, মক্কায় ইসলামি সরকার থাকা তো দুরের কথা, নিরাপদ জীবনযাপনই অসম্ভব ছিলো। সেখানে যাকাতের নিসাব ও হার নির্ধারণ করা যেমন নিরর্থক ছিলো, তেমনি তা হতো অসময়োপযোগী পদক্ষেপ। যেখানে জীবনেরই নিরাপত্তা ছিলোনা। সেখানে যাকাতের হার ও পরিমাণ ধার্য করার প্রশ্ন ওঠে কি করে? কেইবা যাকাত আদায় করতো, কোথায়ই বা তা রাখা হতো, আর কিভাবেই বা তা বন্টন করা যেতো? এরূপ পরিস্থিতিতে যাকাতের বিস্তৃত বিধিবিধান প্রবর্তিত হয়নি বলে আল্লাহর অনুগ্রহের পূর্ণতা ও পরিপূর্ণ শরিয়ত বিধিবদ্ধ হওয়ার পরও কি ইসলামি ইবাদতগুলোতে কাটছাট এবং নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সব কিছুরই বিকৃতি সাধনের চেষ্টা চলতে থাকবে?

উপসংহারে আব্দুর রশিদ সাহেব এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, যাকাতের মূল বিধান তো অকাট্য ও চিরন্তন, তবে এর বাস্তব খুঁটিনাটি ব্যাপারে বেশি করে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া (কেয়াস) প্রয়োগ করতে হবে।

আমি আব্দুর রশিদ সাহেবকে আবেদন জানাই, গোলকধাঁধা সৃষ্টি করার পরিবর্তে সহজবোধ্য ভাষায় খোলাখুলিভাবে কথা বলুন, যাতে আমরাও বুঝতে পারি,

যাকাতের সেই মূল বিধানটি কি জিনিস, যাকে তিনি দয়া করে অকাট্য ও চিরন্তন বলে মেনে নিয়েছেন এবং যাতে তাঁর কেয়াসের বা খুব বেশি কেয়াসের প্রয়োজন হবেনা। *[মাশরিক, ২৭ জুন ১৯৬৬]*

[৩]

দৈনিক মাশরিকের বিতর্কিকা শীর্ষক কলামে যাকাত সম্পর্কে রফীউল্লাহ সাহেবের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কোনো কোনো গ্রন্থের পূর্বাপর অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে তা থেকে নানা তথ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ইমাম জাসসাস কৃত আহকামুল কুরআনের ৩য় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

"একটি সহীহ হাদিস অনুযায়ী যাকাতের হার কেবল উট ও অন্যান্য জিনিসের জন্য। টাকাকড়ি সোনা রূপার পুরোটাই যাকাত হিসেবে দিয়ে দিতে হবে।"

উক্ত গ্রন্থের এই পৃষ্ঠায় এমন কোনো হাদিস নেই, যার শাব্দিক অনুবাদ উপরোক্ত কথাটা হতে পারে। তবে এই পৃষ্ঠায় হযরত আবুজর গিফারীর বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। এ হাদিসটির অনুবাদ এ রকম।

"আমি রসূল সা. -কে বলতে শুনেছি যে, উটের বাবদে যাকাত দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি দিনার, দিরহাম বা সোনারূপা ঋণ শোধ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত জমা করে রাখবে, কেয়ামতের দিন ঐ সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে তাকে সেক দেয়া হবে।"

হযরত আবুজর গিফারী সম্পর্কে এ কথা সুবিদিত যে, রসূল সা.-এর এ জাতীয় বক্তব্য এবং কুরআনের আয়াত والذين يكنزون الذهب এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। তাঁর মতে এর অর্থ এই যে, কোনো মুসলমানের আদৌ কোনো সঞ্চিত সম্পদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু সাধারণ সাহাবিগণ ও অন্যান্য বড় বড় ইমামগণ হযরত আবুজরের এই অভিমতকে সঠিক মনে করেননি। হযরত আবুজরের এ অভিমত মেনে নিলে ওসিয়ত, উত্তরাধিকার, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি সংক্রান্ত কুরআনের বহু সংখ্যক নির্দেশ নিষ্ক্রীয় ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসের মর্ম এই যে, ধন সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়কে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য দেয়াকে এড়িয়ে চলা কোনো মুসলমানের উচিত নয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার, রফীউল্লাহ সাহেব উল্লেখিত গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠা থেকে নিজের গরজ মোতাবেক একটা বক্তব্য উদ্ধার করেছেন বটে। কিন্তু একই পৃষ্ঠার শেষভাগে বিদ্যমান আর একটি বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। সে বক্তব্যটির অনুবাদ এরূপ :

"রসূল সা.-এর বহুল প্রচলিত হাদিসসমূহ থেকে জানা যায় যে, প্রতি দুই'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম এবং প্রতি ২০ দিনারে আধা দিনার যাকাত অবশ্যই দিতে

হয়। গবাদি পশুতেও যাকাত দিতে হয়। তবে পুরো সম্পদ দান করে দেয়া জরুরি নয়।"

সোনারূপার সবটাই যদি দান করা আবশ্যিক হতো, তাহলে যাকাতের হার নির্ধারণের কি অর্থ থাকতো? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উসমান রা. এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফের রা. ন্যায় কেউ কেউ বেশ স্বচ্ছল ও বিত্তশালী ছিলেন। রসূল সা. তাঁদের অবস্থা জানতেন। কিন্তু তিনি তাদের সমস্ত সম্পদ দান করার নির্দেশ দেননি। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত টাকা কড়ি ও সোনারূপা দান করা জরুরি নয়।

একটি আলোচনার শুরু থেকে একটা উক্তি পৃথকভাবে নিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার ব্যাখ্যা করা হবে, অথচ ঐ আলোচনার উপসংহারে লেখক সকল দিককে সামনে রেখে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা পেশ করা হবেনা, এটা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক অসাধু পন্থা।

পরবর্তীতে একই গ্রন্থে ১৯১ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে পত্র লেখক লিখেছেন :

"হযরত ওমর রা. বাণিজ্যিক পণ্যে অনৈসলামিক দেশের অধিবাসীদের উপর শতকরা দশভাগ যাকাত ধার্য করেছিলেন, চাই তারা মুসলমানই হোক না কেন।"

এখানে আবার তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকারের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করেছেন। বক্তব্যের সঠিক অনুবাদ হলো :

"হযরত ওমর রা. স্বীয় কর্মচারীদেরকে লিখিত নির্দেশ দেন, তারা কোনো বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কাছ থেকে শতকরা আড়াই ভাগ, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে শতকরা পাঁচ ভাগ এবং অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে শতকরা দশভাগ আদায় করে। মুসলমানদের কাছ থেকে আদায়কৃত অংশ আবশ্যিক যাকাত হিসেবে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি, নিসাবপূর্তি এবং মালিকানা প্রমাণিত হওয়া সংক্রান্ত অপরিহার্য শর্তাবলীর দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।"

এখানে অমুসলিম অঞ্চলের অধিবাসী বলতে অমুসলিমদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সেখানকার মুসলমানদের প্রসঙ্গ এখানে আলোচিতই হয়নি। কেননা সেখানকার মুসলমানদের নিসাবপূর্তি, বর্ষপূর্তি প্রভৃতি শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সে ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত চালানো ইসলামি সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ উক্তিটির এরূপ ব্যাখ্যা করা মোটেই ঠিক নয় যে, হযরত ওমর রা. অমুসলিম অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসীদের কাছ থেকেও যাকাত নিতেন এবং নির্ধারিত শতকরা আড়াই ভাগের পরিবর্তে দশ ভাগ ধার্য করতেন।

এরপরে রফীউল্লাহ সাহেব উট, ছাগল, ভেড়া ও গরুর যাকাতের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন এবং সূক্ষ্ম হিসাব কষে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, এগুলোর হার

শতকরা আড়াই ভাগ থেকে ভিন্নতর হয়। এভাবে তিনি অনাহূতভাবে একটি বিষয়ের সাথে আর একটি বিষয়ের তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যাকাত সংক্রান্ত ইসলামি বিধানের একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীও জানে যে, গবাদিপশু, কৃষি ফসল, খনিজ দ্রব্য এসব জিনিসের যাকাতের হার আলাদা আলাদা। প্রত্যেক জিনিসের যাকাত শতকরা আড়াই ভাগ-এ কথা কে বলেছে? ফলমূল ও কৃষি ফসলের দশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ এবং খনিজ দ্রব্য ও প্রোথিত সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত স্বয়ং রসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত। খোলাফায়ে রাশেদিন বা অন্য কেউ এটা নতুন করে ধার্য করেননি। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয়না যে, নগদ টাকাকড়ি, সোনারূপা, বাণিজ্যিক ও শিল্প পণ্যে শতকরা আড়াই ভাগের চেয়ে কম বা বেশি যাকাত হতে পারে।

রফীউল্লাহ সাহেব শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন, যাতে দেখা যায়, হযরত ওমর রা. জিযিয়ার হার পরিবর্তন করেছিলেন। কথাটা যদি সঠিকও ধরে নেয়া যায়, তবুও এটা একটা আলাদা ব্যাপার। আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। জিযিয়া মুসলমানদের উপর নয় বরং অমুসলিমদের উপর আরোপ করা হয়। এর বিনিময় সরকার অদের জান মাল ও সম্ভ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে এবং তারা দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। তবে অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে এবং আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে যদি তাদের কাছ থেকে দেশ রক্ষার কাজ নেয়া হয়, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া থেকে অব্যাহতিও দেয়া যেতে পারে। অথচ সক্ষম মুসলমানদের উপর থেকে যাকাত কোনো অবস্থায় রহিত হয়না। কোনো সরকার এটা মাফ করা বা রদবদল করার অধিকারী নয়। মোটকথা, রফীউল্লাহ সাহেবের এ কথা কোনোভাবেই সঠিক প্রমাণিত হয়না যে, খোলাফায়ে রাশেদিন যাকাতের হার পরিবর্তন করতেন।

আমি বলেছিলাম, অমুসলিমদের উপর যাকাত আরোপিত হয়নি। এর জবাবে আব্দুর রশিদ সাহেব নামক অপর এক পত্রলেখক লিখেছেন, হযরত ওমরের রা. আমলে একটি খৃষ্টান গোত্র জিযিয়াকে অপমানজনক মনে করে তা দিতে অস্বীকার করলে তাকে যাকাত দিতে বাধ্য করা হয়। তবে প্রচলিত হারের দ্বিগুণ যাকাত ধার্য করা হয়। এই ঘটনার আসল রহস্যটাও আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

ঘটনাটি পেশাদার শিকারী যাযাবর গোত্র বনু তাগলাবের। এরা সিরিয়া ও রোমের সীমান্তে বসবাস করতো। হযরত ওমর যখন তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন, তখন তারা ওটা দেয়াকে নিজেদের জন্য কষ্টকর ও গ্লানীকর মনে করলো। কেননা দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীনচেতা যাযাবর গোত্রের মতো তারা নগদ জিযিয়া প্রদান করাকে পরাধীনতার প্রতীক মনে করতো। তাই তারা সীমান্ত অতিক্রম করে রোম সাম্রাজ্যে চলে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো।

যেহেতু তারা আরব বংশোদ্ভুত গোত্র ছিলো। তাই মুসলমানদের বৈরী একটা শক্তির সাথে তাদের যুক্ত হওয়া সমীচীন ছিলনা। এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলে তারা বললো, আমাদের উপর মুসলমানদের মতো যাকাত আরোপ করা হলে আমরা সেটা দিতে রাজি। এর জবাবে হযরত ওমর যে উক্তি করেন, তা সুনানে বায়হাকীতে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বললেন 'لا هذه فرض المسلمين। "না, এটা তো মুসলমানদের উপর ফরয।" তারা বললো, "আপনি আমাদের গবাদিপশু ও সহায় সম্পদের উপর যে হারে ইচ্ছে কর আরোপ করতে পারেন। তবে তাকে জিযিয়া নামে অভিহিত করবেন না।" অবশেষে তাদের উপর মুসলমানদের যাকাতের দ্বিগুণ কর বসানো হলো। তবে তাকে জিযিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। সেই সাথে তাদেরকে এই শর্তেও রাজি করা হয় যে, তারা তাদের বংশধরকে খৃষ্টান করবেনা। সকল ফেকাহবিদের সর্বসম্মত রায় এই যে, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার ছিলো এবং এ ঘটনা থেকে জিযিয়া বা যাকাতের কোনো সাধারণ বিধি প্রণয়ন করার অবকাশ নেই।

[৪]

ডক্টর ফজলুর রহমান ও তার সতীর্থদের যেসব চিঠিপত্র এ যাবত দৈনিক মাশরিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতে একটি মৌলিক বক্তব্য সমস্বরে ক্রমাগত উচ্চারিত হয়ে আসছে। সেই বক্তব্যটি হলো যাকাত একটা কর বিশেষ। সরকার ইচ্ছেমত যে কোনো জিনিসের উপর তা আরোপ এবং যে কোনো খাতে তা ব্যয় করতে পারে। যাকাত ছাড়া আর কোনো কর ইসলামে বৈধ নয়। তাই যে করই আরোপ হোক, তা যাকাত হিসেবেই গণ্য হবে। অন্য কথায় ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, যাবতীয় সরকারি রাজস্বের উপর ছাপ তো পড়বে যাকাতেরই, কিন্তু নীতিগতভাবে বা কার্যত যাকাত ও করে আদৌ কোনো ব্যবধানই থাকবেনা। যাকাত যে কতকগুলো নির্দিষ্ট জিনিসের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপ ও কতকগুলো বিধিবদ্ধ খাতে ব্যয় করা বাধ্যতামূলক, সেই প্রাচীন ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য যখন যাকাত ও করের মূল পার্থক্য তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় যে, সরকার যাকাত এবং তার আদায় ও বন্টনের সুনির্দিষ্ট ও শরিয়ত নির্ধারিত কাঠামোকে বহাল ও অক্ষুণ্ন রেখে, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অন্যান্য জরুরি কর বসাতে পারে, তখন বলা হয় যে, এভাবে তো দুটো স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। অথচ ইসলাম রাষ্ট্রের প্রাপ্য ও আল্লাহর প্রাপ্য ভিন্ন ভিন্ন রকম ধার্য করেনা।

বস্তুত, কোনো যুক্তিনির্ভর ও মনোজ্ঞ আলোচনায় এ ধরণের অসারও স্থূল জবাব আশা করা যায়না। সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত রয়েছে এমন

একাধিক আর্থিক কার্যক্রমে কি কোনো রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুলমাল বা অর্থব্যবস্থায় থাকতে পারেনা? এতোটুকু ভিন্নমুখী দু'টো ধারা থাকলেই দুটো স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা এবং আল্লাহর ও রাষ্ট্রের দু'রকম অধিকার কোথা থেকে বেরিয়ে আসে, তা আমার বুঝে আসেনা। তবে হ্যাঁ, যদি আসল উদ্দেশ্য এই হয় যে, যাকাতকে নামে মাত্র বহাল রাখা হবে এবং ইবাদত ও ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে তার অস্তিত্ব বিলোপ করা হবে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে কোনো আলোচনার স্বার্থকতা থাকেনা। তেমন হবে ব্যাপারটা যে শুধু যাকাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা, তা সুস্পষ্ট। বর্তমান বিতর্কের মাঝে এক ব্যক্তি হজ্জের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফতোয়া দিয়েই ফেলেছেন। অনুরূপভাবে নামাযের ব্যাপারেও হয়তোবা কেউ বলে বসবে যে, নামাযের 'মৌল তত্ত্ব' শ্রদ্ধাভরে মেনে নিচ্ছি। তবে তা কোন্ কোন্ সময়ে দিনে কতবার, কতো রাকাত করে পড়তে হবে এবং তাতে কি কি দোয়া কালাম পাঠ করতে হবে, সে ব্যাপারে ইসলামি সরকারের হাতে রদবদলের ক্ষমতা আছে। আর এই নয়া ফতোয়ার পক্ষেও ভুল বিকৃত দলিল প্রমাণ খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে।

করাচির ইসলামি গবেষণা সংস্থার (ইদারায়ে তাহকিকাতে ইসলামি) সদস্য মুহাম্মদ খালেদ মাসউদ সাহেবের এক চিঠি দৈনিক মাশরিকের ৬ই জুলাই, ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এতেও পুনরায় কতিপয় হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রীয় উক্তির কদর্থ করে পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। আমি আপাতত ঐ বিধির বক্তব্য খণ্ডনে কালক্ষেপণের পরিবর্তে কয়েকটি মৌলিক বিষয় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি এবং এই বিতর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানাচ্ছি :

১. একটি ইসলামি রাষ্ট্র যদি যাকাত ছাড়া আর কোনো কর অরোপ করতে না পারে, এমনকি অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা করকেও যাকাত নামে অভিহিত করা স্থির হয়, তাহলে এ প্রশ্ন না উঠে পারেনা যে, ইসলামে যাকাত ও জিযিয়া নামে দুটো আলাদা আলাদা পরিভাষা কেন তৈরি হয়েছে? এ পরিভাষা দুটো হাদিস বা ফেকাহ শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং খোদ কুরআনেই তা উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনে এ পরিভাষা দুটো ব্যবহৃতও হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও স্বতন্ত্র আঙ্গিকে। কুরআনে যাকাতের উল্লেখ বেশিরভাগ নামাযের সাথেই হয়েছে এবং স্পষ্টই সে নির্দেশ নামাযের নির্দেশের মতো মুসলমানদের প্রতিই জারি হয়েছে। সদকার নির্দেশও যেখানেই এসেছে, পূর্বাপর প্রসঙ্গ দেখলে বুঝা যায় যে, সেখানে রসূল সা.-কে মুসলমানদের পাপ স্খলন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে সদকা গ্রহণ করতে ও তাদের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে। অপরদিকে যেখানে জিযিয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেখানে পাশাপাশি ইহুদি ও খৃষ্টানদের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং

যে ব্যক্তি সচেতনভাবে কুরআন পড়ে, তার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, সরকার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর যে করই আরোপ করবে তা যাকাতে পর্যবসিত হবে এবং তা যে কোনো মুসলমান ও অমুসলমানের উপর ইচ্ছেমত ব্যয় করা যাবে।

২. 'বাধ্যতামূলক সদকা' তথা যাকাতের অর্থ ব্যয়ের ৮টি খাত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সরকারি কর যদি যাকাত হয়, তাহলে সরকারকে তা প্রত্যেক খাতেই ব্যয় করতে হবে। সরকার যেখানেই তা ব্যয় করবে, তা আপনা আপনি যাকাতের বৈধ খাত হিসেবেই গণ্য হবে। প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হয়, তাহলে তো আল্লাহ্ তায়ালার যাকাত ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করাটি সম্পূর্ণ বৃথা ও পণ্ডশ্রম হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ) এর ফলে এই সব খাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেককে ভীষণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। 'পথিকের' খাত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউবা বিমানযোগে ভ্রমণকেও এর আওতায় এনে দিচ্ছে। আবার কেউবা 'যাকাত কর্মীর' ব্যাখ্যা এমনভাবে করছে যে, বেসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বেতনও এই খাত থেকে দেয়া বৈধ সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সামরিক কর্মচারীদেরকে এই খাতের আওতায় আনার কথা তাদের মনে থাকেনা। অথচ বেসামরিক সরকারি কর্মচারী যদি 'যাকাত কর্মী' খাতের আওতায় আসতে পারে, তাহলে সামরিক কর্মচারীদের কি দোষ, তারা এ খাত থেকে কেন বঞ্চিত হবে?

৩. পবিত্র কুরআনে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদেরকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক হাদিস থেকেও জানা যায় যে, যাকাত ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ছয়খানা প্রখ্যাত বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, জীবিকা উপার্জনে সক্ষম কোনো সুস্থ সবল লোক এবং কোনো স্বচ্ছল লোকের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। কয়েকটি হাদিসে শুধুমাত্র কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে ধনী লোককেও যাকাত গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নচেৎ সাধারণ স্বীকৃত মূলনীতি এটাই যে, ধনী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়।

যাকাত ও সাধারণ করের মধ্যে আরো একটা মৌলিক পার্থক্য হলো, যাকাত শুধু নিসাবধারী (নির্দিষ্ট ন্যূনতম বার্ষিক সঞ্চয়ের অধিকারী) ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় ও গরিবদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। পক্ষান্তরে করের বোঝা ধনী গরিব নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর পড়ে। আর কর আদায় বাবদ যে রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়, তা দ্বারা অনেক সময় ধনীরা বেশি এবং গরিবরা কম উপকৃত হয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ ও তার রসূল সা. গরিবদের স্বার্থ রক্ষার্থে যাকাতের একটা বিশেষ তহবিল গঠন করেছেন, যাতে ধন সম্পদ একতরফাভাবে ধনীদের কাছ থেকে শুধুমাত্র গরিবদের দিকেই আবর্তিত হয়ে থাকে। অন্য কোনো

সরকারি করে এ ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এ যুগের এক ধরনের পণ্ডিত মহারথী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উদারতা ও মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে যাকাত ও প্রচলিত করের পার্থক্য একেবারেই বিলোপ করতে ইচ্ছুক, যার পরিণামে আল্লাহ ও রসূলের আদেশও লংঘন করা হবে গরিবদের হকও নষ্ট হবে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই গোল্লায় যাবে।

৪. যাকাত সম্পর্কে রসূল সা.-এর আরো একটা ফরমান একাধিক হাদিসে ঘোষিত হয়েছে। এ ফরমানে জানা যায় যে, রসূল সা.-এর বংশধরের জন্য যাকাত হালাল নয়। রসূল সা. নিজে রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন এবং সরকারি কর্মচারীদেরকে 'যাকাত কর্মীর' আওতাধীন করার নতুন উদ্যোগ রাষ্ট্র প্রধানের যাকাতের অংশ পাওয়ার কথা। কিন্তু রসূল সা. নিজে কখনো যাকাত বা 'বাধ্যতামূলক সদকা' দ্বারা উপকৃত হননি।

এমনকি হযরত হাসান রা. শিশুকালে সদকার একটা খেজুর মুখে দিলে রসূল সা. তৎক্ষণাৎ জোরপূর্বক তা মুখ থেকে বের করে দেন এবং বলেন, এটা আমাদের জন্য হারাম।

ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বনু হাশেম গোত্রের লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। এখন যারা সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য যাকাত হালাল করে দিতে চান, তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে, রসূল সা. এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থাকা অবস্থায় তারা সৈয়দ, আলভী, ও আব্বাসী বংশোদ্ভূত কর্মচারীদের উপর কিভাবে যাকাত ব্যয় করবেন? আল্লাহর নবী সা. যখন অসাধারণ ত্যাগের মনোভাব দেখিয়ে নিজেকে ও নিজের বংশধরকে যাকাত থেকে বঞ্চিত করেছেন, তখন এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করার অধিকার কার আছে? আর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা অবস্থায় সরকারি কোষাগারে যাকাত ছাড়া আর কোনো অর্থ না থাকলে এই সব কর্মচারীর বেতন কোথা থেকে আসবে?

শরিয়তের নির্ধারিত যাকাত ব্যবস্থায় রদবদল করলে এবং যাকাতের সাথে সাধারণ করকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেললে যে জটিল ও কুৎসিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তার কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আভাস দিলাম। প্রতিটি বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি ও কুরআন হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে প্রমাণাদিও উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ প্রমাণই কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তি থেকে সংগৃহীত, অপরিচিত ও বিরল ফেকাহ শাস্ত্রিয় বিধির উপর নির্ভরশীল নয়। যারা সত্যনিষ্ঠ ও ইনসাফপ্রিয় এবং যারা ইসলামের বিকৃতি সাধনের বাতিকে ভোগেননা, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার কথাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় পুনরায় বিবেচনা করুন এবং হঠকারীতার নীতি পরিহার করে চলুন।
[তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৬]

১৭. পিতামাতার অধিকার

প্রশ্ন : আমাদের বন্ধু বান্ধব মহলে কয়েকটি বিষয়ে বিতর্ক ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক এগুলোর সঠিক সমাধান কি জানাবেন। বিতর্কিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. হাদিসে কি বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন মানুষ মায়ের নামে পরিচিত হবে? মায়ের ফযিলত ও অধিকার প্রসঙ্গে কেউ কেউ এ হাদিস বর্ণনা করে থাকেন।

২. এ কথা কি সত্য যে, পিতা নিজের পুত্র বা কন্যাকে হত্যা করলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হননা? এর কারণ কি এই যে, হত্যাকারি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বিধায় তিনি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করার অধিকারী? যেসব অপরাধ বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি কি এই যে, শারীরিক বা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে অধিকার হরণকারীর শাস্তি হবেনা?

৩. সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য কোন্ কোন্ ব্যাপারে জায়েয এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে ফরয? পিতামাতার আদেশ দিলে পুত্র কি শরিয়ত মতে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য?

জবাব ১. আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. যে পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে অত্যাধিক জোর দিয়েছেন, তাঁদের উভয়ের সাথে প্রীতিকর আচরণের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজের অধিকারের সাথে সাথে পিতামাতার অধিকার বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথাও সত্য যে, কোনো কোনো সহীহ হাদিসে যেখানে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে প্রথমে দু'তিন বার মাতার কথা উল্লেখ করে তারপর পিতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নে যে কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তা কোনো বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হাদিসে নেই। কোনো কোনো গ্রন্থে এ ধরণের একটি হাদিস বর্ণিত হলেও হাদিস শাস্ত্রিয় বিশেষজ্ঞগণ ও হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী সংক্রান্ত 'রিজাল শাস্ত্র' বিশারদগণের মতে ওটা সহীহ হাদিস নয়। হাদিসটির মূল ভাষ্য হলো :

يدعى الناس بامهاتهم يوم القيامة سترا من الله عليهم

"কেয়ামতের দিন মানুষকে নিজ নিজ মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে ডাকা হবে, যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।"

ইমাম ইবনে জাওযী এটিকে জাল বা মনগড়া হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম সুয়ুতী যদিও স্বীয় 'আত্-তায়াক্কুবাত আলাল মাউযুয়াত' (মনগড়া হাদিস পর্যালোচনা) নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে জাওযী কর্তৃক কিছু কিছু হাদিসকে কৃত্রিম সাব্যস্তকরণের রায় খণ্ডন করেছেন, কিন্তু এ হাদিসকে তিনি ঐ গ্রন্থের কেয়ামত সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম ইবনে আদীর বরাত দিয়ে 'মুনকার' আখ্যায়িত করেছেন। মুনকার বলা হয় সেই যয়িফ হাদিসকে, যার বর্ণনাকারী মারাত্মক ভুল, নিদারুণ শৈথিল্য অথবা পাপাচারের দায়ে দোষি সাব্যস্ত হন।

পিতামাতার বিশেষত মাতার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পর এ ধরনের মনগড়া বা মারাত্মক যয়িফ হাদিসের আশ্রয় নেয়ার কি দরকার, যাতে মাতার শ্রেষ্ঠত্বের কোনো বিশেষ দিক নির্দেশ করা হয়নি। অধিকন্তু তা কুরআনের সূরা আহযাবের যে আয়াতে মানুষকে স্বীয় পিতার পরিচয়ে পরিচিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারও বিপরীত।

২. এ কথা সত্য যে, অধিকাংশ ফেকাহ শাস্ত্রবিদ সন্তান হত্যার দায়ে পিতাকে মৃত্যুদণ্ড না দেয়ার পক্ষপাতি। তবে সেটা এ জন্য নয় যে, পিতা স্বীয় সন্তানের উত্তরাধিকারী এবং খুনের বদলার আইনগত দাবিদার, আর তিনি ইচ্ছে করলে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন। নিজের অপরাধের জন্য নিজেই নিজেকে ক্ষমার যোগ্য সাব্যস্ত করা যেতে পারে এটা একেবারেই একটা বাজে ও ভিত্তিহীন ধারণা। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা তার খুনের বদলার আইনগত দাবিদার হলেই যে সে স্বয়ং খুনি হয়েও মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে– এ কথাও ভুল। পিতাকে সন্তান হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া একটা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থামাত্র। এর কারণ এই যে, সন্তানের উপর তার অধিকার অফুরন্ত ও অগণিত। এক সাহাবির সাথে তাঁর পুত্রের অবনিবণার কথা জানতে পেরে রসূল সা. তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, انت ومالك لا بيك "তুমি ও তোমার যাবতীয় সহায় সম্পদ তোমার পিতার সম্পদ।" এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, সন্তানের উপর পিতার অধিকার কতো বেশি ও নিরংকুশ। অপর এক হাদিসে সন্তান সন্ততিকে পিতার উপার্জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্তানের মোকাবিলায় পিতার এই অসাধারণ গুরুত্ব ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যে, পিতামাতাকে সন্তান হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবেনা। তবে তার অর্থ এটা নয় যে, পিতা সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তাকে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবেনা।

পিতামাতা ছাড়া অন্য যেসব উত্তরাধিকার এবং খুনের বদলা আদায়ের আইনসঙ্গত হকদার, তাদের কেউ নিহত আত্মীয়ের খুনি হলে উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। আর যদি উত্তরাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করে থাকে তবে সে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে।

ইসলামি শরিয়ত এরূপ বিধানও দেয়নি যে, বান্দার অধিকার লংঘনজনিত অপরাধের ক্ষেত্রে মজলুম ব্যক্তি বা তার অভিভাবক ক্ষমা করে দিলে রাষ্ট্র উক্ত অপরাধি বা জুলুমকারীকে শাস্তি দিতে পারবেনা। মানুষের জানমাল ও সম্ভ্রম হানিজনিত বহু অপরাধ সরকারের হস্তক্ষেপ ও বিচার বিবেচনার যোগ্য এবং তা দ্বিপক্ষীয় সম্মতি দ্বারা আইনসিদ্ধ হয়ে যায়না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যভিচার, চুরি ও ডাকাতি এমন অপরাধ, যাকে রাষ্ট্র সব সময় প্রতিরোধ করবে এবং শাস্তি দেবে। কেননা বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ড অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শত্রুতা বা সাময়িক উস্কানির বশে সংঘটিত হতে পারে। নিহতের উত্তরাধিকারীরা যদি দিয়াত (আর্থিক

ক্ষতিপূরণ) নিয়ে ক্ষমা করতে রাজি হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তী প্রতিশোধমূলক তৎপরতা, রক্তপাত ও গোলযোগের পথ বন্ধ হতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত সামাজিক অপরাধগুলো এমন ধরনের যে, এগুলোর ব্যাপারে নমনীয়তা ও শৈথিল্য দেখালে আরো অনাচার ও দুস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে ক্ষমা করে দিলে মৃত্যুদণ্ড তো রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু কোনো কোনো ফেকাহ শাস্ত্রকারের মতে উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করতে রাজি হয়ে যাওয়ার পরও ইসলামি সরকার যদি মনে করে যে গোলযোগ ও দুস্কৃতির উৎসগুলোকে পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য হত্যাকারীর কিছু শাস্তি হওয়া দরকার, তবে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. যে সমস্ত কার্যকলাপ আল্লাহ ও রসূলের নিকট নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ, সেসব কাজে কারো আনুগত্য করা জায়েয নেই। এ ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে মাতাপিতার আনুগত্য করা জায়েয, মুস্তাহাব, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য। পিতার কথামত স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে কিনা, এ প্রশ্নের জবাব এই যে, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তালাক দেয়া যাবে যখন পিতার আদেশ শরিয়তের দৃষ্টিতে কল্যাণকর হয়। নচেত তালাক আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় ঘৃণিত ও অপছন্দণীয় কাজ।

আসলে এ প্রশ্নটির সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, একবার হযরত ওমর রা. স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। পুত্র সেই আদেশ অনুসারে তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। তবে বলাই বাহুল্য যে, সব পিতা হযরত ওমরের মতো হ'তে পারেনা। তিনি রসূল সা.-এর একজন উঁচু দরের সাহাবি এবং খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। তাঁর পবিত্র জীবন ও অতুলনীয় চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রত্যাশা করা চলে যে, তিনি কোনো যুক্তিসঙ্গত ও ইসলামসম্মত কারণেই এ আদেশ দিয়ে থাকবেন। তবে সে যুক্তিসঙ্গত ও শরিয়তসম্মত কারণটি ব্যাখ্যা করা হয়তো আবশ্যক ছিলনা বা সমীচীন ছিলনা। আর হযরত ইবনে ওমর এই বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতেই তাঁর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, হযরত ওমর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু সেটি পরবর্তী সময়ের বর্ণনা থেকে বাদ গেছে। তাই বলে একজন পিতা যখন খুশি পুত্রের কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবদার করবেন, আর পুত্রের তা না মেনে উপায়ান্তর থাকবেনা, এমন কথা এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়না। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬৬]*

১৮. লোহার আংটি পরা কি জায়েয?

প্রশ্ন : লোহার আংটি পরা বৈধ কি অবৈধ– এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সাপ্তাহিক 'আইন' পত্রিকার ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ সংখ্যায় বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদিসের কোথাও এটি নিষিদ্ধ বলা হয়নি। উপরন্তু রসূল সা. যে আংটি পরতেন

তা লোহার তৈরি এবং তার উপরে রূপা দিয়ে মোড়ানো ছিলো। এ জবাব আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। কারণ মিশকাত শরিফের আংটি সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত বারীদা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شبه مالى اجد منك ريح الاصنام فطرحة ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى ارى عليك حلية اهل النار فطرجه فقال يارسول الله من اى شيئ اتخذه قال من ورق (رواه الترمذى و ابو داوود)

পিতলের আংটি পরা এক ব্যক্তিকে রসূল সা. বললেন :

ব্যাপার কি? তোমার কাছ থেকে মূর্তির ঘ্রাণ পাচ্ছি কেন? সে আংটিটি ফেলে দিয়ে চলে গেলো। পরে আবার লোহার আংটি পরে এলো। তখন রসূল সা. বললেন : ব্যাপার কি? তুমি দেখছি দোজখিদের অলংকার পরেছো। সে তৎক্ষণাৎ সেটি ছুঁড়ে ফেললো। অত:পর বললো ইয়া রসূলুল্লাহ! কিসের আংটি পরবো? রসূল সা. বললেন রূপার।" (তিরমিযি, আবু দাউদ)

'মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসের পরে ইমাম মুহাম্মদের মন্তব্য লক্ষ্যণীয় :

قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغى للرجل ان يتختم بذهب ولا حديد ولا صفر ولا يختم الا بالفضة-

"মুহাম্মদ বলেন, আমরা এই হাদিসই অনুসরণ করি। পুরুষের পক্ষে সোনা, লোহা বা পিতলের আংটি পরা উচিত নয়। কেবলমাত্র রূপার আংটি পরা উচিত।"

আমার মতে, হাদিসের আলোকে যদিও কেবল, সোনার আংটিই কড়াকড়িভাবে হারাম, তথাপি লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরি আংটির নাজায়েয এবং মাকরূহ বটে। পুরুষের জন্য শুধুমাত্র রূপার আংটিরই অনুমতি রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদের অভিমত এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

জবাব : রূপার আংটি যে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এবং সোনার আংটি কেবল নারীর জন্য বৈধ, সে ব্যাপারে সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিস একমত। লোহা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত, পুরুষের জন্য একমাত্র সোনার অলংকারই হারাম। লোহার আংটির নির্দ্বিধায় জায়েয এবং কোনো রকম মাকরূহ নয়। আপনি তিরমিযি ও আবু দাউদের যে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে যদিও লোহার আংটিকে দোযখবাসীর অলংকার বলা হয়েছে, কিন্তু ঐ হাদিসটির সূত্র দুর্বল। বুখারি ও মুসলিম এই মর্মে সহীহ হাদিস রয়েছে যে এক সাহাবি যখন বিয়ে করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন তখন রসূল সা. তাকে মোহর

প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বললেন "একটা লোহার আংটি দিয়েও যদি পারো মোহরের ব্যবস্থা কর।" মুসলিম শরিফের বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে মোহর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হাদিসের ভাষা এরকম।

انظروا ولو خاتما من الحديد

"একটা লোহার আংটি হলেও যোগাড় কর।"

ইমাম বুখারি বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে একাধিক জায়গায় এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকে হাদিসটির ভাষা এরকম :

فالتمس ولو خاتما من حديد

"একটা লোহার আংটি হলেও সংগ্রহ কর।"

বস্তুত লোহার আংটির বৈধতা প্রতিপন্নকারী হাদিসগুলো বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এর বিপরীতগুলো দুর্বল। ইমাম তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থভুক্ত হাদিসকে 'গরিব' অর্থাৎ বিরল বলে অভিহিত করেছেন। এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম মারওয়াযী সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ নানা রকম আপত্তি তুলেছেন। ইমাম খাত্তাবী আবু দাউদের টীকাগ্রন্থ 'মায়ালেমুস সুনানে' ঐ বর্ণনাকারী সম্পর্কে আবু হাতেম রাযীর নিম্নোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : يكتب حديثه ولا يحتج به 'তাঁর বর্ণিত হাদিস লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে, তবে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়না।' বুখারি ও মুসলিমে লোহার আংটি সংক্রান্ত যে হাদিস রয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন :

"আলোচ্য হাদিসের আলোকে লোহার আংটি পরা জায়েয। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রাচীন ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এটি মাকরূহ কিনা সে ব্যাপারে হাদিস বিশারদদের দু'রকম মতামত রয়েছে। বিশুদ্ধতর মত হলো, লোহার আংটি মাকরূহ নয়। কেননা যে হাদিসে এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা দুর্বল। আমি এ বিষয়টি আমার গ্রন্থ মুহাযযাবে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।"

মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদের যে হাদিসের উল্লেখ আপনি করেছেন, তার বক্তব্য থেকে পুরুষের জন্য রূপা ছাড়া অন্য সকল ধাতুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বুঝা যায়না। এতে হযরত ইবনে ওমরের রা. বর্ণিত হাদিস থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, রসূল সা. সোনার আংটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ আংটি ফেলে দেন। সাহাবায়ে কেরাম যেসব আংটি খুলে ফেলে দেন তা সোনার আংটি ছিলো, এ ধারণাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। কারণ হযরত ইবনে ওমরেরই বর্ণিত অন্যান্য হাদিস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ঐসব হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসূল সা. কিছুদিন সোনার আংটি পরেছিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি সাহাবিগণ সোনার আংটি পরা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি

যখন ওটা খুলে ফেললেন, তখন সাহাবিগণও তা খুলে ফেলেন। মুসনাদে আহমাদে এ ধরণের একাধিক হাদিস রয়েছে। তার একটি এরূপ :

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خوايتم الذهب فقال انى كنت البس هذا الخاتم وانى لن البسه ابدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم

“রসূল সা. একটি সোনার আংটি পরতে লাগলেন আর অন্যরাও সোনার আংটি পরতে লাগলেন। রসূল সা. বললেন আমি এই আংটি পরে আসছিলাম। এখন আর পরবোনা। এই বলে তা ছুঁড়ে ফেললেন। লোকেরাও তৎক্ষনাৎ তা ছুঁড়ে ফেললেন।”

লোহার আংটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, অন্য কয়েকটি হাদিস থেকেও সুস্পষ্টভাবে তার জায়েয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু দাউদের লোহার আংটি সংক্রান্ত অধ্যায়ে রসূল সা.-এর আংটির বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة

অর্থাৎ রসূল সা.-এর আংটি রূপায় মোড়ানো লোহা দিয়ে তৈরি ছিলো। এ হাদিসটি নাসায়ি শরিফেও রয়েছে। প্রসঙ্গত: এ বিষয়টাও লক্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানকালে সাধারণত, যে লোহা দিয়ে আংটি বানানো হয় তা হচ্ছে ইস্পাত এবং এটা বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ বিশেষ। সুতরাং নিরেট লোহার আংটি যদি মাকরূহ সাব্যস্ত হয়ও, তবু যেসব আংটি সোনা ব্যতীত লোহা ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে তৈরি হয়, তার ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষে কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ দেখা যায়না। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬৬]*

১৯. উশর ও খারাজের কয়েকটি সমস্যা

প্রশ্ন উশর (ফসলের যাকাত হিসেবে দেয় দশভাগের একভাগ) ও খারাজ (ইসলামি বিধান অনুসারে ভূমিকর) সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বেগ নিরসনের অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমার মতে উপমহাদেশের ভূমি উশরযোগ্য নয় বরং খারাজযোগ্য। বর্তমান সরকার আমাদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করে থাকে তা খারাজের পর্যায়ে পড়ে। ইতিহাসের গ্রন্থাবলী থেকেও তারই আভাস পাওয়া যায়। ইবনে আসীর আল কামিল গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে বলেছেন, বিজিত এলাকার অধিবাসীদের জানমাল ও ভূ-সম্পত্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কেবল ভূমির উপর শরিয়তের বিধান মোতাবেক খারাজ আরোপ করা হয়েছিল। অত:পর ৩৯২ হি. সনে জয়পাল সুলতান মাহমুদের কাছে গিয়ে বলে : “আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাকে ছেড়ে দিন। এখন থেকে

আমি যতো দিন বেঁচে থাকবো আর কখনো আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হবোনা এবং বার্ষিক খারাজ নিয়মিতভাবে দিতে থাকবো। এতে কোনো রকম ওজর আপত্তি ও টালবাহানা করবোনা।" বস্তুত এই খারাজই সকল মুসলিম শাসনামলে চালু ছিলো। আইনে আকবরি গ্রন্থের সাক্ষ্য এই যে, মোগল শাসনামলেও এই রীতি প্রচলিত ছিলো। আমাদের এতোদঞ্চলের ভূমিতে কখনো উশর চালু ছিলো বলে কোনো ইতিহাস গ্রন্থেই তথ্য পাওয়া যায়না। সুতরাং আমাদের দেশের ভূমির বাবদে উশরের বদলে খারাজ প্রদানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। আর সেই খারাজও প্রচলিত খাজনার আকারেই আদায় হয়ে যাচ্ছে। কেননা শরিয়তের সর্বস্বীকৃত বিধান হলো, মুসলমানদের উপর একই সাথে খারাজ ও উশর দুটোই আরোপিত হতে পারেনা। لا يجتمع على مسلم خراج وعشر

(আল কামিল, ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত, ফাতহুল কাদীর ৪র্থ খণ্ড)

পক্ষান্তরে আমাদের জমি যদি উশরযোগ্য হয়, তাহলে যেসব জমিকে নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তার উপর সরকার দু'ধরনের কর আরোপ করে থাকে। একটি হচ্ছে সেচ কর, অন্যটি খাজনা। এ ধরনের জমিতে এক দশমাংশ দিতে হবে, না এক বিংশতি অংশ? আর সেটা খাজনা বাদে, না খাজনা সমেত?

অধিকাংশ ভূমি মালিক বর্গাচাষীদের দ্বারা চাষ করিয়ে থাকেন, যাদের সাথে ফসলের অর্ধাংশ দেয়ার চুক্তি নির্ধারিত থাকে। কোনো কোনো ভূমি মালিক কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তাদের নির্ধারিত মজুরি ঐ জমির উৎপন্ন ফসল থেকে ফসল কিংবা নগদ টাকার আকারে দেয়া হয়। কোনো কোনো ভূমি মালিক আবার নিজেও চাষ করে থাকে। এখন উশর কি উভয়ের উপর আরোপিত হবে, না শুধু ভূমি মালিকের উপর? যদি উভয়ের উপর হয়, তবে ফসল ভাগ বাটোয়ারা হওয়ার পর, না আগে? আর এতে পাঁচ ওয়াসাক ন্যূনতম নিসাব নির্ধারিত, না যে কোনো পরিমাণের উপর উশর ধার্য হবে?

ফসল ছাড়া যে পশুখাদ্য উৎপন্ন হয়, তার বেশিরভাগ কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুই খেয়ে ফেলে। একটা অংশ বিক্রি হয়। এই অংশের উপর উশর দিতে হবে কিনা?

জবাব উপমহাদেশীয় ভূমি উশরযোগ্য, না খারাজযোগ্য, তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ চলে আসছে। তবে এতদঞ্চলের হানাফি ও আহলে হাদিসসহ সকল মাযহাবের মান্যগণ্য আলেমদের ফতোয়া অনুসারে মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিতে উশর দেয়াই সঠিক ও সাবধানী পন্থা। নিজ ভূমি থেকে ফসল অর্জনকারী মুসলমান মাত্রই কুরআনের নির্দেশ اتوا حقه يوم حصاده "ফসল ঘরে তোলার দিন ফসলের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও" অনুসারে উশর দিতে সর্বাবস্থায় বাধ্য। আপনি যে কয়টি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এ ব্যাপারে কোনো সঠিক ও কার্যকর দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম নয়।

প্রথমত, প্রত্যেক মুসলমান সরকার যে কোনো ভূমি রাজস্ব আদায় করলেই তাকে খারাজ বা উশর নামে অভিহিত করা যায়না। শরিয়তে খারাজ ও উশরের জন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়মবিধি নির্ধারিত রয়েছে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ও সেই নিয়মবিধি অনুসারে একটি ইসলামি সরকারের অধীনে যে ভূমি রাজস্ব লেনদেন করা হয়, তাকেই খারাজ বা উশর নামে আখ্যায়িত করা যায়। জমির উপর আজকাল যে কর ধার্য করা হয়ে থাকে, তার পেছনে খারাজ বা উশরের চেতনা বিন্দুমাত্রও কার্যকরি নেই। এই করকে উশর বা খারাজ নাম দিয়ে কোনো ভূ-স্বামী যদি উশর দিতে অস্বীকার করতে পারে, তাহলে একই পন্থায় একজন পুঁজিপতি এবং শিল্পপতিও বলতে পারে যে, আমি আমার পুঁজি বা সম্পদের উপর যে বিভিন্ন ধরণের কর দিয়ে থাকি, তাতেই আমার যাকাত আদায় হয়ে যায়। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সরকারের প্রাপ্য সরকার ঠিকই পেয়ে যাবে, কেবল আল্লাহর প্রাপ্যটাই বাকি থেকে যাবে।

"কোনো মুসলমানের উপর একই সাথে খারাজ ও উশর দুটোই আরোপিত হয়না।" –এই মর্মে যে রেওয়ায়েতটি আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তা সূত্রের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম ইবনে হুমামও এ কথা স্বীকার করেছেন। দেরায়া নামক গ্রন্থে ইবনে হাজার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, এর একাধিক বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা বিতর্কিত। ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ এ বর্ণনাকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করে মুসলিম ভূ-স্বামীর খারাজযোগ্য জমিতেও উশর দিতে হবে বলে রায় দিয়েছেন। তথাপি এই রেওয়ায়েত যদি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ধরে নেয়াও হয়, তবু হানাফি ফেকাহবেত্তাগণ এ রেওয়ায়েত থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি যে, কোনো জমি থেকে খারাজ ও উশরের একটি আদায় হয়ে গেলে তা থেকে অপরটি আদায় করা যাবেনা। বরঞ্চ তারা বলেন, জমি যদি মূলত উশরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে তা থেকে খারাজ আদায় হওয়ার পরও উশর দিতে হবে। তবে জমি যদি সুনিশ্চিতভাবে খারাজযোগ্য হয়, তবে তা থেকে খারাজ বা উশরের যে কোনো একটি আদায় হয়ে গেলে অপরটি আর দিতে হবেনা। এখন আমাদের ভূমিগুলোকে বিতর্কিত ধরে নিলেও আসলে তা যদি উশরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে হানাফি মতানুসারে ঐসব জমিতে উশর পাওনা থেকে যাবে, চাই তা থেকে খারাজ আদায় করা হোক বা না হোক। তাই সতর্কতা ও খোদাভীতির দাবি হলো, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের খাতিরে ফসলি জমির মালিক মুসলমান মাত্রই যেনো উশর দিয়ে দেয়।

সেচ করের ব্যাপারে বলা চলে যে, এটাও উশরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। তবে এর কারণে উশর অর্ধেকে নেমে আসবে। (অর্থাৎ এক দশমাংশের পরিবর্তে এক বিংশতি অংশ দিতে হবে।) অবশ্য হিসাব করার সময় মোট উৎপন্ন ফসল থেকে সেচ কর বাদ দেয়া যাবেনা। কারণ কৃত্রিম সেচের কায়িক ও আর্থিক ব্যয়ের

ব্যাপারটি বিবেচনা করে শরিয়ত নিজেই উশরের অর্ধেক রেয়াত দিয়েছে। এখন একদিকে উশরও অর্ধেক দেয়া হবে। আবার উশর হিসাব করতে গিয়ে সেচ করও বাদ দেয়া হবে, এটা ঠিক নয়। তবে উশর দেয়ার আগে খাজনা কর্তন করা যেতে পারে।

হানাফি মতে উশর হিসাব করার সময় উৎপন্ন ফসল থেকে কৃষিব্যয় কর্তন করা যায়না। স্বাভাবিক অবস্থায় এই বিধি অনুসরণ করা কর্তব্য। ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ থেকে উশর দিতে হবে। হানাফি মাযহাবের ফতোয়া হলো, উশরে কোনো নিসাব তথা ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তবে একাধিক সহীহ্ হাদিস থেকে জানা যায়, মোট ফসলের ন্যূনতম পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় ১৯ মণ হওয়া চাই। ইমাম আবু হানিফার প্রবীণতম দুই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এ কথা মেনে নিয়েছেন। তাই কোনো অস্বচ্ছল কৃষক যদি উক্ত নিসাবের চেয়ে কম ফসল পেয়ে উশর না দেয় তা হলে ক্ষতি নেই।

ভূমিতে উৎপন্ন পশুখাদ্য– যা কেটে বিক্রিও করা যায়, সঞ্চিত করেও রাখা যায়, তারও এক দশমাংশ পরিমাণ উশর দেয়া উচিত। হানাফি মাযহাব অনুসারে প্রত্যেক কৃষিজাত দ্রব্যের উপর উশর দিতে হয়। তবে যেসব জিনিস ইচ্ছা করে বোনা বা রোপণ করা হয়না। কিংবা যার কোনোই মূল্য নেই, যেমন বিভিন্ন রকমের আত্মজ ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি এসবের উপর কোনো উশর নেই। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৭]*

[২]

প্রশ্ন : তরজমানুল কুরআন জানুয়ারি, ১৯৬৭ সংখ্যায় 'উশর ও খারাজের কয়েকটি সমস্যা' শীর্ষক প্রশ্নোত্তর পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। জবাবে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "উপমহাদেশের জমি উশরযোগ্য না খারাজযোগ্য তা নিয়ে বাদানুবাদ চলে আসছে। তবে হানাফি ও আহলে হাদিস সমেত সকল মাযহাবের মান্যগণ্য আলেমগণের ফতোয়া হলো, মুসলমানদের জমি থেকে উশর আদায় করাই অধিকতর নির্ভুল ও সাবধানী পন্থা।"

উপরোক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কোনো সুনির্দিষ্ট আলেমের ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়নি। দেশ বিভাগের পর সমগ্র উপমহাদেশের জমিগুলোকে জমির মালিকানা ও ভোগদখলের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। তাই পরিস্থিতি সংক্রান্ত মতবাদকে উপেক্ষা করা যায়না।

দ্বিতীয়ত: আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বলেই আপনার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। একটা সুস্পষ্ট ও তৃপ্তিকর জবাব প্রত্যাশা করা হয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি বিশ্লেষণে খানিকটা স্ববিরোধিতাও পাওয়া যায়, যা নিরসন করা একান্ত আবশ্যক। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক মুসলমান

সরকারের আদায়কৃত যে কোনো ভূমি রাজস্বকে শরিয়তের দৃষ্টিতে উশর বা খারাজ নামে আখ্যায়িত করা যায় না। শরিয়তে উশর ও খারাজের জন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়মবিধি নির্ধারিত রয়েছে সেই উদ্দেশ্যে ও নিয়মবিধি অনুসারে একটি ইসলামি সরকারের অধীন যে কর লেনদেন করা হয়, তাকেই উশর বা খারাজ নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমানে জমির উপর যে খাজনা আদায় করা হয় তার পেছনে উশর বা খারাজের চেতনা বিন্দুমাত্রও কার্যকর নেই।"

একই আলোচনায় অন্যত্র উশর আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে "তবে উশর দেয়ার আগে মোট উৎপন্ন ফসল থেকে খাজনা কর্তন করা যেতে পারে।" সেই সাথে হানাফি মাযহাবের অনুসৃত নীতি অনুসারে উশর দেয়ার সময় কৃষিব্যয়কে মোট কৃষি উৎপাদন থেকে বাদ না দেয়ারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উশর দেয়ার আগে যদি উৎপন্ন ফসল থেকে খাজনা বাদ দেয়া যায়, তাহলে কৃষি ব্যয় বাদ দেয়া যাবেনা কেন?

এক জায়গায় খোদাভীতি ও সাবধানতার স্বার্থে মুসলমান চাষীর পক্ষে সর্বাবস্থায় উশর দেয়া কর্তব্য বলা হয়েছে।

আশা করি এ বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে সঠিক পথনির্দেশনা দান করবেন।

জবাব : আপনি তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত জবাবে, কয়টি স্ববিরোধিতা চিহ্নিত করেছেন, সে সম্পর্কে নিম্নে আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করছি :

আপনি লিখেছেন, দেশ বিভাগের পর উভয় অংশের জমিকে এক পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। কেননা উভয় অংশের প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। তবে বিভাগোত্তর কালে মুসলমানরা যেসব জমির মালিক হয়েছে, তাতে উশরের বিধি পাল্টে যাওয়ার কারণ হতে পারে এমন কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সেটা আপনি উল্লেখ করেননি। আমি উপমহাদেশ শব্দটা শুধু এ জন্যই ব্যবহার করেছি যে, দেশ বিভাগের আগে এটা অবশ্যই একদেশ ছিলো, এতে বসবাসকারী মুসলমানদের সমস্যাবলী প্রায় একই ধরণের ছিলো এবং সেই সব সমস্যার শরিয়তসম্মত সমাধানের জন্য তারা সাধারণত সমগ্র উপমহাদেশে মান্যগণ্য ও নির্ভরযোগ্য এমন আলেমদেরই শরণাপন্ন হতো। দেশ বিভাগের পরেও এ ধরণের আলেমদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তা এমন সমস্যা সংক্রান্ত না হয় যার প্রকৃতি ও ধরণ এখন মৌলিকভাবেই পাল্টে গেছে। পাকিস্তান হওয়ার পর যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে, আমার মতে তাতে উশরের অপরিহার্যতা আগের চেয়েও সন্দেহাতীত। কেননা কোনো অঞ্চলে একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার মুসলিম মালিকানাভুক্ত জমিতে উশর অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুসলমানদের কৃষি জমিতে উশর সম্পর্কে যে বিতর্ক ও মত বিরোধের উল্লেখ আমি করেছি, তা থেকে এ কথা বুঝা যায়না এবং আমিও বুঝাইনি যে, যার ইচ্ছে উশর

দিতে পারবে, আর যার ইচ্ছে মতভেদের ওজুহাত দিয়ে উশর দিতে অস্বীকার করতে পারবে। একটু-আধটু মতভেদ সব ব্যাপারেই হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত মত প্রতিষ্ঠার বেলায় সব সময়ই নির্ভরযোগ্য আলেমদের অধিকাংশের অভিমত কি এবং কোন পক্ষের যুক্তি প্রমাণ অধিকতর বলিষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, সেটাই অগ্রগণ্য, সেটাই বিবেচনা করতে হয়। আমার পূর্ববর্তী জবাবে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও এসব তথ্য সন্নিবেশিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। তথাপি আপনি সুনির্দিষ্ট মতামত জানতে চাওয়ায় আমি কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের অভিমত তুলে ধরছি।

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেবের 'ইসলাম কা নিযামে আরাযী' (ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা) নামক একখানা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর ১৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

"পাকিস্তান সরকার অমুসলিমদের পরিত্যক্ত যেসব জমি মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছে, সেগুলো সব উশরযোগ্য জমি। পাকিস্তান হওয়ার আগে এসব জমির অবস্থা যে রকমই থাক না কেন, তাতে কিছু আসে যায়না। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও উভয় দেশের সরকারের ভুসম্পত্তি বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তির ফলে এসব জমি প্রথমত, বায়তুলমালের আওতাভুক্ত হয়েছে। অত:পর সরকার কর্তৃক ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে তা মুসলমানদের প্রাথমিক মালিকানাভুক্ত জমিতেই পরিণত হয়েছে আর মুসলমানদের জমিতে তো উশরই আরোপ করতে হয়। কাজেই এগুলো সব উশরযোগ্য জমি। অনুরূপভাবে যে সব জমি পাকিস্তান হওয়ার আগে অনাবাদী ছিলো, কারো ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অত:পর সরকার তাতে সেচের ব্যবস্থা করে আবাদযোগ্য করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে মূল্যের বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। সেসব জমিও যেহেতু মুসলমানদেরই প্রাথমিক মালিকানাভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, কাজেই তা উশরযোগ্যই সাব্যস্ত হবে।"

আবার ১৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

"কোনো অঞ্চলে যেসব জমি পুরুষানুক্রমিকভাবে মুসলিম ভূ-স্বামীদের মালিকানা-ভুক্ত চলে আসছে, সেসব জমির মালিকানা সম্পর্কে এই বলে সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবেনা যে, ঐ অঞ্চল যখন প্রথম বিজিত হয়, তখন অমুসলিম মালিকদের মালিকানা স্বত্ব যথাযথ বহাল রাখা হয়েছিল।"

১৭০ পৃষ্ঠায় দেওবন্দের প্রধান মুফতি হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেবের দুটি ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো :

"ভারতে যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে, তা উশরযোগ্য। কেননা মুসলিম ভূ-সম্পত্তিতে উশরই মূল কথা। কোনো সন্দেহ দেখা দিলেও উশর দেয়াই নিরাপদ।"

দ্বিতীয় ফতোয়াটি এরূপ :

"ভারতের সকল জমিতে একই বিধি প্রযোজ্য নয়। তবে যে জমি মুসলিম মালিকানাভুক্ত, তাতে উশর দিতে হবে। মুসলমানদের উশর দেয়া উচিত।"

এরপর ১৮২ পৃষ্ঠায় মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব "সরকারি রাজস্ব প্রদানে উশর আদায় হবেনা।" শিরোনামের অধীন লিখেছেন :

"সরকার যদি মুসলিম জনগণের কাছ থেকে যাকাত ও উশর ঠিক যাকাত ও উশরের নামেই এবং যাকাত ও উশর সংক্রান্ত ইসলামি বিধান অনুসারেই আদায় করে আর সেই অনুসারেই তা ব্যয় করার সংকল্প ঘোষণা করে তাহলে ইসলামি সরকারকে প্রদত্ত এই যাকাত ও উশর শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত ও উশর বলেই গণ্য হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এখন পর্যন্ত যে আয়কর আদায় করে থাকে, তা যাকাতের নামেও আদায় করা হয়না, যাকাতের বিধান অনুসারেও নেয়া হয়না। যাকাতের নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করার অঙ্গীকারও সরকার দেয়না। অনুরূপভাবে সরকার যে ভূমি রাজস্ব আদায় করে থাকে, তাও উশর ও খারাজের শরিয়তি বিধি অনুসারে আদায় করেনা। ওটাকে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার জন্যও সরকার কোনো অঙ্গীকার ঘোষণা করেনা। তাই মুসলিম সরকারের আরোপিত আয়কর অথবা সরকারি ভূমি রাজস্ব দিলেও যাকাত ও উশরের ফরয থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়না।"

এরপর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. এরও একটা ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। মাওলানা থানবীকে জানানো হয়েছিল যে, কোনো কোনো আলেম সরকারি খাজনা দিলে উশর আদায় হয়ে যায় বলে অভিমত দিয়েছেন। অত:পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার দৃষ্টিতে সঠিক মত কোনটি? মাওলানা থানবী র. জবাবে বলেন আমিতো এটাই জানি যে, এতে আদায় হয়না, যেমন আয়কর দিলে যাকাত আদায় হয়না। উক্ত আলেমগণ কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন আমার জানা নেই। এই গ্রন্থের পরবর্তী এক স্থানে মুফতি আযীযুর রহমানেরও একই অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

'ইলমুল ফিকাহ' নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুশ শাকুর লাখনবী বলেন :

সরকারি ভূমি রাজস্ব বাবদ যা দেয়া হয় তা উশর বলে গণ্য হতে পারেনা। কেননা তা উশরের নির্ধারিত খাতে ব্যয় হয়না। কাজেই এটা দিলে উশর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী কাদেরী স্বীয় গ্রন্থ 'বাহারে শরিয়ত' পঞ্চম খণ্ডে ৪০ পৃষ্ঠায় বলেন :

"জমি তিন রকমের (১) উশরযোগ্য (২) খারাজযোগ্য (৩) উশরযোগ্য ও নয়, খারাজযোগ্য নয়। প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের জমিতে উশর দিতে হবে।

উপমহাদেশের মুসলমানদের জমি খারাজযোগ্য সাব্যস্ত হবেনা। যতোক্ষণ না কোনো সুনির্দিষ্ট জমির খারাজযোগ্য হওয়া শরিয়তসম্মত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়।" অত:পর ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন :

"সরকারকে যে খাজনা দেয়া হয়, তা দ্বারা শরিয়ত আরোপিত খারাজ আদায় হয়না। বরং এটা ভূ-স্বামীর দায় হিসেবে থেকে যাবে এবং তাকে খারাজ দিতে হবে।"

সর্বশেষ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ নাযীর হোসাইন দেহলভীর গ্রন্থ 'ফাতোওয়ায়ে নাযীরিয়া' প্রথম খণ্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠা থেকে একটা উক্তি উদ্ধৃত করবো। ইনি আহলে হাদিস গোষ্ঠির কাছে সবচেয়ে বড় আলেম গণ্য হয়ে থাকেন। উক্তিটি হলো :

"উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক জমির উৎপন্ন ফসলে উশর কিংবা অর্ধ উশর (ক্ষেত্র বিশেষে) দেয়া বাধ্যতামূলক যদি জমির মালিক মুসলমান হয় এবং উৎপন্ন ফসল নিসাব পরিমাণ হয়। জমি খারাজযোগ্য হোক বা উশরযোগ্য হোক এবং জমি ফসলের মালিকের মালিকানাভুক্ত হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় উশর অথবা অর্ধ উশর বাধ্যতামূলক। কারণ উশর বাধ্যতামূলক হওয়ার পক্ষে শরিয়তের যেসব দলিল রয়েছে তা উল্লেখিত সর্ব প্রকারের জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" [লেখক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী]

আপনি আমার আলোচনায় স্ববিরোধিতার যে অভিযোগ তুলেছেন, তা আমার কাছে পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি। খাজনা বা ভূমিকর সম্পর্কে আমি এ কথাই বলেছি যে, তা খারাজ বা উশরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। খাজনা বা ভূমিকর দিয়ে কেউ বলতে পারেনা যে, আমি খাজনা বা ভূমিকরের মাধ্যমে উশর বা খারাজ পরিশোধ করে দিয়েছি। হানাফি ফেকাহবেত্তাদের এ অভিমত আমি বর্ণনা করেছি যে, তারা উশর প্রদানের আগে ফসল থেকে কৃষি ব্যয় কর্তন করা সঠিক মনে করেননা। তবে খাজনা বা ভূমিকরের ব্যাপারটা কৃষি ব্যয় থেকে ভিন্ন। কারণ এটা সেই আমলে বিদ্যমান ছিলনা যখন ফকীহগণ কৃষি ব্যয় কর্তন না করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া এক হিসেবে খাজনা বা ভূমিকর কৃষি ব্যয়ের পরিবর্তে একটা কৃষিকর বিশেষ। কেননা কৃষি ব্যয় বলতে ভূমি উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বাবদ যে ব্যয় হয় তাকেই বুঝায়। তাই উশর হিসেব করার আগে যদি কেউ ফসলের মূল্য থেকে খাজনা ও ভূমিকর দিয়ে দেয়, তাতে দোষের কিছু নেই। এটা আমার একার মত নয়, আলেম সমাজও এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও আপনি ইচ্ছে করলে এ বক্তব্য অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং সমগ্র ফসলের উপর খাজনা ও ভূমিকর কর্তন না করেই উশর দেয়া উত্তম। এতে গরিবদের উপকার আরো বেশি হবে এবং শরিয়তের বিধানের ব্যাপারে যতো বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততোই ভালো। *[তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৬৭]*

[৩]

প্রশ্ন : আগষ্ট সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে আপনার জবাব পড়ে মোটামুটি আশ্বস্ত হয়েছি। আমি বিগত বছরের উপার্জন হিসেব করে অর্ধ উশর আলাদা করে ফেলেছি। তবে একটি বিষয় এখনো বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রয়েছি। এ ব্যাপারে যদি আরো একটু পথনির্দেশনা পাই, তাহলে অধিকতর মানসিক তৃপ্তি পাবো এবং সংশয় ও বিভ্রান্তির পুরোপুরি অবসান ঘটবে। আমি লিখেছিলাম, "উপমহাদেশে বিভাগোত্তরকালে জমির মালিকানার পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে যাবে।" এ কথা দ্বারা আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম, পাকিস্তানে ভূমি মালিকানা তিন প্রকারের (১) যে জমি পাকিস্তান হবার আগেও মুসলমানদের ছিলো, এখনো তাদেরই অধিকারেই রয়েছে। (২) যে জমি পাকিস্তান হবার আগে অমুসলিমদের দখলে ছিলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে সরকারের দখলে এসেছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। এসব জমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সেলামি কিংবা খারাজের বিনিময়ে মুহাজিরদেরকে দেয়া হয়েছে। সেলামি সরকারি বিধি মোতাবেক প্রত্যেক জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে নির্দিষ্ট রয়েছে। (আখের জন্য এক রকম, গমের জন্য এক রকম, ঘাসের জন্য এক রকম, ধানের জন্য এক রকম ইত্যাদি ইত্যাদি।) এই বিধিতে সরকার প্রয়োজন মোতাবেক রদবদল ঘটিয়ে থাকে। কতিপয় জিনিসের ক্ষেত্রে এই সেলামি বা খারাজ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাছাড়াও জমি বরাদ্দের সময় এ কথা জানা থাকে যে, এর মালিকানা কি প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর সেলামি বা খারাজের আকারে দিতে হবে? (৩) যে জমি সরকারের মালিকানাভুক্ত ছিলো, বর্তমান সরকার সাবেক সরকারের উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে এবং কতিপয় ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে পুরস্কার কিংবা কৃতিত্বের প্রতিদান হিসেবে দেয়া হয়েছে। এর বাবদেও নির্দিষ্ট নিয়মে সেলামি বা খারাজ দিতে হয়। স্মরণযোগ্য, বিজিত দেশসমূহে ইসলামি কৃতিত্বের প্রতিদান হিসেবে এ জাতীয় পুরস্কারাদি দেয়ার রেওয়াজ ছিলো এবং এ ধরনের ভূমি সম্ভবত খারাজযোগ্য গণ্য হতো। এ থেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে, যেসব পরিত্যক্ত জমির বাবদে সরকার ভূমিকরের আকারে খারাজ পেয়ে থাকে, সেই কর সরকারি কোষাগারে জমা হয় এবং সরকারি কোষাগার থেকে জনহিতকর কাজে ব্যয় হয়, তাকে খারাজযোগ্য জমিরূপে গণ্য করা চলে।

দেশ বিভাগের আগে ইংরেজ সরকার সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে জমির সর্বোচ্চ মালিক হয়ে বসেছিল। এখন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই রাষ্ট্রের মুসলিম সরকার জমির সর্বোচ্চ মালিক। সরকার সব সময় এই ক্ষমতার অধিকারি যে, জনকল্যাণের স্বার্থে যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো জমি হুকুম দখল করতে পারে কিংবা মূল্য দিয়ে করায়ত্ত করতে পারে। এ ধরনের ক্ষমতা অবশ্যই খারাজযোগ্য জমিতেই হয়ে থাকে।

হযরত ওমরের রা. আমলে ইরান প্রভৃতি দেশের যেসব জমি মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল, তা যদি ইতোপূর্বে অমুসলিমদের অধিকারে থাকাকালে প্রাচীন নদনদী, খাল, নালা বা জলাশয় থেকে সিঞ্চিত হয়ে থাকতো, তা হলে তার উপর খারাজ আরোপ করা হতো। এ ধরনের কিছু জমি কোনো কোনো সাহাবির দখলে ছিলো এবং তাদের কাছ থেকে খারাজ নেয়া হতো। যদি স্বয়ং মুসলমানরা নতুন খাল বা পুস্করিনী খনন করে সেচকার্য চালাতো তাহলে তাদের উপর খারাজ আরোপ করা হতো। (দেখুনঃ আল ফারুক, রচনা-শিবলী নুমানী, রাজস্ব অধ্যায়, পৃ. ১৭৪-১৭৫) উল্লেখ্য, তৎকালে খারাজের তুলনায় উশর অনেক কম আদায় হতো এবং অপেক্ষাকৃত রেয়াত দেয়া হতো। ইরাকে কোথাও কোথাও জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুপাতে রাজস্বের হারে পার্থক্যও হতো। *[আল ফারুক, ২য় খণ্ড, রাজস্ব অধ্যায়, পৃ. ১৬৮]*

প্রসঙ্গত, এ কথাও বিবেচনার দাবি রাখে যে, প্রথম প্রথম যখন মুসলিম সরকার এ ধরনের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতো, তখন আদায়কারিদের ব্যয় এই রাজস্ব থেকেই নির্বাহ করা হতো। এখন যেহেতু জমির ফসল একত্রিত করে উশর দেয়ার দায়িত্ব ফসলের মালিকের উপর বর্তেছে, সেহেতু তার যাবতীয় ব্যয় উশর থেকে কর্তন করা ন্যায়সঙ্গত হবে।

জবাব : আপনি আমার জবাবের উপর যে সব নতুন প্রশ্ন তুলেছেন, তা নিয়ে যদি বিস্তারিত আলোচনা করি, তাহলে একটা নিবন্ধ লিখতে হবে। আপাততঃ আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি :

প্রথমতঃ আমি প্রথম জবাবেই বলেছি যে, উশর ও খারাজ দুটোই একই জমিতে আরোপিত না হওয়া শুধুমাত্র হানাফি মাযহাবের নীতি। অন্যথায় অন্যান্য ইমামদের মতে, মুসলমানরা যে জমি থেকেই ফসল পাক, তা থেকে তাকে উশর দিতে হবে। হানাফিদের নীতি যে হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত, হাদিসবেত্তদের নিকট তার সনদ দুর্বল। এমন কি বিশিষ্ট হানাফি ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ তাহির স্বীয় গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল মাউযুয়াত' (মনগড়া হাদিসের বিবরণ)-এ ঐ হাদিসকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদিন যেসব জমিকে খারাজযোগ্য ঘোষণা করে তাতে খারাজ আরোপ করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কেও রসূল সা. বা কোনো সাহাবির এমন কোনো উক্তি চোখে পড়েনা যে, এসব খারাজযোগ্য জমি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত হলে তাতে উশর দিতে মুসলমানের উপর তা ইবাদাত হিসেবে ফরজ করা হয়েছে। কুরআনের নির্দেশ اتوا الزكوة (যাকাত দাও) এবং اتوا حقه يوم حصاده (ফসল ঘরে তোলার পর তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।) সকল ভূমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সহীহ হাদিসসমূহে উশরের যে নির্দেশ এসেছে, তাও সকল জমির উপরই প্রযোজ্য। উশর সংক্রান্ত বিশ্বস্ততম হাদিসগুলোতে কোথাও

খারাজযোগ্য জমিকে উশর বহির্ভূত করা হয়নি। এ জন্য অন্যান্য ফেকাহবেত্তাগণ এ কথাই বুঝেছেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন কেবল মালিকানা স্বত্ব ভোগদখলের অধিকারের বিনিময় হিসেবেই খারাজ আরোপ করতেন। উশরের পরিবর্তে নয়। এটা উশরের স্থলাভিষিক্তও ছিলোনা, উশর থেকে অব্যহতি পাওয়ার ছাড়পত্রও ছিলোনা। এ জন্য হানাফি মাযহাবও স্বীকার করেছে যে, কোনো জমি যদি প্রকৃতপক্ষে উশরযোগ্য হয়ে থাকে এবং ভুলক্রমে তাকে খারাজযোগ্য মনে করে খারাজ আরোপ করা হয়ে থাকে তবে তা সত্ত্বেও উশর দেয়া বাধ্যতামূলক থাকবে। যে জমি সরকারের মালিকানায় থাকে এবং তা প্রথমবারের মতো কোনো মুসলমানের ভোগদখলে দেয়া হয় তবে তা সর্বসম্মতভাবে উশরযোগ্য-চাই মুসলমানের মালিকানা বা ভোগদখল যে ধরনেরই হোকনা কেন।

এ বিধিটাও কোনো চিরস্বীকৃত ও সার্বজনীন বিধি নয় যে, ইসলামি সরকারের করায়ত্ত হওয়ার সময় যে জমি কোনো অমুসলিমের ছিলো, তা চিরকাল খারাজযোগ্যই থাকবে– কখনো তাতে উশর আরোপিত হবেনা। কা'বা শরিফ ও মসজিদে নববীর আশপাশে একাধিক জমি এরূপ ছিলো, যা যাকাত ও উশরের হুকুম নাযিল হবার পর মক্কা বিজয়ের সময় অমুসলিমদের সম্পত্তি ছিলো। কিন্তু রসূল সা. তাকে খারাজযোগ্য বলেননি। এসব জমি মুসলমানদের অধিকারে আসার পর তাদের কাছ থেকে উশর আদায় করা হয়।

অমুসলিমদের পরিত্যক্ত যেসব জমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে, তার সেলামি প্রভৃতির যে বিবরণ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মনে হয়না। যেসব মুহাজির এখন এসব জমির মালিক হয়ে গেছে, সরকারি রাজস্বের ব্যাপারে তাদের ও স্থানীয় লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বৈষম্য রয়েছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থেকেও থাকে, তবে আমি আগেই বলেছি, ভূমির মালিক ফসল থেকে খাজনা, সেলামি ইত্যাদি কেটে রেখে বাদবাকী ফসলের উপর উশর দিতে পারে। কিন্তু এই সব সেলামি ইত্যাদিকে খারাজ আখ্যায়িত করে তাকে উশরের স্থলাভিষিক্ত করার যুক্তিকে আমি মোটেই সঠিক মনে করিনা। এবং এর ভিত্তিতে উশর না দেয়াকে বৈধ বলে স্বীকার করিনা।

আপনার এ যুক্তিটাও অদ্ভুত যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সরকার রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করতো, কিন্তু এখন উশরের দায়িত্ব ফসল মালিকের উপর বর্তানোর কারণে তার পক্ষে উশর থেকে কৃষি ব্যয় কর্তন করা সঙ্গত হবে। মুসলিম সরকার যাকাত, উশর ও খারাজ আদায়কারিদের উপর যা ব্যয় করতো, তা এই সব রাজস্বের একটা নগণ্য অংশ ছিলো। আসল রাজস্ব অনেক বেশি আদায় হতো এবং কর্মচারীদের মজুরি দেয়ার পর তা অন্যান্য খাতে ব্যয় হতো। আজকের যুগে একজন ভূ-স্বামী ব্যক্তিগতভাবে যে উশর দেয়, তা দিতে তার

বাড়িতে কি খরচ বহন করতে হয় এবং তাকে কিভাবে আপনি আদায়কারি ও কর্মচারীদের মজুরির স্থলাভিষিক্ত করে উশরের মধ্যে গণ্য করতে চান, তা আমার বুঝে আসেনা। আর যদি এই খরচ দ্বারা আপনি কৃষি খরচ, ফসল রক্ষণাবেক্ষণ, ফসল কাটা ইত্যাদির খরচ বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে কর্মচারীদের মজুরির সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। এসব ব্যয়কে কর্মচারীদের ব্যয়ের নাম দিয়ে উশর থেকে কর্তন করা কিভাবে জায়েয হবে?

অনারব দেশগুলোর বিজিত ভূমি এবং ইংরেজ শাসনের অবসান ইত্যাদির ভিত্তিতে আপনি যে যুক্তি দাঁড় করেছেন, তাও আমার কাছে দুর্বোধ্য। কোনো বহিরাগত ইসলামি সরকারের সামরিক অভিযান অথবা চরমপত্রের মাধ্যমে কোনো এলাকাকে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেনি। বরং যেসব এলাকার মুসলমানরা পরাধীন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। সেসব এলাকার স্বাধীনতা লাভ এবং কিছু অমুসলিমদের বহিষ্কারের মাধ্যমেই এটা হয়েছে। এ জন্য আমার মতে শরিয়তের বিধানের কার্যকারিতায় কোনো পরিবর্তন যদি এসেই থাকে তবে সেটা হলো, মুসলমানদের দখলে আসা অমুসলিমদের পরিত্যক্ত ভূমিগুলোও উশরযোগ্য হয়ে গেছে। *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬৭]*

২০. উশরযোগ্য ফল ফসল কি কি?

প্রশ্ন উশরের যেসব বিধিতে হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো উশরযোগ্য ফসল বা ফলমূল কি কি সেই সংক্রান্ত। কিছু কিছু ফসল রয়েছে, যা পাকতে দেয়া হয়না, বরং কাঁচা বা তরতাজা অবস্থায় বিক্রি করা হয়। শাক সবজির অবস্থাও তাই। এই সব ফসল দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়। কোনো কোনো আহলে হাদিস আলেম বলেন, রসূল সা.-এর আমলে শুধু গম, যব, খেজুর ও কিসমিস প্রভৃতির বাবদে উশর নেয়া হতো। শাক সবজির বাবদে উশর নেয়া হতোনা। ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যেসব খাদ্যদ্রব্য শুকিয়ে গুদামজাত করে রাখা যায়, কেবল সেগুলোই উশরযোগ্য। এ কারণে ইক্ষু, সবজি তরকারি ইত্যাদিতে উশর আরোপিত হবেনা।

অনুরূপভাবে কৃষি খরচ, কৃত্রিম সার প্রয়োগ, টিউবওয়েল ইত্যাদির বাবদে যে অর্থ ব্যয় হয়, অথবা সরকার যে খাজনা বা সেচ কর আদায় করে, তা উশর দেয়ার আগে ফসল থেকে কর্তন করার ব্যাপারে সঠিক মত কি? কোনো কোনো আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ প্রয়োগে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা গোটা কৃষি উৎপাদনের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি হয়ে যায়। উশর হিসেব করার সময় এসব ব্যয় হিসেবে ধরা যাবে কি?

এসব বিষয়ে কুরআন হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রীয় মতামতের আলোকে আলোচনা করে যে মতটি আপনার বিচার বিবেচনায় অগ্রগণ্য মনে হয়, তা জানালে ও তরজমানুল কুরআনে ছেপে দিলে আমাদের বন্ধু মহল ও সাধারণ পাঠক উপকৃত ও দুশ্চিন্তামুক্ত হবে।

জবাব ইমাম আবু হানিফার মতে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন করা হয় এবং একেবারেই মূল্যহীন ও বেচাকেনার অযোগ্য নয় এমন যে কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের উপর উশর দিতে হয়। অন্য কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিস কয়েকটি নির্দিষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের উপর বিশেষ বিশেষ শর্ত ও গুণাগুণ সাপেক্ষে উশর দেয়া বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন। যেমন, তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া চাই এবং শুকিয়ে গুদামজাত করা যায় এমন হওয়া চাই। কেউ কেউ এর সংখ্যা চার বা ততোধিক নির্দিষ্ট করে তার নামের তালিকাও লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে যতোদুর জানতে পেরেছি, তাতে ইমাম আবু হানিফার মতামতই অগ্রগণ্য এর পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ বিদ্যমান। আধুনিক ও প্রাচীন অনেক হানাফি আলেমও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। দলিল প্রমাণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১. পবিত্র কুরআন কৃষি উৎপাদন থেকে আল্লাহর নামে ব্যয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার ভাষা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক। যেমন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

"হে ঈমানদারগণ! যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যে সম্পদ আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে উদগত করেছি, তার মধ্য থেকে উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" *[সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৬৭]*

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন নানা রকমের লতা ও বৃক্ষের বাগান, খেজুরের বাগান, রকমারি খাদ্য ফসলের ক্ষেত, যাইতুন ও ডালিমের গাছ –যা দেখতে এক রকম ও স্বাদে বিভিন্ন রকমের। এসব ফসল যখন উৎপন্ন হয় তখন তা খাও এবং ঘরে তোলার সময় তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।" *[সূরা আল আনয়াম, আয়াত : ১৪১]*

এ সব আয়াতে যে ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সর্বব্যাপী। উপরন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে কৃষিজাত দ্রব্য, বাগান, ফসল, আঙ্গুর, যাইতুন, ও ডালিমের উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এমন কোনো সহীহ হাদিস যদি থাকতো, যা এই সর্বব্যাপী নির্দেশকে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের ভেতর সীমাবদ্ধ

ও নির্দিষ্ট করে দিতো, তাহলে সেই হাদিস অনুসারেই এর প্রয়োগ হতো। কিন্তু তেমন কোনো হাদিস বিদ্যমান নেই। যা আছে তা সনদের দিক থেকে দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় গ্রন্থ 'আততালখীসুল জাবীরে' প্রথমে হযরত মায়াযের বর্ণিত একটি হাদিস দারকুতনী, হাকেম ও বায়হাকী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদিসে বলা হয়েছে যে, রসূল সা. কাকুড়, তরমুজ, ডালিম তরিতরকারিতে উশর রহিত করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি এ হাদিসের সনদ ধারাবাহিক নয় এবং দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। অত:পর তরিতরকারি ও বিভিন্ন ফসলে উশর রহিত হওয়া সংক্রান্ত অন্য একটি হাদিস তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত করার পর ইবনে হাজর স্বয়ং ইমাম তিরমিযীর নিম্নোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

"শাক সবজি ও তরিতরকারি সম্পর্কে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়নি।"

সূরা আল বাকারার উপরোক্ত ২৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম রাজী বলেন :

এ আয়াতের সুস্পষ্ট শাব্দিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয়, মাটি থেকে উদগত যে কোনো ফসলেরই যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যও তাই। এ আয়াত থেকে তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবেই তার বক্তব্য প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু 'তরিতরকারি ও শাকসবজীতে যাকাত নেই' এই বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফার বিরোধীরা বলেন, শাক সবজি ও তরিতরকারি বাদে আর যতো ফসল আছে কেবল সেগুলোতেই যাকাত দিতে হবে।

আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী স্বীয় গ্রন্থ 'ফিকহুয যাকাতে'র 'ইসলামের যাকাত বিধান' প্রথম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় ইমাম রাযীর তফসির থেকে উপরোক্ত অংশ উদ্ধৃত করার পর এর সর্বশেষ বক্তব্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন :

"কিন্তু শাক সবজি ও তরিতরকারি সংক্রান্ত এই হাদিসটি বিশুদ্ধতার মানের দিক দিয়ে এমন নয় যে, আয়াতে যেখানে সর্বব্যাপী ফসলে যাকাত আরোপ করা হয়েছে সেখানে এর ভিত্তিতে কতিপয় শ্রেণীকে বাদ দেয়া যেতে পারে। তাই ইমাম রাযীর ন্যায় আমার মতেও আবু হানিফার যুক্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল।"

ফিকহুয যাকাতের এই জায়গায় আল্লামা কারজাভী বিভিন্ন মাযহাবের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেন :

"উশর সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার নীতিই সবচেয়ে উত্তম ও অগ্রগণ্য। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. মুজাহিদ র. হাম্মাদ র. দাউদ জাহেরী র. এবং ইবরাহীম নাখয়ীর অভিমতও এই যে, মাটি থেকে উদগত যে কোনো ফসলেই উশর দিতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত সর্বব্যাপী উক্তি এ বক্তব্যেরই সমর্থন করে এবং যাকাতের সামগ্রিক বিধানের সাথেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। গম ও যব উৎপাদনকারির উপর উশর আরোপিত হবে, আর আম ও আপেলের বাগানে উশর আরোপিত হবেমা– এটা আমার মতে ইসলামি বিধান

প্রণয়নের পেছনে যে গভীর প্রজ্ঞা ও মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয়, তার পরিপন্থী। যেসব হাদিসে চারটি খাদ্য ফসলের মধ্যে উশরকে সীমিত করা হয়েছে তার কোনো একটি হাদিস নিখুঁত নয়। কোনোটির সনদ দুর্বল কিংবা বিচ্ছিন্ন। আবার কোনোটির সনদ রসূল সা. পর্যন্ত না পৌঁছে সাহাবি পর্যন্ত গিয়ে থেমে রয়েছে। (দেখুন, 'আর রুয়াতু আলাল্ মিশকাত') আর এগুলোকে নির্ভুল ও নিখুঁত মেনে নিলেও ইবনুল মালিক র. ও অন্যান্য আলেমগণ এর এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, রসূল সা.-এর আমলে আরবে এই চারটি ফসলই উৎপন্ন হতো। তাই এ চারটির মধ্যে সীমিত রাখাটা নিতান্তই কাকতালীয় ও আপেক্ষিক, প্রকৃত অর্থে সীমিত রাখা নয়।" *[মিশকাত দ্রষ্টব্য]*

মালেকি ফেকাহ বিশারদ ইবনুল আরাবী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআনে' ইমাম আবু হানিফার মাযহাব সমর্থন করেছেন। নিজের রচিত তিরমিযী শরিফের টীকাগ্রন্থ আরিযাতুল আহওয়ামী শরহে সুনানুত তিরমিযীতে তিনি বলেন :

"উশর বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়েও সবচেয়ে বলিষ্ঠ, দরিদ্র লোকদের অধিকারের ব্যাপারেও সতর্কতামূলক এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায়ের দিক দিয়েও সর্বোত্তম। তাছাড়া কুরআন ও হাদিসের সর্বব্যাপী নির্দেশাবলি থেকেও সেটাই প্রতীয়মান হয়।"

ইবনুল আরবি র. পরবর্তি পর্যায়ে সূরা আল আনয়ামের ১৪১ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার মতের সপক্ষে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য মাযহাবের মতামত খণ্ডন করেছেন। এর একটি সংক্ষিপ্ত অংশ নিম্নে তুলে ধরছি :

আবু হানিফা এ আয়াতটি দর্পণের মতো সামনে রেখেছেন এবং সত্যদর্শিতার চেতনা নিয়ে প্রতিটি কৃষি উৎপাদনে উশর বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন– চাই তা খাদ্য জাতীয় হোক বা না হোক এবং গুদামজাত করার যোগ্য হোক বা না হোক। রসূল সা. নিজেও স্বীয় সর্বব্যাপী উক্তিতে এ কথাই বলেছেন যে,

فيما سقت السماء العشر

"অর্থাৎ বর্ষণসিক্ত ভূমির ফসলে উশর এবং জলাশয় সিঞ্চিত ভূমির ফসলে অর্ধ উশর দিতে হবে।" আল্লামা ইবনুল আরাবীর মূল গ্রন্থে সমগ্র আলোচনাটি পড়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অত:পর ফিকহুয্ যাকাতের লেখক বলেন ইবনুল হুমাম ফাতহুল ক্বাদীর গ্রন্থে, আল হাইসামী মাজমায়ুজ জাওয়ায়েদ গ্রন্থে এবং তাবরানী মু'জামুল আউসাত গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, শাক সবজি ও তরিতরকারিতে উশর দিতে হবেনা– এই বক্তব্য সম্বলিত হাদিসটি দুর্বল। এ হাদিস কোনোভাবেই আইন প্রণয়নের উৎস হতে পারেনা, এর ভিত্তিতে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদিসের বক্তব্যকে সীমিত করা বা নির্দিষ্ট করা তো দুরের কথা। এছাড়া হানাফি ফেকাহবেত্তাদের মতে এসব হাদিসের ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যারও অবকাশ রয়েছে। যেমন এ কথা

বলার অবকাশ রয়েছে যে, শাক-সবজি ও তরিতরকারি মাপজোখ করে উশর আদায় করা যাকাত কর্মীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তার আগেই এগুলো নষ্ট হয়ে বা পচে যাবে।

অন্য কথায় বলা যায়, আল্লামা কারযাভী হয়তো বলতে চান যে, এসব দ্রব্যের পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হলে যাকাত কর্মীদের মাধ্যমে তার উশর আদায় করতে হবে। কেননা, পরবর্তীতে এই আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি ইয়াহিয়া বিন আদম র.-এর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজ ও অন্যান্য সূত্রের বরাত দিয়ে ইমাম জুহরি, আতা আল্ খুরাসানী, ইমাম শায়বী এবং আরো কয়েকজনের এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন যে, এ ধরনের পচনশীল তরকারি ও ফলমূলের মূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং যাকাত আদায় করতে হবে। এগুলোর যদি বেচাকেনা চলে তবে বাণিজ্য পণ্য ধরে নিয়ে তাতে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতও ধার্য করা যেতে পারে। কিতাবুল খারাজে উদ্ধৃত বহুসংখ্যক মতামত থেকে এ রকমই মনে হয়। তবে আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর অভিমত হলো, এগুলো কৃষিজাত ও খামারজাত দ্রব্য বিধায় এতে উশর কিংবা অর্ধ উশর ধার্য হওয়াই সঙ্গত। এই অভিমতের সপক্ষে তিনি প্রাচীন ইমামদের কিছু কিছু উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। আমিও এই শেষোক্ত অভিমতটিই সমর্থন করি। তবে আমার মতে এ অভিমতকে আরো একটু বিস্তারিত রূপ দিতে গেলে সেটা এ রকম দাঁড়াবে যে, যে ব্যক্তি খামার বা বাগানের মালিক অথবা বর্গা চাষ প্রভৃতি নিয়মে কৃষি উৎপাদনে অংশীদার, সে যদি ফসল বা ফল বিক্রি করে তবে নিজের উৎপন্ন ফসলে উশর ১০ ভাগের ১ ভাগ অথবা অর্ধ উশর ২০ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করবে। যে ব্যক্তি খামার বা বাগান বন্ধক নিয়েছে, সে বন্ধকের টাকা কেটে রেখে বাদবাকি ফসলে উশর কিংবা অর্ধ উশর দিবে। আর জমির মালিক যে অর্থ বন্ধক রাখার বাবদে পেয়েছে, তার উশর মালিক নিজে দিবে। কিন্তু জমির ফসল বা বাগানের ফলমূল একবার বিক্রি হওয়ার পর তা যখন বাজারে পণ্য হিসেবে পুনরায় বিক্রি হবে, তখন তাতে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আরোপিত হবে।

আমাদের দেশের আহলে হাদিস গোষ্ঠিভুক্ত কোনো কোনো আলেমও গম, যব, আঙ্গুর ও খেজুর এই চারটি প্রধান জিনিস বাদে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য যেমন আখ, ছোলা ইত্যাদিতেও উশর বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন। কেউ কেউ ফলমূল, সবজি ও তরকারিকেও উশরযোগ্য বলেছেন। ফতোয়ায়ে সানাইয়া প্রথম খণ্ডের যাকাত অধ্যায়ে এ ধরনের একাধিক ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। মাওলানা উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী আখ, কলাই, বুট ইত্যাদিতেও উশর বাধ্যতামূলক বলে মত দিয়েছেন। মাওলানা আবুল কালাম বেনারসীর ফতোয়া এই যে, আখে উশর কিংবা অর্ধ উশর দিতে হবে। মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেবও এই ফতোয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ীর মতে উশর উক্ত চারটি

জিনিসে সীমিত নয়। কেননা আবু দাউদ শরিফে ইয়ামনের ভূমি সংক্রান্ত অধ্যায়ে তুলাতেও উশর আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ধান, ভুট্টা, বুট, আখ ইত্যাদিতেও তার মতে উশর দিতে হবে।

মাওলানা শামছুল হক আযিমাবাদী এবং মাওলানা আব্দুর রউফও এই ফতোয়ায় একমত হয়েছেন। মাওলানা শারফুদ্দীনের এক পৃথক ফতোয়া অনুসারে যাবতীয় ফসল ও যাবতীয় ফলমূল যথা–আম, ডালিম, আপেল ইত্যাদিতেও উশর অথবা অর্ধ উশর দিতে হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর উপসংহারে তিনি বলেন :

"সুতরাং প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রামাণ্য দলিল অনুসারে প্রত্যেক কৃষি দ্রব্যেই উশর অথবা অর্ধ উশর দিতে হবে। শাক সবজি ও তরিতরকারি উশরযোগ্য নয় এই মর্মে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার কোনোটাই সঠিক নয়। এটা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত বটে। কাজেই ঐ সব মত অনুসারে কাজ করা চলবেনা। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ওগুলো সঠিক, তবে ঐ শাক-সবজি ও তরিতরকারির অর্থ হলো নিজেদের খাওয়ার জন্য যে সব শাক, পাতা লাউ ইত্যাদি স্বল্প পরিসরে ফলানো হয়। খামারের পর খামার ও একরের পর একর জুড়ে হাজার হাজার টাকার যে ফসল ফলানো হয়, তা কখনো উশর থেকে বাদ পড়তে পারেনা। এটা কুরআন ও হাদিস ও সাধারণ বিবেক বুদ্ধি উভয়েরই পরিপন্থী। মূলা, গাজর, শালগম, আলু, আখ, তরমুজ, খিরাই ইত্যাদি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়ে থাকে।" *[ফতোয়ায়ে সানাইয়া, প্রথম খণ্ড, পৃ, ৫৪-৭৪]*

মাওলানা আতাউল্লা হানিফ সাহেব নাসায়ী শরিফের টীকায় যে আলোচনা করেছেন, তাতে এই অভিমতের প্রতি সমর্থনের দিকটাই প্রবল বলে মনে হয়।

ক্ষেত খামার এবং বাগানের পাহারা ও রক্ষণাবেক্ষন, চাষাবাদ, সার প্রয়োগ, ফসল কাটা ইত্যাদির খরচের ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের সাধারণ ফতোয়া এই যে, মোট কৃষি উৎপাদন বা তার মূল্য থেকে এটা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর উশর দেয়া জায়েয নয়, বরং গোটা ফসলের উপর উশর দিতে হবে। এ বিধান অধিকাংশ হানাফি গ্রন্থে লেখা আছে, বরাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' (চারি মাযহাবের ফেকাহ নামক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে মনে হয়, শাফেয়ী মাযহাবের নীতিও এটাই। প্রথম খণ্ডের ৬১৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে :

"নির্ভরযোগ্য মতানুসারে যাকাত দেয়ার আগে ফসল কাটার খরচ বের করা নাজায়েয।"

'আল মুহাল্লা' ৫ম খণ্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজম বলেন, ফসল উৎপাদন, কাটা ও মাড়াই, মাটি খনন, সার প্রয়োগ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যয় উশর দেয়ার আগে বাদ দেয়া জায়েয নয়। তাঁর মতে, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানিফা এবং জাহেরিয়া মাযহাবের ইমামদের অভিমতও তাই।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি তথা ট্রাক্টর, থ্রাসার, টিউবওয়েল ইত্যাদির বিধানও তদ্রুপ। এগুলোর মূল্য বা ভাড়ার টাকা মোট উৎপন্ন ফসল থেকে বাদ দেয়া যাবেনা। অন্যথায়, সাধারণ কৃষকের হালের বলদ ও কূয়া খননের খরচও বাদ না দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। টিউবওয়েল বা কূয়ার কিংবা খাল-নালা সিঞ্চিত জমির সেচকর উশর দেয়ার আগে কর্তন করা অবৈধ এ কারণে যে, এ ধরনের কৃত্রিম ও শ্রমসাপেক্ষ সেচের জন্য প্রথমেই উশরে রেয়াত দিয়ে অর্ধ উশর করে দেয়া হয়েছে। অনেকে বলেন, আমরা টিউবওয়েল ও ট্রাক্টরে পঞ্চাশ হাজার বা লাখ টাকা ব্যয় করেছি। এসব ব্যয় না পুষিয়ে উশর দেয়া কিভাবে সম্ভব? এ কথার যৌক্তিকতা মেনে নিলে তো এ কথাও উঠবে যে, আমি এক লাখ বা দু'লাখ টাকায় জমি কিনেছি। জমির এই দাম না ওঠা পর্যন্ত উশর নেয়া কেন? এ ধরনের টালবাহানা একজন ব্যবসায়ীও করতে পারে যে, আমি দোকান বা কারখানা স্থাপনে এতো টাকা ব্যয় করেছি। কাজেই আমার বাণিজ্যিক পণ্যে আপাতত যাকাত ধার্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবে ধনীরা নিরাপদ আর গরিবরা বঞ্চিত হতে থাকবে।

একজন বৃহৎ জমিদার যেমন যান্ত্রিক উপকরণ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে একদিকে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় এবং অপরদিকে বিপুল বাড়তি ফসল উৎপাদন করে, তেমনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক নিজের হাত, পা ও গবাদিপশু ব্যবহার করে। উভয়ের মধ্যে বৈষম্য করার কোনো যৌক্তিকতা বা শরিয়তসম্মত ভিত্তি নেই। তবে সরকারি খাজনা তথা ভূমিকর (সেচকর নয়) উশরের আগে পরিশোধ করা নতুন ও প্রাচীন বহু ফেকাহবিদই অনুমোদন করেছেন। এর সপক্ষে তাদের প্রমাণ হলো, খাজনা সরাসরি ভূমি উন্নয়ন, অধিক ফসল ফলানো বা কৃষি ব্যয়ের সাথে জড়িত নয়। তাই উশরের হিসাব করার আগে এটিকে উৎপাদন থেকে বাদ দেয়াতে কোনো আপত্তি নেই। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮]*

২১. মোজার উপর মসেহ করার বিধান

প্রশ্ন : রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ডে এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, সকল ধরনের মোজার উপর মসেহ করা চলে, চাই তা সুতি হোক কিংবা পশমি হোক রামপুর (ভারত) থেকে প্রকাশিত মাসিক যিন্দেগীর ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, সুতি হোক, পশমি হোক, পাতলা মোজার উপর মসেহ করা চলবেনা। কেননা পবিত্র কুরআন ও উৎকৃষ্ট মানের সহীহ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত বিধিকে দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে শিথিল করা যায়না। হযরত মুগীরা ইবনে শুবার যে হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যা অত্যন্ত সহীহ হাদিস, তাতে একমাত্র চামড়ার মোজার উপরে মসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর অপর যে হাদিসটিতে জাওরাইন (সুতি ও পশমি মোজা) শব্দটি সংযোজিত হয়েছে, হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ তাকে দুর্বল বলে রায় দিয়েছেন।

বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ যুক্তিও উত্থাপন করা হয়েছে যে, 'জাওরাব' ও চামড়ার তৈরি হয়ে থাকে বিধায় 'জাওরাব' ও এক ধরনের খুফ্ (চামড়ার মোজা) সুতরাং হয় চামড়ার মোজার উপরই মসেহ্ জায়েয মেনে নিতে হবে, নচেত জাওরাব যদি চামড়ার না হয়, তবে তাকে এমন শর্ত আরোপ করতে হবে যাতে তা খুফ্ তথা চামড়ার মোজার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। অন্যথায় চামড়ার মোজা ছাড়া আর কোনো মোজার উপর মসেহ করা জায়েয হবে না।

যিন্দেগীর উক্ত সংখ্যায় যে বিতর্ক, প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হয়েছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তরজমানুল কুরআনে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনা আসা জরুরি হয়ে পড়েছে। যে কোনো মোজার উপর যে মসেহ করা চলে, সে সম্পর্কে প্রাচীন ইমামদের কোনো উক্তি থাকলে সেটাও তুলে দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জবাব : চামড়ার মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সুন্নি ইমামরা প্রায় সকলেই একমত। তবে জাওরাব তথা চামড়ার তৈরি নয় এমন মোজার উপর মসেহ করার জন্য ফেকাহবিদগণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন তা মোটা হওয়া চাই, গাঢ় ও পুরু হওয়া চাই, পানি নিরোধক হওয়া চাই এবং তাতে জুতার সমপরিমাণ চামড়াযুক্ত থাকা চাই। তবে প্রাচীন ফেকাহবিদদের কেউ কেউ আবার সকল ধরনের মোজার উপর মসেহ করাকে জায়েয মনে করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম এবং ইবনে হাজ্ম এই মতেরই প্রবক্তা। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সুতি হোক, পশমি হোক, চামড়াযুক্ত হোক বা না হোক– যে কোনো মোজার উপর মসেহ জায়েয বলে একটি ফতোয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। রসূল সা. চামড়ার তৈরি নয় এমন মোজার উপরও মসেহ করতেন এই মর্মে যেসব হাদিস বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া বলেন :

এই হাদিসগুলোর বক্তব্য হাদিসবেত্তাদের মানদণ্ডে সহীহ প্রমাণিত না হলেও স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির দৃষ্টিতে এই বক্তব্য সঠিক। মাসাহের প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই সমান। উভয় ক্ষেত্রেই মাসাহের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা একই রকম। কাজেই এ দুটোর মধ্যে বৈষম্য করা সমমানের জিনিসকে অসম বলারই নামান্তর এবং সুবিচারের পরিপন্থী।

অনুরূপভাবে, চামড়া বেশি টেকসই হয়ে থাকে এবং তাতে পানি ঢোকে না এ যুক্তিও তাঁর মতে গুরুত্ববহ নয়। তিনি বরঞ্চ মনে করেন, সুতি বা পশমি মোজায় পানি শোষণ ও ভেতরে পানি প্রবেশ করা পবিত্রতার প্রয়োজনে অধিকতর অগ্রগণ্য এবং ধর্তব্য। এসব মোজার পাতলা বা ঢিলে হওয়া অথবা বাঁধার প্রয়োজন না হওয়ায় তাঁর মতে অসুবিধার কিছু নেই।

আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থে মসেহ সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে হাফেয ইবনে কাইয়েমও এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। এসব

হাদিসের সনদ যে নির্ভরযোগ্য নয়, সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে তার বিভিন্ন জবাবও দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, সুতি ও পশমি মোজায় মসেহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারটা শুধুমাত্র রসূল সা.-এর প্রত্যক্ষ বক্তব্য বা আচরণ সম্বলিত হাদিসের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং ১৩ জন সাহাবির কার্যধারা থেকেও তা সমর্থিত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. এই হাদিসগুলোকে দুর্বল আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও সুতি ও পশমি কাপড়ের মোজার উপর মসেহকে বৈধ বলে রায় দিয়ে সুবিচার ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছেন। সাহাবাদের কার্যধারা ও সুস্পষ্ট যৌক্তিকতার আলোকেই তিনি এরূপ রায় দিয়েছেন। আসলে 'জাওরাবাইন তথা সুতি ও পশমি মোজা এবং 'খুফ্‌ফাইন' তথা চামড়ার মোজার এমন কোনো কার্যকর পার্থক্য নেই, যা শরিয়তের বিধানে পার্থক্য সুচিত করতে পারে। ইবনে কায়েম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এতে তিনি সুতি ও পশমি মোজার উপর মাসাহের শর্তবলীর সমালোচনা করেছেন এবং এ জাতীয় মোজার উপর মাসাহের বৈধতা সম্বলিত হাদিসগুলোতে সনদ ও যুক্তির বিচারে যে খুঁত ধরা হয়েছে, তা খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পরিহাসচ্ছলে একটা তীর্যক মন্তব্যও ছুড়ে দিয়েছেন যে, কোনো কোনো ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের কাছে চামড়ার মোজার সাথে সুতি ও পশমির মোজাকেও মসেহযোগ্য ধরা গ্রহণযোগ্য হয়নি। অথচ এ ধরনের কোনো সংযোজন যখন তাদের ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় মতামতের পক্ষে যায়, তখন সেটাকে তারা নি:সংকোচে গ্রহণ করেন।

الا نصاف ان تكتال لمنازعك بالصاع الذى تكتال به لنفسك اهما

"ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবি এই যে, আপনি নিজের পণ্য যে পাল্লা দিয়ে মাপেন, আপনার বিরুদ্ধবাদীর পণ্যও সেই পাল্লা দিয়েই মাপবেন। নেয়া ও দেয়ার পাল্লা আলাদা আলাদা রাখবেন না।"

ইবনে হাজমও তদীয় গ্রন্থ মুহাল্লাতে বিশদ আলোচনা করে ও সকল হাদিস উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, পায়ে চামড়া, সুমি, পশমি, বা অন্য কোনো কাপড়ের তৈরি যাই পরা হোক না কেন, তাতে মসেহ চলবে। এতো সব ইতিবাচক মতামত ও বক্তব্য বর্তমান থাকা অবস্থায় কেউ যদি পূর্ববর্ণিত ফকীহদের উল্লেখিত শর্তাবলী সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ ও সর্বপ্রকারের মোজার উপর মসেহ করাকে বৈধ মনে করে, তবে তার বক্তব্য সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এরপর আরো কয়েকটি কথা বলা সমীচীন মনে করছি। প্রথম কথা হলো, সুতি ও পশমি মোজার উপর মসেহ জায়েয এই মর্মে মুগীরা ইবনে শুবা রা. বর্ণিত হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযী সহীহ ও উত্তম বলেছেন। এই হাদিসটিকে একই সাহাবি বর্ণিত চামড়ার মোজায় মসেহ সংক্রান্ত হাদিসের বিপরীত বলে অগ্রাহ্য করা যায়না। এতোটুকু বৈপরিত্য মেনে নেয়া যেতো যদি মাসাহের ঘটনা এক-

আধবার ঘটতো। ওযু করা ও পবিত্রতা অর্জন করা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। তাই উভয় ধরনের মোজায় মসেহ করার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই একাধিকবার দেখা দেয়ার কথা। তাছাড়া হযরত মুগীরা দীর্ঘদিন যাবত রসূল সা.-এর সাথে থেকেছেন। তাই তার এই দু'ধনের বর্ণনায় রসূল সা.-এর বিভিন্ন সময়কার কার্যধারার প্রতিফলন ঘটেছে ধরে নিতে অসুবিধা কোথায়? সুতি ও পশমি মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে রসূল সা.-এর আরো বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিশেষ ধরনের মোজা নয় বরং যে কোনো ধরনের মোজার উপরই মসেহ জায়েয। তাই মসেহকে শুধুমাত্র চামড়ার মোজার সাথে নির্দিষ্ট করা এবং সুতি বা পশমির মোজা হলে তাকেও চামড়ার মোজা সদৃশ্য ঘন ও পুরু ইত্যাদি হওয়ার শর্তযুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কথাটা আরো একটু সহজবোধ্য করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সোনা ও রূপার যাকাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ আলাদা আলাদা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রূপার নিসাব সম্বলিত হাদিস সবচেয়ে বিশুদ্ধ। কিন্তু সোনার নিসাব সংক্রান্ত হাদিস সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। ছয়টি সহীহ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে কেবলমাত্র আবু দাউদ শরিফে সোনার নিসাব ২০ দিনার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই হাদিসের বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা বিতর্কিত। তা সত্ত্বেও দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান সোনা ও রূপার আলাদা আলাদা নিসাবই মেনে চলে। নিসাব সংক্রান্ত এই হাদিসকে গ্রহণ করলে নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণে যাকাত থেকে অব্যাহতি মেলে, ঠিক যেমন মাসাহের হাদিস গ্রহণ করলে মসেহ করে পা ধোয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। নিসাবের প্রশ্নটা যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত সম্পাদনের সাথে জড়িত। এখন সোনার নিসাব সংক্রান্ত হাদিসটি যদি গ্রহণযোগ্য মনে করা না হয়, তাহলে কুরআনের কঠোর সতর্কবাণী অনুযায়ী যাকাত না দিয়ে স্বর্ণের একটা তারও রাখা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। আর যদি (একই কারণে অর্থাৎ হাদিসটি দুর্বল হলে অগ্রাহ্য করার কারণে) সোনাকে রূপার সমপর্যায়ের ধাতু ধরে নিয়ে সোনার নিসাব ও রূপার নিসাবের সমান মনে করা হয়, (যেমন সুতি ও পশমি মোজাকে চামড়ার মোজার সমপর্যায়ের ধরা হয়) তাহলে একতোলা সোনার উপরও যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করার অনুমতিকে যদি পৃথক পৃথক অনুমতি মেনে নেয়া হয় এবং একটির সাথে অন্যটিকে জড়িয়ে ফেলা না হয়, তাহলে মোজা মোটা বা পাতলা যাই হোক, বিধি অপরিবর্তিতই থাকবে। কোনো জিনিসের পুরু বা পাতলা হওয়াটা আপেক্ষিক গুণ বা অবস্থা মাত্র, মূল জিনিসের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মোটা বা পাতলা যাই হোক চামড়া চামড়াই এবং পশম পশমই। আজকাল যে ধরনের পাতলা ও কোমল চামড়ার পায়তাবা পরে কেউ কেউ মসেহ করে থাকেন, সে মসেহ জায়েয হলে সুতি পশমি ও নাইলনের মোজায় মসেহ করা নাজায়েয কেন হবে?

আরবিতে খুফ্ ও (জাওরাব) বলতে যে মোজা বুঝায়, সেই উভয় মোজাই চামড়ার হয়ে থাকে– এ কথা ঠিক নয়। প্রচলিত আরবিতে খুফ্ বলতে চামড়ার মোজা এবং জাওরাব বলতে চামড়া ছাড়া অন্যান্য মোজা বুঝায়। তবে লিসানুল আরব, কামুস ও তাজুল আরুসে এই দুটো শব্দের আভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে 'পায়ের পোশাক।' চামড়ার তৈরি না অন্য কিছুর তৈরি, এই দু'টি শব্দের আসল আভিধানিকদের কাছে কোনো ধরাবাধা ব্যাপার নয়। তাজুল আরুস এবং লিসানুল আরবে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জাওরাব আসলে ফার্সী শব্দ 'গোরব'-এর আরবি রূপ। আর ফার্সী আভিধানে গোরব অর্থ হলো পশম বা সুতার মোজা। আরবি ভাষায় খুফ্ শব্দ দ্বারা জাওরাব এবং জাওরাব দ্বারা খুফ্ বুঝানোও বিচিত্র নয়। ইমাম দুলাবী স্বীয় গ্রন্থ 'আসমা ও কুনাতে হযরত আনাস সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি স্বীয় পশমি মোজায় মসেহ করে বললেন : خفان ولكنهما من صوف 'এ দুটো হচ্ছে পশমের তৈরি খুফ্।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, পশমি মোজাকে হযরত আনাস একশ্রেণীর খুফই বলেছেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, এটা খুফ তো নয়, তবে অত্যাধিক মোটা ও পুরু বলে এটা খুফেরই পর্যায়ভুক্ত এবং এ কারণেই তার উপর মসেহ বৈধ। *[তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮]*

[২]

করাচি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আল বালাগ' এর জমাদিউল উলা ১৩৯৭ হি. সংখ্যায় 'প্রচলিত মোজার উপর মসেহ' শিরোনামে জনাব মুহাম্মদ তক্বী সাহেবের একটি ফতোয়া ছাপা হয়। শুভানুধ্যায়ীদের কেউ কেউ ঐ ফতোয়ার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ফতোয়াটিতে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত মাওলানা মওদূদীর একটি জবাবের যেরূপ সমালোচনা করা হয়েছে ও কটুক্তিপূর্ণ আক্রমণ চালানো হয়েছে, তার পর্যালোচনা করার জন্যও তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন। তাই তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে উক্ত 'ফতোয়া'র নিম্নরূপ পর্যালোচনা করা হলো।

'প্রচলিত মোজার উপর মসেহ' বিষয়ে 'আল বালাগ' সম্পাদক যে লেখাটি ছেপে দিয়েছেন, তাতে তিনি যদি সোজাসুজি বলে দিতেন যে, হানাফি মাযহাব বা অন্য কোনো বিশেষ মাযহাব অনুসারে ঢালাওভাবে সব ধরনের মোজার উপর মসেহ জায়েয নেই এবং জায়েয হওয়ার পক্ষে যেসব মতামত রয়েছে তা খণ্ডন করার জন্য তিনি নিজের গবেষণা কিংবা হানাফি আলেমদের উক্তি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত থাকতেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেতো এবং আমাদেরও তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হতোনা। কিন্তু জনাব মুহাম্মদ তক্বী উসমানী সাহেব শুধু অতোটুকু করে ক্ষান্ত হননি। উপরন্তু এ কথাও প্রমাণ করা আবশ্যক মনে করেছেন যে, "এ বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের

অনুসৃত নীতি থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন।" সেই সাথে তিনি এ অভিযোগও আরোপ করেছেন যে, "বহু সংখ্যক মাসয়ালাতে মাওলানা মওদূদী সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন এবং আলোচ্য ব্যাপারটা তারই একটি। যদিও আল্লামা ইবনে হাজম, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়েমের মতামতও মাওলানা মওদূদীর মতোই, তথাপি এটা তার একটা নিদারুণ ধৃষ্টতা।"

পাঠককে বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য যথাযথভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে উসমানী সাহেব সর্বপ্রথমে একটা ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, কোনো মুতাওয়াতের (সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত) হাদিস ব্যতীত কুরআনের কোনো আদেশকে কোনোভাবে সীমিত বা শর্তযুক্ত করা যায়না। খবরে ওয়াহেদ (একজন সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস) দ্বারা কুরআনের কোনো হুকুমকে রহিত করা, সীমিত করা বা তাতে কোনো কিছু সংযোজন করা জায়েয নেই। উসমানী সাহেব যে সুতি বা পশমি মোজার উপর মসেহ অবৈধ এই মতটিকে যেভাবে মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদী সম্মত রায় বলে উল্লেখ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে উল্লেখিত ফেকাহ শাস্ত্রীয় মূলনীতিটিও এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেনো এটা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট উক্তি অথবা ওটাও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অথচ আসল ব্যাপার হলো, এই মূলনীতিটি শুধুমাত্র হানাফি মাযহাবের গৃহীত মূলনীতি। আর হানাফি ইমামগণও মূলনীতিটি যতো কড়াকড়িভাবে নিজেদের 'উসূলে ফেকাহ' (ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি) গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, নিজেদের ইজতিহাদে ও ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিধি রচনার ক্ষেত্রে ততোটা কড়াকড়িভাবে ঐ মূলনীতি অনুসরণ করেননি। এমন বহু খুঁটিনাটি বিধি পাওয়া যায়, যা রচনা করতে গিয়ে হানাফি ফেকাহবেত্তাগণ খবরে ওয়াহেদ (সনদের দিক থেকে বলিষ্ঠ, স্বল্প বলিষ্ঠ কিংবা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও) ও সাহাবির উক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই সব বিধি দেখলে কারো পক্ষে একথা বলা বিচিত্র নয় যে, এ দ্বারাও কুরআনের অমুক ব্যাপক আদেশকে সীমিত বা শর্তযুক্ত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য মাযহাবের ফেকাহবেত্তাগণ ও হাদিস বিশেষজ্ঞগণ হানাফিদের উক্ত মূলনীতিকে সর্বোতভাবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মনে করেননা এবং এটিকে হাদিস গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড হিসেবেও গ্রহণ করেননা। এ মূলনীতির সাথে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ যে একমত নন, সে কথা স্বয়ং হানাফি আলেমগণ মূলনীতিটি বর্ণনা করার সাথে সাথেই বলে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, শরিয়তের কোনো বিধি রহিতকরণ সংক্রান্ত মূলনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে 'নূরুল আনোয়ার' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"কুরআনে বর্ণিত কোনো সাধারণ ও সর্বব্যাপী বিধিকে যখন কোনো হাদিস দ্বারা সীমিত ও শর্তযুক্ত করা হয়, অথবা কুরআন বর্ণিত বিধির উপর হাদিস দ্বারা কিছু সংযোজিত হয়, তখন আমরা (হানাফিরা) এই উভয় কাজকে 'রহিতকরণ' নামে

অভিহিত করি। আর ইমাম শাফেয়ী প্রথমটিকে 'নির্দিষ্টকরণ' এবং দ্বিতীয়টিকে 'বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণ' নামে আখ্যায়িত করেন। আমাদের মতে এ উভয় প্রকারের পরিবর্তন কেবলমাত্র 'মুতাওয়াতির' (সর্বজনবিদিত)' মাশহুর (বহুল প্রচলিত) হাদিসের ভিত্তিতেও বৈধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে, এটি একজন সাহাবির বর্ণিত হাদিসের (খবরে ওয়াহিদ) ভিত্তিতেও বৈধ।" *(নূরুল আনোয়ার মোস্তফাই প্রকাশনা কর্তৃক ১৩০৫ হিজরীতে মুদ্রিত, পৃ. ২১০)।*

ইমাম শাফেয়ী স্বীয় ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্মলিত গ্রন্থ 'আররিসালাহ'তে নাসেখ ও মানসুখ' (রহিতকারি ও রহিত) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এতে 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা কুরআন বর্ণিত বিধির ব্যাপকভাবে সীমিত ও সংকচিত করার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। অথচ একজন মাত্র সাহাবির বর্ণিত এইসব হাদিসের সনদেরও ধারাবাহিকতা নেই এবং তার কোনো কোনো বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্তও অজ্ঞাত। উদাহরণস্বরূপ لا وصية لوارث (যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পত্তির অংশীদার– তার জন্য ওসীয়ত দ্বারা কোনো সম্পত্তি বরাদ্দ করা জায়েয নেই।) তবে হাদিসটির সনদ লক্ষ্য করুন :

اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث –

অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের ন্যায় হানাফি মাযহাবের ইমামগণও উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসীয়ত না হওয়ার বিধি রচনায় এই হাদিসকে উৎস ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। আর শুধু এটা কেন, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ থেকে হত্যাকারীর বঞ্চিত হওয়া, সোনার যাকাতের নিসাব ২০ মিসকাল (সাড়ে সাত ভরি) হওয়া, সন্তান হত্যার দায়ে পিতামাতার মৃত্যুদণ্ড না হওয়া মোটকথা এ ধরনের একাধিক বিধি এমন রয়েছে যার উৎপত্তি হয়েছে 'খবরে ওয়াহেদ' থেকে এবং হাদিস বিশেষজ্ঞদের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে তার সনদও সবল বা নির্ভরযোগ্য নয়। তথাপি হানাফিসহ সকল মাযহাবের ফেকাহ শাস্ত্রকার ও হাদিস বিশারদগণ এধরণের হাদিসকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শরিয়তের বিধি রচনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ ঐসব বিধি রচনা করতে গিয়ে কার্যত কুরআনের সাধারণ ও সর্বব্যাপী নির্দেশকে সীমিত ও শর্তযুক্ত করা হয়ে গেছে যা হানাফি মূলনীতির আলোকে হওয়ার কথা নয়। এই হাদিসগুলোকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু হয়ে যাওয়ার পর এ প্রশ্ন অনেকটা অবান্তর হয়ে যায় যে, ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ এসব হাদিসের উপর কোন কারণে এতো নির্ভরশীল ও আস্থাশীল হয়ে পড়লেন? তাঁরা এর বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে থাকেন। কখনো বলা হয় যে, এসব হাদিস দ্বারা যে বিধিসমূহ রচিত, তা আসলে কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণিত। কখনো একথাও বলা হয় যে, এসব হাদিস

'খবরে ওয়াহেদ' হলেও পরবর্তীকালে তা বহুল প্রচলিত হাদিসে পরিণত হয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই এখন এগুলো থেকে কুরআন বর্ণিত বিধিসমূহের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও শরিয়তের অন্যান্য বিধি রচনায় আর কোনো বাধা নেই। কিন্তু এতদসত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে সময় ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয়নি এবং এই সব বিচ্ছিন্ন, বিরল ও অসম্পূর্ণ সনদযুক্ত হাদিস ব্যাপক প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তখনও কি এসব হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধি প্রণয়ন মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো? তা যদি থাকতো, তবে এসব হাদিস মুসলিম জগতের আলেম সমাজে এতো জনপ্রিয় হলো কিভাবে?

হানাফি মাযহাব হাদিস দ্বারা কুরআনের বিধির পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংকোচনের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতবাদ নীতিগতভাবে ঘোষণা করেছে বটে, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এ নীতি পদে পদে কঠোরভাবে অনুসরণ করেনি। তাছাড়া হানাফিদের এই মূলনীতির সাথে যে শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামদের মতভেদ রয়েছে, সে কথাও স্বীকার করা হয়েছে। মুসাল্লামুস সুবুত গ্রন্থের টীকায় পরিবর্তন ও সংকোচনের ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব বলেন :

একক সাহাবি বর্ণিত হাদিস দ্বারা কুরআনী বিধির আওতা সীমিতকরণকে হানাফিরা জায়েয মনে করেন না। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির তথা সর্বজনবিদিত হাদিসের আওতা সংকোচনও জায়েয নয়, যদি না ইতিপূর্বে অপর কোনো অকাট্য আয়াত বা হাদিস দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি বলেন :

"ফেকার শাস্ত্রীয় মূলনীতির (উসুলে ফেকাহ) অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ একক সাহাবি বর্ণিত হাদিস দ্বারা কুরআনী বিধির আওতা সংকোচন বা নির্দিষ্টকরণকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন– চাই তা ইতিপূর্বে অপর কোনো অকাট্য দলিল দ্বারা সংকচিত হয়ে থাক বা না থাক (*পৃ. ৩৪৯*)।"

কেউ যদি উসুলে ফেকাহ (ফেকাহ শাস্ত্রীয় মূলনীতি) বিষয়ে কোনো গ্রন্থ রচনা করতে চান, তবে তিনি সে ক্ষেত্রে যতো খুশি গবেষণা চালাতে পারেন এবং হানাফি আলেমদের এই একক মূলনীতির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু নিছক মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রায় খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এতো লম্বা চওড়া ভূমিকা রচনা করা এবং একথা বলা যে, 'চামড়ার মোজার উপর মসেহ করার সপক্ষে দু'তিনটি হাদিসও যদি থাকতো তবু তার ভিত্তিতে কুরআনের হুকুমকে সীমিত করা বৈধ হতোনা, কারণ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের আদেশ রহিতকরণ, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জায়েয নয়– ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোনো সঠিক পদ্ধতি নয়। আরবি মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থীরা এ আলোচনা দ্বারা উপকৃত ও আনন্দিত হতে পারে। কিন্তু একজন সাধারণ পাঠক এ বক্তব্য পড়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবে এবং হতোবুদ্ধি হয়ে যাবে যে,

দু'তিনটি হাদিস দ্বারা তো কুরআনের বিধির পরিবর্তন করা যায়না। কিন্তু অনেকগুলো হাদিস পাওয়া গেলে তার দ্বারা এই পরিবর্তন সাধন করা যায়। 'খবরে ওয়াহেদ' প্রভৃতি পরিভাষাও সকলের বোধগম্য নয়, আর স্বয়ং তক্বী উসমানী সাহেব সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন তাও বলেননি। খবরে মুতাওয়াতির নয় এমন হাদিস মাত্রই খবরে ওয়াহেদ পদবাচ্য, চাই তার সনদ বিশুদ্ধ হোক এবং দু'তিনটি সূত্রে নয় বরং বহুসংখ্যক সূত্রে তা বর্ণিত হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। আর যে হাদিস প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্তরে এতো বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মিথ্যা বা ভুল হাদিস বর্ণনা করার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছিল বলে ধারণা করা স্বভাবতই অসম্ভব, সেই হাদিসকে বলা হয় 'খবরে মুতাওয়াতির'। তাছাড়া হাদিসের বক্তব্য, দৃষ্টি, শ্রবণ ও অনুভবযোগ্য ব্যাপার সম্পর্কিত হওয়াও মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য জরুরি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ছয়খানা সহীহ হাদিস গ্রন্থসমূহ তো দুরে থাক, খোদ বুখারি ও মুসলিম এই দু'খানা সর্বোচ্চ মানের বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থেরও শরিয়তের বিধান এবং ইবাদত ও বৈষয়িক লেনদেনের খুঁটিনাটি সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদিস খবরে ওয়াহেদেরই পর্যায়ভুক্ত, খবরে মুতাওয়াতির নয়। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কার্যকলাপ, গ্রহণ ও বর্জন এসব হাদিস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং এসব হাদিসের বেশিরভাগ সম্পর্কেই একথা বলা চলে যে, এগুলোর দ্বারা কুরআনের উপর পরিবর্ধন, রহিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এর প্রতিটি হাদিসেই কুরআনের বক্তব্যের কিছুনা কিছু রদবদল বা সংযোজনমূলক কথা বলা হয়েছে, চাই তা নিছক ব্যাখ্যাসম্বলিত হোক, কোনো বিধির আওতা নির্দিষ্ট বা সংকুচিত করার লক্ষ্যে উচ্চারিত হোক অথবা উসুলে ফেকাহ বিশারদদের ভাষায় তা অন্য কোনো বিশেষ নামে পরিচিত হোক আর না হোক, এ কথা তো সত্য যে, হাদিসে হুবহু কুরআনের আয়াত পুনরুচ্চারিত হয়নি। এতো সব হাদিসের অনুসরণে কাজ করা যদি জায়েয না হয়, তাহলে আমাদের হাতে আর কয়টা মুতাওয়াতির হাদিস অবশিষ্ট থাকবে, যার অনুকরণ ও অনুসরণ জায়েয হবে বা বাধ্যতামূলক হবে?

মোটকথা, দু'তিনটি হাদিস নয়, মোজা বা জারাবের উপর মসেহ করার বৈধতা নিরুপণকারী হাদিস যদি মাত্র একটা করেও থাকে এবং তা সনদের দিক থেকে নির্ভুল হয়, আর এই মসেহকে নিষিদ্ধকারী অপর কোনো হাদিস না থাকে, তা হলেও আমার মতে চামড়ার মোজার মতো কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করাও জায়েয হবে।

'আল বালাগ' সম্পাদক লিখেছেন, কাপড়ের মোজার উপর মসেহ বৈধ অভিহিতকারী হাদিস মাত্র তিনটি এবং তিনটিই যয়ীফ। এর একটি হযরত বিলাল থেকে, একটি হযরত আবু মূসা থেকে এবং একটি হযরত মুগীরা থেকে বর্ণিত। হযরত বিলাল এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত হাদিস দুটো সম্পর্কে

উসমানী সাহেবও বলেন, হাফেয জায়লায়ী উভয় হাদিসকে সনদের দিক থেকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এখন দেখা যাক, ইমাম জায়লায়ী স্বীয় গ্রন্থ 'নাসকুর রায়া'তে কি বলেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

বুঝা গেলো বিলাল থেকে দু'টি সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সা. চামড়ার মোজার উপরও মসেহ করতেন, কাপড়ের মোজার উপরও মসেহ করতেন। এখানে 'খুফ' এবং 'জাওরাব' শব্দ দু'টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা যে শর্তহীন ও কোনো গুণ বা অবস্থার ভেদাভেদ করা হয়নি তাও পরিস্ফুট। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, চামড়ার কিংবা সুতি পশমি কাপড়ের তৈরি সব রকমের মোজার উপর মসেহ করা যায়। এই দুটি হাদিসের মধ্যে প্রথমটির সনদ নিয়ে হাফেয জায়লায়ী কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। শুধুমাত্র দ্বিতীয় হাদিসের দু'জন বর্ণনাকারী বা রাবী সম্পর্কে লিখেছেন :

"ইয়াযীদ ইবনে আবু জিয়াদ ও ইবনে লায়লাকে দুর্বল মনে করা হয়। তবে তাদের সম্পর্কে সত্যবাদী হওয়ার ধারণাই প্রবল। অর্থাৎ তারা মিথ্যা বা ভুল বর্ণনাকারী ছিলেন না।"

ইয়াযীদ ইবনে আবু জিয়াদ নামে একাধিক রাবী রয়েছেন। কাজেই তাদের সম্পর্কে ঝটপট কিছু বলা কঠিন। তবে আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লাকে হাদিস শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশ বিশ্বস্ত বলে রায় দিয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। স্বয়ং জায়লায়ী উভয় রাবী সম্পর্কে সতর্কতার সাথে মন্তব্য করেছেন এবং সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, তাদেরকে সত্যভাষী মনে করা হয়। সুতরাং হযরত বিলাল বর্ণিত হাদিসকে একেবারেই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দেয়া উসমানী সাহেবের সম্পূর্ণ ভুল।

এরপর হযরত আবু মূসা আশয়ারীর বর্ণিত হাদিসটির প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সম্পর্কেও 'আল বালাগ' সম্পাদক শুধু একথা লিখেই দায় সেরে ফেলেছেন যে, হাফেয জায়লায়ী এ হাদিসের সনদকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদও বলেছেন যে, এর সনদ ধারাবাহিক নয় এবং দুর্বল। কিন্তু কি কারণে এ হাদিসের সনদ ধারাবাহিক এবং সবল নয়, তা ইমাম আবু দাউদ বিশদভাবে বলেননি। অবশ্য অন্যান্য হাদিসবেত্তাগণ এর কারণ দেখিয়েছেন এই যে, এর সনদে দিহাক নামে এক বর্ণনাকারী (রাবী) রয়েছে যিনি সাহাবি হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে সরাসরি এই হাদিস শুনেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। আর অপর রাবী ঈসা বিন সিনান দুর্বল। কিন্তু এই দুটো কথাই তথ্যগতভাবে সঠিক নয়। হাফেয ইবনে হাজারের মতে দিহাক সরাসরি হযরত আবু মূসা থেকে হাদিসটি শুনেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। স্বীয় গ্রন্থ 'তাহজীবুত তাজীবে' তিনি মিহাক বিন আব্দুর রহমান সম্পর্কে বলেন :

"দিহাক নিজের পিতা এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী।"

খ্যাতনামা হানাফি মনীষী হাফেয আলাউদ্দীন মারদিনী স্বীয় গ্রন্থ 'আল জাওয়ারুন্নাকী'তে মোজার উপর মসেহ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি এই হাদিসের বর্ণনাকারী যাহহাক যে হযরত আবু মূসা থেকে সরাসরি হাদিস শুনেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য হাফেয আবুল কামালের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেন :

"যাহহাক হযরত আবু মূসা থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন।"

দ্বিতীয় রাবী ঈসা বিন সিনানকে যদিও কোনো কোনো হাদিসবেত্তা অমিতভাষী বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু তাকে তাঁরা সত্যভাষী ও বলেছেন। ইবনে হাব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত রাবীদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। সহীহ বুখারিতে তাঁর বর্ণিত হাদিস গৃহীত হয়েছে। ইমাম মারদিনীও উল্লেখিত ক্ষেত্রে হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে তার হাদিস শ্রবণ প্রত্যয়ন করেছেন। ইমাম যাহাবী স্বীয় গ্রন্থ আলমীযানে বলেন যে, কেউ কেউ তাকে বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। তাছাড়া হযরত আবু মূসাই শুধু নন, হযরত মুগীরা থেকেও একই বক্তব্য সম্বলিত হাদিস আবু দাউদ শরিফে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ইমাম আবু দাউদ এতে কোনো খুঁত ধরেননি। হযরত আবু মূসা থেকে বর্ণিত হয়ে এ হাদিস ইবনে মাজা, মুজামে তাবরানী, এবং ইমাম তাহাবীর শরহে আসার গ্রন্থেও শোভা পেয়েছে। কাজেই এ হাদিস কোনোমতেই মধ্যম ধরণের বিশুদ্ধ হাদিসের চেয়ে নিম্নমানের নয়। একাধিক হাদিস বিশারদের মতে এটিকে দুর্বল মনে করার কোনো কারণ নেই।

হযরত বিলাল ও আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত হাদিসকে প্রত্যাখ্যান ও অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করার পর উসমানী সাহেব লিখেছেন : "এখন শুধু হযরত মুগীরা বিন শু'বার হাদিসটিই অবশিষ্ট থাকছে। এর অবস্থাও এই যে, ইমাম তিরমিযী এ হাদিসকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত বললেও অন্যান্য বড় বড় হাদিস বিশারদগণ ইমাম তিরমিযীর উক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন।" কাপড়ের মোজার উপর মসেহ বৈধ প্রতিপন্নকারী হাদিস একটাই অবশিষ্ট রইলো, না আরো হাদিস রয়েছে, সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পরে আলোচনা করবো। তবে যদি ধরেও নিই যে, আর কোনো হাদিস এমন নেই, তাহলেও উসমানী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি বড়ই বিস্ময়কর লাগে। কেননা আবু দাউদ শরিফে কাপড়ের মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে সর্বপ্রথম হযরত মুগীরার যে হাদিসটি নিয়মমাফিক উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি সম্পর্কে যে ইমাম আবু দাউদ নিজে কোনোই আপত্তি তোলেননি, বরঞ্চ আরো নয় জন সাহাবি কর্তৃক কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করার তথ্য তুলে ধরেছেন, উসমানী সাহেব সে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনা এরূপ :

مسح على الجوربين على بن ابى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابوا امامة وسهل بن سعد وعمروا بن حريث وروى ذلك عمر بن الخطاب وابن عباس رضى الله عنهم -

"ইমাম আবু দাউদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, উপরোক্ত নয় জন সাহাবি কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করেছেন। অথচ এ বিবরণটা উসমানী সাহেব একেবারেই এড়িয়ে গেলেন। তবে কেবল আবু দাউদের এই উক্তি তুলে ধরলেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এ হাদিস বর্ণনা করতেন না। কারণ হযরত মুগীরা থেকে বর্ণিত যেসব হাদিস সমধিক পরিচিত, তা চামড়ার মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত। প্রশ্ন এই যে, ইবনে মাহদী যদি কোনো হাদিস বর্ণনা করতে দ্বিধান্বিত হয়ে থাকেন, তাহলে শুধু এই কারণে সে হাদিস অন্য সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় কিভাবে? অন্যান্য হাদিস বিশারদগণ ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণ তো কাপড়ের মোজার উপর মসেহ বৈধ প্রতিপন্নকারী একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন।"

সমগ্র হাদিস ভাণ্ডারে একটি হাদিসও এমন নেই, যাতে রসূল সা. শুধুমাত্র চামড়ার মোজার উপরই মসেহ করেছেন এবং চামড়া ছাড়া আর কোনো মোজার উপরে কখনো মসেহ করেননি বলা হয়েছে। এমন হাদিসও নেই, যাতে রসূল সা. ঘোষণা করেছেন যে, শুধুমাত্র চামড়ার মোজার উপর মসেহ করা জায়েয, কাপড়ের বা অন্য কোনো জিনিসের তৈরি মোজার উপর জায়েয নয়, অথবা অমুক অমুক শর্ত সাপেক্ষে বা অমুক অমুক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মোজার উপর মসেহ করা চলবে, যা কিনা অমুক গুণবৈশিষ্ট্যের দরুন চামড়ার মোজার সমপর্যায়ে পৌঁছে যায়। হযরত মুগীরা থেকে যদি উক্ত সংখ্যক হাদিসও চামড়ার মোজার উপর মাসাহের সপক্ষে এবং একটিমাত্র হাদিস কাপড়ের মোজার উপর মাসাহের সপক্ষে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলেও উভয় প্রকারের হাদিসের মধ্যে বিরোধ ও বৈপরিত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে না। যদি একই সফর ও একই নামাযের ব্যাপারে দুই ধরণের হাদিস বর্ণিত হতো, যার একটিতে চামড়ার মোজা এবং অপরটিতে কাপড়ের মোজার উল্লেখ থাকতো, তাহলেই বিরোধ ও বৈপরিত্য দেখা দিতে পারতো। একথা সবার জানা যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের নামাযের নিয়মবিধি, দোয়া, রুকু ও সিজদা ইত্যাদির খুঁটিনাটি নিয়ে বিভিন্ন হাদিস বিভিন্ন রকমের বিবরণ এসেছে এবং সেগুলোকে পরস্পর বিরোধী মনে করা হয়নি, বরং এক এক সময় এক এক রকমের প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে হযরত মুগীরা ও অন্যান্য সাহাবি থেকে চামড়ার মোজা ও সুতি পশমি মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকেও আলাদা আলাদা ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, তার কি কারণ থাকতে পারে? সফরে মোজার উপর মাসাহের ঘটনার চেয়ে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের ঘটনা তো অনেক বেশি বিরল।

উসমানী সাহেব সুতি পশমি কাপড়ের মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হরত মুগীরার হাদিস সম্পর্কে লিখেছেন :

"এই হাদিসের সনদে আবু কায়েস ও হোযায়েল বিন শুরাহবীল নামক দু'জন বর্ণনাকারী থাকার কারণে একাধিক হাদিসবেত্তা এটিকে দুর্বল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন।" উসমানী সাহেবের এ বক্তব্যের পরিপূর্ণ সন্তোষজনক ও নির্ভুল জবাব হাফেয আলাউদ্দিন মারদিনী স্বীয় গ্রন্থ আল জাউহারুন্নাক্কী'তে দিয়েছেন। সুবিজ্ঞ এই হানাফি ফকীহ মুহাদ্দিসের পরিচয় ইতিপূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে। কাপড়ের মোজার উপর মাসাহের বৈধতার পক্ষে হযরত মুগীরার বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেন :

"ইমাম আবু দাউদ এ হাদিসটি সংগ্রহ করেছেন এবং এতে তিনি কোনো আপত্তি তোলেননি। ইবনে হাম্বানের মতে এ হাদিস বিশুদ্ধ এবং তিরমিযীর মতে মোটামুটি ভালো। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু কায়েস আব্দুর রহমান বিন মারওয়ানকে প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ ইবনে মুঈন নির্ভরযোগ্য রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আজালীও এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি হুযায়েলকেও নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম বুখারিও এই উভয় রাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এঁরা দু'জন এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি, যা অন্যান্য রাবীর বর্ণনার বিরোধী বা বিপরীত। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন সনদের মাধ্যমে কিছু বাড়তি বক্তব্য সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কোনো হাদিসের বিপরীত নয়। বস্তুত চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজা সংক্রান্ত হাদিস দু'টোকে পৃথক পৃথক হাদিস হিসেবে গণ্য করতে হবে। কাজেই জাওরাব তথা কাপড়ের মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসটি সম্পূর্ণ শুদ্ধ তথা সহীহ ও প্রামাণ্য হাদিস। ইতিপূর্বেও আমরা এ কথা একবার বলে এসেছি।"

হাফেজ ইবনে হাজর, আবু কায়েস, আব্দুর রহমান মারওয়ানকে সত্যবাদী এবং হুযায়েল ইবনে শুরাহবীলকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে হুযায়েল সম্পর্কে যতো জন হাদিস বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তারা সকলে হুযায়েলকে সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং কেউ সামান্যতম খুঁতও ধরেননি। এর পরে উসমানী সাহেবের এ কথা বলা যে, এই রাবী দুর্বল, একথা কতোখানি গুরুত্ব রাখে, তা যে কেউ বুঝে নিতে পারে। উসমানী সাহেব 'নাসবুর রায়া' গ্রন্থে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যতোটুকু পেয়েছেন সেটুকু তো উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, কিন্তু গ্রন্থকার ইমাম জায়লায়ী নিজের শিক্ষক শেখ তাক্বিউদ্দীন ইসকান্দারীর যে অভিমত উপসংহারে উদ্ধৃত করেছেন, সেটা এড়িয়ে গেছেন। সেই অভিমতটি হলো :

"শেখ তাক্বিউদ্দীন বলেন : যে সকল মনীষী হযরত মুগীরা থেকে বর্ণিত কাপড়ের মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন, তারা বিশ্বাস

করেন যে, প্রথমত আবু কায়েস একজন সত্যনিষ্ঠ বর্ণনাকারী, তাছাড়া আবু কায়েসের বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যে অন্যদের বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যের সাথে যে বিভিন্নতা পাওয়া যায়, সেটা বিরোধ ও বৈপরিত্যের পর্যায়ের নয়, বরং আবু কায়েসের বর্ণনায় অন্যদের বর্ণনার চেয়ে একটা অতিরিক্ত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত হযরত মুগীরা থেকে হুযায়েল যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তার সনদ যখন স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সুপরিচিত হাদিসের সনদের সাথে তা যুক্ত হয়নি, (তখন তো এটিকে অন্যান্য হাদিসের সাথে তুলনা করারই প্রশ্ন ওঠেনা)।" *[নসবুর রায়া : ১ম খণ্ড : মজলিসু ইলমী পরিচ্ছেদ : পৃ. ১৮০]*

এ থেকে বুঝা গেলো, হযরত মুগীরা বর্ণিত কাপড়ের মোজা তথা 'জারাবের' উপর মসেহ করা সংক্রান্ত হাদিসটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিশুদ্ধ হাদিস এবং চামড়ার মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসের সাথে তা বিরোধপূর্ণ নয়। মিশকাত শরিফের টীকা মিরকাতে মুগীরা রা. বর্ণিত কাপড়ের মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মোল্লা আলী ক্বারী বলেন :

"প্রাচীন মনীষীদের একটি দল কাপড়ের মোজার উপর মসেহ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আর ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক বিন রাহওইয়াসহ শহরাঞ্চলীয় ফেকাহবিদদের একাংশও এই মত সমর্থন করেন। তবে ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম শাফেয়ি এ কাজ বৈধ মনে করেননা। হযরত মুগীরা বর্ণিত এ হাদিস মুনসাদে আহমদ ও তিরমিযী শরিফে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম তিরমিযির মতে এ হাদিস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। তিরমিযীর অভিমতকে কেউ কেউ এই বলে খণ্ডন করেছেন যে, মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত চামড়ার মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসটিই সমধিত পরিচিত। তবে এর জবাবে বলা হয়েছে, মুগীরা তাঁর হাদিস বর্ণনায় উভয় শব্দই (জাওরাবইন ও খুফফাইন অর্থাৎ কাপড়ের মোজা ও চামড়ার মোজা) প্রয়োগ করে থাকতে পারেন। এমনটি যে তিনি করতে পারেননা, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া কাপড়ের মোজায় মসেহ করার বৈধতার পক্ষে সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব অনুশীলন থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হযরত আলী এবং ইবনে মাসউদ. আবু উমামা, সাহল বিন সা'দ, আমর বিন হুরায়েস, হযরত ওমর এবং ইবনে আব্বাস কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করেছেন। এই বৈধতা এমন কোনো শর্তসাপেক্ষও নয় যে, ঐ কাপড়ের মোজার উপরে ও নিচে, অথবা শুধু নিচে চামড়া মোড়ানো থাকতে হবে, কিংবা তা পায়ের ঘোড়ার সাথে লেপ্টে থাকার মতো মোটা হতে হবে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে এই শর্ত প্রযোজ্য। ইমাম আবু হানিফার সর্বশেষ রায়ও এই শর্ত আরোপের পক্ষে এবং তদনুসারেই ফতোয়া চালু হয়েছে।" *[মিরকাত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮, এম দাদিয়া প্রকাশনী, মুলতান)*।

এটা ইমাম আলী ক্বারীর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার নিদর্শন হলো, তিনি স্বীয় অনুসৃত হানাফি মতামতের মধ্যে যে মতটি ফতোয়ার আকারে বাস্তবে চালু রয়েছে, তাও অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তার আগে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ বিষয়টি প্রাচীন ইমামগণ ও মুসলিম ফেকাহবিদদের মধ্যে বিতর্কিত। উভয় মতের সপক্ষে হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করার জন্য হানাফি ইমামগণ যে শর্ত ও কড়াকড়ি আরোপ করেছেন, হাদিস ও সাহাবাদের দৃষ্টান্তে তার কোনো উল্লেখ নেই, বরঞ্চ হাদিস ও সাহাবাদের দৃষ্টান্তে শর্তহীন বৈধতাই প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে আল বালাগ সম্পাদকের বক্তব্য এই যে, হাদিস ও সাহাবাদের দৃষ্টান্ত পাতলা মোজার কথা বলা হয়নি। অথচ সেখানে পাতলা বা মোটা কোনোটার কথাই বলা হয়নি। অনেকে কাপড়ের মোজার উপর চামড়ার পাতলা পায়তাবা তৈরি করে পরে থাকেন এবং তার উপর মসেহ করে থাকেন। এদের মধ্যে শরিয়তের অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই পাতলা চামড়ার উপর মসেহ করা গেলে সরাসরি কাপড়ের মোজার উপর মসেহ করা যাবে না কেন? চামড়া পাতলা হোক বা মোটা হোক তা চামড়াই। তদ্রুপ কাপড়ের মোজা পাতলা হোক বা মোটা হোক তা কাপড়ের মোজা ছাড়া আর কিছু নয়। উভয়ের উদ্দেশ্য একটাই এবং তা হলো পা ঢাকা। উভয়ের মধ্যে কোনো কার্যকর পার্থক্য নেই। *[তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৭৭]*

২২. কারো সম্মানে দাঁড়ানো কি জায়েয?

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি লিখেছেন : "ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচরাচর শিক্ষকের জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজ রয়েছে। এ প্রথাটি নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। মিশকাত শরিফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. স্বয়ং সম্মানার্থে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছেন। হযরত ফাতেমার জন্য তিনি যে দাঁড়াতেন তার প্রমাণ রয়েছে। অপরদিকে তিরমিযী শরিফে বর্ণিত সহীহ হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, সাহাবাগণ রসূল সা.-এর জন্য দাঁড়াতেন না। হযরত মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদিসে কারো জন্য দাঁড়ালে জাহান্নামে যেতে হবে বলে সাবধান করা হয়েছে। হযরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিসে এটিকে অনৈসলামিক কাজ আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারো কারো ধারণা, হযরত সা'দের আগমনে রসূল সা. সাহাবাগণকে উঠে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে যে কথাটি বলেছিলেন, তা قوموا الى سيدكم 'তোমাদের নেতার জন্য উঠে দাঁড়াও' নয় বরং তিনি বলেছিলেন قوموا الى سيدكم 'তোমরা তোমাদের নেতার কাছে উঠে যাও।' কেননা হযরত সা'দ অসুস্থতার জন্য একাকী সওয়ারি জন্তুর পিঠ থেকে নামতে অক্ষম ছিলেন, তাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ

দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমস্যাটা শুধু মাদরাসার নয় বরং দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই এর সম্মুখিন হতে হয়। তাই এ প্রথাটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন এবং এ সংক্রান্ত ইসলামি বিধির আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য কি, তা সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত করলে বারবার এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিতর্কের উদ্ভব ঘটবেনা।"

জবাব : এ সমস্যাটা নিয়ে আমাদের এখানে মাঝে মধ্যেই কিছু প্রশ্ন এসে থাকে। আলোচ্য প্রশ্নটিও তারই একটি। তাই প্রশ্নটিকে হুবহু তুলে দিয়ে তার বিশদ ও তথ্যনির্ভর জবাব দেয়া হচ্ছে।

প্রাচীন ইমামদের মধ্যে 'কিয়াম' তথা সম্মানসূচক দাঁড়ানো নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ এটিকে বৈধ মনে করেন। আবার কেউ কেউ এটি সর্বোতভাবে অবৈধ বলে রায় দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ এ কাজ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৈধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবৈধ মনে করেন। প্রত্যেক মতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণাদি রয়েছে। এগুলো প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। নচেৎ এগুলোর ব্যাপারে তুলনামূলক-ভাবে পর্যালোচনা চালানো সম্ভব নয়।

যারা একে বৈধ মনে করেন তারা এর সপক্ষে একাধিক হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকেন। তন্মধ্যে বুখারি, মুসলিম ও অন্য কতিপয় হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদিস প্রশ্নকর্তা স্বীয় প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে, বনু কুরায়যা গোত্রের ইহুদীরা পরাজিত হয়ে যাওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মায়াযকে শালিস মেনেছিল। সে মতে রসূল সা. তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হযরত সা'দ যখন একটা সওয়ারী জন্তুর আরোহী হয়ে তাঁর দরবারে এলেন, তখন রসূল সা. সমবেত সাহাবামণ্ডলীকে বললেন قوموا لسيدكم 'ওঠো, তোমাদের নেতার কাছে যাও।'

আবু দাউদ ও অন্য কয়েকটি হাদিস গ্রন্থ থেকে এও জানা যায় যে, রসূল সা. স্বীয় ধাত্রীমাতা ও তার স্বামীকে চাঁদর বিছিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং দুধভ্রাতাকে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানান ও তারপর কাছে বসান।

অনুরূপভাবে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে এই মর্মে একাধিক হাদিস বর্ণিত আছে যে, রসূল সা. যখন হযরত ফাতিমার কাছে যেতেন, তখন ফাতিমা দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে চুমু খেতেন এবং তাঁকে সাদরে বসাতেন। অনুরূপভাবে হযরত ফাতিমা এলে রসূল সা. ও তদ্রুপ করতেন।

হযরত ইকরামা রা. সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর তিনি এতো দিশেহারা হয়ে পড়লেন যে, দেশ ছেড়ে পালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে উপনীত হন এবং একটি নৌকায় চড়ে বসেন। সহসা নৌকাটি

দুর্যোগের কবলে পড়লে যাত্রীদের একজন দেবতাদের সাহায্য কামনা করতে বলে। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা বললো : "এমন কঠিন বিপদে দেবতাদের দ্বারা কাজ হবেনা। তোমরা সবাই শুধু আল্লাহকে ডাকো।" এ কথাটা ইকরামার অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল হলো, তিনি ভাবলেন, তাহলে তো মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মই সত্য। তিনি অন্য একটি নৌকায় চড়ে ফিরে গিয়ে রসূল সা.-এর দরবারে হাজির হলেন, এ সময়ে রসূল সা. তাঁকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ান।

হযরত আদী বিন হাতেমকে স্বাগত জানাতেও অনুরূপভাবে রসূল সা.-এর উঠে দাঁড়ানোর উল্লেখ হাদিসে রয়েছে। এ ধরণের দাঁড়ানোকে বৈধ প্রতিপন্ন করে এমন সকল হাদিস এখানে উল্লেখ করতে চাইনা। নচেত এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদিস ও সাহাবাদের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, বায়হাকীতে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসূল সা. মসজিদ থেকে ফিরে এলে সাহাবিগণ তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন।

অনুরূপভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক ও তাঁর দুই সাথি আলস্যবশত যুদ্ধে যাননি। তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার পর হযরত কা'ব রসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে উপস্থিত জনৈক সাহাবি তাকে স্বাগত জানাতে ও খোশ আমদেদ বলতে উঠে দাঁড়ান। হযরত কা'বের কাছে এই সাহাবির দাঁড়ানোর এতো বড় মহানুভবতা মনে হয়েছিল যে, তিনি তা কোনো দিন ভুলতে পারেননি এবং তাঁর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। মোটকথা সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বৈধতা প্রতিপন্ন করে এমন হাদিস অনেক রয়েছে।

যারা এই দাঁড়ানোকে অবৈধ কিংবা মাকরূহ মনে করেন, তারাও অন্য কয়েকটি হাদিস দ্বারা তাদের মতের যথার্থতা প্রমাণ করে থাকেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

সুনানে ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদে আছে যে, রসূল সা. লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে সাহাবিগণ তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হন। তখন রসূল সা. বলেন "এভাবে একে অপরকে স্বাগত জানাতে দাঁড়ানো আজমীদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) রীতি, তোমরা এভাবে দাঁড়াবে না।"

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আরো একটি হাদিসে রয়েছে যে, রসূল সা. বলেছেন :

من احب ان يتمثل له الرجال وجبت له النار

"যে ব্যক্তি কামনা করে যে লোকেরা তার জন্য দণ্ডায়মান হোক, তার জন্য দোযখ অনিবার্য।"

হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস তিরমিযী শরিফে রয়েছে যে, "সাহাবিদের কাছে রসূল সা.-এর চেয়ে প্রিয় কোনো ব্যক্তি ছিলনা। কিন্তু তারা রসূল সা.-কে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তিনি যে এটা পছন্দ করেননা তা তাঁরা জানতেন।"

হযরত আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও ইবনে সাফওয়ানের সামনে আবির্ভূত হলে তাঁরা উভয়ে অথবা তাঁদের একজন দাঁড়িয়ে যান। মুয়াবিয়া বললেন : বসে যান আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি :

من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعدو من النار –

"যে ব্যক্তি তাকে দেখে লোকেরা দাঁড়ালে খুশি হয়, সে যেনো দোজখে তার আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেয়।"

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সা. রোম পারস্যবাসির আপন সম্রাটদের দেখে দাঁড়ানোর প্রথা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনকে যারা অবৈধ মনে করেন, তারা উল্লেখিত হাদিসগুলোকে তো নিজেদের মতের সপক্ষে উপস্থাপিত করেনই, অধিকন্তু দাঁড়ানোকে বৈধ প্রতিপন্নকারি হাদিসগুলোর এমন ব্যাখ্যা দেন যার ফলে বৈধতা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত সা'দ বিন মায়ায সংক্রান্ত হাদিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো, খন্দক যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে হযরত সা'দের কারো সহায়তা ছাড়া একা একা সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে নামার সামর্থ ছিলনা। তাই রসূল সা. সাহাবিদেরকে বলেন, তারা যেনো উঠে গিয়ে তাঁকে নামিয়ে আনেন। এ জন্যেই রসূল সা. قوموا لسيدكم (তোমাদের নেতার জন্যে উঠে দাঁড়াও) না বলে قوموا الى سيدكم(ওঠো, তোমাদের নেতার কাছে যাও) বলেন। এর দ্বারা তার সম্মানার্থে বা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়াতে বলা বুঝায়না বরং সওয়ারি থেকে নামতে তাকে সাহায্য করতে বলা বুঝায়। কেউ কেউ দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য উদঘাটন করেন। যেমন তাঁরা বলে থাকেন যে, দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য যদি হয় মমত্ব ও সৌজন্য প্রকাশ করা তাহলে তা জায়েয, আর যদি তা হয় অগন্তুকের বড়ত্ব জাহির করার জন্য তবে তা নাজায়েয। কেউ কেউ বলেন, বসার জন্য জায়গা করে দেয়া ও প্রশস্ততা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ। কেউ কেউ মনে করেন, সেবা কিংবা মনসন্তুষ্টির জন্য একান্ত জরুরি মনে হলে দাঁড়ানো বৈধ। নচেত তা অবৈধ।

উপরে যা কিছু উল্লেখ করা হলো, মোটামুটিভাবে এগুলোই দাঁড়ানোর বৈধতা ও অবৈধতার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হলো, প্রকৃত ব্যাপার কি? ইসলামের নীতি নির্ধারক রসূল সা.-এর মহান বাণী ও মহৎ দৃষ্টান্তসমূহের আসল প্রতিপাদ্য বিষয় কি? একজন মানুষের জন্য আর একজন মানুষের দাঁড়ানোটাকে কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন বা বৈধ করেছেন? না কি, (নাউজুবিল্লাহ) তার কথা ও কাজে এমন কোনো স্ববিরোধিতা রয়েছে, যার সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব?

এর জবাব এই যে, আসলে এ বিষয়ে যেসব হাদিস ও বাস্তব দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাতে আদৌ কোনো বিরোধ ও অসমাঞ্জস্য নেই। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রও প্রেক্ষাপট রয়েছে, যার উপর পৃথক পৃথক বিধি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কোনো অবস্থাতেই দাঁড়ানো চলবেনা। কিংবা সর্বাবস্থায় দাঁড়ানো বৈধ এ ধরণের রায় দেয়াতে চরমপন্থী মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। শরিয়তের দাবি এই উভয় চরম বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সব ক'টি হাদিস যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কারো জন্য মানুষের দাঁড়ানো যদি তার দাপট ও ক্ষমতা মদোন্মত্ততার প্রতীক হয় এবং সেই ব্যক্তি নিজেও কামনা করে যে, লোকেরা তার জন্য দাঁড়াক, তাহলে সে ক্ষেত্রে এ কাজটি হবে নিষিদ্ধ ও অবাঞ্ছিত। অনুরূপভাবে এ কাজটি যদি একপক্ষের তোষামোদী ও নতজানু মনোভাবের পরিচায়ক হয় এবং অপরপক্ষের ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ধারক হয়, তাহলেও উভয় পক্ষের জন্য এ কাজ নিন্দনীয়ও অসমীচীন হবে। কিন্তু এছাড়া অন্য যেসব ক্ষেত্রে দাঁড়ানো হয়, তাকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে রায় দেয়ার সপেক্ষ কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ ও যুক্তি দেখানো সম্ভব নয়। সেই সকল ক্ষেত্রে দাঁড়ানোকে বৈধ বলা যেতে পারে। এমনকি যে ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো হয়, সে যদি ইসলামি মানদণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এর উপযুক্ত হয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই দাঁড়ানো প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছিত কাজ বলে গণ্য হবে। এটা একটা ভারসাম্যপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য নীতি। একাধিক ইমাম ও ফকীহ্ এই নীতি অবলম্বন করেছেন। আবু দাউদের টীকা গ্রন্থ "মায়ালিমুস সুনানে" ইমাম খাত্তাবী র. বলেন :

"একজন জ্ঞানীগুণী নেতা ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্য তার অনুসারী ও অনুগতদের দাঁড়ানো এবং একজন ইসলামি বিদ্বানের জন্য শিক্ষার্থীর দাঁড়ানো মাকরূহ নয় বরং মুস্তাহাব। এ কাজ মাকরূহ কেবল সেই ব্যক্তির বেলায়, যার মধ্যে এসব গুণগরিমা ও বৈশিষ্ট অনুপস্থিত।"

আবু দাউদের সংক্ষিপ্তসার টীকায় হাফেজ মুনযিরী ইমাম খাত্তাবীর এই উক্তিটি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন যে, অহংকার ও ঔদ্বত্যের বসে জনগণকে দাঁড়ানোর আদেশ দেয়া এবং এটাকে তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া অবৈধ। অন্যথায় অধিকাংশ শরিয়ত বিশেষজ্ঞের মতে ন্যায়পরায়ণ লোকদের জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। ইমাম বুখারি ও ইমাম নববীর অভিমতও অনুরূপ। এমনকি ইমাম নববী দাঁড়ানোকে বৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একখানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। হানাফি ফেকাহবেত্তাদেরও অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয।

যেসব হাদিসে দাঁড়ানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তার অধিকাংশই দাঁড়ানোর এমন সব অন্তর্নিহিত দোষ, বাহ্যিক আকৃতি ও ভঙ্গিমার উল্লেখ রয়েছে, যার দরুণ ঐ কাজ সত্যিই আপত্তিকর ও অননুমোদনযোগ্য হয়ে পড়ে। এই সব দোষের

মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, মানুষের মধ্যে মানসিক গোলামী ও হীনমন্যতা সৃষ্টির প্রয়াস, নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার মানসিকতা এবং নিজের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভৃত্বের জোয়াল চাপিয়ে দেয়ার কুমতলবে এই প্রথাকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু রাখার প্রবণতা। এক প্রতাপশালী ব্যক্তি ক্ষমতার মসনদে আসীন থাকবেন, আর সকলে তার সামনে হাত জোড় করে, নতজানু হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে–এ ভাবধারাটা নি:সন্দেহে দাসত্বের পর্যায়ে পড়ে এবং "এক আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্য করা" বলে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার পরিপন্থী। এ জন্যই হাদিসে যে ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও তার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে,

من احب ان يستجم له الرجال صفوفا

"যে ব্যক্তি কামনা করে যে জনগণ তার জন্য দলবদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকুক।"

কোনো কোনা হাদিসে يستخم এর পরিবর্তে يستجم এর صفوفا এর পরিবর্তে صفونا শব্দ এসেছে। এরও অর্থ এই যে, লোকেরা তার জন্য দাঁড়াতে দাঁড়াতে অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং তাদের পা ক্লান্ত হয়ে যায়, যার দরুন তারা পশুর মতো এক পা উঠিয়ে ক্লান্তি দুর করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে যে, من سره ان يتمثل له ارجال قيام অর্থাৎ লোকেরা তার সামনে মূর্তির মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

যারা হযরত সা'দ বিন মায়ায সংক্রান্ত হাদিসের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, রসূল সা. শুধু তাকে সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এজন্য قوموا له এবং قومو اليه এর শাব্দিক হেরফেরকে ভিত্তি করে যুক্তি দাঁড় করেছেন, তাদের যুক্তি তেমন বলিষ্ঠ নয়। ধরে নিলাম যে, হযরত সা'দ যুদ্ধাহত ও অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি তো মদিনা থেকে বনু কুরায়যার এলাকা পর্যন্ত গাধার পিঠে আরোহণ করে পৌছে গিয়েছিলেন। গাধার পিঠ থেকে নামা তার জন্য বোধ হয় এতো অসাধ্য ছিলনা যে, তার জন্য লোকদের সহায়তা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। অত:পর তিনি যখন সামনের দিক থেকে আগমন করলেন তখন, রসূল সা. তাঁকে নাম ধরে ডাকার পরিবর্তে سيدكم (তোমাদের নেতা) বা خيركم (তোমাদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তি) শব্দ বা উপাধি ব্যবহার করলেন। এ দ্বারা তিনি অত্যন্ত জোরালো ইঙ্গিত দিয়ে সাহাবিগণকে বলতে চেয়েছিলেন, ইনি তোমাদের একজন অতীব সম্মানিত ও মর্যাদাবান নেতা যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে সালিশ ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে আসছেন। তাই তোমরা এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাও বরণ করে নাও, যাতে ইহুদীরা এরূপ ধারণা করার সুযোগ না পায় যে, তোমরা মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মর্যাদা দাওনা। এ ঘটনা সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনায় রসূল সা.-এর উক্তি انزلوا (নামিয়ে আনো)

উদ্ধৃত হয়েছে। আর যথারীতি কোনো কোনো টীকাকার এর এরূপ মর্মই গ্রহণ করেছেন যে, "সা'দ বিন মায়াযকে ধরে সওয়ারী থেকে নামাও।"
অথচ এ শব্দটিরও বিশুদ্ধতর তাৎপর্য সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা জানানো। অন্য একটি হাদিসে আছে انزلوا الناس منازلهم "লোকদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নাও।" এ হাদিসটিও উল্লেখিত ব্যাখ্যার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে।
قوموا له এবং قوموا عليه শব্দদ্বয়ের অর্থে যে তারতম্য করা হয়েছে, অভিধানের বিচারে সেটাও ধরাবাধা ও অপরিহার্য কোনো ব্যাপার নয়। قام الى প্রবচনটি শুধু কোনো বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা বা তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া অর্থেই ব্যবহৃত হয় তা নয়। বরঞ্চ নিছক প্রীতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ কিংবা স্বাগত অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়ানো বা এগিয়ে যাওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত অর্থে قام له প্রবচনের ব্যবহার সমধিক প্রচলিত হলেও قام اليه প্রবচনটির ব্যবহারও প্রচলিত আছে। হাদিসেই এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।
তিরমিযী শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা মদিনা পৌঁছে রসূল সা.-এর কক্ষের দরজায় করাঘাত করলেন। এরপর মূল হাদিসটির বিবরণ এরূপ :

فقام اليه النبى صلى الله عليه وسلم يجرثو به فاعتنقه وقبله

"রসূল সা. তৎক্ষণাৎ নিজের চাদর টানতে টানতে উঠে তার কাছে ছুটে গেলেন, তার সাথে কোলাকুলি করলেন ও তাকে চুমু খেলেন।"

এখানে সুস্পষ্টতই সাহায্য করা বা উদ্ধার করার কোনো ব্যাপার ছিলনা, যেমনটি হযরত সা'দের বেলায় ধারণা করা হয়েছে। এখানে শুধু উচ্চ আবেগোদ্দীপ্ত অভ্যর্থনা ব্যক্ত করার জন্যই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজার উদ্ধৃত আবু উমামার বর্ণিত একটি হাদিসের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ঐ হাদিসের ভাষা এরূপ :

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا اليه

"রসূল সা. আমাদের কাছে এলো পরে আমরা তার কাছে উঠে গেলাম।"

এখানেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল সা. ও হযরত ফাতেমার পরস্পরকে দেখে উঠে দাঁড়ানো সংক্রান্ত যে হাদিস উপরে আলোচিত হয়েছে, তাতেও হযরত আয়েশার ভাষা আবু দাউদে নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে?

كانت اذا دخلت عليه قام اليها   واذا دخل عليها قامت اليه

"যখনই হযরত ফাতেমা রসূল সা.-এর কাছে যেতেন, তিনি তার জন্য উঠে দাঁড়াতেন আর যখন রসূল সা. হযরত ফাতেমার কাছে যেতেন, ফাতেমা তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন।" এখানেও উভয় স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এই উঠে দাঁড়ানোটিকে যে একান্ত স্নেহ ও ভক্তির বশেই হতো, তা বলাই বাহুল্য।"

এই বিশদ আলোচনার পর আর একটিমাত্র প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থাকে। সেটি হলো, উঠে দাঁড়ানো যদি শুধুমাত্র একপক্ষের দাসসুলভ বিনয় এবং অপর পক্ষের প্রভূসুলভ ঔদ্ধত্য ও অহংকার যেখানে বিদ্যমান সেখানেই নিষিদ্ধ হয় তাহলে, রসূল সা. নিজের বেলায় সেটা কেনো পছন্দ করেননি? তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তো এ ধরনের মনোভাব বিরাজ করার কথা কল্পনাও করা যায়না।

এ প্রশ্নের একাধিক জবাব থাকতে পারে। তবে দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর জন্য শুধু একটি জবাব দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি। সেটি হলো, সাহাবায়ে কেরামের দন্ডায়মান হওয়াকে রসূল সা. হারাম ও অবৈধ মনে করে অপছন্দ করতেননা। নিছক স্বভাবসুলভ ও অভ্যাসগতভাবে তিনি এর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু তার অসন্তোষের উদ্রেক করে এমন নগণ্যতম কাজও করতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই সচরাচর তাঁর জন্য দাঁড়াতেননা। রসূল সা.-এর ব্যক্তিগত আচরণ ও চালচলনের এমন অনেক দিক রয়েছে, যেখানে তিনি কোনো পন্থা গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। এগুলোকে তাঁর ব্যক্তিগত সহজাত গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু উম্মতের জন্য সেগুলোকে আদেশ বা নিষেধ বলে মনে করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ রসূল সা. পথ চলার সময় অন্যদের আগে থাকতে চাইতেননা। এর দ্বারা শরিয়তের কোনো বিধি প্রণীত হয়না, যদিও এতে বিনয় ও সরলতার ভাব বিদ্যমান। কাউকে দেখে দন্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারটাও তদ্রুপ। তিনি এ কথা কখনো বলেননি যে আমার জন্য দাঁড়ান হারাম বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে কিভাবে ও কোন্ মনোভাব নিয়ে তা হারাম করা যায়, সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দাঁড়ানোকে নিজের জন্য সহ্যও করেছেন এবং অপরের জন্য পছন্দও করেছেন, এমনকি উৎসাহিতও করেছেন। যাতে এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারামে পরিগণিত না হয়। আসল ব্যাপার এই যে, ইসলামে জ্ঞানীগুণী ও গুরুজনের প্রতি সম্মান, প্রবীনদের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমত্ব প্রদর্শনের যে নীতিগত ও সাধারণ বিধিমালা দেয়া হয়েছে, তার আলোকে স্বতস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে যে আদর, শ্রদ্ধা ও মমত্ব প্রকাশ করা হয়, সেটা ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। *[তরজুমানুল কুরআন, মে ১৯৬৮]*

২৩. 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করা' সংক্রান্ত কুরআনের আদেশের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা কখনো কখনো নিজেদের সমর্থনে কুরআনের আয়াত ও আল্লামা ইকবালের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ কুরআনের উক্তি قل العفو (তুমি বলে দাও, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে হয়)-এর বরাত দিচ্ছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, ক্ষমতাসীন সরকার প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সহায়সম্পদ তার কাছ থেকে

কেড়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার রাখে। অন্য কথায়, এর দ্বারা ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন বিধিসম্মত বলে প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ইকবালের দুটো কবিতাও উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। নিম্নে তার উদ্ধৃত দেয়া যাচ্ছে :

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

جو حرف قل العفو میں پوشیدہ

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار ۔

"হে মুমিন! কুরআনের মধ্যে ডুব দাও। আল্লাহ তোমাকে নবতর চরিত্রে ভূষিত করবেন। قل العفو কথাটিতে যে মর্মবাণী এ যাবত লুকিয়ে রয়েছে, হয়তো এ যুগে তা আত্মপ্রকাশ করবে।"

আল্লামা ইকবালের অপর একটি কবিতা থেকেও এক উদ্ভট যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। বলপ্রয়োগ, ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে যখন এসব অপকর্ম বর্জন করতে বলা হলো, অমনি তারা ইকবালের এই কবিতাটি আবৃত্তি করলো :

جس کھیت سے دھقان کو میسر نہ ہو روزی. اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو ۔

"যে ক্ষেত থেকে কৃষকের জীবিকা অর্জিত হয়না, তার প্রতিটি গমের শীষকে জ্বালিয়ে দাও।"

এ ধরনের যুক্তির কি জবাব দেয়া যায় ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। ফসলভরা ক্ষেতে সত্যি সত্যি আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হোক– এরূপ কামনা করা কি মরহুম আল্লামা ইকবালের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো?

জবাব : পবিত্র কুরআনের উক্তি قل العفو এবং অন্য কতিপয় আয়াতকে যেরূপ ভ্রান্ত পন্থায় কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের সমর্থনে ইদানিং ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পুরো রহস্য উদঘাটনের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। তথাপি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া হচ্ছে।

ইসলামি বিধান ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য হলো, ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের অভ্যন্তরীণ ও নৈতিক শুদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তার অন্তর আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহির চেতনা সৃষ্টি করে। যাতে সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই তা সামাজিক হোক, রাজনৈতিক হোক কিংবা অর্থনৈতিক হোক–সততা ও ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করে। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করি, তাহলে এ কথা আমাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জীবনের প্রতিটি সমস্যাই মূলত একটা নৈতিক ও চারিত্রিক সমস্যা। মানুষের চরিত্র

সংশোধন করা ছাড়া সমাজ সংস্কারে কোনো কর্মসূচিই সফল হতে পারেনা এবং দুনিয়া থেকে অনাচার ও নৈরাজ্য নির্মূল করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে চরিত্র সংশোধন এবং তার মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্লানি দূর করা এর পাশাপাশি ইসলাম আইনগত ও রাজনৈতিক কৌশলও প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু ডান্ডার জোরে মানুষের যাবতীয় সম্পত্তি নির্বিচারে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানার ছলনাময় নাম দিয়ে তা আল্লাহ কিংবা জনগণ কারোর কাছেই জবাবদিহির প্রয়োজন অনুভব করেনা এমন কয়েকজন লাগামহীন একনায়কের হাতে অর্পণ করলেই সকল সমস্যার সমাধান ও সকল অনাচার নিমূর্ল হয়ে যাবে– এই মতবাদ ইসলাম স্বীকার করেনা।

সমাজতন্ত্র যে মতবাদ পেশ করে তা এই যে, মানুষ একটা ভোগসর্বস্ব জীব, বরঞ্চ একটা ছদ্মবেশি শয়তান, যার মধ্যে কোনো নৈতিক অনুভূতি বিদ্যমান থাকে, তাকে জাগ্রত করা এবং অর্থনৈতিক সুবিচারে উদ্বুদ্ধ করার প্রশ্নই উঠেনা। জগতের যাবতীয় অনাচার ও অবিচারের একমাত্র উৎস হলো ব্যক্তি মালিকানা। ব্যক্তি মালিকানাকে আইনের জোরে ছিনিয়ে নেয়া এবং উৎপাদনের যাবতীয় উৎস ও উপকরণ শাসকদের হাতে সমর্পণ করার মাধ্যমেই এই অনাচার ও অবিচারের প্রতিকার ও প্রতিবিধান সম্ভব। কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন উঠে, যার কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব সমাজতন্ত্রীদের কাছে নেই। সে প্রশ্নটি এই যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে একত্রিত করে যেই ব্যক্তিবর্গের নিরংকুশ কর্তৃত্বে সমর্পণ করা হবে এবং গোটা জাতিকে যাদের দয়ামায়ার উপর ছেড়ে দেয়া হবে, তারা কি একেবারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক? তারা কি কোনো লাল স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে আসা ধোয়া তুলসী পাতা ফেরেশতা? আসলে তারাও তো সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দর্শন মোতাবেক হয় নিরেট পশু, না হয় আস্ত শয়তান। বরঞ্চ নির্ঘাত সম্ভাবনা রয়েছে যে, সীমাহীন সম্পদের কর্তৃত্ব পেয়ে তারা জঘন্যতম ইবলিসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তারা যদি জুলুম, অবিচার ও অধিকার হরণের কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের ঠেকাবে কে?

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের এই মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টি পথে রেখে এবার আপনি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এতে বলা হয়েছে :

ويسئلونك ماذا ينفقون

"হে নবী! আপনাকে মুসলমানরা জিজ্ঞেস করে যে তারা কি খরচ করবে?"

এ বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে এমন একটা সমাজ গঠন করা হয়েছে, যার কাছে সম্পদ রয়েছে এবং তা কেড়ে নেয়া হয়নি। কিন্তু তারা সম্পদের মোহাবিষ্ট নয় এবং ভোগবাদী নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার দিতে আপনা থেকেই প্রস্তুত। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সাগ্রহে জানতে

চায়, কতোটুকু সম্পদ তাদের দান করা উচিত? এর জবাবে বলা হয়েছে : قل العفو "তাদেরকে বলে দাও, নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের পর যা বেঁচে যায় তাই দান কর।" এ কথা বলা হয়নি, জনগণের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু আছে, তাকে জাতীয় মালিকানাভুক্ত আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে নাও। বরং বলা হয়েছে যে, জনগণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে বলে দাও।

এই উক্তিতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রথমত: প্রতিটি ব্যক্তি নিজের বৈধ সম্পদের মালিক। দ্বিতীয়ত: এই সম্পদ থেকে যে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মোতাবেক স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অধিকারী, তাকে যদি আল্লাহর পথে দান করার অনুশীলন ও সুযোগ না দিয়ে জোর করে আদায় করা হয়, তবে তা দান করা নয় বরং জরিমানারূপে বিবেচিত হবে। তৃতীয়ত: কোনো ব্যক্তির জন্য তার সম্পত্তির কতোখানি প্রয়োজনীয় এবং কতোখানি প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা নির্ণয়ের জন্য কোনো স্থায়ী ধরাবাধা আইনানুগ ফর্মুলা তৈরি করা সম্ভব নয়। একটি বিশুদ্ধ ও সঠিক মানের ইসলামি সমাজে এমন ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে যে, সেখানে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর ভীতির চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আপনা থেকেই সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তার ব্যক্তিগত ও সমাজের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার সম্পদের কতোটুকু প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য এবং কতোটুকু তার ইসলামি রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা উচিত কিংবা অভাবি লোকদেরকে সরাসরি দান করা উচিত। যে সব সমাজতান্ত্রিক দেশ এর বিপরীত চলতে গিয়ে এরূপ নীতি নির্ধারণ করেছিল যে, সরকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে কাজে নিয়োগ করবে এবং তার প্রয়োজন নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের কাজও সরকারই করবে, যেসব দেশে এই নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে এবং এতে বারবার সংশোধনী প্রয়োগ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে এই নীতিটা একেবারেই বাদ দিতে হয়েছে।

সে যাই হোক, সমাজতন্ত্রী হিসেবে নয় বরং মুসলমান হিসেবে যদি আমরা কুরআনের গভীর গবেষণায় নিমজ্জিত হই, তাহলে আমাদের কাছে قل العفو কথাটার উপরোক্ত অন্তর্নিহিত মর্মই পরিস্ফুট হয়। মরহুম আল্লামা ইকবাল সম্পর্কেও আমাদের সুধারণা এই যে, তিনি উক্ত অভিমতই পোষণ করতেন।

আমাদের এ আলোচনা قل العفو এর ব্যাখ্যা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাই বলে যে অর্থগৃধনু পূঁজিপতি ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়না, তাকে সোজাপথে আনার জন্য ইসলাম আদৌ কোনো আইনগত ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করেনা– তা নয়। এ ধরনের অর্থ পিশাচদের শোধরানোর জন্য অবশ্যই ইসলামের নিজস্ব বিধান রয়েছে। সে বিধান সমাজের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা চলে এবং আজও করা উচিত। কিন্তু ইসলাম মানুষের

মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন একেবারেই সমান এ বক্তব্যকে একটি প্রধান মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করেনা। এর ভিত্তিতে গোটা জীবন নিয়ন্ত্রিত হোক এবং মানুষের বিশ্রাম, চরিত্র, আত্মমর্যাদা ও বিবেকের স্বাধীনতা তার জন্য বিসর্জন দেয়া হোক–এটা বরদাশত করতে সে প্রস্তুত নয়। ধনী হোক, গরিব হোক, তার মনুষত্ব ও তার ভেতরকার নৈতিক সত্তাই যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে শুধু পেটের উপর নির্ভর করে তার বেঁচে থাকা ও না থাকা সমান। ইসলামের সুদূরপ্রসারী নীতিমালা অনুসারে আকিদা বিশ্বাস, চরিত্র ও নৈতিকতা, সমাজ ও অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতি এককথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে একই সাথে সংস্কার ও শুদ্ধির অভিযান চালু না হওয়া পর্যন্ত কোনো একটি ক্ষেত্রেও ইসলামি ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

"যে ক্ষেত থেকে কৃষকের জীবিকা অর্জিত হয় ..." ইকবালের এই কবিতা থেকে যারা হিংসা, বলপ্রয়োগ, আইনভংগ করা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বৈধতা প্রমাণ করতে চায়, তাদের বুদ্ধিমত্তা দেখে করুণা হয়। আসলে ইকবাল নিজেকে একজন দার্শনিক ভেবে এই কবিতায় নিজের ব্যক্তিগত দর্শন বর্ণনা করেননি। এ কবিতাকে তিনি কোনো কৃষক বা শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্যও রচনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে এতে তিনি কল্পনার জগতে আল্লাহকে এভাবে কল্পনা করেছেন যেনো তিনি প্রাকৃতিক জগতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বীয় ফেরেশতাদেরকে ফরমান জারি করেছেন যে, "তোমরা আমার পৃথিবীতে এরূপ ব্যবস্থা চালু কর।" আকাশের ব্যবস্থাপনা আর দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যে একরকম নয়– তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহর প্রাকৃতিক জগতের শাসন ও নিয়মবিধি একরকম, আর শরিয়তের বিধিবিধান অন্যরকম। মহাবিজ্ঞানী ও মহাপ্রতাপান্বিত শাসক আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা তো দিনরাত মানুষের উপর নানা রকমের শাস্তি ও বিপদ নাযিল করে চলেছেন। তাদের প্রাণও সংহার করছেন। তাই বলে আজ কিছুসংখ্যক মানুষও কি খোদার আসনে আসীন হয়ে নিজের অনুসারীদেরকে এই অধিকার দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে যে, তারা ইচ্ছামত যে কোনো মানুষের জান ও মাল হরণ করুক এবং আল্লাহর পৃথিবীতে যতো খুশি ধ্বংস ও নৈরাজ্য বিস্তার করুক : *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬৯]*

২৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ভরণ পোষণ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : মুসলমানদের বর্তমান সমাজে বহু অন্যায় রীতিপ্রথা চালু রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ ও নির্যাতনের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এ ধরনের একটি কুপ্রথা সম্পর্কে শরিয়তের বিধান জানতে চাই। স্বামী-স্ত্রীর অবনিবণার কারণে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে ছোট বা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের হাতে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু এই শিশুদের ভরণপোষণের ব্যাপারটা খুবই জটিল রূপ ধারণ করে। পিতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেনা। সাধারণত এই গুরুভার মায়ের ঘাড়ে চাপানো হয়। এ

ব্যাপারে ইসলামের আইন কি? সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তে কিনা? যদি বর্তে তবে কতোদিন পর্যন্ত? এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের অনুসৃত নীতি জানতে পারলে ভালো হয়। কেননা এতদঞ্চলের বেশিরভাগ হানাফি মাযহাবের অনুসারী। এ ব্যাপারটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তবে আদালতও সচরাচর স্বামী স্ত্রী যে মাযহাবের অনুসারী, সেই অনুসারেই রায় দিয়ে থাকে। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে কোনো নীতি নির্দেশ থাকলে তাও জানাবেন, যাতে এ ধরনের ঘরোয়া বিরোধ ঘরোয়া পরিবেশেই মিটমাট করে ফেলা যায়।

জবাব : হানাফি মাযহাব অনুসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদ ঘটে গেলে স্ত্রী যদি নিজের শিশু পালনের অধিকার প্রয়োগ করে ছোট শিশুদেরকে নিজের কাছে রাখে, তবে এই লালন পালনকালীন শিশুর ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাকে বহন করতে হবে। আর পিতা বেঁচে না থাকলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে বহন করতে হবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেলায় তো যতোদিন দুধ খাওয়ানো চলবে ততোদিন শিশুর মায়ের ভরণপোষণও পিতাকে বহন করতে হবে। এ বিষয়টা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল বাকারার ২৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দুই বছর দুধ খাওয়াবে, যার দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ পূর্ণ করার ইচ্ছে আছে তার জন্য। আর যে পুরুষের সন্তান, তার দায়িত্ব মায়েদের ভরণপোষণ প্রচলিত রীতি মোতাবেক প্রদান করবে।"

এ আয়াতে যদিও শিশুর পরিবর্তে তার মায়ের ভরণপোষণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দুধ খাওয়ানো মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব যখন পিতার উপর অর্পিত হচ্ছে, তখন দুধ খাওয়া শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বত:সিদ্ধভাবেই পিতার উপরই অর্পিত হয়। স্ত্রী যখন নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করেনা, তখন সন্তানের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার উপর কিভাবে চাপানো যায়? এভাবে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদকালে যখন শিশু ও তার মায়ের ভরণপোষণের ভার পিতার উপর অর্পিত, তখন দুধ খাওয়ার মেয়াদের পর যদি শিশু কিছুকাল মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে, তবে সে সময় মায়ের উপর নিজের ভরণপোষণের সাথে সাথে সন্তানেরও ভরণপোষণের ভার অর্পণ করা যুক্তি ও ন্যায়বিচারের আলোকে সমীচীন হতে পারেনা। পিতাকে কুরআনে مولود له (সন্তানের মালিক) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তান পিতারই অধিকারভুক্ত। কাজেই তার ভবিষ্যত ও মঙ্গলামঙ্গলের তদারকি ও দায়দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

হেদায়া গ্রন্থে তালাক সংক্রান্ত অধ্যায়ে الولد من احق به "সন্তানের উপর কার অধিকার ও দায়দায়িত্ব বেশি" এই শিরোনামে গ্রন্থকার বলেন والنفقة على الاب সন্তান মায়ের কাছে থাকলেও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পিতা দায়ি। হেদায়ার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'ফাতহুল ক্বাদীরে' এ উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল হুমাম বলেন :

"পিতার উপর এ দায়িত্ব বর্তাবে যদি সে জীবিত থাকে। সে যদি মারা গিয়ে থাকে তবে উত্তরাধিকারী রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর উত্তরাধিকারের মাত্রা অনুপাতে দায়িত্ব বর্তাবে।"

পরবর্তীতে হেদায়ার ভরণপোষণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে :

"অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য পিতা দায়ি। এ দায়িত্বে তার কোনো অংশীদার নেই।"

কিছু পরে আবার বলা হয়েছে : "অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণপোষণের ভার পিতার উপর অর্পিত।"

হানাফি মাযহাবের সাধারণ ফতোয়া হলো, পুত্র সন্তানকে সাত বছর ও কন্যা সন্তানকে নয় বছর লালন পালনের অধিকার মায়ের রয়েছে। এই মেয়াদকালে সে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে কিংবা এমন পুরুষকে বিয়ে করে যার সাথে তার কন্যা সন্তানদের বিয়ে চির নিষিদ্ধ (মুহাররম), তাহলে সন্তানদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখার অধিকার মায়েরই বেশি। এই মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর পিতা দাবি করলে সন্তানকে ফেরত নিতে পারে ।

আমার জানা মতে প্রচলিত আইনেও মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে সন্তানদের ভরণপোষণের ভার পিতার উপরই অর্পিত। তথাপি এতে যদি কোনো সংশয় বা বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি আইনের বিধিব্যবস্থা কি, তা সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হলো। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৭১]*

২৫. কবর আযাব

প্রশ্ন : আমি দোয়ার মাধ্যমে আখেরাতের আযাব, দোযখের আযাব ও কবরের আযাব থেকে নিস্কৃতি চেয়ে থাকি। এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমাকে উপহাস করে বললো, কবরের আযাব বলে কোনো জিনিস নেই। ওটা মৌলবীদের মনগড়া ব্যাপার। লোকটা হাদিস অস্বীকারকারী গোষ্ঠিভুক্ত বলে মনে হয়। সে বলে, কুরআনে কবরের আযাবের কোনো উল্লেখ নেই। যে সব হাদিসে এর উল্লেখ আছে, তা মনগড়া হাদিস। বরঞ্চ সেগুলো ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফল। কেননা ঐ হাদিসগুলোতেই বলা হয়েছে যে, রসূল সা. প্রথমে কবরের আযাব থেকে নিস্কৃতি

চাইতেননা। কিন্তু জনৈক ইহুদী রমণী যখন হযরত আয়েশাকে জানালো যে, কবরে আযাব হয় এবং তিনি রসূল সা.-এর কাছে তা ব্যক্ত করলেন, তখন থেকে তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুরু করলেন। লোকটি বললো, কবরে যদি সত্যিই আযাব হয় তাহলে সে কথা কি শুধু ঐ ইহুদী মহিলার মাধ্যমেই জানা গেলো? এ সম্পর্কে শুধুমাত্র ওহীর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক তথ্য অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

এই ব্যক্তি আরো বলে যে, আযাব ও পুরস্কারের ফায়সালা তো কেয়ামতের আগে হতে পারেনা। তাহলে ফায়সালার আগে আযাব হওয়ার অর্থ কি? এক ব্যক্তি যদি কেয়ামতের এক লাখ বছর আগে মারা যায় আর একজন যদি কেয়ামতের দিনই মারা যায়, তাহলে একজনকে এক লাখ বছর বেশি শাস্তি ভোগ করতে হলো।

তাছাড়া পৃথিবীতে এমন বহু মানবগোষ্ঠি রয়েছে, যারা মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরস্থই করেনা। তাদের কবরের আযাব কবরের কোথায় হবে? অনুগ্রহপূর্বক এই প্রশ্ন ও আপত্তিগুলোর এমন জবাব দেবেন, যাতে অন্তত আমার নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দুর হয়ে যায়।

জবাব কবরের আযাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, কবরের আযাব আসলে বরযখ অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের পূর্ববর্তী সময়কালের আযাব। মৃত্যুর পর মানুষকে যে গর্তটিতে দাফন করা হয়, এ আযাব তার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এ কথা সত্য যে, হাদিসে এ আযাবকে বুঝাতে কবরের আযাব শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তার কারণ এই যে, মানুষের চিরাচরিত ধারণা ও পরিভাষা অনুসারে কবরই হচ্ছে পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা। ইহলৌকিক জগতের সমাপ্তি ও পরবর্তী জগতের সূচনা চিহ্নিতকরণের এটাই চূড়ান্ত সীমারেখা। সেই পরবর্তী জগত হচ্ছে বরযখ এবং তা প্রকৃতপক্ষে রূহ বা আত্মার জগত। এই জগতে যা কিছু ঘটে, আযাব কিংবা সওয়াব হয়, কষ্ট বা সুখ অনুভূত হয়, সবই শুধুমাত্র আত্মার উপলব্ধিতে আসে। এমনও হতে পারে যে, আত্মা এইসব ঘটনা বা ভাবান্তর এমনভাবে ভোগ বা উপলব্ধি করে যেন তা একই সাথে আত্মা ও দেহ উভয়ের উপরই সংঘটিত হচ্ছে। তবে তার আসল কেন্দ্রবিন্দু ও ঘটনাস্থল আত্মাই। তাই যে মৃত ব্যক্তি কবরে সমাহিত হয়না সে কোনো অবস্থাতেই বরযখী জীবন এবং তার আযাব ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়না বা অব্যাহতি পায়না। এমনকি একই কবরে যদি একাধিক লাশ দাফন করা হয়, তবুও প্রত্যেকের বরযখী জীবন ভিন্ন ভিন্ন হবে। অন্য কথায় বলা যায়, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কবরে থাকবে।

কবরের আযাব অর্থাৎ মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী বিরতিকালীন আযাব সম্পূর্ণ সত্য। কুরআন ও হাদিস উভয়টি থেকেই এর সত্যতা প্রমাণিত এবং কোনো মুসলমানের পক্ষে এটি অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা যে ফেরাউনের গোত্রের একমাত্র মুমিন ব্যক্তিটিকে ফেরাউন ও তার দলবলের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতম শাস্তি দিয়েছিলেন, সে কথা পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনের ৪৫তম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে :

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

"তারা প্রত্যহ সকালে বিকেলে আগুনের সামনে নীত হয়। আর যেদিন কেয়ামত হবে, সেদিন আদেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের লোকজনদেরকে কঠিনতম শাস্তি দাও।"

এ আয়াতে দুটো আযাবের কথা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো যা কেয়ামতের আগেই সংঘঠিত হচ্ছে। অপরটি কেয়ামতের দিন ফেরাউন ও তার দলবলকে ভুগতে হবে। এখানে এই দুই আযাবের ধরন এবং পার্থক্যও স্পষ্ট। একটি আযাব অপেক্ষাকৃত হালকা এবং কেবল সকাল বিকেলে তার মুখোমুখি করা হয়। অপরটি আরো কঠিন এবং তা হবে জাহান্নামে। কবরের প্রশ্নোত্তর বা আযাব ও সওয়াবের যে বিবরণ হাদিসে পাওয়া যায়, তা এই আয়াতের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যহীন এবং এরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা তা থেকে বুঝা যায় যে, কবরে যা কিছু সংঘটিত হয় তা মূলত কেয়ামতের পরে যে ভালো বা মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তার ভূমিকা ও পূর্বাভাস মাত্র। মানুষ এর মাধ্যমে জানতে ও উপলব্ধি করতে পারে কি পরিণতি তার জন্য অপেক্ষমান। বরযখ কেয়ামতের আযাবের এই বিশ্লেষণ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় যে, বিচার ফায়সালার আগে আযাবের অর্থ কি?

এ কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আসামীকে ধরার পর পুলিশ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে এবং হাজতেও আটকায়। অথচ তখনো তাকে বিচারের জন্য আদালতে সোর্পদ করা বাকি থাকে। তবে এই বিরূপ অভ্যর্থনা থেকে আসামী নির্ঘাত টের পেয়ে যায় যে, সে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়েছে। কবর আযাবটা আসলে এ ধরনেরই আযাব।

কবরের আযাব ও তার বিস্তারিত বিবরণ একাধিক হাদিসে রয়েছে। কিন্তু যারা হাদিস মানেনা তাদের আচরণ বড়ই অদ্ভুত ধরনের। যে হাদিস বা হাদিসের যে অংশ দ্বারা তাদের মতলব সিদ্ধি হয়, কিংবা যা দ্বারা হাদিসকে অস্বীকার করা যায় বা তার উপর আপত্তি তোলার কোনো অবকাশ সৃষ্টি হয়, সেটিকে তারা সাড়ম্বরে পেশ করে।

কিন্তু হাদিসের যে বক্তব্য দ্বারা তাদের চিন্তাধারা খণ্ডিত হয়, তাকে তারা বেমালুম উপেক্ষা করে। এখানেও তাই ঘটেছে। তারা ইহুদী রমণীর কাহিনী তো বর্ণনা করেছে। কিন্তু তার কথায় যে হযরত আয়েশা এবং রসূল সা. কিছুমাত্র প্রভাবিত হননি এবং শুধুমাত্র তার কথায় যে তিনি কবর আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার

দোয়া করা শুরু করেননি, বরং বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রসূল সা.-কে আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে কবরের আযাবের কথা জানিয়েছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে তিনি দোয়া করেছিলেন সে কথা তারা চেপে গিয়েছে। তখন যেহেতু রসূল সা. নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, কবরের আযাব সংক্রান্ত ওহী আমার উপর নাযিল হয়েছে এবং তিনি তা থেকে পানাহ্ চেয়ে দোয়াও করেছেন। এরপর যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস ও দোয়া করাকে উপহাস করে, তার ঈমানের কি দশা হয়েছে, সেটা তার ভেবে দেখা উচিত।

কবরের আযাবের তথ্য যে সব হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা কোনো দুর্বল হাদিস নয় বরং অত্যন্ত সহীহ্ হাদিস। এ ধরনের একটি হাদিস সহীহ্ মুসলিমের নামায সংক্রান্ত অধ্যায়ের "কবর আযাব থেকে নিস্কৃতি চাওয়া অতি উত্তম কাজ" শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এর ভাষান্তর নিম্নরূপ :

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে এক ইহুদী রমণী বসা ছিলো। সে বলছিল কবরে যে আযাব হয় তা কি তুমি জান? এ কথা শুনে রসূল সা. শিউরে উঠলেন এবং বললেন কবরের আযাব ইহুদীদেরকে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা বলেন এই অবস্থায় কয়েকদিন কেটে গেলো। অত:পর রসূল সা. বললেন : তোমাদের জানা দরকার যে, আমার কাছে এই মর্মে ওহী এসেছে যে, কবরে তোমাদের উপর পরীক্ষা হবে। تفتنون فى القبور। হযরত আয়েশা বলেন যে, এরপর আমি শুনতে পাই, রসূল সা. কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাইতেন।

এটি মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশার বর্ণিত হাদিসসমূহের অন্যতম। অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আপনার প্রশ্নে যেভাবে হাদিসের বরাত দিয়ে ব্যাপারটা উল্লেখ করা হয়েছে, হাদিস ঠিক তার বিপরীত। এ হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইহুদী মহিলার কথায় রসূল সা. মোটেই সায় দেননি, বরং তাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, কবরে (অর্থাৎ মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে) কাফের ও মুমিন সবারই পরীক্ষা হবে। তিনি যখন আল্লাহর খাঁটি নবী ছিলেন এবং তাঁর উপর ওহীও নাযিল হয়েছিল, তখন একটা অদৃশ্য বিষয়ে তাঁর কোনো ইহুদী নারীর কথার উপর নির্ভর করার কোনোই প্রয়োজন ছিলনা।

এখন শুধু একটা প্রশ্নের নিষ্পত্তি বাকি থাকছে যে, এক ব্যক্তি লাখো বছর আগে মারা গেলো এবং আরেকজন কেয়ামতের দিন মারা গেলো তাহলে প্রথমজনের বেশি আযাব ভোগ করতে হবে।

এর জবাব হলো, ইহলৌকিক জগতে স্থান ও কাল পরিমাণ করার মানদন্ড একরকম এবং আখেরাত ও কবর অন্যরকম। সেটা বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন

রকম হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, লাখো বছর আগে মৃত ব্যক্তি কেয়ামত পর্যন্ত যে শাস্তি ভোগ করেছে, তা কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে মৃত ব্যক্তিকে এক মুহূর্তেই ভোগ করানো হবে। এই দুনিয়াতেও আমরা নিদ্রার মধ্য দিয়ে এক বিরল অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। এক ঘন্টার ঘুমে আমরা এমন স্বপ্ন দেখি, যাতে বহু বছরের ব্যবধান অতিক্রম করি। দেহের খোলসে আটকে থেকেও যদি আমাদের চেতনা এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে থাকে, তা হলে যে অসীম শক্তিধর সত্তা দেহ ও আত্মার বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কালগত সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে এক ব্যক্তির একদিনকে অপর ব্যক্তির লাখো বছরের সমান বানাতে অবশ্যই পারেন। 'আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।' *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৭১]*

২৬. কুরআন শিক্ষাদান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের পারিশ্রমিক নেয়া কি বৈধ?

প্রশ্ন : ইসলামি বইপুস্তক অধ্যয়নকালে একটা সমস্যা বারবার মস্তিষ্কে জট পাকায়। আপনার কাছ থেকে এ সমস্যার সমাধান কামনা করছি। মিশকাত শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, সাহাবিদের একটি দল গ্রামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় ঐ গ্রামের এক ব্যক্তি সাপ বা বিচ্ছুর কামড় খায়। জনৈক সাহাবি কয়েকটি ছাগলের বিনিময়ে সাপে কামড়ানো লোকটিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝেড়ে দেন। এতে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠে। অন্য সাহাবিগণ ছাগল গ্রহণে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। অত:পর তাঁরা মদিনা পৌঁছে রসূল সা.-কে সমগ্র ঘটনা খুলে বলেন। রসূল সা. বললেন :

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

"যে সব জিনিসে তোমরা পারিশ্রমিক নিয়ে থাক, তার মধ্যে আল্লাহর কিতাবই যোগ্যতম।"

পক্ষান্তরে হযরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়েছ :

قلت يا رسول الله رجل اهدى الى قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب والقران
قال ان كنت تحب ان تطوق طوقا من النار فاقبلها –

"হাদিসের আলোকে কুরআন শিখানোর বিনিময়ে ধনুকের মতো একটা মামুলী জিনিস পারিশ্রমিক হিসেবে নেয়াও শাস্তিযোগ্য ও গোনাহর কাজ সাব্যস্ত হয়েছে।"

উক্ত দুটো হাদিসে সমন্বয় সাধন করা আমার পক্ষে দুষ্কর। হাদিসে যদি একটা নির্দেশই থাকতো চাই তা নিষেধাজ্ঞা হোক কিংবা বৈধতার ছাড়পত্র হোক– তা হলে সেই অনুসারেই কাজ হতো। কিন্তু একই সাথে উভয়টির অনুসরণ কিভাবে সম্ভব? ইমামতি, খতীবগিরি, ইসলামি বিষয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষতার কাজও কুরআন শিক্ষাদানের মতোই আবার ইসলামি বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজও নানা

রকমের হয়ে থাকে। কিছু কাজ সামষ্টিক কিছু কাজ ব্যক্তিগত উদাহরণস্বরূপ কোনো একজন শিক্ষক বা ক্বারী কারো বাড়িতে গিয়ে তাকে বা তার ছেলেমেয়েকে কুরআন শিখায় এবং এ কাজে নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করে। এই শিক্ষকের পক্ষে কি গৃহস্থের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নেয়া হারাম হবে? দৃশ্যত এটা খুবই কঠিন অকার্যোপযোগী ব্যাপার বলে মনে হয়। তাই উপরোক্ত হাদিসসমূহের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য কি তা সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

জবাব : যে সকল আলেম কুরআন ও ইসলামি বিদ্যা শিক্ষাদানে কিংবা অন্য কোনো ইসলামি কাজ সম্পাদনে সময় ও শক্তি ব্যয় করে থাকেন, প্রাচীন আলেমগণ প্রায় পুরোপুরি একমত যে, তাদের পক্ষে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই কাজের মজুরি ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বৈধ শরিয়ত সম্মত। কেউ কেউ বলেন যে, ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে ইমাম আবু হানিফা জায়েয মনে করতেননা, কিন্তু সাম্প্রতিককালের হানাফি ফকীহগণ এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন যে, ইমামতি, খতীবগিরি ও কুরআন শিক্ষাদানের জন্য আর্থিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যায়। সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পর্কে যে হাদিসের আপনি উল্লেখ করেছেন, সেটি বুখারির চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায় এবং ভাড়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী এই হাদিসের বর্ণনাকারী। হযরত আবু সাঈদ বর্ণিত যে হাদিসটি ভাড়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার ভাষান্তর নিম্নরূপ :

"রসূল সা.-এর কতিপয় সাহাবি এক সফরে রওনা হন। তারা এক আরব গোত্রের বস্তিতে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চান। কিন্তু তারা খাবার দিতে অস্বীকার করে। এই সময় ঐ গোত্রের সরদারকে হঠাৎ সাপে দংশন করে। গোত্রের লোকেরা তার চিকিৎসার জন্য অনেক চেষ্টা তদবীর করলো। কিন্তু কোনো ফলোদয় হলো না। অবশেষে তারা উক্ত সাহাবিদের কাছে এলো। ভাবলো তাদের কাছে কোনো ওষুধ থাকতে পারে। তারা বললো, ওহে পথিকগণ! আমাদের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিয়েছে। কোনো চেষ্টা তদবীরেই তার কোনো উপকার হলোনা। আপনাদের কাছে কি এর কোনো ওষুধ আছে? কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললো : হ্যাঁ আমি ঝাড় ফুঁক করে থাকি। তবে আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমরা তোমাদের কাছে খাবার চেয়েছিলাম তোমরা তা দাওনি। কাজেই তোমরা কি পারিশ্রমিক দেবে তা ঠিক না করা পর্যন্ত আমি ঝাড় ফুঁক করবোনা। এ কথা শুনে গোত্রের লোকেরা এক পাল ছাগল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো। অত:পর ঐ সাহাবি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে লাগলেন। এতে সর্প দংশিত গোত্রপতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে হাটাচলা করতে লাগলো। গোত্রের লোকেরা প্রতিশ্রুত ছাগলগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করলো। সাহাবিগণের কেউ কেউ ছাগলগুলোকে সফরসঙ্গিদের মধ্যে বন্টন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ঝাড়

ফুঁককারী সাহাবি বললেন এখনই এরূপ করোনা। আমরা রসূল সা.-এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করবো। দেখি তিনি কি বলেন। তাঁরা রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। রসূল সা. বললেন ব্যাপার মন্দ নয়। তুমি জানলে কি করে যে, এভাবে ঝাড়ফুঁক করতে হয়? অত:পর বললেন: তোমরা যা করেছ ঠিকই করেছ। তারপর মুচকি হেসে আবার বললেন: ছাগলগুলো বন্টন করে দাও এবং আমার জন্যও এক ভাগ রেখো।"

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসে এ কথাটাও যুক্ত হয়েছে যে, রসূল সা. বললেন :

احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

"পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে বেশি যোগ্য।"

এ হাদিস সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন ও আপত্তি মনে জাগতে পারে। তবে তা এতো জটিল নয় যে, তার কোনো সমাধানই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কুরআন শিক্ষার সাথে এ ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। যাদের কাছ থেকে ছাগলগুলো নেয়া হয়েছিল, তারা অতিথিপরায়ণ ছিলনা। তারা মুসলমান ছিলো বলেও উল্লেখ নেই, আর সাহাবিগণ তখন প্রবাসকালীন অভাব ও সংকটে ছিলেন। তাই এ ঘটনা দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন শিখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া শর্তহীনভাবে বৈধ? অধিকাংশ হাদিস সংগ্রাহক এ হাদিসকে ভাড়া দেয়া (সম্পত্তি ও শ্রম দুটোই এর আওতাভুক্ত) চিকিৎসা, তাবিজতুমার ও ছাড়ফুঁক সংক্রান্ত অধ্যায়ে এনেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এ ঘটনা ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

কিন্তু এ সকল প্রশ্ন ও আপত্তির জবাব হলো এ হাদিস থেকে অন্ততপক্ষে এতোটুকু প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আয়াতের ব্যবহার করার বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে আর্থিক সুবিধা আদায় করে দেয়া হয়েছে। এ সুবিধা যারা অর্জন করলেন তারা সাহাবি ছিলেন এবং তারা শরিয়তের বিধিনিষেধের অনুগত ছিলেন। স্বয়ং রসূল সা. এ লেনদেনকে বৈধ বলে রায়ও দিয়েছেন। উপরন্তু এখানে একটা মৌলিক তত্ত্ব বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন অন্যান্য কাজের পারিশ্রমিক নিয়ে থাক, তখন আল্লাহর কিতাব দ্বারা কারো উপকার ও প্রয়োজন পূরণ করে থাকলে তার বদলা নেয়ার তোমরা আরো বেশি হকদার। রসূল সা. এ কাজটাকে কোনো আপদকালীন বা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা বলেও অভিহিত করেননি। বরঞ্চ এতে নিজের হিস্সাও দাবি করেছেন যদিও তা উপহাসচ্ছলেই করেছেন।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এ হাদিস সরাসরি কুরআন শিখানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তথাপি কিয়াসের মাধ্যমে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এটিকে কুরআন পড়ানো বা শিখানো বাবদ পারিশ্রমিক গ্রহণের পক্ষেও প্রয়োগ করা যায়। কেননা আল্লাহর

কালাম পড়ে ফুঁক দেয়া যেমন একজন রোগীর জন্য উপকারী হতে পারে। তেমনি তার শিক্ষাদানও একজন শিক্ষার্থীর উপকার সাধন করতে পারে। তাই হাফেয ইবনে হাজার এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

استدل به الجمهور في جواز اخذ الاجرة على تعليم القران

"হাদিসটিকে অধিকাংশ ফেকাহবিদ কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

মুসলিম শরিফের সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়ের চিকিৎসা বিষয়ক পরিচ্ছেদেও এ হাদিসটি রয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন যে, এর দ্বারা জানা যায় সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা বা দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করে মজুরি নেয়া বৈধ। وكذا الاجرة على تعليم القران অনুরূপভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েও মজুরি নেয়া জায়েয আছে বলে প্রমাণিত হয়। তিনি আরো বলেন, ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, ইসহাক বিন রাহওয়ে, আবু সাওর ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামদের অভিমত ও অনুরূপ। এসব মতামত ব্যক্ত হওয়ার পর অবশ্য আরো একটা সমস্যা অবশিষ্ট থেকে যায়। সেটি হলো এসব বর্ণনা অনুসারে যদি কুরআন শিক্ষা দেয়া বাবদ পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয হয়, তাহলে কিছু লোক যে খাওয়া কিংবা টাকার লোভে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআনখানি করে, তাও তো জায়েয হওয়ার কথা। অথচ অধিকাংশ ফেকাহবিদ ও হাদিসবেত্তার মতে এ ধরনের কুরআন পড়াতে কোনো সওয়াব নেই।

আমার মতে এর জবাব এই যে, যার জন্য এই কুরআনখানি করা হয়, তার কোনো ইহলৌকিক কল্যাণ সাধন বা তাৎক্ষণিক উপকার করার ইচ্ছে পোষণ করা হয়না। এর দ্বারা আখেরাতের সওয়াব ও কল্যাণ কাম্য হয়ে থাকে। এ জন্য এ কাজ ইসালে সওয়াব নামে পরিচিত। আর সওয়াব বলতে বুঝায় আখেরাতের পূণ্য ও প্রতিদান। এটা শিক্ষাদান, মজুরির ভিত্তিতে কোনো কাজ করা, চিকিৎসা বা তাবিজকুমার ও ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির ব্যাপার নয়। তাই উভয় পক্ষের অভিষ্ট পার্থিব কল্যাণ হওয়া চাইনা। এ কাজ পুরোপুরি আল্লাহর ওয়াস্তে করা কর্তব্য। এতে দুনিয়াবি ফায়দা অর্জনের অভিপ্রায় থাকলে এমনকি তার কোনো নামগন্ধও থাকলে এটা নিরর্থক কাজে পর্যবসিত হবে। মোটকথা, ইসালে সওয়াব অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থে কুরআন পড়া এক ধরণের কাজ। আর কুরআন শিখানো, লেখা ছাপানো ও প্রকাশ করা অন্য ধরনের কাজ। কোনো মুসলমানকে আল্লাহ যদি এতোটা স্বচ্ছলতা দিয়ে থাকেন যে, সে কুরআনের এইসব খিদমতের বিনিময়ে কোনো দুনিয়াবি পরিশ্রমিকের মুখাপেক্ষী হয়না এবং সে এইসব খিদমত বিনা পারিশ্রমিকে আল্লাহর ওয়াস্তে করে তবে সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু সে যদি নিজের শ্রমের আর্থিক বিনিময় চায়, তবে দুনিয়ার জীবনে তা নিতে পারে এবং

দুনিয়ার জীবনে নেয়া সত্ত্বেও তার নিয়ত যদি বিশুদ্ধ থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে তা করে থাকে, তবে সে আল্লাহ চাহে তো আখেরাতের পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত হবেনা। ইমামতি ও খতীবগিরিও এই ধরণের কাজ। কেউ যদি যথেষ্ট সচ্ছল ও বিত্তশালী হয়ে থাকে, তবে তার এসব কাজ বিনা পারিশ্রমিকেই করা উচিত। কিন্তু প্রয়োজন থাকলে প্রচলিত নিয়মে পারিশ্রমিক নিতে পারে। বৃহত্তম ইমামতীর (ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) দায়িত্ব পালন করে খোলাফায়ে রাশেদীন যদি বায়তুলমাল থেকে ভাতা নিয়ে থাকেন, তবে ক্ষুদ্রতর ইমামতির পারিশ্রমিক নেয়া নাজায়েয হবে কেন? বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিকে নাজায়েয বলে ফতোয়া দিলে ইসলামের খিদমত ও কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের কাজ নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। এ কাজ বিঘ্নিত হওয়া মারাত্মক ধরণের অনভিপ্রেত ব্যাপার যে, এর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতর অনভিপ্রেত কাজ সহ্য করে নিতেই হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন স্বীয় গ্রন্থ রদ্দুল মুখতারে বলেন :

"পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাদানকে যদি অনুমোদন না করা হয়, তবে কুরআন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

যে হাদিসে কুরআন শিখানোর বিনিময়ে একটি ধনুক পর্যন্ত গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, এবার সেই হাদিসটির প্রসঙ্গে আসা যাক। মিশকাত শরিফের ইজারা অধ্যায়ে এ হাদিসটি রয়েছে। এর অনুবাদ নিম্নরূপ

"হযরত উবাদা ইবনে সামেতকে কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময়ে একটি ধনুক দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে রসূল সা. বললেন তোমার গলায় আগুনের শিকল পরানো হোক এটা যদি পছন্দ কর তবে এটি গ্রহণ করতে পার।"

কিন্তু এ হাদিস আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ থেকে নেয়া হয়েছে। সেখানে আরো কিছু বিবরণ রয়েছে, যা মিশকাতে উদ্ধৃত করার সময় বাদ পড়ে গেছে। আবু দাউদে হযরত উবাদার বক্তব্য এরূপ 'আমি আহলে সুফফাকে কুরআন পড়াতাম।' ইবনে মাজার হাদিসটিও অবিকল এই ভাষাতেই বর্ণিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, এতো কঠোর সতর্ক বাণী আহলে সুফ্ফার সাথেই সংশ্লিষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের এই দলটির আদৌ কোনো ঘরবাড়ি ছিলনা। খোলা আকাশের নিচে একটি চত্বরে তারা দিনরাত পড়ে থাকতেন। তাদেরকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে যদি বায়তুলমাল কিংবা অন্যান্য ধনী লোকদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নেয়া হতো তবে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু ইসলামের খিদমতে সদাপ্রস্তুত ও সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত এই নিঃস্ব ও সর্বহারা লোকদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নেয়া কোনো শিক্ষকের জন্যই বৈধ ছিলনা। সে সাহাবি ধনুক দিতে চেয়েছিলেন, তার হয়তো ওটাই একমাত্র সম্বল ছিলো এবং তা দিয়ে তিনি হয়তো জিহাদ কিংবা ভক্ষণযোগ্য

প্রাণী শিকার করার কাজ করতেন। এ জিনিসটি থেকে তাকে বঞ্চিত করা কোনো মতেই সঙ্গত হতে পারেনা। তাছাড়া ইমাম সুয়ূতী ও অন্যান্য হাদিস বিশারদগণের মতে এ হাদিসের সনদ দুর্বল। তাই বুখারি ও মুসলিমের মোকাবিলায় এ হাদিস পরিত্যাজ্য অথবা স্বল্প গুরুত্ববহ হবে।

কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, হযরত উবাদা প্রথমে কুরআন শিক্ষাদানের কাজটা অবৈতনিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই এ জন্য পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ ছিলনা। হাদিসটির যে ব্যাখ্যা আমি উপরে করেছি, আবু দাউদের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ 'আউনুল মা'বুদ' এর লেখকও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন :

"আহলে সুফ্‌ফাহ অতি দরিদ্র লোকদের দল। তারা মানুষের দানসদকা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে কিছু নেয়া সমীচীন ছিলনা।"

এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, যারা কুরআন শিক্ষাদান বা অন্য কোনো দীনি কাজ করেন এবং এ কাজে নিজেদের সময় ও মাথা খাটান, তারা যদি সচ্ছল হন এবং আল্লাহর ভয় ও সন্তোষের তাগিদে কোনো আর্থিক বা বস্তুগত প্রতিদান না চান, তারা অসাধারণ মহত্ব ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ জন্য তারা ইনশাআল্লাহ আখেরাতে অগণিত ও অফুরন্ত পুরস্কার পাবেন। কিন্তু যারা সচ্ছল নন, তাদের জীবিকার ভার যদি সরকার বা সমাজ গ্রহণ করে, অথবা দীনি শিক্ষা গ্রহণকারীরা বা তাদের অভিভাবকরা স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে তাদেরকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হারে কোনো পারিশ্রমিক দেন, তবে সেটা দেয়া ও নেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। এ ব্যাপারে মুসলিম আলেমগণ বলতে গেলে একমত। *[তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৭৪]*

[২]

প্রশ্ন : জুন মাসের তরজমানুল কুরআনে কুরআন শিক্ষা দানের পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতার পক্ষে আপনি যে আলোচনা করেছেন, তা আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। আপনি লিখেছেন যে, আধুনিক হানাফি ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ এর বৈধতার ব্যাপারে একমত। কিন্তু হানাফি ফেকাহশাস্ত্রের আধুনিক যুগ কবে থেকে শুরু হয় এবং প্রাচীন যুগ কবে শেষ হয়, সেটা আমি জানতে পারলাম না। প্রাচীন ইমামদের বরাত দিয়েও আপনি লিখেছেন, তাঁরা সবাই পারিশ্রমিক নেয়াকে জায়েয মনে করেন। এই প্রাচীন ইমামদের দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন।

আল্লামা আবু বক্‌র জাস্‌সাসের লেখা গ্রন্থ আহকামুল কুরআনের ২য় খণ্ডের ৫২৬ পৃষ্ঠায় ঘুষ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

"এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে কাজ ফরয হিসেবে অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে কাজে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নেই। যেমন হজ্জ এবং কুরআন ও ইসলাম শিক্ষাদান ইত্যাদি।"

আহকামুল কুরআনের লেখক প্রাচীন যুগের না আধুনিক যুগের এবং অন্যদের মোকাবিলায় তাঁর ও তার মতামতের গুরুত্ব কতোখানি জানাবেন।

আপনি ইমাম আবু হানিফার অভিমতের বিপক্ষে শুধুমাত্র শামীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা ইমাম সাহেবের অভিমতের চেয়ে অগ্রগণ্য হতে পারেনা। তাছাড়া আপনার যুক্তির ধাঁচই অন্য রকমের। হানাফি মাযহাবের আলোকে আপনি আলোচনা করেননি। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে হানাফি মাযহাবের ফতোয়া কি– তথা কোন্ রায়টি কার্যকর হওয়া উচিত, সে কথা আপনার আলোচনা থেকে জানা যায়না। এ জন্য বিষয়টি পুনরায় বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

জবাব : আল্লামা আবু বকর জাসসাস, তাঁর পূর্বসুরি ও প্রাচীন হানাফি ফকীহগণ যে কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয় বলে ফতোয়া দিতেন, সে কথা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। জাসসাস ইন্তিকাল করেন ৩৭০ হিজরীতে। আমার যতোদূর জানা আছে, ঐ যুগেই অর্থাৎ ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে হানাফি ফেকাহবিদদের কেউ কেউ ফতোয়া পরিবর্তন করেন এবং পূর্বতন ইমামদের রায়ের সাথে দ্বিমত ব্যক্ত করেন। ফতোয়ায়ে কাযীখান গ্রন্থে ইমাম হাফেজ আবুল্লায়েসের উক্তি এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :

"ইমাম আবুল্লায়েস বলেন যে, আগে আমি কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া নাজায়েয বলে ফতোয়া দিতাম ... কিন্তু এখন তা প্রত্যাহার করেছি।"

ফকীহ আবুল্লায়েস আবু বকর জাসসাসের সমসাময়িক এবং ২৭৩ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। স্বয়ং কাযীখানও (তাঁর পূরো নাম ফখরুদ্দীন হাসান বিন মানসুর) এটাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি ৫৯২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এর এক বছর পর ৫৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন হেদায়া গ্রন্থের লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন আল মারগী নানী। তিনি হেদায়ার 'ইজারা' অধ্যায়ে প্রথমে এর নাজায়েয হওয়া সংক্রান্ত রায় উদ্ধৃত করেন এবং তারপর বলেন :

"আমাদের কোনো কোনো প্রবীণ মনীষী আজকাল কুরআন শিক্ষাদানের কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে রায় দিয়েছেন। কারণ আজকাল ইসলামি তৎপরতার শৈথিল্য ও উদাসীনতা দেখা দিয়েছে। কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে কুরআনের সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই অভিমতই এখন ফতোয়া হিসেবে চালু।"

হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'এনায়া' ৭৮৭ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত ইমাম আকমালুদ্দীন বলেন :

"প্রাচীন ইমামগণ পারিশ্রমিক নেয়া নাজায়েয বলে রায় দিয়েছিলেন শুধু এ কারণে যে, তৎকালে শিক্ষকদেরকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা দেয়া হতো এবং তারা নিজেদের জীবিকার ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী ছিলেননা। তাছাড়া আল্লাহর

সন্তুষ্টির খালেছ উদ্দেশ্যে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে মানুষের মধ্যে আগ্রহ ছিলো। কিন্তু এখন তা আর নেই।"

৭১০ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী কানযুদ দাক্বায়েক গ্রন্থে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন "বর্তমানে কার্যকর ফতোয়া এই যে, কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া চলবে।"

কানযুদ দাক্কায়েক্ব গ্রন্থের টীকাকার ইমাম মুঈনুদ্দীন হারাভী (মোল্লা মিসকিন) বলেন :

"অনুরূপভাবে আজকাল এই মর্মে ফতোয়া দেয়া হয় যে, কুরআন ও ফেকাহ শিক্ষাদান বাবদ পারিশ্রমিক নেয়া যাবে। আমাদের প্রবীণ ইমামগণ বলেছেন, উস্তাদকে পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য পিতাকে বাধ্য করতে হবে। ইমাম আবু মুহাম্মদ খাইযাখাযমী বলেছেন, আমাদের যুগে ইমাম, মুয়াযযিন ও শিক্ষকের জন্য ইসলামি শিক্ষা দানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয। যখীরা ও রওয়া গ্রন্থেও একথাই বলা হয়েছে।"

শরহে বেকায়া গ্রন্থে আছে :

"যেহেতু ইসলামি কার্যকলাপে শৈথিল্য বিরাজ করছে, সেহেতু কুরআন ও ফেকাহ অধ্যাপনায় পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ বলে ফতোয়া দেয়া হয়ে থাকে, যাতে এ শিক্ষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে না পারে।"

১০৮৮ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত আল্লামা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাসকাফী 'আল মুখতার' গ্রন্থে বলেন :

"বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরআন ও ফেকাহ শিক্ষা দানের জন্য এবং ইমামতি ও আযান দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। নিয়োগ কর্তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য করতে হবে।"

দুররুল মুখতার গ্রন্থের ব্যাখ্যা রদ্দুল মুখতারে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ওফাত ১১৯২ হিজরী) উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ খায়রুদ্দীন রামলী, ইমাম যায়লায়ী ও অন্যান্য ফকীহদের এই সর্বসম্মত রায় উদ্ধৃত করেছেন :

"কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়াকে যদি জায়েয ঘোষণা না করা হতো, তাহলে কুরআনের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তাই ফকীহগণ এটিকে জায়েয বলে রায় দিয়েছেন এবং এ কাজটি তারা ভালো মনে করেছেন।"

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে পারিশ্রমিক গ্রহণকে যারা বৈধ মনে করেন তাদের সমর্থন করে বলা হয়েছে :

"পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতার পক্ষে যারা মত দিয়েছেন তাদের বক্তব্যই আমাদের যুগে অগ্রগণ্য।"

প্রাচীন ইমামদের যুগ কবে শেষ হয়েছে এবং আধুনিক ইমামদের যুগের সূচনা কোথা থেকে শুরু হয়েছে– আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন। সাধারণত এ শব্দ দুটি বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং আপেক্ষিক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেক পূর্বসূরী প্রত্যেক উত্তরসূরীর জন্য প্রাচীন এবং প্রত্যেক উত্তরসূরী প্রত্যেক পূর্বসূরীর তুলনায় আধুনিক। তবে ফেকাহ শাস্ত্রীয় ইমামদের বেলায় ৭টি স্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম স্তরগুলো মুজতাহিদ ইমামদের। এঁদের থেকে মূলনীতি ও মৌল বিধি উদ্ভাবন ও গ্রহণ করেছেন এবং ইজমা (কুরআন ও হাদিস অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতৈক) ও কিয়াস (কুরআন, হাদিস ও ইজমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নতুন ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা) এর আলোকে খুঁটিনাটি বিধি প্রণয়নের সূচনা করেছেন। হানাফি মাযহাবের দ্বিতীয় স্তরের ফকীহগণকে 'মুজতাহিদীন ফীল মাযাহিব' অর্থাৎ মাযহাবী মুজতাহিদ বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু হানিফার অন্যান্য শিষ্যগণ। এরা সবাই মৌলিক বিধি ও নীতিমালায় যথারীতি ইমাম আবু হানিফার অনুসারী। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস প্রয়োগ করে স্বীয় উস্তাদের মূলনীতি অনুসারে তারা স্বাধীনভাবেও ফেকাহ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিধি রচনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাদের মতামত অনেক সময় ইমাম আবু হানিফার বা পরস্পরের মতামত থেকে ভিন্নও হয়ে থাকে।

তৃতীয় স্তরটি 'মুজতাহিদীন ফিল মাসায়েল' এর স্তর। যেসব ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা এবং তার শিষ্যদের কোনো ঘোষিত মতামত বা ফতোয়া নেই, এরা সেই সব ব্যাপারে ইজতিহাদ করে বিধিমালা রচনা করে থাকেন। ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, শামসুল আইম্মা সারাখসী, ফখরুল ইসলাম বাযদবী, কাযীখান প্রমুখ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার স্থিরীকৃত নীতিমালার আলোকে এরা সেই সব বিষয়ে রায় দিয়ে থাকেন, যেসব বিষয়ে আগে কোনো রায় উদ্ধৃত নেই এবং কুরআন হাদিস থেকেও কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়না।

চতুর্থ স্তর হলো আসহাবে তাখরীজ তথা শরিয়তের বিধিমালা সংকলকদের। ইমাম আবু বকর জাসসাস এবং তার সমকালীন ফকীহগণ এই স্তরের আওতাভুক্ত। এই স্তর এবং পরবর্তী স্তরসমূহের ফকীহগণ পূর্ববর্তী মুজতাহদিদের তুলনায় মুকাল্লিদ অর্থাৎ নিরেট অনুগামী হিসেবে পরিচিত। তবে তাদের উক্তিসমূহ ও মতামতগুলো মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তারা ইজতিহাদের দাবিদার না হলেও ইজতিহাদী গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে শরিয়তের মূল উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে শরিয়তের বিধি প্রণয়ন কর্মকান্ড থেকে একেবারে রিক্ত নন। তাঁরা কখনো কখনো আপন উস্তাদের অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক উক্তির ব্যাখ্যা

দিয়ে থাকেন এবং সম্ভাব্য একাধিক রায়ের কোনো একটিকে শরিয়তের উৎসের সাথে বা ইমামগণের নির্ধারিত নীতিমালার সাথে অধিকতর সঙ্গতিশীল আখ্যা দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঘোষিত ফতোয়ায় পরিবর্তন সাধন ও পরিবর্তনকে বৈধ করে থাকেন।

পঞ্চম স্তরের ফকীহগণও পূর্ব মতামতগুলোকে ছাটাই বাছাই করে কোনোটি গ্রহণ কোনোটি বর্জন করেন। যেসব বিধি সাধারণ মানুষের জন্য সহজতর অথচ মৌলিক নীতিমালার বিরোধি নয় সেগুলোকেই তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এই স্তরকে 'আসহাবে তারজীহ' তথা অগ্রাধিকার নির্ণয়কারীদের স্তর বলা হয়। আবু হাসান কুদুরী ও বুরহানুদ্দীন মরগনানী (হেদায়ার গ্রন্থকার) এই স্তরের আওতাভুক্ত।

৬ষ্ঠ স্তরকে বলা হয় 'আসহাবে তমীয' তথা নির্বাচক বা বাছাইকারীদের স্তর। প্রাচীন ইমামগণের বর্ণিত মতামত থেকে কোনটি সবল ও কোনটি দুর্বল কোনটি ব্যাপক ও কোনটি বিরল তা তারা চিনতে ও বাছাই করতে পারেন এবং অধিকতর প্রামাণ্য মতকে নির্বাচন করে সংকলিত করে থাকেন। কানযুদদাক্বায়েক্ব, দুররে মুখতার ও বেকায়ার গ্রন্থকারগণ এই স্তরের। তারা প্রত্যাখ্যাত ও দুর্বল মতামতকে বাদ দিয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত ও প্রচলিত মতামতের উপর নির্ভর করেন।

সপ্তম তথা সর্বশেষ স্তরে যারা আছেন তাদেরকেও নিরেট মুকাল্লিদ তথা অন্ধ অনুসারি ভাবা ঠিক নয়। তারা সচরাচর স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখেননি, তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে তারা এমন টীকা ও ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন যে, তা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বক্তব্য সহজে বোধগম্য হয়। এসব টীকা ও ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে কোনো শিক্ষার্থী প্রাচীন গ্রন্থাবলী দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা ও শরিয়তের প্রয়োজনীয় বিধান ও নির্দেশ প্রণয়ন করতে পারেনা।

যা হোক, এই সব মনীষীর প্রত্যেক উত্তরপুরুষ পূর্বতনদের তুলনায় আধুনিক এবং পরবর্তীদের তুলনায় প্রাচীন। তাদের কোনো স্তরকে এরূপ অকাঠ্যভাবে চিহ্নিত করা যায়না যে, তাদের পূর্ববর্তীরা সবাই প্রাচীন এবং পরবর্তীরা সবাই আধুনিক। তবে আমাদের তুলনায় তারা সকলেই প্রাচীন ও অগ্রণি। যে সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিস প্রথম থেকেই এ মাসয়ালার ব্যাপারে বৈধতার প্রবক্তা তারাও আমাদের প্রবীণ মুরব্বী। তাই আমি যে বলেছি, পূর্বতন আলেমগণ এ ব্যাপারে প্রায় একমত সে কথা ভুল নয়। আমি ইমাম আবু বকর রাযী (জাসসাস) সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিনা। কেননা অন্যান্য হানাফি ইমামদের সুচিন্তিত অভিমত আমি আগেই তুলে ধরেছি। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]*

২৭. ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : তরজমানুল কুরআনের জানুয়ারি সংখ্যাটা পড়লাম। এতে জনাব কাযী বশীর আহমদ সাহেবের 'চুরির অপরাধ প্রমাণের উপায়' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে দেখেছি। এ নিবন্ধের কয়েকটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অন্যথায় স্বস্তি পাচ্ছিনা। তাই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।

১. ২৬ পৃষ্ঠায় হযরত আবু দারদার বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, রসূল সা. দাসিটিকে বললেন 'বলে দাও না।' অর্থাৎ কিনা তিনি দাসিকে চুরির অপরাধ অস্বীকার করা শিখিয়েছিলেন।

২. ২৭ পৃষ্ঠায় হযরত মাগর রা.-এর শাস্তি সম্পর্কে রসূল সা. বললেন যে, 'তোমরা তাকে যেতে দিলেনা কেন?' অথবা, 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেনা কেন?'

৩. ৩৩ পৃষ্ঠায় সাক্ষ্যদানের এক মাসের মেয়াদ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, আমার মতে তাতে এবং লুকিয়ে রাখার পরামর্শ দ্বারা তো অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাবে। বলা হয়েছে সাক্ষ্যদান বিলম্ব একাধিক কারণে হতে পারে। এ কথাটার ব্যাখ্যা দরকার।

রসূল সা.-কে গোটা বিশ্বজগতের জন্য করুণাস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে রসূল সা.-এর উপস্থিতির কারণে অপরাধ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, যে দু'একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটা শুধু মুসলিম জাতির সংশোধনের নিমিত্তে হয়েছিল। এখন উল্লেখিত হাদিসগুলোর প্রসঙ্গে আসা যাক। চোর বা অভিযুক্তকে তার জবানবন্দী নেয়ার আগেই যদি বলে দেয়া হয় যে, তুমি বল 'অপরাধ করিনি।' তাহলে তাতে অপরাধী তো আরো আস্কারা পেয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শাস্তি কার্যকর করার সময় অপরাধীকে পালাতে দিলে ন্যায়বিচারের দাবি পূর্ণ হয়না। অপরাধকে চেপে রাখা বা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটিও তদ্রুপ। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, যতোক্ষণ কোনো অপরাধ প্রকাশিত হয়ে না পড়ে, ততোক্ষণ তা লুকানো যেতে পারে। আর তাও এমনভাবে করা চাই যেনো তা দ্বারা সমাজের উপর খারাপ প্রভাব না পড়ে অর্থাৎ অনাচার ও অপরাধের দাপট বেড়ে না যায়। নচেৎ যেসব অপরাধ দ্বারা সমাজে অনাচারের উদ্ভব ঘটে, সেগুলোকে লুকানো বা উপেক্ষা করা সমীচীন মনে হয়না। তা করা হলে হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার এবং অন্যান্য ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত লোকেরা আরো অপরাধ করতে উৎসাহ পাবে।

জবাব : আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার আগে এ কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন মনে হচ্ছে যে, ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিশেষত ফৌজদারী ও অপরাধসমূহের জন্য হুদুদ ও কিসাস নামে যে দন্ড বিধান করেছে, তার উদ্দেশ্য যেমন সমাজের সংশোধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, তেমনি অপরাধীদের চরিত্র ও

মানসিকতার পরিশুদ্ধি এবং আখেরাতের আযাব থেকে তাদের নিস্কৃতি লাভও। এ কারণে কোনো কোনো হাদিসে দৈহিক শাস্তি দেয়ার পর অপরাধীকে তওবা করানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। যাতে গোনাহ্ থেকে তার দেহ ও মন পাক-সাফ হওয়ার পাশাপাশি সে কেয়ামতের শাস্তি থেকেও রেহাই পায়। অনুরূপভাবে অপরাধসমূহের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তের এও একটা মূলনীতি যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্তভাবে অপরাধ সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা।

এখন অপরাধ কিভাবে প্রমাণিত হবে সেই প্রশ্নের সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। এর সবচেয়ে নিশ্চিত ও অকাট্য পন্থা এই যে, অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করবে আর সেই সাথে তার বিরুদ্ধে সাক্ষীও বিদ্যমান থাকবে যে, সে অপরাধটি সংঘটিত করেছে। অপরাধ প্রমাণের জন্য এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের একটা পন্থা এই যে, অপরাধ স্বীকারোক্তি করছেনা কিন্তু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য রয়েছে। তবে খুবই বিরল, বিস্ময়কর ও অসাধারণ একটা পন্থা এমনও রয়েছে যে, আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী নেই, কিন্তু সে নিজেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অপরাধের কথা স্বীকার করে। এ ধরনের আত্মস্বীকৃত অপরাধী আসলে অনুশোচনা ও তাওবার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে এবং সে আখেরাতের মুক্তির স্বার্থে পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে থাকে। এমনকি নিজের সাধের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ ধরনের অপরাধী পরিপূর্ণ মানসিক তৃপ্তি ও আন্তরিক আগ্রহ সহকারে দুনিয়ায় শাস্তি হয় হোক কিন্তু আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত হোক এই মনোভাব নিয়ে নিজেকে শাস্তির জন্য এগিয়ে দেয়। যদিও এ ধরনের অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য পার্থিব শাস্তি আর তেমন প্রয়োজন থাকেনা। তথাপি ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সাধারণ ও সামগ্রিক দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে তার উপরও শরিয়তের নির্ধারিত দন্ড কার্যকর করে। এর পেছনে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণকর দিকটি নিহিত রয়েছে, সেটি হলো সাক্ষীসাবুদ না থাকা অবস্থায় অপরাধের স্বীকারোক্তি করলেই যদি শরিয়তের নির্ধারিত দন্ড রহিত হয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের স্বীকারোক্তি শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটা উপায় বা ছুঁতা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার আর কোনো গুরুত্ব ও মূল্য থাকবেনা। ফলে অপরাধীদের দ্বারা আল্লাহ ও মানুষের অধিকার পদদলিত হতেই থাকবে। তা সত্ত্বেও রসূল সা. এ ধরনের অপরাধীদেরকে ওজর পেশ করা, নিজের নির্দোষিতা দাবি করা, কিংবা সন্দেহ সংশয় দ্বারা উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ সুযোগ দিয়েছেন।

এই পটভূমি দৃষ্টিপথে রেখে যদি হযরত মাগের সংক্রান্ত হাদিসগুলো বিবেচনা করা হয়, তাহলে ঘটনার প্রেক্ষাপট সহজেই বুঝা যায় এবং সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। একজন অপরাধীর সাধারণ চিত্র এই যে, অপরাধ সংঘটিত করার পর

যেনতেন উপায়ে তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ কোনো না কোনো উপায়ে তার সন্ধান পেয়ে গ্রেফতার করে। সম্ভাব্য যাবতীয় তদন্ত প্রণালী প্রয়োগ করে তার স্বীকারোক্তি আদায় করে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে আদালতে সোপর্দ করে এবং আসামীর উকিল তাতে সর্বপ্রথম এ কথাই শেখায় যে, তুমি আদালতে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করবে। আপনি যে হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেছেন তার কোনোটিই এ ধরনের অপরাধীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ ধরনের আসামীদেরকে যদি আদালতও এরূপ বলে যে, তোমাকে তো অপরাধী বলে মনে হয়না, তুমি বরং নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি কর। তাহলে তাকে অবশ্যই অপরাধপ্রবণ লোকদের আস্কারা দেয়া হবে এবং সমাজে অপরাধের মাত্রা বাড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে নিজেকে আদালতের কাছে সমর্পণ করে এবং তার নিজের স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কোনো সাক্ষ্যও থাকেনা। তার ব্যাপারটা সাধারণ অপরাধীদের মতো নয়। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অপরাধের স্বীকারোক্তি করে তার সম্পর্কে ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়া শুধু সঙ্গতই নয় বরং অত্যাবশ্যকও। তার স্বীকারোক্তি বারবার গ্রহণ করা উচিত এবং কি পরিস্থিতিতে সে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে তা বিভিন্ন পন্থায় অনুসন্ধান করা উচিত। যদি সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে কিংবা এমন আচরণ করে যা প্রত্যাহার ও অস্বীকার করার নামান্তর। তাহলে তার প্রত্যাহারকে মেনে নিতে হবে এবং দন্ড প্রয়োগ স্থগিত রাখতে হবে।

হযরত মাগের বিন মালেক আসলামীর ঘটনাটা এ ধরনেরই। তার উপর ব্যাভিচারের দন্ড কার্যকর হয়েছিল। তিনি স্বয়ং রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে আর কোনো রকমের চাক্ষুস বা বাস্তব সাক্ষী ছিলনা। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরার পর্যায়ে তার পরিবার ও গোত্রের লোকেরা এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ইনি আমাদের মধ্যে একজন সৎ লোক। কিন্তু তিনি বারংবার স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি করতে থাকায় এবং তার উপর অবিচল থাকায় শেষ পর্যন্ত রসূল সা. তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (রজম) শাস্তি দেয়ার রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করার সময় তিনি কিছুক্ষণ অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ছুটে পালাতে লাগলেন এবং এমন কিছু কথাও বললেন, যা দ্বারা অপরাধ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির অবকাশ দেখা দেয়।

আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে : "হযরত মাগেরকে পাথর মেরে হত্যাকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম মারতে শুরু করলাম। পাথরের আঘাত অনুভব করে তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন। তোমরা আমাকে রসূল সা.-এর নিকট

ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে খুন করেছে। তারা আমাকে ধোকা দিয়েছে। তারা বলেছিল যে, রসূল সা. আমাকে হত্যা করবেননা।"

এ ধরনের আরো হাদিস রয়েছে, যা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত মাগের পালাবার এবং শাস্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর একবার রসূল সা.-এর কাছে যাওয়ার এবং নিজের ব্যাপারে আরো সাফাই বা ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক এও তিনি চেয়েছিলেন। এক হিসেবে এভাবে তিনি তার অপরাধের সাবেক স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে। আর না হোক, অন্তত নিজের দেয়া জবানবন্দীতে তিনি কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য রসূল সা. পরে এসব বিবরণ শুনে বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেনা কেনো? অর্থাৎ তাকে আমার কাছে এসে পুনরায় জবানবন্দী দিতে দিলেনা কেনো? এ থেকে বুঝা যায়না যে রসূল সা. তার প্রাণদন্ড মওকুফ করেই দিতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো তাঁর সর্বশেষ ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য শুনেই নেয়া হতো। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি তাকে সাফাই ব্যাখ্যা দানের শেষ সুযোগ দেয়া জরুরি মনে করেছিলেন। হযরত জাবিরের উপরোক্ত হাদিসের শেষাংশে তিনি নিজে বলেন :

قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاما ترك حد فلا-

রসূল সা. বললেন : "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেনা কেনো এবং আমার কাছে নিয়ে এলেনা কেনো?" রসূল সা.-এর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তিনি পুনরায় তার বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালাতেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি তার শাস্তি মওকুফ করেই দিতেন।

আমাদের মতে হযরত জাবিরের এই ব্যাখ্যাই এ ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যা। এ থেকে শরিয়তের এরূপ বিধি প্রণয়ন করার অবকাশ রয়েছে এবং অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহ করেছেন যে, আসামীর বিষয়ে যদি আর কোনো সাক্ষ্য না থাকে এবং সে অপরাধের স্বীকারোক্তি করে তা প্রত্যাহার করে, তবে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তার যে দৈহিক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা স্বীকারোক্তির পর তা প্রত্যাহার করলে অবশ্যই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সন্দেহ সংশয় দ্বারা শরিয়তের শাস্তি মওকূফ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় যে হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, সেটি হযরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত। এতে বলা হয়েছে, রসূল সা.-এর নিকট চুরির অভিযোগে ধৃত এক মহিলাকে আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি চুরি করেছো? সে কোনো জবাব দেয়ার আগেই তিনি আবার বললেন 'বল, না।' এ হাদিস হয়তো কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণের মতে মারফু এবং এর সনদের ধারাবাহিকতা স্বয়ং

রসূল সা. পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু অধিকাংশ সুদক্ষ হাদিস বিশারদ ও সমালোচকের মতে এ হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা হযরত আবু দারদা পর্যন্ত গিয়েই থেমে আছে। তার পরবর্তী সনদ বিশুদ্ধ নয়। হাফেয ইবনে হাজর স্বীয় গ্রন্থ 'আত্ তালখীসুল জাবীরের' কিতাবুল হুদুদ-এ [অর্থাৎ ফৌজদারি দন্ডবিধি সংক্রান্ত অধ্যায়ে] বলেন :

وقوله قل' لا لم يصححه الائمة فيبقى اللفظ على صحته قوله "ما اخالك سرقت"

হাদিসটির এ অংশকে ইমামগণ সঠিক মনে করেননা যে, তিনি ঐ মহিলাকে বলেছেন 'বল, না।' (অর্থাৎ আমি চুরি করিনি) বর্ণনা থেকে রসূল সা. শুধু এ কথা বলেছিলেন : "আমার তো মনে হয়না তুমি চুরি করে থাকবে।" কাযী বশীর আহমদ সাহেব সুনানে বায়হাকীর বরাত দিয়েছেন 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থ থেকে। এটি হাফেজ ইবনে হাজার রচিত 'বুলুগুল মুরাম' এর ব্যাখ্যা। এ মুহূর্তে আমার কাছে সুনানে বায়হাকী বা সুবুলুস সালাম নেই। তবে হাফেজ ইবনে হাজর তালখীসের এই জায়গাটাতেই যে ভাষায় এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে তো মনে হয় যে, সরাসরি রসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমন ধারাবাহিক সনদে বায়হাকী এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন : "বায়হাকী এ হাদিসটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে এর সনদ হযরত আবু দারদা পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেছে।" স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজর 'বুলুগুল মুরামে' চুরির শাস্তি অধ্যায়ে শুধু এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, "রসূল সা.-এর নিকট এক চোরকে ধরে আনা হলো। তার কাছে চুরির মাল পাওয়া যায়নি। রসূল সা. তাকে বললেন আমার মনে হয়না যে তুমি চুরি করেছো।" এটি একটি ভিন্ন হাদিস, যার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আবু দারদা বর্ণিত হাদিসের সাথে এটির শাব্দিক মিলও নেই। মোদ্দাকথা হলো, রসূল সা. কর্তৃক কোনো চোরকে 'তুমি বল আমি চুরি করিনি' বলা আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়নি। চুরির অভিযোগে ধৃত যে ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন যে, আমার মনে হয়না তুমি চুরি করেছো, তার কাছ থেকে চোরাই মালও উদ্ধার হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এমন কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়না। সম্ভবত শুধুমাত্র বাদীর কথায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এরপর আপনার আর মাত্র একটা আপত্তির মীমাংসা বাকি আছে। সেটি এই যে, তরজমানুল কুরআনের জানুয়ারি সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠায় সাক্ষ্যের মেয়াদের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তা লুকানোর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারাও অপরাধ প্রবণতা উৎসাহিত হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। যদি আবারও সবিস্তারে আলোচনা করি তবে আরো দীর্ঘায়িত হবে। আপাতত সংক্ষেপে শুধু এতোটুকু বলতে চাই যে, লেখক স্বীয় পুস্তক বিশেষত তার মূল অংশ হানাফি মাযহাব অনুসারেই লিখেছেন। অন্যান্য মাযহাব নিয়ে

তেমন কিছু লেখেননি। তাই আলোচ্য নিবন্ধে যেসব ফেকাহ শাস্ত্রীয় মাসয়ালা ও খুঁটিনাটি বিধি সন্নিবেশ করেছেন, তার উপর সকল ইমাম ও ফকীহকে একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের দেশের আলেমগণ সম্মিলিত হয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা গবেষণা চালাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ এই বিধিটাই ধরা যাক যে, চুরি, মদ্যপান ও ব্যভিচারের মামলায় সাক্ষীকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হবে। নচেত তার সাক্ষ্য শ্রবণ ও গ্রহণযোগ্য হবেনা। অবশ্য বিলম্বের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করলে সাক্ষ্য শোনা ও গ্রহণ করা হবে। আজকাল পুলিশের তদন্ত চার্জশিট প্রদান ও আদালতি কার্যক্রমের যে রীতি চালু রয়েছে, তাতে সাক্ষ্য প্রদানের মেয়াদের ক্ষেত্রে তারা এরূপ কড়াকড়ি আরোপ করলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হতে পারে। তাছাড়া এ বিধিটা কেবলমাত্র কার্যপ্রণালীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় এতে রদবদলের অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে খোদ হানাফি ফেকাহবিদদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে ফৌজদারী দন্ডবিধি অধ্যায়ে ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"জ্ঞাতব্য যে, ইমাম হানিফার মতে সাক্ষ্য শ্রবণের মেয়াদ কি হবে এবং সে মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে কি করতে হবে, সেটা প্রত্যেক যুগে বিচারপতির বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।"

অনুরূপভাবে নিবন্ধটিতে যেভাবে অপরাধ চেপে রাখাকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে এবং এক মাসের পরে সাক্ষ্য দানকারীকে ফাসেক ও অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে, তাও বিবেচনা সাপেক্ষ এবং এ বক্তব্যকে ঢালাওভাবে সমর্থন করা কঠিন। হাদিসে মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, তা সত্য কিন্তু এ মূলনীতিকে প্রত্যেক অপরাধ ও অপরাধীর বেলায় প্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন রয়েছে যেখানে সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়না। যেমন ব্যভিচারের দন্ড বিধান করতে চারজন সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু ব্যভিচার একজন সাক্ষীর সামনে সংঘটিত হয়ে বসলো এবং ব্যভিচারী অপরাধের কথা স্বীকার করবে কিনা নিশ্চিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত একক সাক্ষীর পক্ষে ঘটনা চেপে রাখা ও নিরব থাকাই উত্তম। নচেত অশ্লীলতার প্রচার করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবেনা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সকল অপরাধ ধামাচাপা দেয়া অপরাধের সাথে আপোস করা ও সাক্ষ্য গোপন করার নামান্তর, যা কুরআন ও সুন্নাহর বহু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে নিন্দিত হয়েছে। স্বয়ং হানাফি ফকীহগণ সাক্ষ্যের যে মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন তা থেকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের সাক্ষ্যদানকে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা তাদের মতে এ ক্ষেত্রে হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ মানবাধিকারও জড়িত। অথচ অন্যান্য অপরাধ যথা চুরি ও ব্যভিচারের ব্যাপারেও এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে,

এগুলোর একটা দিক মানবাধিকারের সাথে জড়িত। হেদায়ার যে স্থানে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের মেয়াদ শিথিলযোগ্য বলা হয়েছে, ঠিক সেই স্থানেই ইমাম শাফেয়ীর ভিন্নমত তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী কোনো অপরাধকেই নিছক আল্লাহর অধিকার পদদলিত করা মনে করেননা, বরং একদিক দিয়ে তাকে মানবাধিকারের সাথেও সংশ্লিষ্ট মনে করেন। এ জন্য সাক্ষ্য দানের মেয়াদ নির্ধারণ করাকে তিনি সমর্থন করেননা। এ ব্যাপারে শুধু ইমাম শাফেয়ী কেন, অন্যান্য ইমামগণও হানাফিদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' গ্রন্থের ৫ম খন্ডে ফৌজদারী দন্ডবিধি অধ্যায়ে, ৭২ পৃষ্ঠায় আল্লামা আব্দুর রহমান আল জাযিরী সাক্ষ্যদানের কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট নেই। শিরোনামে বলেন :

"মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত এই যে, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ ও মদ্যপানের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দীর্ঘকাল পরেও সাক্ষ্য শ্রবণযোগ্য। কারণ সাক্ষ্য প্রদানের পর দন্ড কার্যকর হওয়া একটা আইনসম্মত অধিকার। এই অধিকারকে বাতিল করতে পারে, এমন কোনো দলিল আমাদের কাছে নেই।" *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৭৮]*

[২]

প্রশ্ন : আমি তরজমানুল কুরআনের জুলাই, ১৯৭৮ সংখ্যায় আপনার "ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি সম্পর্কে কতিপয় ব্যাখ্যা" শীর্ষক জবাব পড়েছি। অত:পর আমি মিশকাত শরিফ, আবু দাউদ শরিফ ও অন্য কয়েকটি হাদিস গ্রন্থে এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোও অধ্যায়ন করেছি। এর ফলে আমার মনে আরো কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। রসূল সা. যে মহিলাকে চুরির অপরাধে হাতকাটার শাস্তি দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে যে, সে কোনো গহনা বা অন্য কোনো জিনিস ধার নিয়েছিল। পরে তা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাত করে। এ জন্য সে হাতকাটা দন্ড ভোগ করে। প্রশ্ন এই যে, কোনো জিনিস চেয়ে আনার পর ফেরত দিতে অস্বীকার করলে তাও কি চুরির পর্যায়ে পড়ে এবং সে জন্য চুরির শাস্তি হাতকাটা কার্যকর হতে পারে? আবু দাউদ শরিফে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই মহিলাকে শাস্তি দেয়ার আগে রসূল সা. বলেছিলেন, যে মহিলা এ অপরাধ করেছে সে কি তওবা করবে? কিন্তু সে যখন তওবা করলো না তখন তাকে শাস্তি দেয়া হলো। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, তওবা দ্বারা চুরির শাস্তি বা শরিয়ত নির্ধারিত অন্য কোনো শাস্তি রহিত হতে পারে কি? এই হাদিস কয়টি থেকে স্পষ্ট উল্লেখিত প্রশ্ন কয়টির জবাবও তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে দিলে খুবই ভালো হয়।

জবাব : হাতকাটার শাস্তি প্রয়োগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে ঘটনা রসূল সা.-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি ছিলো বনি মাখযুম গোত্রের এ মহিলা সংক্রান্ত। এ কথা

সত্য যে, তার সম্পর্কে কিছু কিছু হাদিসে বলা হয়েছে যে, সে গহনা ইত্যাদি ধার নিয়ে যেতো এবং পরে তা অস্বীকার করতো। কোনো কোনো হাদিসে চেয়ে নেয়ার পরিবর্তে চুরি করার উল্লেখ রয়েছে। এসব জবাবের কিছু প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

সর্বপ্রথম যে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো এই যে, বিশুদ্ধতম হাদিসসমূহে চেয়ে নেয়ার পরিবর্তে চুরি করার কথাই বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বুখারি শরিফের ফৌজদারি দন্ডবিধি সংক্রান্ত অধ্যায়ে শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ অবাঞ্ছিত শিরোনামে একটিমাত্র হাদিসই ইমাম বুখারি উদ্ধৃত করেছেন। সে হাদিসটির ভাষান্তর নিম্নরূপ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরাইশ গোত্র চুরির অপরাধে ধৃত এই মাখযুমী মহিলা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলো। তারা বলাবলি করছিল যে, রসূলুল্লাহ সা.-এর অতীব প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে সাহসি হবেনা। তাই হযরত রসূল সা.-এর সাথে আলোচনা করতে গেলে তিনি বললেন, "আল্লাহর ঘোষিত শাস্তি সমূহের ব্যাপারে কি তুমি সুপারিশ করতে এসেছো?" অত:পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিতে লাগলেন। "হে জনমণ্ডলী! তোমাদের পূর্বতন লোকেরা এ জন্যই গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মদ সা.-এর কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।"

এ হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং অকাট্যভাবে বারবার চুরি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায় যে, ঐ মহিলা চুরিই করেছিল এবং চুরির অপরাধেই তার হাত কাটা হয়েছিল। হতে পারে যে, চুরির সাথে সাথে তার ধার করে আনা জিনিসপত্র আত্মসাত করারও অভ্যাস ছিলো। কিন্তু চুরির অপরাধি হবার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ধার করা জিনিস আত্মসাত করার উপর চুরি শব্দটির প্রয়োগ আরবি ভাষায় নেই। অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুসারে এই মহিলার নাম ছিলো ফাতিমা। আর এ ঘটনার সময় রসূল সা.-এর কন্যাদের মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতিমাই জীবিত ছিলেন। তাই তিনি বিশেষভাবে তার নাম উল্লেখ করেন। চুরির অপরাধে দন্ডিত এই ফাতিমা বিশিষ্ট সাহাবি এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার সাবেক স্বামী হযরত আবু সালমার ভ্রাতৃত্ব কন্যা ছিলো। হযরত আয়েশা রা. এ কথাও বলেছেন যে, এই মহিলা পরে খাঁটি মনে তওবা করে বিয়ে করেছিল। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে রসূল সা.-এর উপদেশ ও নির্দেশ লাভের জন্য আমার কাছে আসতেন। আমি রসূল সা.-এর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকে জবাব দিতাম। অধিকাংশ মুহাদ্দিস চুরির বদলে ধার গ্রহণ

সম্বলিত বর্ণনাকে বিরল বর্ণনা আখ্যায়িত করে অগ্রাহ্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজর ইমাম কুরতুবীর বরাত দিয়ে লিখেছেন :

"ধার করে এনে অস্বীকার ও আত্মসাত করার বর্ণনার চেয়ে চুরি সংক্রান্ত বর্ণনাই সমধিক পরিচিত ও বিশুদ্ধ।"

মুসলিম শরিফ ও আবু দাউদ শরিফেও উভয় ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইমাম নববী এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

"আলেমগণের মতে এসব হাদিসের তাৎপর্য এই যে, ঐ মহিলা চুরির কারণেই হাতকাটা দন্ড পেয়েছিল। জিনিসপত্র ধার করার বিষয়টি তার একটা অতিরিক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম এ ঘটনা সংক্রান্ত সবক'টি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু হাতকাটার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, শাস্তিটা চুরির কারণেই কার্যকর হয়েছিল। এ থেকে জানা যায় হাতকাটার শাস্তি প্রদানের ঘটনা একটাই এবং তা এই মহিলা সংক্রান্ত। যদিও কোনো কোনো আলেম একথাও বলেছেন যে, এই মর্মে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত বিরল এবং অধিকাংশ রাবীর বর্ণিত হাদিসের বিরোধী। তাই এটা আমলযোগ্য নয়। অধিকাংশ আলেমদের অভিমত এই যে, ধার করা জিনিস আত্মসাত করার জন্য হাত কাটা হয়নি।"

ইমাম আবু দাউদ ধার করা জিনিস অস্বীকার ও আত্মসাত করা সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন বটে। তবে তার ব্যাখ্যায় মাওলানা শামসুল হক স্বীয় গ্রন্থ আউনুল মাবুদে ইমাম যায়লায়ীর বরাত দিয়ে বলেছেন যে :

"এটা সুবিদিত যে, অন্যের জিনিসপত্র ধার করে নেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বলেই এ বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। মাখযুমী হওয়াটা যেমন তার বংশীয় পরিচয় ছিলো, তেমনি চেয়ে ধার আনা জিনিস আত্মসাত করা তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে চুরি করে বসলো। ফলে রসূল সা. তার হাত কেটে দিলেন।"

আবু দাউদ শরিফের অপর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'মায়ালিমুস সুনানে' ইমাম খাত্তাবীও প্রায় অনুরূপ বক্তব্যই রেখেছেন। তিনি বলেছেন :

"আলোচ্য হাদিসটিতে ধারে জিনিসপত্র নিয়ে অস্বীকার ও আত্মসাত করার উল্লেখ রয়েছে। যাতে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে চেনা যায়। কেননা তার মাখযুমী বংশ পরিচয়টি যেমন সর্বজনবিদিত ছিলো, তেমনি তার এই বদঅভ্যাসটিও সকলের কাছে পরিচিত ছিলো। আর এই বদঅভ্যাসটি ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে চুরির আকার ধারণ করে এবং চুরি করার ধৃষ্টতা দেখায়।"

হাফেয ইবনে হাজর ফাতহুল বারীতে এই হাদিসগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইমাম কুরতুবীর যে বক্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি তিনি

শুরুতেই তুলে ধরেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কুরতুবীর বরাত দিয়েই আরো কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাত কাটার শাস্তি চুরির কারণেই দেয়া হয়েছিল। যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত হাদিসের শেষের এই উক্তিটি যে, "মুহাম্মদ সা.-এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম" অকাট্যভাবে প্রমান করে যে, চুরির কারণেই হাতকাটা হয়েছিল। যদি ধার করে আনা জিনিস অস্বীকার করার কারণে হাত কাটা হতো, তা হলে চুরির উল্লেখ করার প্রয়োজন হতোনা। সে ক্ষেত্রে রসূল সা. বলতেন :

لو ان فاطمة جحدت العارية

"ফাতিমা রা.ও যদি ধার করে আনা জিনিস অস্বীকার করতো... ।"

দ্বিতীয়ত হাতকাটার শাস্তিটা যদি ধার জিনিস অস্বীকার ও আত্মসাতের কারণে দেয়া হতো, তাহলে এ ধরনের অপরাধের জন্য হাতকাটা শাস্তি স্থায়ীভাবে চালু হয়ে যেতো। যে কোনো ব্যক্তির কাছে অন্য কারো কোনো জিনিস পাওনা থাকলে এবং সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেই অমনি তার উপর নেমে আসতো হাতকাটা শাস্তি। চাই সে ঐ জিনিস ধার করে এনে থাক, বা অন্য কোনো পন্থায় তার দায়ভুক্ত হোক।

তৃতীয়ত : যদি ধার করে আনা জিনিস সংক্রান্ত হাদিসের এই মর্ম গ্রহণ করা হয় যে, তার আলোকে ধার চেয়ে আনা জিনিস ফেরত দিতে অস্বীকার করলেই হাতকাটা অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে সেটা রসূল সা.-এর নিম্নোক্ত অকাট্য হাদিসের বিরুদ্ধে যায় :

ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع

"গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাতকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীর হাত কাটতে হবেনা।"

হাফেয ইবনে হাজর কুরতুবীর এই যুক্তিগুলোর পর্যালোচনা করে আরো বলেন "আত্মসাতকারী এবং ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, তাদের হাতকাটা হবেনা যতোক্ষণ না সেটা ডাকাতি ও রাহাজানির পর্যায়ে পড়ে। (অবশ্য আত্মসাত প্রভৃতি অপরাধে অন্য কোনো দমনমূলক বা নিরোধমূলক শাস্তি বা জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে।)"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদিসে যেখানেই হাতকাটার শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, সেখানে উক্ত শাস্তি চুরির সাথেই সম্পৃক্ত অন্য কোনো ধরনের খেয়ানত বা জবরদখলের সাথে নয়। পবিত্র কুরআনেও والسارق والسارقة শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা সর্বসম্মতভাবে কেবল চোর নারী ও পুরুষ বুঝায়। এই সাথে হাদিসে হাতকাটার জন্য অতিরিক্ত কিছু শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করা

হয়েছে, যার আলোক ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ সুদূরপ্রসারী বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। যেমন চোরাই মাল সুরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হওয়া চাই, দ্রুত নষ্ট হওয়ার যোগ্য জিনিস না হওয়া চাই। তার মূল্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম না হওয়া চাই। তার মালিকানায় চোরের কোনো অংশ না থাকা চাই ইত্যাদি। এ সব বিধির বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার এখানে অবকাশ নেই।

এবার হাদিসের একটি অংশের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই অংশটিতে বলা হয়েছে যে, রসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন অপহরণকারিনী মহিলা কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করতে প্রস্তুত আছে? কিন্তু এর উত্তরে মহিলা উঠলো না এবং কোনো কথাও বললোনা।

হাদিসের এই অংশটি সম্পর্কে সর্বাগ্রে যে কথা বলা হয়েছে তা এই যে, এই শেষোক্ত কথাগুলো এক মহিলা বর্ণনাকারী সফিয়া বিনতে আবি উবাইদ হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরা দু'জন সমসাময়িক এবং সফিয়া সরাসরি ইবনে উমারের মুখ থেকে হাদিস শুনেছেন। তাই সনদের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার কারণে হাদিসটিতে দুর্বলতা বা খুঁত রয়েছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্তি কার্যকর করার আগে রসূল সা. যদি তাকে তওবা করতে বলে থাকেন, তবে তা দ্বারা এ কথা বুঝা যায়না যে, তওবা করেই শাস্তি মাফ হয়ে যেতো। কোনো কোনো টীকাকার এরূপ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, রসূল সা. স্বয়ং ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস ও রচয়িতা হবার সুবাদে তওবার পর শাস্তি কার্যকর নাও করতে পারতেন। তবে এই ক্ষমতা স্বয়ং রসূল সা.-এর ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কারো নেই। যাই হোক, এটা একটা বাস্তব সত্য যে, রসূল সা. ইসলামি দন্ডবিধির ব্যাপারে এ ধরনের ক্ষমতা কখনো প্রয়োগ করেননি।

কুরআন ও হাদিসের অন্যান্য অকাট্য উক্তি থেকেও এ কথাই জানা যায় যে, কেবলমাত্র তওবা দ্বারা সূরা মায়েদায় বর্ণিত সশস্ত্র বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টির পার্থিব শাস্তিই শুধু ক্ষমা করা যেতে পারে। আর এই ক্ষমার জন্যও কুরআন এই শর্ত আরোপ করেছে যে, এই অপরাধ সংঘটনকারী, যাকে ফেকাহ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দস্যু বা ডাকাত বলা হয়, ধরা পড়া বা নাগালের মধ্যে আসার আগেই তওবা করে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। রসূল সা. নিজের উপস্থিতিতে যেসব অপরাধের শাস্তি কার্যকর করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত অপরাধীকে তওবা করতে বলতেন। তওবা করার এই উপদেশ ও প্রেরণাদানের অবকাশ শাস্তি কার্যকর করার আগেও ছিলো আর মৃত্যুদন্ড না হলে শাস্তি প্রয়োগের পরেও ছিলো। কোনো কোনো সময় রসূল সা. শাস্তি প্রয়োগের পরে তওবা করিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় হয়তো রসূল সা. শাস্তি কার্যকর করার আগে তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তওবার পরে শাস্তি কার্যকর করার ইচ্ছে পোষণ

করতেন। হাদিসের এ অংশে মাখযুমী মহিলাকে এমন কথা বলা হয়নি যে, তুমি যদি তওবা কর তবে পার্থিব সাজা থেকে রেহাই পাবে। হাদিসের এ অংশটির ভাষা এরূপ :

هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله

"কোনো মহিলা কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করতে প্রস্তুত আছে?"

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, একনিষ্ঠ তওবা ছাড়া অপরাধীর পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের আর কোনো উপায় নেই। অপরাধী যদি সাচ্চা দিলে তওবা না করে এবং দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরে যায়, মনে মনে ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়। তাহলে তার পক্ষে দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা আখেরাতের আযাব থেকে নিস্তার পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করা কঠিন। কিন্তু কোনো অপরাধীকে এরূপ বলা যে 'তুমি তওবা করলে তোমার শাস্তি রহিত করা হবে' শরিয়তের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। বিশেষত দাগি ও ঝানু অপরাধী কিংবা অপরাধ সংঘটিত করেও তা অস্বীকার করে এমন দুর্বৃত্তকে এ ধরনের আশ্বাস দেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে নিতান্ত অবিজ্ঞসুলভ কাজ। রসূল সা. যদি তওবা ও সৎপথে ফিরে আসার পর কোনো অপরাধীর আইনানুগ শাস্তি ক্ষমা করতেন, তাহলে এই ক্ষমার সবচেয়ে যোগ্য বিবেচিত হতেন সেইসব মহান সাহাবি, যারা স্বয়ং রসূল সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বারংবার এবং দৃঢ়তার সাথে নিজের কৃত পাপের স্বীকারোক্তি করেছিলেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত মাগের বিন মালেক এবং গামেদিয়া গোত্রের সেই মহীয়সী মহিলা, যিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যুদন্ড গ্রহণের জন্য প্রথমে সন্তান প্রসবের পর এবং তার পরে পুনরায় শিশুর দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ শেষে নিজেকে সমর্পণ করেন। তাদেরকে যদি তওবা না করানো হয়ে থাকে অথবা তওবা করানোর বিষয় হাদিসে উল্লেখ না থেকে থাকে, তাহলেও তাদের এই মৃত্যুদন্ডের জন্য আত্মসমর্পণ করা এবং পুন:পুন: আত্মসমর্পণ করাটাই এমন এক বাস্তব ও খালেস তওবা, যার পরে মৌখিক তওবার আর কোনো প্রয়োজন পড়েনা। বস্তুত এ জন্যই তাদের সম্পর্কে রসূল সা. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, তারা এমন তওবা করেছে, যা তাদের সমগ্র গোত্রে কিংবা সমগ্র নগরীতে বন্টন করে দিলেও সকলেই ক্ষমা পেয়ে যাবে, চাই যতো বড় গুণাহগারই থাক না কেনো। আর মহিলা সম্পর্কে বলেছেন যে, সে যে নিজের প্রিয় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে এর চেয়ে বড় তওবা আর কি হতে পারে। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৭৯]*

২৮. বেতের নামাযে দোয়া কুনূত

প্রশ্ন ১. খুতুবাত (হাকিকত সিরিজ) ১৯৭৪ সালের আগষ্টে মুদ্রিত ২৩তম সংস্করণ– এর ১৫৬ পৃষ্ঠায় যে দোয়া কুনূত লেখা রয়েছে তাতে প্রচলিত দোয়া

কুনূতের চেয়ে দুটো শব্দ বেশি রয়েছে : (১) প্রথম লাইনে نستهديك শব্দটি (২) তৃতীয় লাইনে كله শব্দটি। খুতুবাত ২য় খন্ডের নবম সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠায় যে দোয়া কুনূত লেখা রয়েছে, তাতে উল্লেখিত দুটো শব্দ ছাড়া الجد শব্দটিও অতিরিক্ত রয়েছে। এটি দোয়ার শেষে بالكفار ملحق এর আগে লেখা রয়েছে।

উল্লেখিত শব্দগুলো যদি দোয়া কুনূতেরই অংশ হয়ে থাকে তবে তার দলিল কি? তাছাড়া আহলে হাদিস মতের অনুসারীরা রুকুর পর হাত উঠিয়ে ভিন্ন রকমের দোয়া পড়ে থাকেন। এটাই বা কোথা থেকে প্রমাণিত হয়? অনুগ্রহপূর্বক ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করুন, যাতে মনের দ্বিধা সংশয় দূরীভূত হয়।

জবাব : বেতের নামাযের শেষ রাকাতে যে দোয়া কুনূত পড়া হয়, তা হাদিসে একাধিকভাবে উল্লেখিত রয়েছে। এর সনদ যদিও বিশুদ্ধভাবে সর্বোচ্চ মানে উত্তির্ণ নয়। তথাপি অধিকাংশ হাদিসবেত্তা ও ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ সেগুলোকে মেনে নিয়েছেন ও তদনুসারে কাজ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি গোষ্ঠিও বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে নামাযের কোন পর্যায়ে তা পড়তেন এবং কি ভাষায় পড়তেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হানাফি মাযহাবে দোয়া কুনূত রুকুর আগে এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে রুকুর পরে পড়া সুন্নাহসিদ্ধ রীতি। শেখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী স্বীয় গ্রন্থ 'সালাতুন্নবী'তে ইবনে আবি শায়বা, আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, তাবরানী, বায়হাকী প্রভৃতির বরাত দিয়ে লিখেছেন :

"রসূল সা. কখনো কখনো বেতেরের শেষ রাকাতে রুকুর আগে দোয়া কুনূত পড়তেন।"

'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' (চার মাযহাবের ফেকাহ) গ্রন্থে হানাফি মাযহাবের ওয়াজিব দোয়া কুনূত হযরত ইবনে মাসউদের বরাতে নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّه وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ –

'মুনিয়াতুল মুসাল্লি' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'গুনিয়াতুল মুসতামলী' হানাফি মাযহাবের একখানি প্রামাণ্য নামায সংক্রান্ত গ্রন্থ। এটি 'আশশারহুল কবির' বা 'কবিরি' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

এতে দোয়া কুনূতের ভাষা অবিকল উপরোক্ত দোয়া কুনূতের অনুরূপ, যা আপনি 'খুতুবাত'-এর নবম সংস্করণ থেকে তুলে দিয়েছেন। হেদায়ার ব্যাখ্যা 'ফাতহুল

ক্বাদিরে' মারাসিলে আবু দাউদের বরাত দিয়ে হযরত খালেদ বিন আবি ইমরান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরীল আ. রসূল সা.-কে নিম্নরূপ দোয়া কুনূত শিক্ষা দিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

এ দোয়া ও পূর্বোক্ত দোয়াতে অল্পবিস্তর শাব্দিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। এরপর 'ফাতহুল ক্বাদির' প্রণেতা ইমাম ইবনে হুমাম আরো বলেন "নামাযী যদি উপরোক্ত দোয়া ছাড়া অন্য কোনো দোয়া পড়ে তাহলেও চলবে।"

তবে এর পরে রসূল সা. কর্তৃক হযরত ইমাম হাসানকে শিখানো নিম্নোক্ত দোয়া কুনূতটাও পড়া উত্তম :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ

কবিরিতে তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজার বরাত দিয়ে বেতেরের নিম্নোক্ত দোয়াও লিপিবদ্ধ রয়েছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ –

কবিরির গ্রন্থকার শেখ ইবরাহীম হালবি এ কথাও বলেন যে : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ এর সাথে সেই দোয়াটিও মিলিয়ে পড়লে ভালো হয় যা রসূল সা. ইমাম হাসান রা. কে শিখিয়েছেন। সেই দোয়াটি হলো :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ

অত:পর শেখ হালবি লিখেছেন :

"উল্লেখিত দোয়াগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো দোয়াও পড়া যেতে পারে। তবে তা এমন হওয়া চাই যেনো মানুষের সাধারণ কথাবার্তার সাথে তার সাদৃশ্য না থাকে।"

এই সংক্ষিপ্ত জবাব থেকে আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, বেতেরে দোয়া কুনূত রুকুর আগেও পড়া চলে, রুকুর পরেও পড়া চলে। আহলে হাদিস অনুসারীগণ যে দোয়া পড়েন এবং হানাফিগণ যে দোয়া পড়েন, উভয়টিই হাদিস থেকে প্রমাণিত। বরঞ্চ হানাফিগণ উভয়টি পড়াই উত্তম মনে করেন। 'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হাম্বলীদের নিকট যে দোয়া কুনূত প্রচলিত ও উত্তম তা নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلُّه وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّكَ نَعْبُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

এর অব্যবহিত পরেই হযরত হাসান রা. থেকে বর্ণিত, দোয়াটি উদ্ধৃত রয়েছে। অত:পর ফাতহুল কাদিরে উল্লেখিত দোয়া اِنَّا نَعُوْذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ উদ্ধৃত রয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, হাম্বলী মাযহাবের মতানুসারে হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো উত্তম বিবেচিত হলেও অন্য কোনো দোয়া পড়াতেও আপত্তি নেই। মোটকথা, ভাষাগত দিক দিয়ে হানাফি ও হাম্বলীদের দোয়া কুনূতে তেমন কোনো প্রভেদ নেই। অবশ্য হাম্বলীগণ রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়া উত্তম মনে করেন, দোয়াতে হাত জোড় করে উত্তোলন করেন এবং দোয়া শেষে মুখে হাত ফেরান, ঠিক যেমনটি আমাদের অঞ্চলে আহলে হাদিস গোষ্ঠি করে থাকেন। তাদের যুক্তি এই যে, দোয়ায় হাত উঠানো এবং তা মুখে ফেরানো সুন্নত তরিকা এবং কোনো কোনো সাহাবি এরূপ করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। হানাফিদের বক্তব্য এই যে, নামাযের অন্যান্য দোয়া যেমন হাত না তুলে পড়তে হয়, দোয়া কুনূতও তেমনিভাবে পড়তে হবে। ইমাম বায়হাকীসহ কেউ কেউ বলেন, হাত তুলতে হবে তবে মুখে ফেরাতে হবে না। আমরা মনে করি, এগুলো নিতান্তই খুঁটিনাটি মতভেদ। এতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি দিতে পারেন এবং প্রত্যেক মতই সঠিক ও বৈধ। *[তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৭৮]*

২৯. লাইসেন্স ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। বিগত কয়েক মাস ধরে এ ব্যবসায়ে এক নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে। এই নতুন ধারা সম্পর্কে আমার বিবেক শুধু দ্বিধাগ্রস্তই নয়, বরং আমার অনেকটা নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ওটা হারাম। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

বিষয়টি হলো, বর্তমান সরকার সংবাদপত্র মালিকদের প্রবল দাবির মুখে তাদেরকে নিউজপ্রিন্ট কাগজ আমদানি করার অবাধ অনুমতি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনের মাত্রার তারতম্য ছাড়াই প্রত্যেক ছোট বড় পত্রপত্রিকা ইত্যাদিকে এককথায় যে কোনো ডিক্লারেশনের অধিকারীকে অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে যাতে সে যতো খুশি নিউজপ্রিন্ট আমদানি করতে পারে। এ ব্যাপারে যে নির্দেশ জারি হয়েছে, দৃশ্যত তার উদ্দেশ্য হলো, নিউজপ্রিন্ট খরিদ্দাররা যেনো সস্তা দামে কাগজ পায় এবং তার পরিমাণের দিক দিয়েও তারা যেনো বিগত আমলের ন্যায় সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকে।

কিন্তু যেভাবে লাইসেন্স দেয়া চলছে তাতে মনে হয়, সংশ্লিষ্ট মহল যাতে নিজ প্রয়োজনের অজুহাতে কাগজ আমদানি করে বাজারে প্রচলিত মূল্যে বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, এখন যার কাছেই পত্রিকার ডিক্লারেশন আছে, সে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত দিয়ে মোটা অংকের লাইসেন্স বাগিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সেই লাইসেন্স দিয়ে কাগজ আমদানি করার পরিবর্তে বাজারে শতকরা ১০ ভাগ, ১২ ভাগ অথবা প্রচলিত হারে কেবল লাইসেন্সটাই বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। লাইসেন্সধারী লাইসেন্স বিক্রেতাকে এই মর্মে একটা মুক্তারনামা দিয়ে দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অত্র লাইসেন্সের ব্যাংক ও কাস্টম সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যত এটাই প্রকাশ পায় যে, যার নামে লাইসেন্স রয়েছে, লেটার অব ক্রেডিটও তার নামেই, এবং দৃশ্যত মালও সেই আমদানি করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, লাইসেন্সধারী কেবল লাইসেন্সের দামটা হস্তগত করেই সেটকে পড়ে। এরপর কার্যত লাইসেন্সের ভিত্তিতে মাল আমদানি করা, তা বিক্রি করা এবং লাভ, লোকসানের যাবতীয় দায়দায়িত্ব লাইসেন্স ক্রেতার ঘাড়ে চাপে।

যেসব কারণে আমি এই ক্রয় বিক্রয়ের গোটা কার্যক্রমকে (প্রথমত লাইসেন্স কেনাবেচা এবং তারপর সেই খরিদ করা লাইসেন্সের ভিত্তিতে মাল আমদানি করা) নাজায়েয বা হারাম মনে করি তা নিম্নরূপ :

১. এতে কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তুর বেচাকেনা হয়না, বরং মৌলিকভাবে ও প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র লাইসেন্সই বিক্রি হয়। (এমনকি এই লাইসেন্সের ভিত্তিতে কি কি দ্রব্য আমদানি করা হবে, কোথা থেকে কি পরিমাণে ও কি দরে আমদানি করা হবে ইত্যাদি বিষয়ের কোনোটাই উল্লেখ করা হয়না।) যে বেচাকেনায় কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তুর লেনদেন হয় না, বহুসংখ্যক হাদিস সে বেচাকেনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তির নামে লাইসেন্স ইস্যু হয়, সে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ যেমন লাইসেন্সের মূল্যের শতকরা দশ ভাগ বা যে পরিমাণ ধার্য হয়, নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। এরপর লাইসেন্স ক্রেতা মাল আমদানি করে। লাভ লোকসানের যাবতীয় দায় তার ঘাড়েই চাপে। এভাবে এই কারবারে সুদ ও জুয়ার সাদৃশ্য নজরে পড়ে।

৩. কাঁচা ফসল কিংবা কাঁচা ফলমূলসহ বৃক্ষের বাগান বিক্রির নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বেশকিছু হাদিস রয়েছে। যদিও মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে বেশকিছু ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগসুবিধা উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে নিরেট কাগুজে লাইসেন্স সেই সুযোগ সুবিধার আওতায় পড়েনা। কাগুজে লাইসেন্স কাঁচা ফসলের পর্যায়ে পড়েনা। কারণ বিক্রয়ের প্রাক্কালে এই লাইসেন্সের ফলের কুঁড়িও জন্মেনা। (উপরে

১ নম্বরে আমি বলেছি যে লাইসেন্সে আমদানিযোগ্য জিনিসের কোনো বিবরণই থাকেনা। কিন্তু কোনো কোনো কারবারি লোক বলেন, পত্রপত্রিকার মালিকদেরকে এই সুযোগ এ জন্যই দেয়া হয় যেনো তারা এর দ্বারা বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। কাজেই সরকারের উদ্দেশ্যই যদি এরূপ থাকে, তাহলে এ ধরনের লাইসেন্স ক্রয় করে তার দ্বারা মাল আমদানি করাতে দোষের কিছু নেই। এ যুক্তিও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়না। সরকারের উদ্দেশ্য যদি এরূপ ধরেও নেয়া হয়, তথাপি নিছক কাগুজে লাইসেন্স কেনাবেচা করা এবং এই কেনা লাইসেন্সের ভিত্তিতে কাগুজে মাল আমদানি করা জায়েয হতে পারে না। অবশ্য মূল লাইসেন্সধারীরা যদি নিজ উদ্যোগে মাল আমদানি করার পর বিক্রি করে, তবে সেটা বিক্রির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। কিন্তু লাইসেন্স বেচাকেনা বৈধ কারবার বলে গণ্য হতে পারেনা।

আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি নিজের গবেষণা ও বিচার বিবেচনার আলোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করবেন। অধিকন্তু জবাবে যদি দলিল প্রমাণের বরাতও উল্লেখ করেন তাহলে আরো ভালো হয়। উপরে যে তিনটি যুক্তি উল্লেখ হলো, তাছাড়া আরো যুক্তি প্রমাণ যদি এ কারবারটির বৈধতা বা অবৈধতা প্রতিপন্ন করার মতো থাকে, তবে তাও উল্লেখ করবেন। অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত জবাব দেবেন।

জবাব : আপনার এ অভিমত শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সঠিক বলে মনে হয় যে, সরকার কতিপয় দ্রব্য আমদানি করার জন্য যে ছাড়পত্র, লাইসেন্স বা পারমিট দেয় এবং যা কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে দেয়া হয়, সেই সব ছাড়পত্র ক্রয় বিক্রয় করা বা কোনো আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা জায়েয নয়। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ ক্রয় বিক্রয়ের যে সাধারণ নীতিগত সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের বিনিময় হওয়া চাই। দ্রব্যের বিনিময়ে যদি এমন মুদ্রা দেয়া হয়, যা প্রচলিত অর্থে মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে সেটাও বৈধ কারবার বলে গণ্য হবে। কিন্তু পারমিট বা লাইসেন্স প্রচলিত অর্থে কিংবা সত্যিকার অর্থে মূল্যমান ধারণ করেনা। তাই তাকে দ্রব্য নামেও আখ্যায়িত করা যায়না, আর তার বিপণন তথা কেনাবেচাও বৈধ হতে পারেনা। লাইসেন্স বা পারমিট আসলে দ্রব্য অর্জনের একটা প্রতিশ্রুতি বা অনুমতি মাত্র। সেই দ্রব্য যতোক্ষণ প্রথম পক্ষের হাতে না আসে, ততোক্ষণ সে এমন একটা জিনিস কিভাবে অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই কিংবা যা এখনো তার দখলে আসেনি। এ ব্যাপারে রসূল সা.-এর নির্দেশাবলী এবং সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মুসলিম শরিফের কিতাবুল বুয়ু (ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়)–এর 'দ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বেচাকেনা অবৈধ' শীর্ষক হাদিসগুচ্ছের একটি হাদিস নিম্নরূপ :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه – قال ابن عباس واحسب كل شيئ لو بمنزلة الطعام–

"হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে, সে যেনো তা হস্তগত না করা পর্যন্ত বিক্রি না করে। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি প্রত্যেক দ্রব্যকেই খাদ্যদ্রব্য মনে করি। পরবর্তীতে মুসলিম শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরো কয়েকটি হাদিসেও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। অত:পর অবিকল আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ হাদিস আমাদের চোখে পড়ে। হাদিসটি নিম্নরূপ :

عن ابي هريرة انه قال لمروان احللت بيع الزبا– فقال لمروان ما فعلت فقال ابو هريرة احللت بيع الصكات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى– فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها– قال سليمان فنظرت الى حرس ياخذونها من ايدى الناس–

"হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি মারওয়ানকে বললেন, তোমরা কি সুদকে হালাল করে নিলে? মারওয়ান বললো আমরা কি করলাম। (অথবা, আমরা তো এমন কিছু করিনি)। হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন তোমরা কাগজে দলিলপত্র বেচাকেনাকে জায়েয করে নিয়েছ। অথচ রসূল সা. কোনো ক্রয় করা জিনিস পুরোপুরি দখলে নেয়া ও হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী সুলায়মান বলেন: এরপর আমি দেখলাম, প্রহরীরা লোকজনের হাত থেকে উক্ত কাগজপত্র ফেরত নিচ্ছে।"

অন্য একটি হাদিস থেকে এ হাদিসটির পুরো ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। হাদিসটি মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে "ইমাম মালেক বর্ণনা করেন, মারওয়ানের শাসনামলে (সমুদ্র তীরবর্তী স্থান) জারে অবস্থিত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের মধ্যে পরোয়ানা বা অনুমতিপত্র বন্টন করা হয়। লোকেরা ঐ শস্য হস্তগত হওয়ার আগেই ঐ সব লিখিত অনুমতিপত্র বেচাকেনা শুরু করে দেয়। হযরত যায়েদ বিন সাবেত ও অপর একজন সাহাবি মারওয়ানের কাছে আসেন এবং বলেন হে মারওয়ানা তুমি কি সুদভিত্তিক লেনদেন হালাল করে দিয়েছ? মারওয়ান বললো : আল্লাহর পানাহ চাই। কেনো কি হয়েছে? উভয় সাহাবি বললেন লোকেরা সরকারের কাছ থেকে এই অনুমতিপত্র কিনেছে। অতপর তার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ না করেই তা বেচে দিয়েছে। এরপর মারওয়ান পুলিশ পাঠিয়ে দেয়? যাদের

জন্য পরিচয়পত্র বন্টন করা হয়েছিল, পুলিশ তাদের খুঁজে বের করে এবং তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে থাকে।"

এসব হাদিসের বক্তব্য ও পূর্বাপর প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা করলে কয়েকটি নিগূঢ় তথ্য অনুধাবন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এখান থেকে এই মৌলিক তত্ত্বটি ফুটে উঠে যে, কোনো শাসকের আমলে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটুক বা যে কোনো প্রথা প্রচলিত হোক তার দায় সরাসরি ঐ শাসকের উপরেই বর্তে, চাই সেটা তার কোনো নির্দিষ্ট আদেশের ভিত্তিতে সংঘটিত হোক বা না হোক। কোনো অনাচার বা অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপ যদি প্রকাশ্যে কোনো প্রশাসকের কার্যকলাপে সংঘটিত হয় এবং প্রশাসক তা রোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঐ অনাচারের জন্য তাকেই দায়ি করা হবে। মারওয়ান মদিনাতে হযরত মুয়াবিয়ার গভর্ণর ছিলেন। তিনি নিজে এই সব পারমিট কেনাবেচা করার অনুমতি দেননি। এমনকি হয়তো এটা তার জানাও ছিলনা। নচেত তিনি এভাবে নিজের সাফাই দিতেননা এবং সান্ত্রী সিপাই পাঠিয়ে লোকজনের কাছ থেকে পারমিট ফেরত আনাতেননা। তা সত্ত্বেও সাহাবিগণ এ কাজটির জন্য তাকেই দায়ি করেন এবং জবাবে তিনিও নিজের দায় স্বীকার করেন। ইবনে আব্দুল বাকী যারকানী এই হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোনো কাজ বর্জন (Omission) করাও একটা কাজ (Comission) বলে গণ্য।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত রা. নিষেধাজ্ঞাটিকে শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেননি। বরং অন্যান্য জিনিসকেও তার আওতাভুক্ত মনে করেছেন। এমনকি এই সব অনুমতিপত্রের বেচাকেনাও ততোক্ষণ পর্যন্ত জায়েয সাব্যস্ত করেননি, যতোক্ষণ না কোনো দ্রব্য বিক্রেতার দখলে আসে এবং সে তা ক্রেতার দখলে সমর্পণ করে। অন্যান্য সহীহ হাদিসেও এই মূলনীতিটি ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রকাশ্য জনসমাবেশে এই ঘটনাটির প্রতিবাদ উচ্চারিত হওয়া এবং তার সিদ্ধান্তে অন্য কোনো সাহাবির ভিন্নমত ব্যক্ত না করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অনুমতিপত্রগুলোর কেনাবেচাকে সুদী কারবারের শামিল বলে যে রায় দেয়া হয়েছিল, তা সাহাবায়ে কেরাম ও মদিনাবাসির সর্বসম্মত রায় (ইজমা) ছিলো। মুয়াত্তায় বর্ণিত পরবর্তী হাদিস থেকে এই সর্বসম্মত রায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। হাদিসটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"ইমাম মালেক রহ. ইয়াহিয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শুনতে পেলেন যে, জামিল বিন আবদুর রহমান সাঈদ বিন মুসাইয়্যারকে বলছে জার নামক স্থানে যে খাদ্যশস্য জনগণের জন্য বরাদ্দ রয়েছে, তার অংশবিশেষ আমি খরিদ করি। এখন আমার ইচ্ছে, যে পরিমাণ খাদ্য ক্রয়ের জন্য আমাকে অনুমতি ও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অন্যের কাছে বিক্রি করে দেই।

হযরত সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন যে খাদ্য তুমি কিনেছ (কিন্তু এখনো হস্তগত করনি) তা তুমি অন্যদের কাছে বেচে দিতে চাও? সে বললো : হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব এরূপ করতে তাকে নিষেধ করলেন।"

কেউ কেউ যুক্তি দেখান, দখল হস্তগত করার প্রশ্ন শুধুমাত্র অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রেই উঠে, কিন্তু অধিকার ও প্রত্যাশিত মুনাফার ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উঠেনা। যে ব্যক্তি এসবের অধিকারি সে যখন যেভাবে চায়, অন্যের নিকট তা হস্তান্তর করতে পারে এবং তার উপযুক্ত বিনিময়ও সে গ্রহণ করতে পারে। এ যুক্তির জবাবে আপাতত এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, প্রদত্ত ঋণ বাবদ কিংবা দেনমোহর বা উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থ বা সম্পদ পাওনা থাকে, তা যেমন স্বীকৃত ও নিশ্চিত অধিকার, লাইসেন্স বা পারমিট সে ধরনের কোনো স্বীকৃত ও নিশ্চিত অধিকার নয়। পারমিট প্রকৃতপক্ষে কোনো অধিকার নয়, তা নিতান্ত একটা অনুমতি বা সুযোগ বা তার প্রতিশ্রুতি মাত্র। এর নাম থেকেও এ ব্যাপারটা সুস্পষ্ট। পারমিট দাতা ইচ্ছে করলে তাকে দিতে পারে, আবার নাও দিতে পারে। এটা তার মর্জির উপর নির্ভরশীল। যে কোনো সময় সে তা বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে। এ ধরনের শর্তসাপেক্ষ ও অসম্পূর্ণ অধিকার, কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, অনুমতি বা প্রতিশ্রুতি যতোক্ষণ না সুনির্দিষ্ট সম্পদের আকারে হস্তগত হবে, ততোক্ষণ তা হস্তান্তরযোগ্য বা ভোগ্যদ্রব্য নয়। কোনো কোনো ফেকাহ শাস্ত্রবিদও এই মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের নিরেট, অনিশ্চিত ও অবাস্তব অধিকার হাতছাড়া করার জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'আল আশবাহ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে এই মূলনীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, 'শুফয়ার অধিকার' (সন্নিহিত ভূসম্পত্তি ক্রয়ে অগ্রাধিকার) এর ন্যায় অনিশ্চিত ও অবাস্তব অধিকার বিনিময়যোগ্য নয়।

অর্থাৎ "কোনো বিক্রিত জমিতে যদি অগ্রাধিকারী কোনো ব্যক্তির অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয়, তবে তার পক্ষে এটা বৈধ নয় যে, সে নিজে তা ক্রয়ের দাবি না জানিয়েই নিজের অধিকারের বিনিময়ে খরিদ্দার বা অন্য কোনো অগ্রাধিকারীর কাছ থেকে কোনো আর্থিক বিনিময় গ্রহণের চেষ্টা চালাবে।" 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে 'আল আশবাহে'র বরাত দিয়ে এই কথাই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। গ্রন্থকার ইবনে আবেদীন শামী বলেন "এ ধরনের অনিশ্চিত অধিকারের বেলায় সংশ্লিষ্ট অধিকারের দাবিদার যদি কোনো সম্পদের বিনিময়ে আপোস করে, তবে সেই আপোস বাতিল হবে এবং তা প্রত্যাহার করতে হবে।"

ইবনে আবেদীন প্রায় একই বিধি ভিন্নতর ভাষায় 'আল বাদায়ে' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন : "এ ধরনের অনিশ্চিত অধিকারের মালিকানা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করা যায়না এবং তা ছেড়ে দেয়ার জন্য কারো সাথে আপোস করাও বৈধ নয়।"

আলোচনার উপসংহারে দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম মাওলানা আযিযুর রহমান সাহেবের একটি ফতোয়া উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে হচ্ছে। কেননা ফতোয়াটির বক্তব্য একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব সংকলিত 'ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ' গ্রন্থের ৭ম ও ৮ম খণ্ডে ফতোয়াটি নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে :

"সম্ভাব্য মুনাফা বিক্রি করা জায়েয নয়"

প্রশ্ন : একটি গ্রাম আছে। গ্রামটির বর্তমান জমিদার অর্থাৎ জমির মালিক আমর। এই জমির খাজনা বা রাজস্ব, যা সমসাময়িক শাসক ঐ জমিদারের কাছ থেকে আদায় করে থাকে, প্রচলিত আইন অনুসারে আমরের প্রাপ্য হয়ে যায়। এখন আমর যদি তার প্রাপ্য অধিকারকে বকরের নিকট বিক্রি করে দেয় বা বন্ধক রাখে, তাহলে প্রচলিত আইন অনুসারে ঐ খাজনা বা রাজস্ব বকর আদায় করতে পারবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই প্রাপ্য অধিকার খাজনা বিক্রি করা বা বন্ধক রাখা কি জায়েয?

জবাব : قال فى الدر المختار وبطل ما ليس بمال اهـ

অর্থাৎ দুররে মুখতারে বলা হয়েছে, যে জিনিস অর্জিত সম্পদ নয় তার বেচাকেনা অবৈধ। শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে :

قدمنا اول البيوع تعريف المال بما يميل اليه الطبع ويمكن اذخاره لوقت الحاجة وانه خرج بالادخار المنفعة فهى ملك لا مال

অর্থাৎ আমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ের ভূমিকায় 'মাল' (সম্পদ) এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি। যে জিনিসের দিকে মানুষ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনের সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়, তাকেই 'মাল' (সম্পদ) বলা হয়। সঞ্চয়ের শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো জিনিসের মুনাফা মালের সংজ্ঞা বহির্ভূত। কেননা তার মালিক হওয়া যায় কিন্তু তা মাল বা সম্পদ নয়।

উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, এ ধরনের সম্ভাব্য অধিকার ও মুনাফা বিক্রি করা ও বন্ধক রাখা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও বাতিল। *[তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯]*

৩০. কিবলার দিক নির্ণয়ের শরিয়তসম্মত বনাম বিজ্ঞানসম্মত পন্থা

প্রশ্ন আমি একটি সমস্যার ব্যাপারে আপনার সহায়তা ও নির্দেশনা চাই। এ সমস্যাটি আমার দেশ ..... তে নিদারুণ অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। সমস্যাটি হলো, কতিপয় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, আমাদের দেশের মসজিদের মিহরাবগুলো কাবা থেকে ৩৮ বা ৪০ ডিগ্রি বিচ্যুত। বহুসংখ্যক মুসলমান দাবি জানাচ্ছে যে, এই মসজিদগুলো ভেঙ্গে দিয়ে অথবা

মেরামত করে সঠিক কিবলামুখি করা হোক, যাতে নামায বিশুদ্ধভাবে পড়া সম্ভব হয়। অন্য কতক মুসলমান মনে করেন, এরূপ করার প্রয়োজন নেই। তারা দুররে মুখতারের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মিহ্‌রাব যদি ৪৫ ডিগ্রির চেয়ে কম পরিমাণ কাবা ঘর থেকে দূরে সরে যায়, তাহলেও মসজিদের দিক সঠিক এবং তাতে নামায জায়েয। কিন্তু প্রথম দলের বক্তব্য হলো, কিতাব (দুররে মুখতার) অনেক প্রাচীন যুগের লেখা। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে যেভাবে কিবলার দিক নির্ণয় করা যায়, সেকালে তা করা যেতনা। তাই আমাদের উচিত যথাযথভাবে কিবলার দিক নির্ণয় করা।

অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন যে, দুররে মুখতারের ফতোয়া এ যুগে অনুসরণ করা যাবে কিনা এবং কিবলার দিক নির্ণয়ে যদি কিছুটা কমবেশি হয়ে যায়। তা হলে নামায শুদ্ধ হবে কিনা। যদি শুদ্ধ হয়, তবে এই কমবেশির কোনো সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা?

জবাব আপনার প্রশ্নের উত্তরে পয়লা কথা হলো, ইসলামি কর্মকান্ডের জন্য আমাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা শরিয়ত আমাদের উপর আরোপ করেনি। এ ধরনের যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করা সর্বাবস্থায় সম্ভব নয় এবং তা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য এ যুগেও কষ্টকর ও বিব্রতকর হয়ে দেখা দিতে পারে।

পবিত্র কুরআনে কিবলামুখি হবার জন্য شطر المسجد الحرام শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ এ নয় যে, একেবারে নাকের ছিদ্র বরাবর কিবলার দিক নির্ণয় করে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে নামায পড়তে হবে। বরঞ্চ এর অর্থ হলো, আল্লাহর ঘর যেদিকে অবস্থিত, মোটামুটিভাবে সেই দিকে মুখ করে নামায পড়তে হবে। সুনানে তিরমিযীর নামায সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে কিবলা রয়েছে' শীর্ষক হাদিসগুলো হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقى المشرق والمغرب قبلة ●

"রসূল সা. বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে আমাদের কিবলা রয়েছে।"

রসূল সা.-এর উক্তি উচ্চারিত হয়েছিল মদিনাবাসীকে লক্ষ্য করে। মদিনা মক্কা থেকে উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় মদিনাবাসী দক্ষিণমুখী হয়ে নামায পড়ে থাকেন। এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, মদিনাবাসীর মুখ যদি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকে থাকে তা হলেই তাকে কিবলামুখি ধরে নেয়া হবে। এ হাদিস আরো অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া হানাফি মাযহাবভুক্ত ফকীহগণসহ সকল ফকীহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কিবলামুখি হওয়ার ব্যাপারে অল্পবিস্তর পার্থক্য ক্ষতিকর নয়। খোদ মদিনা শরিফ সম্পর্কে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, মসজিদে নববী হুবহু কাবা শরিফমুখি নয়।

ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞগণ ও মূলনীতিটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কাবা শরিফ স্বচক্ষে দেখতে পায়, তার জন্য হুবহু কাবা অভিমুখি হয়ে নামায পড়া অপরিহার্য। কিন্তু কাবা শরিফ যার দৃষ্টিসীমার ভেতরে অবস্থিত নয় সে যদি সামান্য কিছু হেরফের করে বসে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। হানাফি ফেকাহবিদগণ এ সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো অঞ্চলে যদি প্রাচীন আমলের মুসলমানরা কোনো মসজিদ নির্মাণ করে থাকে এবং পরে জানা যায় যে, সেই মসজিদ কাবার দিক থেকে সামান্য কিছুটা বিচ্যুত, তাহলে মসজিদ ভাংচুর করে তাকে সঠিক কিবলামুখি বানানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়। বড় জোর ভবিষ্যতের নির্মিতব্য মসজিদে সুক্ষ্ম অনুসন্ধান ও বাছবিচারের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। অবশ্য তাও একেবারে অপরিহার্য নয়।

'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে ফাতওয়ায়ে খায়রিয়ার বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফার নিম্নরূপ অভিমত তুলে ধরা হয়েছে :

"ইমাম আবু হানিফা বলেছেন পাশ্চাত্যবাসীর কিবলা পূর্বদিক, প্রাচ্যবাসীর কিবলা পশ্চিম দিক, উত্তর দিকের অধিবাসীদের কিবলা দক্ষিণ দিক এবং দক্ষিণ দিকের অধিবাসীদের কিবলা উত্তর দিক। সুতরাং সামান্য হেরফের ক্ষতিকর নয়।"

কতোটুকু হেরফের গ্রহণীয় এবং কতোটুকু নয়, তারও সীমা নির্দেশ করেছেন ফেকাহবিদগণ। তারা বলেছেন, ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হেরফের গ্রহণীয়। তার বেশি হলে কিবলামুখি ধরা যাবেনা।

এ ব্যাপারে দুররে মুখতারের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা যথার্থ এবং তা অবিকল শরিয়তের অভিপ্রায় প্রতিফলিত করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতি প্রযোজ্য। কেননা সেই যুগেও যখন ডিগ্রি পরিমাপ পূর্বক এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে, তখন ভূগোল বা জ্যামিতির আলোকে ডিগ্রিকৃততে কোনো হেরফের হতে পারেনা। এ ফতোয়ার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদিসেও দলিল রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ফাতওয়ায়ে খায়রিয়াতে এ উক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে যে:

"অর্থাৎ ৪৫ ডিগ্রির বেশি বিচ্যুতি ঘটলে কিবলার দিক পাল্টে যাবে। কেননা সে ক্ষেত্রে যে এক চতুর্থাংশ ভূমির উপর মক্কা শরিফ অবস্থিত, তা দিকরেখা থেকে সরে যাবে। এ ধরনের বিচ্যুতিতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে আর এর চেয়ে কম বিচ্যুতিতে দোষ নেই।"

আপনি এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, আপনাদের দেশের মসজিদগুলোর কিবলার দিক থেকে বিচ্যুতি ৩৮ বা ৪০ ডিগ্রির বেশি নয়। কাজেই এতোখানি হেরফের সত্ত্বেও এই সব মসজিদের কিবলামুখিতা বিশুদ্ধ বলে ধরে নিতে হবে এবং এসব মসজিদে কোনো রদবদল ঘটানোর প্রয়োজন নেই। ভারতীয় উপমহাদেশেও এক সময় জনৈক উঁচু দরের জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ এ ধরনের হিসাব করে বলেছিলেন যে,

উপমহাদেশের কোনো মসজিদ সঠিকভাবে কিবলামুখি নয় এবং তাতে নামায জায়েয নয়। তার যুক্তিকে এ দেশের আলেম সমাজ সর্বসম্মতভাবে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সকল মসজিদ আজও অক্ষতভাবে বহাল রয়েছে। এ ধরনের দুর্বল ও খোঁড়া যুক্তির অজুহাতে সুনির্মিত আল্লাহর ঘরগুলোকে ভাঙ্গা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। দুনিয়াতে এমন বহু মসজিদ থাকতে পারে, যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাদের পরবর্তী মনীষীগণ নির্মাণ করে গেছেন। আমরা কি সেই সবগুলোকে ভাঙ্গতে আরম্ভ করবো? সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, হাতীম নামক অংশটি আগে কাবা শরিফের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণের সময় তা কোনো কারণে বাইরে থেকে যায়। রসূল সা.ও তা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং আল্লাহর ঘর যেমন ছিলো তেমনি থাকতে দিয়েছেন। মসজিদগুলোকে ভাংচুর করা বা ধসানো অত্যন্ত মারাত্মক ধৃষ্টতা। এ ধৃষ্টতার অর্থ যে সমস্ত মহান পূর্বপুরুষগণ মসজিদগুলো নির্মাণ করেছেন এবং যারা এতে নামায পড়ে গেছেন, তারা সবাই অন্যায় করেছেন। আর এখন কতোক লোক সেই স্বকল্পিত অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করছেন। *[তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৮০]*

৩১. মৃত ব্যক্তির জন্য ফিদিয়া দান, শোক ও কুরআন খতম

প্রশ্ন : আলেম ও মুফতিগণের নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে শরিয়তের বিধান জানতে চাওয়া হয়েছে :

১. আমাদের এলাকায় দীর্ঘকাল যাবত এরূপ প্রথা চালু রয়েছে যে, যখন কোনো বয়স্ক নারী বা পুরুষ মারা যায়, যখন তার পরকালীন মুক্তির জন্য কিছু সংখ্যক আলেম জানাযার নামাযের পর বৃত্তাকারে বসে যান। ইতিপূর্বে লাশের সাথে কুরআন শরিফ আনা হয় এবং তার সাথে কিছু টাকাও রক্ষিত থাকে। বৃত্তকারে বসা আলেমগণ ঐ কুরআন ও টাকা এক এক করে একজন অপর জনকে হস্তান্তর করতে থাকেন। এভাবে তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে আনা হয়। অতপর ঐ টাকা বৃত্তের মধ্যে বসা ধনী, গরিব, মুফতি সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। অতপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানকে হিলায়ে ইসকাত [মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাক্ত নামায রোযার দায় থেকে অব্যাহতি দানের কৌশল] বলা হয়।

২. যখন লাশ তুলে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন নারীরা ও পুরুষের পাশাপাশি চলে এবং কবরের কাছে হাজির হয়। জানাজার নামায পড়ার পর যখন লাশ দাফনের জন্য কবরের কাছে আনা হয়, তখন নারীরা সেখানেও কান্নাকাটি করে।

৩. এ প্রথাও চালু রয়েছে যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন উত্তরাধিকারীরা এতিম কি বিধবা, ধনী কি গরিব, নিজস্ব অর্থ দিয়ে হোক অথবা ধার করে আনা অর্থ দিয়ে হোক– সর্বসাধারণের জন্য ঠিক মৃত্যুর দিনে ভোজের আয়োজন করে থাকে। সেই

ভোজে ধনী, গরিব, মেম্বার, চৌকিদার, আলেম, কাযী নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে। একে 'খয়রাত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ সেদিন শোকসন্তপ্ত পরিবারকেই খানা খাওয়ানো দরকার।

উল্লেখিত অনুষ্ঠানগুলোতে যারা অংশগ্রহণ করেনা, তাদেরকে 'গায়রে মুকাল্লিদ' (চারি মাযহাব বহির্ভূত) আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। জনগণ দাবি জানাচ্ছে, এসব প্রথা যদি কুরআন ও হাদিসের পরিপন্থী হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণাঙ্গ ফতোয়া জানিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব নিরসন করা হোক। আপনার প্রতিষ্ঠান একটা ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং সারা পাকিস্তানে আপনার ফতোয়া চালু আছে। উল্লেখিত অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের আলোকে বিশদভাবে আলোচনা লিপিবদ্ধ করে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ পুরস্কার লাভ করুন। উল্লেখ থাকে যে, আমরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী।

জবাব : প্রচলিত 'হিলায়ে ইসকাত' নামক প্রথার পক্ষে কুরআন সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের রায় থেকে কোনোই প্রমাণ পাওয়া যায়না। প্রশ্নকর্তা জানিয়েছেন, তারা হানাফি মাযহাবের অনুসারী। এ জন্য কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক দলিলসমূহের বিবরণ আপাতত বাদ রেখে এবং যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধান প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

হানাফি মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রদ্দুল মুখতারের নামায সংক্রান্ত অধ্যায়ে কাযা নামাযের বিধি আলোচনা প্রসঙ্গে 'মৃত ব্যক্তির নামাযের দায় থেকে অব্যাহতি' শিরোনামে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন :

জেনে রাখা দরকার যে, মৃত বক্তি যদি রোযার ফিদিয়া দেয়ার ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে, তাহলে এই ফিদিয়া দেয়া নিশ্চিতভাবে জায়েয। কেননা এই ফিদিয়ার কথা সুস্পষ্ট ওহির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যখন এ ধরনের ফিদিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রেও ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, ইনশাআল্লাহু (আল্লাহ চাহেন তো) এতে তার উপকার হবে। এখানে তিনি ইনশাআল্লাহ কথাটা এ জন্যই বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা ওহির মাধ্যমে আসেনি। অনুরূপভাবে যদি নামাযের ফিদিয়ার জন্য ওসিয়ত করেও গিয়ে থাকে, তবে ফেকাহ শাস্ত্রীয়বিদগণ তাকে সতর্কতাবশত রোযার সমপর্যায়ে গণ্য করেন। কেননা রোযা না রাখার জন্য সম্ভাব্য শারীরিক অক্ষমতাকে হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নামাযে এ কারণটি উপস্থিত না থাকলেও তাকে উপস্থিত ধরে নিয়ে নামায ও ফিদিয়ার আওতাভুক্ত হতে পারে। নামাযীর নামায ত্যাগ যদি শারীরিক অক্ষমতার কারণে না হয়ে থাকে, তাহলে ফিদিয়া দ্বারা তার গুণাহ মাফের সম্ভাবনা আছে। তবে সে ক্ষেত্রে সন্দেহ বিরাজমান, ঠিক যেমন রোযার ফিদিয়া দিতে ওসিয়ত করা না হলেও যদি ফিদিয়া দেয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রেও সন্দেহ বিরাজ করে। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ রোযার ফিদিয়ার ওসিয়ত করা হলে নিশ্চয়তার সাথে তা জায়েয

বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু রোযা বা নামাযের ওসিয়ত না করা হলে নিশ্চয়তর সাথে জায়েয বলে ফতোয়া দেননি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মৃত ব্যক্তি যদি নামাযের ফিদিয়া দিতে ওসিয়ত না করে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ফিদিয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রবলতর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, প্রথমত ফিদিয়ার আদেশ কেবল রোযার সাথে সংশ্লিষ্ট। যারা ঐ আদেশকে পরিত্যাক্ত নামাযের উপর প্রয়োগ করেছেন, তারাও এটা করেছেন সন্দেহেরই সাথে। দ্বিতীয়ত নামাযের ক্ষেত্রে ফিদিয়া বা কাফফারা যেটারই সুপারিশ করা হোক না কেন, তা এই ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থেরই (অর্থাৎ রদ্দে মুখতারের) মূল গ্রন্থ দুররে মুখতারে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"মৃত ব্যক্তি যদি ছুটে যাওয়া নামাযগুলোর কাফফারা দিতে ওসিয়ত করে যায়। তবে প্রত্যেক ছুটে যাওয়া নামায বাবদ ফেৎরার ন্যায় অর্ধ সা' গম দিতে হবে।"

অন্য কথায় বলতে গেলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোনো কোনো ফেকাহ শাস্ত্রবিদ যে ইসকাতের কথা বলেছেন, তার জন্য মৃত ব্যক্তির যতোগুলো নামায ও রোযা ওজরের কারণে কাযা হয়েছে, সেগুলো হিসেব করে প্রত্যেক নামায ও রোযার বদলে দু'সের বা পৌনে দু'সের করে খাদ্যশস্য দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে পবিত্র কুরআন ও তার সাথে কিছু খাদ্যশস্য বা টাকার পুটুলি রেখে চক্রাকারে ঘোরানোর যে প্রথা চলছে, তার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়না। এটা আসলে কুরআনের অবমাননা। হাদিস বা ফেকাহ গ্রন্থে যে ফিদিয়ার উল্লেখ রয়েছে, এটাকে সেই ফিদিয়াও বলা চলেনা।

আল্লামা শামী স্বীয় আলোচনায় নিজের একটি পুস্তিকার উল্লেখও করেছেন। সেই পুস্তকের নাম 'شفاء العليل فى بطلان الوصية باخذ مانو التهاليل' (রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন রকমের খতম ও কলেমা পাঠ অনুষ্ঠানের ওসিয়তের অবৈধতা প্রসঙ্গ) পুস্তিকার নাম থেকেই বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য খতম বা যিকিরের অনুষ্ঠানাদি করার যে প্রথা চালু রয়েছে, আল্লামা শামী তার ঐ পুস্তিকায় তাকে অবৈধ বলে প্রমাণ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনার কিছু পর তিনি পুনরায় এরূপ একটি শিরোনাম লিখেছেন "খতম ও যিকির অনুষ্ঠানাদির ওসিয়তের অবৈধতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।"

এই শিরোনামের অধীন তিনি লিখেছেন :

আমাদের সময়কার লোকেরা যে ওসিয়ত করে থাকেন, তার ধরণ আমার আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তিদের অনেকেরই অবস্থা এরূপ যে, তাদের অনেক নামায, যাকাত, কুরবানি, কসমের কাফফারা ইত্যাদি ছুটে গেছে এবং তারা এ সবের কাফফারা আদায়ের জন্য সামান্য কিছু টাকা দান করার

ওসিয়ত করে যায়। (আজকাল তো অনেকে তাওবাও করেনা।) তারা প্রায়ই এই মর্মে ওসিয়ত করে যায় যে, খতম পড়িয়ে দিও, আল্লাহর যিকির করিয়ে দিও। অথচ আমাদের ওলামায়ে কেরাম এ ধরণের ওসিয়ত যে আদৌ জায়েয নয়, তা অকাট্যভাবে ব্যক্ত করেছেন। পার্থিব স্বার্থের লোভে কোনো পাঠ জপ করা মোটেই জায়েয নেই। এ ধরণের কাজের জন্য অর্থদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়েই গুণাহগার। কেননা কুরআনের জন্য মুজরি আদান প্রদানের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। কুরআনের জন্য মজুরি আদান প্রদান মূলত অবৈধ। কাজেই এ কাজের সাথে যে কাজের সাদৃশ্য থাকবে তাও অবৈধ হবে। আমাদের মাযহাবের বড় বড় বিখ্যাত গ্রন্থাবলিতে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক-কালের ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ শুধুমাত্র কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মজুরি জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন আবৃত্তির জন্য মজুরি জায়েয বলে ফতোয়া দেননি। কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মজুরি বৈধ বলে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে, তাও একটা অনিবার্য কারণে দেয়া হয়েছে। নচেত কুরআনের শিক্ষা বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু কুরআন পাঠের বিনিময়ে মজুরি লেনদেনের পেছনে সে ধরনের কোনো অনিবার্য কারণ সক্রিয় নেই। আমার পুস্তিকা 'শিফাউল আলীলে' (রোগ নিরাময়) এ বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা করেছি। সর্বশেষে আল্লামা শামী লিখেছেন, ইমাম হাসান বিন আলী রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, অন্তিম রোগ শয্যায় নামাযের ফিদিয়া দিতে ওসিয়ত করা কি জায়েয? তিনি বলেছেন, 'না।'

ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিভিন্ন মতামতের আলোকে এটা ছিলো সংক্ষিপ্ত জবাব। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও মুজতাহিদ ফকীহগণের বিশদ মতামতের আলোকে দেখতে গেলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা এই যে, ফিদিয়া, ইসকাত, কাফফারা ইত্যাদির যে ক'টি বৈধ নিয়ম চালু আছে, তা শুধুমাত্র ওযর ও অক্ষমতাবশত ছুটে যাওয়া ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের যদি শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে কোনো ইবাদত যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ছুটে যায়, ছুটে যাওয়ার দরুণ সে অনুতপ্ত থাকে এবং জীবদ্দশাতেই সে শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় তার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা অন্ততপক্ষে চেষ্টা করার সংকল্প পোষণ করে এবং সে কোনো প্রতিকার করতে সক্ষম হওয়ার আগেই মারা যায়, তবে তার ক্ষেত্রেই ফিদিয়া, কাফফারা ইত্যাদি দেয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগতভাবে এবং ব্যাপকভাবে শরিয়ত সম্মত ওযর ছাড়াই ফরয কাজসমূহ তরক করতে থাকে, সে যদি জীবদ্দশায় বিভিন্ন নফল কাজ যথা নামাযের বদলে কিছু দান সদকা দিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করে, তবে তা তার নিজের পক্ষ থেকেও গ্রহণযোগ্য হবেনা। তার মৃত্যুর পর অন্যেরা এরূপ পন্থা অবলম্বন করলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। ফরয কাজ ছুটে গেলে নফল কাজ দ্বারা যে তার ক্ষতিপূরণ হতে পারেনা, সে ব্যাপারেও আলেমদের সর্বসম্মত অভিমত

(ইজমা) রয়েছে। যেমন কেউ ফরয নামায পড়েনা, যাকাত ও উশর ফরয হওয়া সত্ত্বেও দেয়না এরূপ ব্যক্তি যতো নফল নামাযই পড়ুক, যতো নফল সদকাই দিক, তা দ্বারা ফরয তরকের গুনাহ কোনোক্রমেই মাফ হবেনা।

২. লাশের সাথে মহিলাদের গমন, মৃত ব্যক্তির জন্য পুরুষ বা মহিলাদের কান্নাকাটি করা, অর্থাৎ উচ্চশব্দের হায় হায় করা ও শোক বিলাপ করা নিষিদ্ধ। মুনিয়াতুল মুসাল্লীর ব্যাখ্যা 'আশ্‌শারহুল কবীর' বা 'কবিরী' গ্রন্থের শেষাংশে জানাযা সংক্রান্ত আলোচনায় হিদায়া ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে "ফকিহগণের বৃহত্তর অংশের মতে লাশের সাথে মহিলাদের গমন করা জায়েয নয়।"

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন :

"মহিলাদের লাশের সাথে চলা জায়েয কি নাজায়েয সে প্রশ্ন করা চাইনা। বরং এরূপ মহিলার উপর কি পরিমাণ অভিশাপ বর্ষিত হবে সেটাই জিজ্ঞাসার ব্যাপার হওয়া উচিত। জেনে রেখ, কোনো মহিলা যখনই লাশের সাথে গমনের ইচ্ছে করে, অমনি সে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের কবলে পড়ে। যখন সে সত্য সত্যই বেরিয়ে পড়ে, অমনি তাকে শয়তান চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। যখন সে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন মৃতব্যক্তির আত্মা তাকে অভিশপ্ত করে। আর যখন সে ফিরে আসে তখনো সে আল্লাহর অভিশাপের ভেতরে অবস্থান করে। ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া দ্রষ্টব্য।"

তিনি আরো লিখেছেন "লাশের সাথে যদি কোনো বিলাপকারিনী থেকে থাকে তবে তাকে ধমক দিয়ে সাথে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।"

৩. রদ্দুল মুখতার গ্রন্থের জানাযা নামায সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'বিপদ মুসিবতে পুণ্য লাভ' শিরোনামে বলা হয়েছে :

"মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার সরবরাহ করা প্রতিবেশি ও দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনের জন্য মুস্তাহাব, যাতে তাদের ঐ দিন ও রাতের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা হয়। কেননা রসূল সা. হযরত জাফরের ইন্তিকালের খবর শুনে বলেছিলেন তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি কর। কেননা তারা বিপদাপন্ন ও শোকাহত।"

পরবর্তীতে পুনরায়, 'মৃত ব্যক্তির পরিবারে অতিথি হওয়া অনুচিত' শিরোনামে লিখেছেন :

"মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে ভোজের আয়োজন সহকারে অতিথি আপ্যায়ন করা অনুচিত এবং জঘণ্য বিদয়া'ত। কেননা অতিথি আপ্যায়ন সুখের সময়ের কাজ, দুর্যোগের সময়ের নয়।"

আরো কিছু দূর গিয়ে মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজার বরাত দিয়ে হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে : "মৃত ব্যক্তির গৃহে লোকজনের সমবেত

হওয়া এবং ভোজের আয়োজন করাকে আমরা নিষিদ্ধ বিলাপ অনুষ্ঠানের অংশ বলে গণ্য করতাম।"

দুররে মুখতারে আছে : "তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এর পরে তা মাকরূহ। তবে কেউ যদি প্রবাস থেকে আসে তবে তার কথা আলাদা। দ্বিতীয়বার শোক জ্ঞাপন করতে আসা মাকরূহ।"

দ্বিতীয়বার শোক জ্ঞাপন মাকরূহ হওয়ার তাৎপর্য হলো, যারা জানাযার নামাযে শরিক হতে পারেনি, তারা এসে একবার শোক জ্ঞাপন করলে তাতে দোষ নেই। কিন্তু জানাযায় শরিক হওয়ার পর কিংবা একবার শোক জ্ঞাপন করার পর পুনরায় শোক জানাতে আসা মাকরূহ। *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৮০]*

৩২. কয়েদি সৈন্যরা কি নামায কসর করবে

প্রশ্ন ১. রসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরামের রা. যুগেও যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল। একপক্ষের লোকেরা অন্য পক্ষের লোকদের হাতে বন্দি হয়েছিল। যুদ্ধবন্দি অবস্থায় কোনো সাহাবি নামায কসর করেছিলো কি? নাকি এ অবস্থায়ও তারা পূর্ণ নামায আদায় করতেন? এ ব্যাপারে কোনো দৃষ্টান্ত থাকলে অনুগ্রহ করে তা উল্লেখ করুন। গ্রন্থসূত্র অবশ্যি উল্লেখ করবেন। কারণ, জনৈক ব্যক্তি বলে বেড়াচ্ছেন ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পতনের পরে যেসব পাকিস্তানী সৈন্য ভারতের হাতে বন্দি ছিলো। তাদের মধ্যে যারা নামায কসর করেছে এখন তাদের সমস্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে। এ ব্যাপারে অনেকেই পেরেশানী বোধ করছেন এবং সঠিক নির্দেশনা কামনা করছেন।

২. যাকাতের মতো সদকায়ে ফিতরও কি কেবলমাত্র সাহেবে নিসাবের উপরই ওয়াজিব, নাকি সকল মুসলমানদের উপর?

জবাব : আপনার চিঠি পেয়েছি। নিম্নে আপনার প্রশ্ন দু'টির জবাব দেয়া গেলো :

১. যিনি বলে বেড়াচ্ছেন ১৯৭১ সালে ভারতের হাতে আটককৃত পাকিস্তানী সৈন্যরা নামায কসর করে থাকলে, এখন তাদের সমস্ত নামায পুণরায় পড়তে হবে, আমরা তার সাথে একমত নই। যেসব মুসলমান দূর পথে রওয়ানা করে, তারা যতোক্ষণ না কমপক্ষে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করবে ততোক্ষণ তাদের ব্যাপারে মুসাফিরের সংজ্ঞাই প্রযোজ্য হবে। মুসলিম মুজাহিদরা দারুল হরবে স্বাধীন অবস্থায় যুদ্ধরত থাকুক, কিংবা বন্দি অবস্থায়ই থাকুক। দারুল হরবে অবস্থানটা আসলে অনির্দিষ্টকালীন ব্যাপার। অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণ এরূপ ক্ষেত্রে তাদের এখতিয়ার থাকেনা। তাই তাদের জন্যে মুসাফিরের সংজ্ঞাই সঠিক। যেখানে বাধ্য হয়ে অবস্থান করতে হয় এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হবার সাথে সাথেই প্রত্যাবর্তনের নিয়ত থাকে, সেখানে যতোদিনই অবস্থান করতে হোকনা কেন, নামায কসর করতে হবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিস একমত।

যুদ্ধাবস্থার কারণে কোনো কোনো সাহাবিকে কোথাও কোথাও অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য হয়ে কয়েক মাস পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়। এ সময় তারা নামায কসর করতেন।
হযরত আনাস রা. দুই বছর পর্যন্ত সিরিয়ায় আটকা পড়ে থাকেন। দু'বছরই তিনি সেখানে নামায কসর করেন। বিখ্যাত হানাফি ফিকাহ গ্রন্থ কবীরীর গ্রন্থকার লিখেছেন : "এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, মুসাফির যতোদিন অবস্থানের ইচ্ছে ও নিয়ত করবেনা, ততোদিন কসর পড়বে।"

তিনি বলেন, হযরত উমরের রা. ও এটাই মত। অতপর লিখেন, সাহাবায়ে কিরাম বাধ্য হয়ে হরমুযানে নয় মাস অবস্থান করেন এবং পুরো সময় নামায কসর করেন। এরপর বায়হাকি থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, এক যুদ্ধের সময় তিনি বরফ জমে যাবার কারণে ছয়মাস আজারবাইজানে অবস্থান করেন, এই পুরো সময় তিনি এবং অন্যান্য সাহাবি রা. নামায কসর করেন। সামনে অগ্রসর হয়ে গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করেন, দারুল হরবে যদি অবস্থানের নিয়তও করা হয়, তবু তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, হতে পারে তারা শত্রুদের পরাজিত করে সেখানে অবস্থান করবে, আবার এমনও হতে পারে যে তারা নিজেরা পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পিছু হটবে। তাদের অবস্থার এই অনিশ্চয়তা তাদের অবস্থানের ইচ্ছেকে বাতিল করে দেয়। অথচ অবস্থানের জন্যে অটল সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। গ্রন্থকার আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত করেছেন। সবটা উল্লেখ করা সম্ভবও নয়। প্রয়োজনও নেই।

২. সদকায়ে ফিতরের নিসাব আর যাকাতের নিসাব একই রকম। তবে যাকাতের নিসাব সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, পুঁজি, ব্যবসায়ের মাল প্রভৃতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, কিন্তু সদকায়ে ফিতর ঐ ব্যক্তির জন্যেও ওয়াজিব, যার কাছে তার অপরিহার্য প্রয়োজনের বাইরে যে মাল সামগ্রিই থাকবে, তার মূল্যও যাকাতের নেসাবের মতো গণ্য করতে হবে। *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৮১]*

৩৩. পবিত্র কুরআন ও গুপ্ত ওহি

প্রশ্ন : এরূপ আকিদা প্রচলিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর কাছ থেকে দুই ধরণের ওহি লাভ করতেন। এর একটি হলো ফেরেশতা জিবরীলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহি। এই ওহির প্রতিটি শব্দ আল্লাহর কাছ থেকেই আসতো। এভাবে নাযিলকৃত সকল ওহির সমাহার হলো কুরআন। এ ধরণের ওহি ঠিক যে শব্দাবলীতে নাযিল হয়েছে, অবিকল সেই শব্দাবলীতেই তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে রসূল সা. আদিষ্ট ছিলেন। একে প্রকাশ্য ওহি বলা হয়। যেহেতু এ ধরণের ওহির সংকলন (কুরআন) কে নিয়মিত তিলাওয়াত বা পাঠ করা হয় এবং রসূল সা.-এর যুগেও পাঠ করা হতো, তাই একে 'ওহিয়ে মাতলু' (পঠিত বা পাঠ্য ওহি) বলা হয়। আবার এ ধরনের ওহিকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেয়া হতো বলে এর তৃতীয় নাম ওহিয়ে মাকতুব' (লিখিত ওহি) হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহি কেবলমাত্র রসূল সা.-এর পথনির্দিশনার জন্য আসতো এবং তা জিবরীলের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি পাওয়া যেতো। এ জাতীয় ওহির শব্দ আল্লাহর কাছ থেকে আসতোনা, এর তিলাওয়াতও প্রথম শ্রেণীর ওহির মতো করা হতোনা এবং তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখারও ব্যবস্থা করা হতোনা। এ ধরণের ওহি রসূল সা.-এর কথাবার্তা ও তৎপরতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌছে যেতো। এই ওহিকে 'গুপ্ত ওহি', 'অপঠিত ওহি' বা 'অলিখিত ওহি' বলা হয়।

এবার আসুন, কুরআন এ সম্পর্কে কি বলে দেখা যাক।

আল্লাহ তায়ালা কোন্ কোন্ পন্থায় মানুষের সাথে কথা বলেন, সূরা শূরাতে তার বিবরণ দিয়েছেন :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"কোনো মানুষ এরূপ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় ওহির আকারে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোনো বার্তাবাহক পাঠান এবং সে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহি করে। তিনি মহান ও বিচক্ষণ।" *[সূরা আশ শূরা, আয়াত: ৫১]*

উল্লেখ্য, আয়াতটির উপরোক্ত অনুবাদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অনুবাদ। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মানুষের উপর আদেশ ও বিধান নাযিল হওয়ার তিনটি পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। একটি হলো প্রত্যক্ষ ওহি। অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি অন্ত রে ফুকিয়ে দেয়া বা উদগত করা। আরবিতে এ প্রক্রিয়াকে ইলকা বা ইলহাম বলে। দ্বিতীয় পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা। তৃতীয় আল্লাহর বার্তাবাহক (ফেরেশতা) এর মাধ্যমে ওহি প্রেরণ। পবিত্র কুরআনে যে ওহির সমাবেশ ঘটেছে, তা শুধু তৃতীয় প্রকারের ওহি। পবিত্র কুরআনের ২নং সূরা ১৮, ৯৭ এবং ২৬ নং সূরার ১৯১ ও ১৯৪ আয়াতে আল্লাহ এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেলো যে, রসূল সা.-এর ঐশী নির্দেশ প্রাপ্তির আর যে দু'টি পন্থার উল্লেখ উপরোক্ত আয়াতে (৪২/৫১) করা হয়েছে, তা কুরআন বহির্ভূত। বক্তব্যের পক্ষে আরো পাকাপোক্ত সমর্থন লাভের জন্য কুরআনের আরো কয়েকটি আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। এভাবে যারা গুপ্ত ওহিকে বিশ্বাস করেন, তারা এ ধরণের ওহির অস্তিত্ব প্রমাণের কাজটি খোদ কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাবলী দ্বারা পাকাপাকিভাবেই সম্পন্ন করেন।

কিন্তু উপরোক্ত ৪২/৫১ নং আয়াতটির তফসিরে যে সার সংক্ষেপ আমি উপরে উল্লেখ করেছি, তাতে কয়েকটি মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পন্ন ভুলত্রুটি রয়েছে :

১. প্রথম ত্রুটি এই যে, এই আয়াতে 'রসূল' বা বার্তাবহ শব্দটির মর্ম 'বার্তাবাহী ফেরেশতা' গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ এর দ্বারা 'বার্তাবহ মানুষ' বুঝানো হয়েছে।

২. দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, এরূপ ধরে নেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতে আল্লাহ শুধু নবী রসূলের সাথে নিজের কথা বলার বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করেছেন এবং এতে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ প্রকৃতপক্ষে এখানে সকল মানুষের সাথে আল্লাহর কথা বলার পন্থাবলী আলোচিত হয়েছে।

৩. তৃতীয় ত্রুটি এই যে, আয়াতের যে অংশে তৃতীয় পন্থাটির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে অর্থাৎ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ তে فيوحى ক্রিয়াটির কর্তা উক্ত বার্তাবাহক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অথচ আসলে এই ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ, বার্তাবাহক নয়। (প্রশ্ন কর্তার এই ব্যাকরণগত ভিন্ন মতের ফলে এই অংশটির অনুবাদ দাঁড়ায় "অথবা তিনি কোনো বার্তাবাহক পাঠান, অত:পর আল্লাহ নিজেরই অনুমতিক্রমে নিজে যা চান তা ওহি করেন।" এতে অনুবাদটি কেমন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় তা সহজেই বোধগম্য। *(অনুবাদক)*

পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ 'কিতাবুমমুবীন' তথা 'স্ববিশ্লেষিত গ্রন্থ' বলেছেন। কুরআন নিজেই বলে দিয়েছে, কোথায় সে রসূল শব্দ দ্বারা 'বার্তাবাহক ফেরেশতা' এবং কোথায় 'বার্তাবাহী মানুষ' বুঝিয়েছে। কুরআনের একটি সাধারণ নীতি এবং বাচনভঙ্গি এই যে, বার্তাবাহী ফেরেশতাদেরকে সে 'নাযিল' করে এবং 'বার্তাবাহী মানুষ'কে সে 'প্রেরণ' করে। 'নূযুলে মালায়িকা' (ফেরশতাদের নাযিল হওয়া) এবং 'ইরসালে রুসূল' (মনুষ্য রসূল প্রেরণ) কুরআনের নির্দিষ্ট পরিভাষা বলা যেতে পারে।

'ইলকা' (নিক্ষেপ করা বা ঢুকিয়ে দেয়া) শব্দটি গুপ্ত ওহির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এ শব্দটি কুরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের যতো জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা আপনি দেখুন। সমগ্র কুরআনে কোথাও এ শব্দটি 'অপঠিত ওহি' অর্থে দেখতে পাবেন না। বরঞ্চ এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে রসূল সা.-কে কুরআন দেয়া হয়েছে এই অর্থে। ২৭/৬নং আয়াতে দেখুন :

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

"এক সুবিজ্ঞ মহাবিজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে আপনার উপর কুরআন নিক্ষেপ করা হয়।"

রসূল সা.-এর ব্যক্তিগত তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির নাগালের বাইরে যা কিছু ছিলো এবং যা নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পরিচালনার জন্য জ্ঞানগত পর্যায়ে আবশ্যক ছিলো, তার সবই তাঁকে কুরআনের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হয়েছে। কুরআনই

তাঁর জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন ছিলনা– গোপন ওহিরও নয়।

জবাব আপনি যে আকিদা বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে সচেষ্ট, আমি স্বয়ং সেই আকিদার প্রবক্তা। এ আকিদার সত্যতা কোনো একটি আয়াতের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আরো বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদিস দ্বারা এটি আমার কাছে প্রমাণিত। নবীদের উপর কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ ছাড়াও ওহি নাযিল হয়েছে এবং সেই সব ওহিও নবুয়তের ওহিরই প্রকার বিশেষ। এসব ওহিকে কোনো পারিভাষিক নামে আখ্যায়িত করা হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে যায়না। এসব ওহি সব সময় শব্দ ব্যতিরেকেই কিংবা ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই আসতো এমন কথাও নয়। সেগুলো শব্দ সহকারেও নাযিল হয়ে থাকতে পারে। বিশেষত, যখন কোনো ফেরেশতা তা বহন করে আনতেন, তখন তা তিনি শব্দের মাধ্যমেই পৌঁছাতেন বলে ধরে নেয়া যায়। এমন কথাও নয় যে, এ ধরণের ওহি সব সময় নবীদের ব্যক্তিগত পথনির্দেশনা দেয়ার জন্যই আসতো। অনেক সময় নবী বা তাঁর অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ, সতর্কবাণী, সান্ত্বনা ও প্রেরণার উপাদানও এর অন্তর্ভুক্ত থাকতো। কখনো কখনো এতে নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য পথনির্দেশ এবং আদেশ নিষেধও থাকতো। তাছাড়া এই ওহি স্বপ্নের আকারেও আসতো। কুরআন ও হাদিসের একাধিক জায়গায় এ ধরণের স্বপ্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম আ. কে পুত্র কুরবানীর আদেশ স্বপ্নযোগে দেয়া হয়েছিল। কার্যত, সে আদেশ মানা বাধ্যতামূলক ছিলো। পিতাপুত্র উভয়ে তাকে সত্যিকার আদেশ হিসেবেই বিশ্বাস করেছিলেন। নবী ছাড়া আর কারো স্বপ্ন ধর্মীয় ও শরিয়তসম্মত মর্যাদা ও গুরুত্ব বহন করেনা যে, তার ভিত্তিতে কোনো পিতা পুত্রকে জবাই করতে এবং পুত্র জবাই হতে বাধ্য ও প্রস্তুত হয়ে যাবে। বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হযরত আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবি থেকে একাধিক হাদিস এই মর্মে বর্ণিত আছে যে, রসূল সা.-এর নিকট ওহি আগমনের সূচনা সত্য স্বপ্নের আকারেই হয়েছিল, যা রাতের শেষে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার মতো সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিতো। একশ্রেণীর লোকের মতো আপনি যদি বলতে চান যে, হাদিস ও সুন্নাহর আকারে যে দ্বিতীয় প্রকারের ওহি আমাদের কাছে বিদ্যমান, তা কেবল পুরানো কিস্‌সা কাহিনী ও উপাখ্যান এবং তাতে আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় কিছু নেই, তাহলে আপনার সাথে আমার কোনো সংশ্রব নেই। আপনি যা ইচ্ছে লিখতে থাকুন। কিন্তু আপনার বিশ্বাস যদি সে রকম না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি অনর্থক এই বৃথা আলোচনায় নিজেকে ও অন্যদেরকে কেন জড়াতে চান? আমার বিশ্বাস এটাই যে, নবীদের কাছে আগত ওহি লিখিত হয়। অলিখিতও হয়। যে কোনো মুসলমানের জন্য এই উভয় প্রকারের ওহি অকাট্য প্রমাণ এবং অবশ্য পালনীয়।

সূরা শূরায় উল্লেখিত আয়াতটির যে অনুবাদ মাওলানা মওদূদী করেছেন, আমার মতে সেটাই সঠিক এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অধিকাংশ আলেম ও মুফাসসির আয়াতটির মর্ম এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও কেউ কেউ يُرْسِلَ رَسُوْلًا দ্বারা মানবীয় নবী রসূলও বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমার মতে এখানে ফেরেশতাই বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় ফেরেশতাদের জন্য رَسُوْل শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। বস্তুত এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফেরেশতার জন্যও যখন রসূল শব্দ ব্যবহৃত হবে এবং তিনি বার্তাবাহক বা দূত হয়ে আসবেন, তখন তার ব্যাপারে ارسال বা 'প্রেরণ' ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সঙ্গত হবে। কাজেই يرسل رسولا এর অর্থ হবে বার্তাবাহক বা দূত প্রেরণ। এতে আপত্তির কি আছে তা আমার বুঝে আসেনা। ফেরেশতা যদি দূত বা বার্তাবাহক হয়ে আসে তবে কোন্ কারণে তার ক্ষেত্রে 'প্রেরণ' ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারবেনা?

আপনার সুদীর্ঘ আলোচনায় একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। সেটি হলো, আপনার অনেক যুক্তি ও বদ্ধমূল ধারণাকে আপনি এমন মূলনীতির আকারে বর্ণনা করেছেন যে, তাতে যেনো আদৌ কোনো ব্যতিক্রম নেই। অথচ বাস্তব ঠিক তার বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলেছেন যে, সমগ্র কুরআনে কোথাওالقاء বা تلقى শব্দের ব্যবহার অপঠিত ওহির জন্য (অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো ওহির জন্য) হয়নি। অথচ এ শব্দটি সব ধরনের القاء ও تلقى এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে, মানুষের পক্ষ থেকে, এমনকি শয়তানের পক্ষ থেকেও যে القاء ও تلقى হয়ে থাকে, তা কুরআনে লক্ষ্যণীয়। হযরত আদম আ. বেহেশতে বসবাস করেছিলেন, তখনও তিনি নবুয়ত লাভ করেননি। অথচ সেই সময়েও তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী লাভকে تلقى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ (সূরা আল বাকারা আয়াত ৩৭) অনুরূপভাবে সূরা নূরের ১৫ আয়াতে হযরত আয়েশা সংক্রান্ত অপবাদ এক দল মুসলমানের মুখে মুখে রটনা করাকে تلقى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ। একইভাবে সূরা ক্বাফের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ। সূতরাং আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, ফেরেশতাদের জন্য সব সময় نزول (অবতরণ) ক্রিয়াটাই ব্যবহৃত হতে পারে। ফেরেশতাদের বেলা جاء ও جائت শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ارسال শব্দটির প্রয়োগও দেখা গেছে। কাজেই আপনার দাবি ভ্রান্ত এবং এর দ্বারা আপনি যে বক্তব্য প্রমাণ করতে চান তাও প্রমাণিত হয়না। কুরআন ও হাদিসের বহু স্পষ্টোক্তি আপনার বক্তব্যের বিপরীত।

৩৪. ব্যভিচারের অপবাদ

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ এবং তার শরিয়তবিহিত দন্ড সম্পর্কে আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার আগে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশের সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পাকিস্তানে জারিকৃত এই অধ্যাদেশ মোতাবেক যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করলে সে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। কোনো মৃত মুসলমানের বিরুদ্ধেও এ ধরণের অপবাদ আরোপ করা হলে সেটা যদি তার পরিবার বা নিকট আত্মীয়দের মনোকষ্টের কারণ হয় তবে তাও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের জন্য শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। অভিযোগ আরোপকারি যদি নিজের সপক্ষে চারজন সাক্ষীর সত্য সাক্ষ্য আদালতে পেশ করতে না পারে, তবে তার উপর আশিটি কোড়া মেরে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের দণ্ড কার্যকরী করা হবে এবং তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে আর কখনো গ্রহণযোগ্য হবেনা। কোনো মুসলমানকে অবৈধজাত বা হারামজাদা বলাও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শামিল হবে।

অভিযোগ আরোপকারি যদি স্বয়ং আদালতে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করে যে, সে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করেছে কিংবা আদালতের সামনে সে কোনো মুসলমানের উপর এরূপ অভিযোগ আরোপ করে অথবা দু'জন সত্যবাদী এবং কবীরা গুণাহ থেকে নিবৃত্ত প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ আদালতে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি এ ধরণের অভিযোগ আরোপ করেছে এবং অভিযোগ আরোপকারি স্বীয় অভিযোগ প্রমাণ করতে চারজন সত্যবাদী সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তবে এই অভিযোগ আরোপকারি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের অপরাধে দোষী হবে। আসামি যদি অমুসলিম হয়, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো অমুসলিমও সাক্ষী হতে পারবে।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপিত হয়েছে, সে স্বয়ং অথবা তার প্রতিনিধি অপবাদ আরোপকারির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের অভিযোগ দায়ের করতে পারে। সেই ব্যক্তি জীবিত না থাকলে তার পিতামাতা বা সন্তানরা অভিযোগ দায়ের করতে পারে। পিতামাতা যদি সন্তানের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে, তবে অপবাদ আরোপজনিত দণ্ড কার্যকর হবেনা।

স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে তবে সে ক্ষেত্রে সাক্ষী আনয়নের পরিবর্তে পবিত্র কুরআন 'লিয়ান' এর পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এই পদ্ধতি হলো, স্ত্রী যদি অভিযোগটির সত্যতা অস্বীকার করে, তবে স্বামী আদালতের সামনে চারবার আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, "আমি নিজের স্ত্রী, অমুকের মেয়ে

অমুকের বিরুদ্ধে যে, ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছি, তাতে আমি সত্যবাদী।" চারবার এভাবে বলার পর পঞ্চম বারে বলবে "যদি আমি আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে থাকি তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" স্ত্রী যদি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, তবে সে উক্ত অভিযোগের জবাবে চারবার আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে যে, "আমার স্বামী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।" অত:পর পঞ্চম বারে বলবে, "সে যদি এই অভিযোগে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে আমার উপর আল্লাহর গযব হোক।" আদালতের বিচারপতি এই পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর বিয়ে বিচ্ছেদের রায় দেবেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল হবেনা। স্বামী বা স্ত্রী যদি এভাবে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে কসম না খাওয়া পর্যন্ত স্বামীকে হাজতে আটক করা হবে এবং স্ত্রীকেও পাল্টা কসম না খাওয়া অথবা স্বামীর অভিযোগ সত্য বলে মেনে না নেয়া পর্যন্ত হাজতে আটক রাখা হবে। সে যদি স্বামীর আরোপিত অভিযোগকে সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপজনিত অপরাধ এবং লিয়ানের মামলা ও আপিলের শুনানিতে বিচারকের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। অধ্যাদেশটির শেষ ধারা হলো, যেসব মোকদ্দমা এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পূর্বে আদালতে দায়ের হয়েছে এবং যে সব অপরাধ এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে, তার উপর এ অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হবেনা।

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের সংক্ষিপ্ত সার উপরে বর্ণিত হলো। এবার আমি আমার বিবেচনায় যে কয়টি জিনিস এই অধ্যাদেশে সংযোজন অথবা ব্যাখ্যার আকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি তার উল্লেখ করছি :

১. ইসলামের সাক্ষ্য আইনের আলোকে এটা যে কোনো সাক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে সাক্ষীতে বলতে হবে "আমি আল্লাহর কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি" লিয়ানের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষকে "কসম সহকারে সাক্ষ্য দিচ্ছি" কথাটা বলতে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরে লিয়ানের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'বার "আল্লাহর কসম সহকারে সাক্ষ্য প্রদান" শব্দটি এসেছে এবং ফকীহগণও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, লিয়ানে সাক্ষ্য শব্দটা উচ্চারণ করা অপরিহার্য। স্বামী বা স্ত্রী শুধু "আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি সত্যবাদী বা সত্যবাদিনী" বললে লিয়ান কার্যকর হবেনা। এ জন্য সাক্ষ্য শব্দটা বলাও জরুরি। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় মামলার উভয়পক্ষ বা সাক্ষীর জবানবন্দী বা সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাষা সম্বলিত ফর্মুলা বা বিধি নির্ধারিত নেই। সাক্ষীকে সাধারণত এ কথাই বলতে বাধ্য করা হয় যে, "আমি ঈমানদারীর সাথে সত্য বলবো।" কোনো কোনো সাক্ষী আল্লাহর কসম বা কুরআনের কসম খায় অথবা বলে যে, "আমি আল্লাহকে হাজির নাজির (উপস্থিত

ও চাক্ষুস দর্শক) জেনে বলছি।" এসব রকমারি রীতি যেহেতু প্রথাসিদ্ধভাবে চালু হয়ে গেছে, তাই এসব কথার মাধ্যমে দেয়া জবানবন্দী বা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে যেহেতু বর্তমানে আমাদের দেশে আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলামি আইন ও বিধান বাস্তবায়নের সূচনা হয়েছে, তাই সাক্ষ্যদানের ভাষা আইনানুগভাবে নির্ধারণ করে দেয়া আবশ্যক। আমার মতে, যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তাকে বলতে হবে, "আমি আল্লাহর কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।" লিয়ানের বেলায়ও উভয় পক্ষকে নিজ নিজ বিবৃতি এই ভাষাতেই শুরু করতে হবে।

২. অধ্যাদেশটির ধারা ৬-তে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের দায় থেকে অব্যাহতি লাভের কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষেত্র হলো, যদি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপর এমন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে বলে যাদের ঐ ব্যক্তির উপর উক্ত ব্যভিচারের অভিযোগের ব্যাপারে আইনানুগ অধিকার থাকে, বা তারা যদি কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো হয়, তাহলে সেটা ব্যভিচারের অপবাদ বলে গণ্য হবেনা। এই ব্যতিক্রমী ধারার মধ্যে কি মহৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা আমার বুঝে আসেনি। আমার মতে এই ধারাটি অবাঞ্ছিত এবং এটি বাদ দেয়া উচিত। আসলে এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে মানহানি আইনের একটি বিধির অনুকরণে রচিত। পাকিস্তান দন্ডবিধির ৪৯৯ ধারার অধীন 'অষ্টম ব্যতিক্রমে' এই বিধিটি সন্নিবেশিত হয়েছে। পাকিস্তান দন্ডবিধিতে এর যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য অধ্যাদেশটিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণটি নিম্নরূপ :

"A সদুদ্দেশ্য সহকারে Z-এর বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগ রুজু করলো অথবা A সদুদ্দেশ্য সহকারে Z নামক ভৃত্যের চালচলন সম্পর্কে তার মনিবের নিকট নালিশ জানালো, অথবা A সদুদ্দেশ্য সহকারে Z এর চালচলন সম্পর্কে তার পিতার নিকট অভিযোগ দায়ের করলো, এরূপ ক্ষেত্রে A-এর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করা যাবেনা।"

এ ব্যাপারে পয়লা কথা হলো, মানহানিজনিত সাধারণ নালিশ এবং ব্যভিচারের অভিযোগে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা এবং একটির সুবিধা অপরটির ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত: অধ্যাদেশের উল্লেখিত ধারাটিকে পাকিস্তান দন্ডবিধির আলোচ্য ধারাটির সমতুল্য মনে করে কেউ যদি উক্ত উদাহরণ দ্বারা সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করে তবে সেটা সঙ্গত হবেনা। কোনো আদালতে ব্যভিচারের অভিযোগ তুললেই তো তা যথারীতি ব্যভিচারের অপবাদে পর্যবসিত হয় এবং সে কথা অধ্যাদেশে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

পিতার কাছে সন্তানের বা মনিবের কাছে ভৃত্যের নামে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা হলে পিতা বা মনিব যদি ব্যাপারটা আদালতে আনতে না চায়, তাহলে তো

ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি পিতা বা পুত্র বা ভৃত্য স্বয়ং অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অপবাদের মামলা ঠুকে দেয়। তাহলে তো ইসলামি আইন অনুসারে অভিযোগকারী চারজন সত্যবাদী সাক্ষী হাজির না করা পর্যন্ত অপবাদের দন্ড থেকে কিছুতেই নিস্তার পেতে পারেনা। তখন বাদী এই ওজর দিয়ে রেহাই পেতে পারবেনা যে, আমি তো সুদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগটি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বশীলের গোচরীভূত করেছিলাম। এ কারণে আমি এই ব্যতিক্রম ও রক্ষাকবচকে ইসলামি শরিয়তের আলোকে নিস্প্রয়োজন ও অবৈধ মনে করি।

৩. এই অধ্যাদেশের ৬নং ধারার (C) উপধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করলে তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার একটি পন্থা এই যে, দু'জন সৎ, কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ সাক্ষীকে আদালতে হাজির করবে। কিন্তু ৩নং ধারার অপবাদ আরোপের দায়ে ধরা পড়ার যে কয়টি সম্ভাব্য ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে, তার (I) তে বলা হয়েছে যে, এরূপ একটি ক্ষেত্র হলো, আসামি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে ব্যভিচারের অভিযোগ রুজু করলো, কিন্তু নিজের সমর্থনে চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারলোনা। এখানে শুধুমাত্র (Four witnesses) শব্দ রয়েছে, কিন্তু সাক্ষীর কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নেই। এখানেও সাক্ষীর সেই গুণাবলী জুড়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়, যা ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণের জন্য ৬নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাক্ষীকে সত্যবাদী এবং কবীরা গুণাহমুক্ত হতে হবে। মামলার সাক্ষীদের সৎ ও সত্যবাদী হওয়া যে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মূলনীতি, সে কথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবে ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এটিকে অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করেছেন। যদিও অধ্যাদেশটির পূর্বাপর প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এখানে ঐ গুণগুলো অনুল্লেখিত থাকাতে ওগুলোর প্রয়োজন নেই বুঝা যায়না। তথাপি সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা নিরসনের খাতিরে উক্ত গুণগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করাই উত্তম।

৩৫. কোন্ কোন্ প্রাণী হালাল বা হারাম

প্রশ্ন : অনুগ্রহপূর্বক কুরআন ও হাদিসের আলোকে এমন কিছু মূলনীতি জানিয়ে দেবেন যার সাহায্যে প্রাণীসমূহ বিশেষত পাখিদের হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রসঙ্গত এটাও জানাবেন যে, বক, কোয়েল, হলুদ চঞ্চুধারী ও হলুদ পাঞ্জাধারী বড় ময়না পাখি হালাল না হারাম?

জবাব : পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসে কতিপয় প্রাণীর হালাল বা হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সেগুলো ছাড়া বাদবাকি প্রাণীগুলোর হালাল বা হারাম নিরূপণ করা যায়, এমন মূলনীতিও বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত প্রাণী ও শূকর

হারাম এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। হালাল প্রাণীর জন্য একটা মূলনীতি বলা হয়েছে এই যে :

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ

"তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরনের চারণশীল প্রাণীকে হালাল করা হয়েছে।" *(সূরা আল মায়েদা : ১)*

এ আয়াতে গৃহপালিত জন্তু বা তদসদৃশ বিচারণশীল প্রাণী হালাল করা হয়েছে। আর যেসব প্রাণী মাংসভোজী ও হিংস্র, গোশত খাওয়ার জন্য জানোয়ারকে হত্যা বা জখম করে দীর্ণ করে ছিঁড়ে খায়, সেগুলো এর আওতাবহির্ভূত। তাফহীমূল কুরআনের লেখক এ আয়াতের ব্যাপকভিত্তিক তাফসির করেছেন তা নিম্নে দেয়া হলো :

'আনয়াম' (গৃহপালিত পশু) শব্দটা দ্বারা আরবি ভাষায় উট, গরু, মেষ ও ছাগল বুঝায়। আর 'বাহীমা' যে কোনো বিচরণশীল প্রাণীকে বলা হয়। আল্লাহ যদি শুধু এ কথা বলতেন যে, তোমাদের জন্যে আনয়াম হালাল করা হয়েছে তাহলে শুধু গরু ছাগল উট ও ভেড়া এই চার প্রকারের গৃহপালিত পশুই হালাল হতো। কিন্তু নির্দেশটি যে ভাষায় ঘোষিত হয়েছে তাহলো "গৃহপালিত ধরনের সকল বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে" এ দ্বারা নির্দেশের আওতা প্রশস্ততর হয়ে যায় এবং গৃহপালিত প্রকৃতির সকল পশু হালালের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ যাদের ধারালো দাঁত নেই, জন্তু খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তে উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য পাশবিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের গৃহপালিত জন্তুসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এ আয়াত থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, যেসব চতুষ্পদ জন্তু গৃহপালিত পশুর বিপরীত ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হয় এবং অন্যান্য জন্তুকে মেরে খায় তা হালাল নয়। এই ইঙ্গিতকে রসূল সা. স্পষ্ট করে হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন যে, হিংস্র জন্তু হারাম। অনুরূপভাবে যেসব পাখির বিশেষ ধরণের নখর রয়েছে এবং অন্যান্য প্রাণীকে শিকার করে খায় অথবা মৃত প্রাণী খায়, সেগুলোকেও রসূল সা. হারাম ঘোষণা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير -

"রসূল সা. সকল ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং (ধারালো নখর দ্বারা শিকার ধরতে অভ্যস্ত) সকল প্রাণী (খাওয়া) নিষিদ্ধ করেছেন।"

অন্যান্য বহু সাহাবি থেকেও এই বক্তব্যের সমর্থনে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের এই মূলনীতি প্রয়োগ করে হানাফি ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ যেসব জন্তুকে হিংস্র প্রাণী আখ্যায়িত করেছেন ও তা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন তার

মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্তুগুলো হলো সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, শিয়াল, বিড়াল, কুকুর, গণ্ডার, বাগডাসা, গুইসাপ, পালিত গাধা। কুকুর ও বিড়ালের হারাম হওয়া এবং খরগোশের হালাল হওয়ার কথা হাদিসেও বলা হয়েছে। হাতি হানাফি মাযহাবে হারাম।

হানাফি মাযহাবের সাধারণ ফতোয়া অনুসারে চিল, শকুন, ঈগল ও বাজপাখি হারাম পাখিরূপে গণ্য। বক, তোতা, ময়না, কবুতর, তিতির, চড়ুই, আবাবীল, নীলকণ্ঠ, হুদহুদ, কোকিল ও বাবুই হানাফি মাযহাবে হালাল। কেননা এগুলো স্বভাবসুলভভাবে শিকারি ও মাংসভোজি নয়। এগুলো নখর দিয়ে প্রাণী ধরেনা এবং তা দীর্ণ করে ও ছিঁড়ে খায়না। কোয়েল হারাম না হালাল সে সম্পর্কে কোনো গ্রন্থে স্পষ্টোক্তি পাওয়া যায়নি। তবে আমি মনে করি, এটি কোকিলের মতো একটি অশিকারি পাখি এবং তা হালাল হওয়া উচিত।

কাক হারাম কি হালাল এ সম্পর্কে হানাফি ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এর শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এবং কোনো কোনোটিকে হালাল এবং কোনো কোনোটি হারাম বলেছেন। সাম্প্রতিকালে কাক নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উঠেছে। একটি মহল প্রকাশ্য জনসমাবেশে সাধারণ দেশী কাক রান্না করে খাওয়ার মহড়া দেখিয়েছেন। আমার মতে সব ধরণের কাকই হারাম। বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদিস গ্রন্থে রসূল সা.-এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, পাঁচ ধরণের প্রাণী ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত (পাপিষ্ট) এবং এগুলো হারাম শরিফের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র হত্যা করা চাই। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। কোনো হালাল প্রাণীকে এভাবে পাইকারি হত্যার নির্দেশ কিভাবে দেয়া যেতে পারে? কাজেই এসব প্রাণী সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশই থাকতে পারেনা। আরব দেশে আমাদের দেশের মতো কাক ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু রসূল সা. বা সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তা খাওয়া বা হালাল আখ্যায়িত করার কথা কোনো হাদিসেই পাওয়া যায়না।

সামুদ্রিক প্রাণী হালাল হওয়ার কথা কুরআনে নীতিগতভাবে বলা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৯৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও খাদ্য হালাল করা হয়েছে।"

যদিও উপরোক্ত নির্দেশটি প্রাথমিকভাবে এহরাম বাঁধা অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এহরাম অবস্থায়ও (যখন কোনো ভূ-চর প্রাণী শিকার করা হারাম) যে প্রাণী শিকার করা ও খাওয়া জায়েয এবং হালাল, সেই জলজ প্রাণী সর্বাবস্থায় হালাল হবে। তবে এ দ্বারা কি ধরণের প্রাণী বুঝানো হয়েছে, সেটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে। সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাছ তো

নিশ্চিতভাবেই পড়ে। হাদিসেও তা জবাই ছাড়া হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আলখিবতের প্রসিদ্ধ ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আলখিবতের সামরিক অভিযানকালে সাহাবায়ে কেরামের হাতে সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে তিমি মাছ ধরা পড়ে। তারা এ মাছের গোশত খান এবং রসূল সা.-এর কাছে হাজির করলে তিনিও তা খান। তবে অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তুর ব্যাপার বিতর্কিত।

হানাফি মাযহাব অনুসারে জলজ প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র মাছ অথবা মাছের সাথে সঠিক সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাঁতার কাটা প্রাণী হালাল। এ মতের সপক্ষে হানাফিদের যুক্তি হলো, কুরআন শরিফে পবিত্র জিনিস হালাল ও নোংরা জিনিসকে হারাম করা হয়েছে। মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণীকে মানুষ স্বভাবতই ঘৃণা করে। এ ধরণের জলজ প্রাণী রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম খেয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। অধিকন্তু আবু দাউদ ও নাসায়িতে হযরত আব্দুর রহমান বিন উসমান থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সা. জনৈক চিকিৎসককে ব্যাঙ মেরে ওষুধ বানাতে নিষেধ করেছিলেন, যদিও তা জলজ প্রাণী। যে মাছ আপনা আপনি পানিতে মরে ভাসতে থাকে, হানাফি মতে তা খাওয়াও মাকরূহ তাহরীমী। বিশেষ করে সেই মৃত মাছ যদি চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। তবে কোনো মাছ নদী বা খাল থেকে জীবিত ধরে আনার পর কোনো সংকীর্ণ জলাশয় বা পাত্রে রাখার পর মারা যায়, তা মাকরূহ নয়, সম্পূর্ণ হালাল। কাকড়া, ব্যাঙ ও কুমির হানাফিদের মতে হারাম। ভূ-চর প্রাণীর মধ্যে সরীসৃপ ও পোকা মাকড়ও হানাফিগণ নোংরা প্রাণী আখ্যায়িত করে ও হারাম মনে করে। সাপ, গিরগিটি, গুইসাপ ও কেঁচো তাদের মতে হালাল নয়। *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৭৮]*

৩৬. কুরবানীর চামড়া সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

প্রশ্ন : আমি কুরবানীর চামড়া সম্পর্কে শরিয়তের বিধান জানতে ইচ্ছুক। কোনো কোনো আলেম বলেন, কুরবানীর চামড়া কোনো অভাবি কিংবা মিসকিনকে দেয়া উচিত, অথবা দরিদ্র ছাত্র বা এতিমদের কল্যাণে ব্যয় করবে এমন প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করা উচিত। এই সব আলেমের মতে, চামড়া বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর তা যাকাতের বিধানের আওতায় চলে যায়। তাই এগুলো যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট খাতে ও নির্দিষ্ট শর্তানুসারে ব্যয় করতে হবে। সব ধরণের জনকল্যাণমূলক কাজে এর অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়।

কেউ কেউ এ কথাও বলেন, যারা কুরবানী করার পর নির্বিচারে যাকে তাকে কুরবানীর চামড়া দিয়ে দেয় এবং তা কোন্ খাতে ব্যয় করা হবে, তা ভেবে দেখেনা ও খোঁজ নেয়না, তাদের কুরবানী হয়না। আমি তো মনে করেছিলাম, যে ব্যক্তি কুরবানী করে, তার উপর হাদিস অনুযায়ী শুধু এতোটুকু বাধ্যবাধকতা থাকে যে, সে নিজে চামড়া বেচে খেতে পারবেনা। জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের

জন্য তা অন্যের কাছে সোপর্দ করতে হবে। এর পর কুরবানীকারীর আর কোনো দায়দায়িত্ব থাকেনা। যার কাছে সোপর্দ করা হলো, সে যদি তা কোনো ভালো কাজে ব্যয় করে, তা হলে সেও দায়মুক্ত হয়ে যায়। তথাপি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সংশয়মুক্ত করলে ভালো হয়, যাতে কারো মনে আর কোনো জটিলতার সৃষ্টি হতে না পারে।

জবাব হজ্জের সময় হাজী সাহেবদের কৃত কুরবানী এবং ঈদুল আযহা উদযাপনকালে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কৃত কুরবানী উভয়ের গোশত ও চামড়ার ব্যাপারে শরিয়তের বিধান একই রকম। কুরবানীর চামড়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها

"তোমরা কুরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হও, বিক্রি করে দিও না।"

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন :

لا اعطى فى جزارتها شيئا منها

"আমি যেনো কুরবানীর মজুরি বাবদ গোশত বা চামড়া থেকে কসাইকে কিছু না দিই।"

উল্লেখিত নির্দেশাবলীর যে নিগুঢ় মর্ম স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যাচ্ছে তা এই যে, যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, সে কুরবানীর চামড়া বা গোশত বিক্রি করে তার মূল্য নিজের কাজেও লাগাতে পারবেনা, চামড়া ও গোশত দিয়ে কসাইর মজুরিও দিতে পারবেনা। চামড়াকে চামড়ার আকারে রেখে প্রক্রিয়াজাত করে কুরবানীকারী নিজের কাজেও ব্যবহার করতে পারবে, ইচ্ছে করলে তা প্রিয়জনকে উপহার হিসেবেও দিতে পারবে, ইচ্ছে করলে তা সদকাও করতে পারবে। অন্যকথায় বলা যায়, রসূলুল্লাহ সা.-এর উক্ত নির্দেশাবলীর তাৎপর্য হলো, কুরবানীকারী চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য নিজের ব্যক্তিগত কাজে না খাটিয়ে তার পক্ষে চামড়াকে হুবহু নিজের ব্যবহারে লাগানো, অথবা কোনো দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান করা কিংবা কোনো ধনী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে উপহার বা উপঢৌকন হিসেবে দেয়া বৈধ। উপরোক্ত তিনটি কর্মপন্থাই শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

এখানে অবশ্য আরো একটা প্রশ্ন জাগে যে, কুরবানীকারী যদি চামড়া বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার মূল্য কোন্ খাতে ব্যয় করা যাবে। অনুরূপভাবে, কুরবানীকারী যদি চামড়া কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয় এবং সেই স্বচ্ছল ব্যক্তি তা বিক্রি করে দেয়, তবে সে তা কোথায় ব্যয় করবে? এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, উভয় ক্ষেত্রে বিক্রয়কারীর পক্ষে চামড়ার মূল্য ব্যক্তিগত কাজে খাটানো জায়েয হবেনা, বরং তা সদকা হিসেবে দান করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। তবে প্রতিপাদ্য

বিষয় এই যে, এই সদকা কি ওয়াজিব না নফল হিসেবে গণ্য হবে? এটাকে যদি যাকাতের ন্যায় আবশ্যিক সদকা মনে করা হয়, তবে তার ব্যয়ের খাত যাকাতের ব্যয়ের খাতের মতোই হবে। আর যদি এটা নফল সদকা হয়, তবে তা যে কোনো সৎ কাজে ব্যয় করা যাবে এর দ্বারা দরিদ্র লোকেরা ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে ধনী লোকেরাও উপকৃত হলে দোষ নেই।

আধুনিক হানাফি ফকীহগণের মতানুসারে কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ অবিকল যাকাতের ব্যয়ের খাতেই ব্যয় করতে হবে। আমি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চিন্তা গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়েছি যে, কুরআন ও হাদিসের কোথাও এই মতের সপক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় কিনা, এবং হানাফি মাযহাবের ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতেও খুঁজে দেখেছি যে, এই মতের সপক্ষে কোনো যুক্তি লিপিবদ্ধ আছে কিনা? কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এমন কোনো মজবুত দলিল পাইনি। কুরবানী যদিও হানাফিগণের পরিভাষা অনুসারে ওয়াজিব, কিন্তু কুরবানীর গোশত ও চামড়া সম্পর্কে শরিয়তের যেসব নির্দেশ রয়েছে, যাকাত ও উশরের নির্দেশের সাথে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। গোশত ও চামড়া দ্বারা কুরবানীকারী নিজেও কিছু না কিছু উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যাকাতের সম্পদ দ্বারা এধরণের উপকৃত হওয়া নাজায়েয। 'চামড়া বিক্রি করোনা' হাদিসের এই উক্তি থেকে চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়, সে কথা সত্য। তবে কেউ যদি চামড়ার মূল্য কোনো সৎ কাজে বা কল্যাণমূলক কাজে খাটায় এবং বিক্রয়কারী নিজের ব্যক্তিগত ভোগে না লাগায়, তা হলেও নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সফল হয়।

কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থকে যদি যাকাতের সমতুল্য ধরা হয়, তাহলে এ অর্থ সংগ্রহ করা ও যাকাতের খাতে তার বন্টন নিশ্চিত করাকেও ইসলামি সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করতে হবে। সেটা যদি করা হয়, তবে তা এমন একটা বিদ্য়াত হবে, যার সমর্থনে রসূলুল্লাহ সা.-এর কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনের কোনো মৌখিক উক্তি কিংবা বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যাবেনা। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হানাফি ফকীহগণ চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা একেবারেই উপকৃত হওয়া যাবেনা, এ কথা মেনে নেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রকে বরং বিশেষ ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত করে তাতে এই অর্থ খাটানো জায়েয বলে তারা রায় দিয়েছেন এবং সে রায় বিশুদ্ধ কিয়াস ও ইসতিহসানের সূত্র অনুযায়ী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। আল্লামা সারাখসী স্বীয় 'আল মাবসুত' গ্রন্থের ১২শ খণ্ডে বলেছেন :

لا باس بان يشترى بجلد الاضحية متاعا للبيت

"কুরবানীকারী যদি কুরবানীর চামড়া দিয়ে গৃহের কোনো আসবাবপত্র খরিদ করে তবে তাতে আপত্তি নেই।"

তিনি এর আরো বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এমন আসবাবপত্র খরিদ করা চাই যা টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, যেমন চালনি বা ব্যাগ ইত্যাদি। লবণ, সিরকা বা ইত্যাকার ক্ষণস্থায়ী জিনিস চামড়ার বিনিময়ে খরিদ করা উচিৎ নয়। চামড়া বিক্রি করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা হলে সে সম্পর্কেও ইমাম সারখসী শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন যে تصدق بثمنه 'তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে।'

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি সদকাকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে বহাল রেখেছেন। ফলে ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকা দু'টোই এর আওতায় আসে। তাই এটিকে যাকাতের খাতেই ব্যয় করতে হবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা আছে বলে তিনি মনে করেননা। চামড়ার মূল্যকে আল্লাহর পথে ও তার বান্দাদের কল্যাণার্থে ব্যয় করলেই বলবে। *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৬৮]*

৩৭. মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

ইতোপূর্বে এক ব্যক্তি মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার ও বেচাকেনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্ত হননি। আরো বিস্তারিতভাবে প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করেছেন। এবারকার প্রশ্নটি নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন : আমি মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম যে, প্রক্রিয়াজাত করার আগে তা ব্যবহার বা বিক্রি করা যায় কিনা? আপনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন যে, এটা জায়েয আছে। কেনা চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণ সবার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে চামড়ার বেচাকেনা নিষিদ্ধ হলে প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে তাকে পবিত্র করা সকল মানুষের সাধ্যে কুলাবেনা। অথচ শরিয়তে শুধু প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়াকেই পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমি দু:খের সাথে জানাচ্ছি যে, মৃত জন্তুর চামড়ার কেনাবেচা সম্পর্কে আপনার জবাবে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। এর একটি কারণ এই যে, আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন। জবাবে কোনো দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ইমাম শওকানীর এ সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে আপনার জবাবে আরো বেশি অতৃপ্তি জন্মে গেছে। তিনি নিম্নোক্ত হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন :

"হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির কেনাবেচা হারাম করে দিয়েছেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এই চর্বি দ্বারা নৌকা ও চামড়ায় তেল দেয়া হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে প্রদ্বীপ জ্বালায়। তিনি বললেন না এটা হারাম। অতপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন, আল্লাহ ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! আল্লাহ যখন মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম

করেন তখন তারা তাকে গলিয়ে ফেলে, তারপর তা বিক্রি করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজেদের কাজে লাগায়।"

এ হাদিস সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইমাম শওকানী বলেন :

"ইবনুল মুনযির মৃত প্রাণীর ক্রয় বিক্রয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, মৃত প্রাণীর বেচাকেনা হারাম এ কথার অর্থ তার সকল অংশেরই বেচাকেনা হারাম। তবে মাছ, পঙ্গপাল এবং যে অংশে জীবনের কোনো লক্ষণ বিরাজ করেনা তা হারাম নয়। মৃত প্রাণীর দেহের কোনো অংশকে কাজে লাগানো যে হারাম, সেটা অন্য দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন রসূলুল্লাহ সা.-এর এই হাদিস "মৃত প্রাণীর কোনো কিছুই কাজে লাগিও না।" অর্থাৎ এরূপ ধারণা করা চাইনা যে, মৃত প্রাণী বিক্রি করাটা এ হাদিস দ্বারা বৈধ প্রমাণিত হয়, মৃত প্রাণী বিক্রি করা হারাম। এ হাদিস দ্বারা হারাম জিনিসকে ব্যবহারের বিভিন্ন পন্থা ও কলাকৌশলও অবৈধ প্রমাণিত হয়। বস্তুত, আল্লাহ যে জিনিসকে তাঁর বান্দাহদের জন্য হারাম করেছেন তা বিক্রি করাও হারাম। কেননা তার মূল্য হারাম।" *[নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়]*

আমি আশা করি এ বিষয়ে সবিস্তারে লিখবেন এবং আমার ও জনগণের সংশয় দূর করবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

জবাব : আপনার দ্বিতীয় চিঠি পড়ে মনে হয়, আপনার মতে মৃত প্রাণীর দেহের সকল অংশের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান এক ও অভিন্ন চাই তা গোশত হোক বা চামড়া হোক, পশম হোক বা হাড়গোড়, শিং বা নখ যা-ই হোক। তাছাড়া একটিমাত্র হাদিস দ্বারাই আপনি মৃত দেহের সকল অংশকে হারাম মনে করে নিয়েছেন। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। হাদিস বিশারদগণ ও মুজতাহিদ (চিন্তাবিদ ও গবেষক) ইমামগণের সংখ্যাগুরু অংশ মৃত দেহের সকল অংশের উপর একই বিধান প্রয়োগ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি সহীহ বুখারির ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ের "প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে মৃত প্রাণীর চামড়া সংক্রান্ত বিধান" শীর্ষক হাদিসগুচ্ছ দেখুন। এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ সা. একটা মৃত ছাগল দেখতে পেলেন। তিনি বললেন তোমরা এর চামড়া কাজে লাগালে না কেনো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন এতো মরা জন্তু। রসূলুল্লাহ সা. বললেন এটা শুধু খাওয়া হারাম। এরপর আরো কয়েকটি হাদিসগুচ্ছ বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারি আরো একটি হাদিসগুচ্ছ উদ্ধৃত করেছেন। এর শিরোনাম হলো : 'মৃত প্রাণী ও মূর্তি বিক্রয়' এ হাদিসগুচ্ছের অধীনে আপনার উদ্ধৃত হাদিসটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হাদিসে মৃতদেহ ও তার চর্বি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। উভয় হাদিস যে সনদের দিক

দিয়ে বিশুদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা। এর একটি অপরটি দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। তাই এ কথা না মেনে উপায় থাকেনা যে, মৃত প্রাণীর পুরো দেহ গোশত সমেত দাম ঠিক করে বিক্রি করা তো অবশ্যই নিষিদ্ধ, তবে চর্বি ও গোশত ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশ অথবা অন্ততপক্ষে তার চামড়া ব্যবহার করা যেহেতু জায়েয, সুতরাং তার ক্রয় বিক্রয়ও জায়েয হবে।

ফাতহুল বারীতে হাফেজ ইবনে হাজর এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাই বলেছেন যে, এই হাদিস ও তার শিরোনাম থেকে বুঝা যায়, ইমাম বুখারি ব্যবহারের বৈধতা থেকে ক্রয়বিক্রয়ের বৈধতার পক্ষে যুক্তি দর্শিয়েছেন। কেননা যে জিনিস ব্যবহার করা জায়েয, তার ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয। আর যে জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ, তার বেচাকেনাও নিষিদ্ধ। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদিসগুলোকে ইমাম বুখারি 'জবাইযোগ্য প্রাণী' সংক্রান্ত অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করেছেন। এর একটির অনুবাদ একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অপরটিতে রসূলুল্লাহ সা.-এর উক্তি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে :

(ما على اهلها لو انتفعوا باهابها ؟)

"এই ছাগলটির মালিক যদি এর চামড়াটি কাজে লাগাতো, তাহলে অসুবিধা কি ছিলো?"

এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে হাজর বলেন, ইমাম যুহরী এ হাদিস থেকে মৃত প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করাকে শর্তহীনভাবে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, চাই তা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পাকানো হোক বা না হোক। ইমাম দাউদ যাহেরীর মতামতও তদ্রূপ। এছাড়া বুখারি শরিফের 'কসম ও মান্নত' সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস হযরত সওদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের একটা ছাগল মারা গিয়েছিল। আমরা তার চামড়া পাকিয়ে নিলাম এবং ব্যবহার করতে লাগলাম। ক্রমান্বয়ে তা একটা পুরানো পানি মশকের মতো হয়ে গেলো।

বুখারি শরিফের 'জবাইযোগ্য জন্তু' সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'উমদাতুল ক্বারী'তে হাফেজ বদরুদ্দীন আইনি বলেছেন, এ হাদিসের আলোকে অধিকাংশ ফকীহ ও মুফতিগণ পাকানো চামড়ার ব্যবহার বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ঠিক তাই। ইমাম আহমদ সম্পর্কে তিরমিযীর বরাত দিয়ে আইনি লিখেছেন, তিনি প্রথমে 'মৃত জন্তুর কোনো কিছুই ব্যবহার করো না' এই হাদিস অনুসারে আদৌ ব্যবহার না করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরে এ হাদিসের সনদের দুর্বলতাবশত পরিত্যাগ করেন। আলোচ্য হাদিস প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজরও এ কথাই লিখেছেন। আইনি ও ইবনে হাজর উভয়ে একথাও লিখেছেন যে, মৃত প্রাণীর সবকিছুই নিষিদ্ধ এই মর্মে যে কয়টি

হাদিস বর্ণিত আছে, তার প্রত্যেকটির সনদ নিয়ে দ্বিরুক্তি রয়েছে এবং বিশুদ্ধ হাদিসের বিরোধী হওয়ার কারণে ঐ হাদিসগুলো অগ্রহণযোগ্য। এ হাদিসগুলোর মধ্যে একটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইবনে আলীম, যিনি সাহাবি ছিলেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার বর্ণনা একটি চিঠির উপর নির্ভরশীল। চিঠি আর যাই হোক, সরাসরি শ্রবণের সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

সহীহ বুখারির পর সহীহ মুসলিমের হাদিসগুলো বিবেচনায় আনা যাক। এতে 'মৃত জন্তুর চামড়া পাকালে পবিত্র হয়ে যায়।' শীর্ষক হাদিসগুচ্ছে প্রথমে ঐ চারটি হাদিসই হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এবং চারটিই ছাগলের চামড়া সংক্রান্ত। এতে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, মৃত ছাগলটি ছিলো হযরত মাইমুনার চাকরানীর। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের কথা বাদ দিলে এর সব ক'টির বাদবাকি বক্তব্য বুখারি শরিফে বর্ণিত হাদিসগুলোর অনুরূপ। এরপর হযরত ইবনে আব্বাসের আরো কয়েকটি হাদিস রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোও পাকানো চামড়ার পবিত্রতা প্রমাণ করে। এগুলোর ভাষা এরূপ :

اذا دبغ الاهاب فقد طهر- دباغه طهوره

এই সমস্ত হাদিসের বিশদ ব্যাখ্যা লিখে ইমাম নববী সর্বমোট সাতটি অভিমত তুলে ধরেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে কুকুর ও শূকর ছাড়া সকল প্রাণীর চামড়া পাকালে পবিত্র হয়ে যায়, চাই তা ভিজে হোক বা শুকনো হোক।
২. ইমাম আহমদের অপেক্ষাকৃত পরিচিত অভিমত এই যে, কোনো চামড়াই পাকানো দ্বারা পবিত্র হয়না।
৩. ইমাম আওযায়ী, আবুস সাওর ও ইবনে মুবারকের মত এই যে, শুধুমাত্র হালাল প্রাণীর চামড়া পাকালে পবিত্র হয়।
৪. ইমাম আবু হানিফার মত হলো, শূকর ছাড়া সকল প্রাণীর চামড়া পাকালে পবিত্র হয়ে যায়।
৫. ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত এই যে, প্রত্যেক প্রাণীর বাহ্যিক অংশ অর্থাৎ উপরের অংশ পাকালে শুকনো অবস্থায় পবিত্র হতে পারে।
৬. ইমাম দাউদ জাহেরীর মতে প্রত্যেক প্রাণীর চামড়া পাকালে পবিত্র হতে পারে।
৭. ইমাম যুহরীর মত এই যে, পাকানো ব্যতিরেকেও মৃত প্রাণীর চামড়া পবিত্র।

সহীহ মুসলিম, ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'মদ ও মৃত জানোয়ার হারাম' শীর্ষক হাদিসগুচ্ছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে অপবিত্র জিনিসগুলো কেবল খাওয়া ও শরীরে লাগানো নিষিদ্ধ। অন্য সকল প্রকারের ব্যবহার বৈধ।

যা হোক, এ হাদিসগুলো এবং তার উল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকে আমার কাছে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট অন্ততপক্ষে হালাল প্রাণীগুলোর চামড়ার ব্যবহার ও ক্রয়বিক্রয় বৈধ এবং তা পাকানোর পর পবিত্র হয়ে যায়, চাই জবাই হওয়ার পরিবর্তে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে থাকনা কেনো। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইমাম দাউদ যাহেরীকে নাইলুল আওতারের পঞ্চম খণ্ডেরই ১৪ পৃষ্ঠায় 'অনুকরণযোগ্য মহান প্রাচীন ইমাম' বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও ইমাম শওকানী মৃত প্রাণীর চামড়ার প্রশ্নে তাঁর ঠিক বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। ইমাম দাউদ যেখানে প্রত্যেক প্রাণীর চামড়াকে সর্বাবস্থায় পবিত্র মনে করেন, ইমাম শওকানী সেখানে কোনো চামড়াকেই কোনো অবস্থায়ই পবিত্র মনে করেননা।

বিচারপতি শওকানীর যে মত আপনি উদ্ধৃত করেছেন, আমি তার সাথে একমত নই। তবে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা জরুরি মনে করিনা। তিনি আল মুনতাকীর যে হাদিস আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, "আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্য কোনো জিনিস খাওয়া হারাম করে দেন, তখন তার বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম করেন," সে সম্পর্কে আমি শুধু এতোটুকু বলবো যে, আমার নগণ্য বুদ্ধি বিবেচনা মোতাবেক যেভাবে অন্য কয়েকটি সহীহ হাদিস থেকে মৃত প্রাণীর চামড়ার ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয়, তেমনিভাবে তার কেনাবেচার বৈধতাও প্রমাণিত হয়। কেননা কেনাবেচাও এক ধরণের ব্যবহার। ইমাম খাত্তাবীর এ উক্তি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের টীকাকারগণও উল্লেখ করেছেন যে, মৃত প্রাণীর গোশত নিজের পালিত কুকুরকে খাওয়ানো যায় এবং এটাও এক ধরণের বৈধ ব্যবহার। কোনো কোনো হাদিসে শিকার ধরা কিংবা পাহারার কাজের জন্য কুকুর পোষা ও বিক্রি করা জায়েয বলা হয়েছে। অথচ কুকুরের গোশত হারাম ও অপবিত্র। অনুরূপভাবে পালিত গাধা ও খচ্চর হারাম। তাই বলে এ দুটি প্রাণীকে ব্যবহার করা ও ক্রয় বিক্রয় করা কি হারাম? আপনি এবং ইমাম শওকানী যদি এটাকেও হারাম মনে করেন, তবে আমি এর উপরও এই আপত্তি তুলতে পারি যে, ইমাম শওকানী যেমন এই আলোচনা প্রসঙ্গেই লিখেছেন "ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত এই যে, শূকর পবিত্র।" এটা কোনো চলনসই মাযহাবের ভিত্তি হতে পারেনা, এ কথাটাও তদ্রুপ। ইমাম শওকানী আরো লিখেছেন যে, অর্থাৎ কিনা তিনিও মনে করেন, উপযুক্ত দলিল (সহীহ হাদিস) এর ভিত্তিতে পাকানো চামড়া ব্যবহার করা জায়েয। এরপর আপনি কি চান যে, প্রত্যেকে নিজের জানোয়ারের চামড়া নিজেই পাকিয়ে নিক এবং নিজেই ব্যবহার করুক, আর ব্যবহার করতে না পারলে অন্যকে বিনামূল্যে দিয়ে দিক? আমার মতে, এটা একটা অকার্যোপযোগী এবং অবিবেচিত মত এবং এটা শরিয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মৃত জন্তুর সকল অংশ ও তার ব্যবহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এ কথাও সঠিক নয়। ইজমা তো দূরে থাক, কোনো কোনো অংশের ব্যবহার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আবু দাউদের 'হাতির দাঁত ব্যবহার' শীর্ষক হাদিস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং রসূল সা. হযরত ফাতিমার জন্য হাতির দাঁতের তৈরি সামগ্রি ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বুখারিতে ইমাম যুহরীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, "আমি প্রাচীন মনীষীদের অনেককে হাতি ও অন্যান্য মৃত প্রাণীর দাঁতের তৈরি চিরুনী ব্যবহার করতে দেখেছি।" অনুরূপভাবে দেহের চুল, শিং, ক্ষুর ইত্যাকার অংশ, যাতে রক্ত সঞ্চালিত হয়না এবং জীবনের লক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, তা মৃত প্রাণীর হলেও অধিকাংশ ফেকাহ শাস্ত্রকারের মতে তা ব্যবহার করা জায়েয।

এবার মৃত প্রাণীর চর্বির প্রসঙ্গে আসা যাক। রসূল সা.-এর সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে এটা নিঃসন্দেহে অপবিত্র ও হারাম। কিন্তু চামড়াকে চর্বির পর্যায়ে ফেলাও আমার মতে সঠিক নয়। বিশেষত যখন চামড়ার বিধান পৃথক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত জাবির বর্ণিত হাদিসে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষভাবে চর্বি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু চামড়ার কথা জিজ্ঞেস করেননি। কাজেই আমার জ্ঞানমতে ঐ হাদিস থেকে চামড়া সম্পর্কে কোনো বিধান জানা যায়না। তাছাড়া মৃত প্রাণীর চর্বির যে ধরণ এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবই এমন যে, তার তৈলাক্ততা শরীর বা কাপড়ে লেগে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। এ কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়না যে, প্রদীপে, নৌকায় বা চামড়ায় চর্বি ব্যবহৃত হলে যখনই ঐ সব জিনিসে হাত বা কাপড়ের ছোঁয়া লাগবে, অমনি তা অপবিত্র হয়ে যাবে। অনিবার্য প্রয়োজনে অপবিত্র জিনিসের এমন বাহ্যিক ব্যবহার যদি সম্ভব হয়, যাতে এ ধরনের লেগে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, তা হলে আমার ধারণা মতে তা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েনা। *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৭৭]*

৩৮. মৃত প্রাণীর চামড়া সম্পর্কে আরো আলোচনা

প্রশ্ন : তরজমানুল কুরআনের এপ্রিল ১৯৭৭ সংখ্যায় মৃত প্রাণীর চামড়া সম্পর্কে আপনার আলোচনা পড়েছি। এ দ্বারা শুধু এতোটুকু কথা স্পষ্ট হলো যে, এ ধরনের চামড়া যতোক্ষণ পাকানো না হয়, ততোক্ষণ তার পবিত্রতা ও ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটা বিতর্কিত। তাই অস্বীকার করা যাবেনা যে, মতভেদের গণ্ডি এড়িয়ে চলার খাতিরে অপাকানো চামড়ার ক্রয়বিক্রয় থেকে বিরত থাকাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। আপনার অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, মৃত প্রাণীর অপাকানো চামড়ার ব্যবহার ও ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া হানাফি ফেকাহবিদদের সর্বসম্মত অভিমত। উদাহরণস্বরূপ হেদায়ার ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

لا (يجوز) بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ

"পাকানোর আগে মৃত পশুর চামড়া বিক্রি করা জায়েয নেই।"

কিন্তু আপনি হানাফি মাযহাবের মতামত উল্লেখই করেননি। আপনি যদি তার সাথে একমত না হন, তথাপি এই মাযহাবের মতামতকে একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। কেননা আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ এই মতের অনুসারী। আপনি যদি হানাফি মাযহাবের মতামতের বিরোধী হন এবং আপনার দৃষ্টিতে ইমাম বুখারি বা ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীর মতটাই বলিষ্ঠতর হয়ে থাকে, তবে আপনি সেইমত গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উদার ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব। তবে হানাফি মাযহাবের উল্লেখ অবশ্যই করা উচিত, যাতে কেউ এই মতের অনুসারী হতে চাইলে সে যেনো নিছক অজ্ঞতা বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে তা পরিত্যাগ না করে।

স্বীকার করি, হানাফি মাযহাবেও যদি ফতোয়ায় পরিবর্তন এসে থাকে কিংবা বিবিধ মতামত থেকে থাকে, তাহলে আর বিভ্রাটের কিছু থাকেনা। তবে আমার জানামতে এমন কিছু হয়নি। আপনার হয়তো মনে আছে, ১৯৭৪ সালের জুন সংখ্যা তরজমানে আপনি একটি প্রশ্নের জবাবে কুরআন শিক্ষা দান ও ইসলামি সেবামূলক তৎপরতার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয কিনা তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর এটাকে জায়েয বলে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু জনৈক আলেম আপত্তি জানিয়ে আপনাকে জাসসাস-এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে লিখেছিলেন, এরূপ পারিশ্রমিক অবৈধ। আপনি এর জবাবে বহুসংখ্যক আধুনিক হানাফি আলেমদের মতামত উল্লেখ করে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ -এর তরজমানে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, বর্তমানে হানাফি মাযহাবের ফতোয়া বদলে গেছে। তাই কেউ যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিতে চায়, তবে নিতে পারে। অন্যান্য ইমামগণ তো এটা আগে থেকেই জায়েয মনে করেন। এমন পরিস্থিতি যদি এ ক্ষেত্রেও দেখা দিয়ে থাকে বা যে পরিস্থিতিই হোক, যদি ভালো মনে করেন, তবে এ বিষয়ে এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরায় আলোকপাত করবেন এবং জানাবেন যে, এ ব্যাপারে হানাফিদের মতামত কি এবং তার সাথে আপনি কতখানি মতৈক্য বা দ্বিমত পোষণ করেন?

জবাব : আমার জানা আছে যে, জবাই ছাড়া মৃত জন্তুর অপাকানো চামড়া বিক্রি করা না জায়েয– এটাই হানাফি ফকীহগণের ফতোয়া। হেদায়ার উক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য মতামত আমার অজানা নয়। আমার আলোচনায় ঐসব উক্তি ও মতামত অকারণে বাদ দেইনি। হানাফিদের এই ফতোয়ার কোনো পরিবর্তনও হয়নি। কিন্তু হানাফি ফকীহগণ যখন চামড়ার পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এবং তার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তাঁরা মৃত জন্তুর চামড়ার বিক্রি এবং তার ব্যবহারের জন্য যে 'দাবাগাত' এ পাকানোর শর্ত আরোপ করেন, সেটা

প্রশ্নোত্তরের বেলায় প্রশ্নকর্তার ও আমার দৃষ্টি এই শেষোক্ত ধরনের পাকানোর উপরই নিবদ্ধ ছিলো। প্রচলিত ও সুবিদিত আভিধানিক অর্থে চামড়া পাকানো বলতে যা বুঝানো হয় তা এই যে, প্রথমে চামড়াকে শুকানো হয় এবং পচাগলা থেকে রক্ষা করা হয়। তারপর তার দুর্গন্ধ ও অন্যান্য আবীলতা দূর করা হয় এবং রাসায়নিক বা উদ্ভিজ্য দ্রব্যাদি দ্বারা তাকে নরম করে ও পোক্ত করে ভিন্নরূপে রূপান্তরিত করা হয়। হানাফিদের মতে এ সবের পরিবর্তে যদি মৃত জন্তুর চামড়াকে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা দূর করা হয় এবং শুধুমাত্র রোদে বা বাতাসে রেখে তাকে যথাসম্ভব গন্ধমুক্ত করা হয় তাহলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং এ ধরণের চামড়া বিক্রয়যোগ্য ও ব্যবহারোপযোগী হয়ে যায়। হানাফি গ্রন্থাবলীর ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে অনেক সময় বিশদ বিবরণ থাকে না। কেননা গ্রন্থকার তার আগেই পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন করে থাকেন। তাই যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য উভয় জায়গা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

আপনিও হেদায়ার ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ের বরাত তো দিয়েছেন কিন্তু পবিত্রতার অধ্যায় সম্ভবত পড়ে দেখেননি। পবিত্রতা সংক্রান্ত অধ্যায়ের 'কোন্ পানি দ্বারা অযু জায়েয' শীর্ষক অনুচ্ছেদের শেষের দিকে হেদায়া প্রণেতা বলেন :

"যে প্রক্রিয়া দ্বারা চামড়ার গন্ধ দূর হয় এবং তা পচাগলার হাত থেকে রক্ষা পায়, সেটাই দাবাগাত বা চামড়ার পাকানো প্রক্রিয়া। চাই এ উদ্দেশ্য রোদে শুকানো দ্বারা অর্জিত হোক কিংবা মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখা দ্বারা হোক।"

কানযুদ দাকায়েকেও পবিত্রতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ বা পাকানো তথা দাবাগাতের এরূপ সংজ্ঞাই দেয়া হয়েছে। কুদূরীর ব্যাখ্যা 'আল্ জাওহারাতুন নাইয়েরা'তে এর অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

"চামড়া পাকানো দু'রকমের হয়ে থাকে। একটা হলো আসল পাকানো, যেমন ডালিম, বাবলা প্রভৃতি গাছের ছাল দিয়ে পাকানো। অপরটি হলো শুধু পবিত্রতার পর্যায়ে আনার জন্য পাকানো, মাটি বা রোদের সাহায্যে পাকানো।"

দ্বিতীয় প্রকারের পাকানো প্রক্রিয়া কেবল পবিত্রকরণের জন্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কে কুদূরীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এভাবে পাকানো চামড়া যদি পুনরায় পানিতে ভিজে যায়, তাহলে অনেকের মতে তা আবার অপবিত্র হয়ে যায়। আবার কারো কারো মতে তার পবিত্রতা বহাল থাকে। শেষোক্ত মতই অধিকতর প্রসিদ্ধ। চামড়া পাকানো বা প্রক্রিয়াজাতকরণের এই উভয় পন্থায় বিবরণ শরহে বেকায়া, মুনিয়াতুল মুসাল্লীর ব্যাখ্যা আশ শারহুল কবীর এবং অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। শুধুমাত্র পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে যে পাকানোর প্রক্রিয়া চলে, তার বিবরণ কবীরীতে এরূপ দেয়া হয়েছে :

“ওষুধ প্রয়োগ ছাড়াও চামড়া পচাগলা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে এবং তার গন্ধ দূর হতে পারে। চামড়ার উপর মাটি দিয়ে বা মাটির নিচে চামড়া পুতে রেখে তার আর্দ্রতা দূর করলেই তা সম্ভব। রোদে বা বাতাসে রেখে আর্দ্রতা শুকানোর দ্বারাও এটা অর্জিত হতে পারে। আমাদের কাছে এ ধরনের চামড়া পাকানো গ্রহণযোগ্য।”

আমি আমার পূর্ববর্তী আলোচনায় চামড়া পাকানোর যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছি, সেটা হলো আসল ও কারিগরি প্রক্রিয়া, যাকে প্রচলিত পরিভাষায় ‘চামড়া পাকানো বা প্রক্রিয়াজাতকরণ (আরবিতে দাবাগাত এবং ইংরেজিতে (Tanning) বলা হয়। কিন্তু হানাফি ফকীহগণ যে দাবাগাতকে পবিত্রতা ও বিক্রির জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাতে মৃত প্রাণীর চামড়া বিক্রি করার আগে তাকে মাটি কিংবা লবণের সাহায্যে অথবা তা ছাড়াও যদি সম্ভব হয় দুর্গন্ধমুক্ত করতে হবে। এরপর তা নির্বিঘ্নে বেচাকেনা করা জায়েয। গোশত খাওয়া হালাল এমন জন্তু বিনা জবাইতে মারা গেলে তার চামড়া অপাকানো অবস্থায় বিক্রি করাকে যারা জায়েয মনে করেন, তাদের সম্পর্কে আমি শুধু এ কথাই বলবো যে, তাদের মতও ভিত্তিহীন ও গুরুত্বহীন নয়। তাদের কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, কুরআনে যেখানে মৃতপ্রাণী ইত্যাদিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে এই ঘোষণার সম্পর্ক শুধু খাওয়ার সাথে। খাওয়ার জিনিস কেবল গোশত এবং সেটাই শুধু হারাম। মৃতদেহের অন্যান্য অংশ, যার খাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, বরং অন্যভাবে ব্যবহারযোগ্য, তা কাজে লাগানো হারাম নয়। স্বয়ং হানাফি ফকীহদের কেউ কেউ মৃত জন্তুর চুল, হাড় ও রগের ব্যবহার বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ‘ফিকহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পবিত্রতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

“মৃত জন্তুর হাড়, শিং, চুল, পালক পবিত্র। কেননা পবিত্রতাই তার মূল অবস্থা। অপবিত্রতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।”

এরপর উক্ত গ্রন্থে একটি হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে। দারুকুতনী ও ইবনে মুনযির বর্ণিত এ হাদিসটি নিম্নরূপ :

عن عبيد الله ابن عباس انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا باس به -

“হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের পুত্র উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. মৃত জন্তুর দেহের অংশগুলো থেকে কেবল তার গোশত হারাম করেছেন। চামড়া, চুল, পশমে (অর্থাৎ তার ব্যবহারে) কোনো দোষ নেই।”

এ হাদিসটি ইমাম ইবনে হুমামও ফাতহুল ক্বাদীরের পানি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদিসে কোনো খুঁত নেই এবং মানের দিক থেকে তা অন্ততপক্ষে মোটামুটি ভালো। *[তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৭৮]*

৩৯. জবাই হালাল হওয়ার জন্য কি বিস্‌মিল্লাহ্ বলা শর্ত নয়?

প্রশ্ন : একটি বিশেষ সমস্যার জন্য আপনার মূল্যবান সময় নিতে চাই। এখানে কানাডায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত আরব ভাইয়েরা এরূপ নীতি অনুসরণ করে চলছেন যে, আহলে কিতাবের জবাই করা জন্তুকে যেহেতু কুরআনে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই তারা এখানকার দোকানে যতো গোশত বিক্রি হয় সবই হালাল মনে করেন, তারা বলেন, জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ্ আকবর বা বিসমিল্লাহ্ বলা জরুরি নয়। বিসমিল্লাহ্ বলা জবাই-এর জন্য শর্ত নয়। যান্ত্রিক উপায়ে জবাই করা যে গোশত বাজারে আসে, তা খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলাই যথেষ্ট।

জবাব : জবাইর জন্য বিসমিল্লাহ্ বলা শর্ত নয়, আরব ভাইদের এ উক্তি খুবই আশ্চর্যজনক। কুরআনে আল্লাহর নাম নিয়েই জন্তু জবাই করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা খেয়োনা। (সূরা আল আনয়াম ১২১) আহলে কিতাবের জবাই করা জন্তুর গোশত এবং অন্যান্য খাবার কুরআনের অন্যান্য জায়গায় বর্ণিত শর্তাবলীর অধীনই হালাল। অন্যথায় আহলে কিতাবের খাদ্যের মধ্যে শূকরও থাকে। আহলে কিতাবের খাদ্য যদি বিনা শর্তে হালাল হয় তাহলে শূকরও হালাল হওয়ার কথা। তাদের খাদ্যকে কুরআন এমন শর্তহীনভাবে হালাল করেনি যে কুরআনের অন্যান্য বিধিনিষেধ তার উপর আরোপিত হবেনা। আমাদের ইমামদের মধ্যে একমাত্র ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, কোনো মুসলমান আল্লাহর নাম ছাড়া জবাই করলেও তা হালাল। তবে তার অর্থ এই যে, মুসলমানদের বিশ্বাস ও নিয়ত এটাই থাকে যে, আল্লাহর নামে জবাই করছে। তাই মুখে না বললেও তা হালাল থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর আর একটি অভিমত এরূপ বর্ণিত আছে যে, বিসমিল্লাহ্ বলা বাধ্যতামূলক। আমার জানা মতে আর কোনো ইমাম বা ফকীহ এমন নেই, যিনি বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণ ব্যতিরেকে জবাই করা আহলে কিতাবের জন্তুকে হালাল মনে করেন। *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৭৭]*

৪০. যাকাত সংক্রান্ত কিছু খোলামেলা কথা

[১]

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামির বাইতুলমালের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন নিয়ে বিভিন্ন সময় দুটো আপত্তি তোলা হয়। প্রথমটি হলো, যাকাতের অর্থ সাংগঠনিক তৎপরতার পেছনে ব্যয় করা হয় এবং যেসব কর্মীর উপর যাকাত প্রদান ফরয, তাদেরও বেতনভাতা ইত্যাদি এই খাত থেকে দেয়া হয়। অথচ এটা যাকাত ব্যয়ের বিধিসম্মত খাত নয়। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যাকাত প্রদানের বিশুদ্ধতার জন্য 'তামলীক' অপরিহার্য শর্ত। এর অর্থ হলো, যাকাত প্রদানকারী কোনো

হকদার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যতোক্ষণ যাকাতের অর্থের সার্বিক মালিকানা ও অবাধ অধিকার না দেয়, ততোক্ষণ সঠিক অর্থে যাকাত দেয়াই হয়না। যেহেতু জামায়াতের বাইতুলমালে যাকাত দেয়ার সময় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া হয়না, তাই এটা যাকাত প্রদানের কোনো সঠিক পদ্ধতি নয়। এই আপত্তিগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করলে ভালো হয় যে, এগুলো ঠিক কিনা। তামলীকের ব্যাপারটা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাংগঠনিক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় কিনা তাও অবহিত করবেন।

জবাব : কুরআনের আলোকে যারা হকদার, তারা হলো : (১) ফকির (২) মিসকিন (৩) যাকাত কর্মী (৪) যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা প্রয়োজন (৫) মুক্তিকামি দাস ও কয়েদি (৬) আকস্মিক ঋণ ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিগ্রস্ত (৭) আল্লাহর পথে এবং (৮) পথিক। জামায়াতের বাইতুলমালে যাকাতের যে অর্থ সংগৃহিত হয়, তা থেকে দরিদ্র, অতিদরিদ্র, ও ঋণগ্রস্ত খাতের আওতায় সাধারণ দুস্থ মুসলমানদেরকেও যাকাত দেয়া হয়। আবার ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথের খাত থেকে জামায়াতের বিভিন্ন খাতেও ব্যয় করা হয়। 'আল্লাহর পথে' বলতে সাধারণত আল্লাহর পথে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য এই খাত থেকে যাকাত দেয়া উচিত। কিন্তু কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং ইমামদের মতামত গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আল্লাহর পথ' কথাটা সাধারণভাবে যতোটা সংকীর্ণ ও সীমিত অর্থে গ্রহণ করা হয়, আসলে তা ততোটা সংকীর্ণ ও সীমিত নয়।

কুরআনে 'আল্লাহর পথ' খাতটি বর্ণনা করার সময় যুদ্ধের শর্ত আরোপ করা হয়নি। অথচ এই বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য অন্যান্য স্থানে সাধারণভাবে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। অপরদিকে পবিত্র কুরআনে যেখানে শুধু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শব্দটি এসেছে, সেখানে জিহাদের অর্থ ব্যাপক রাখা হয়েছে এবং এটিকে ঢালাওভাবে যুদ্ধের অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। অনুরূপভাবে যুদ্ধ ছাড়া আল্লাহর আনুগত্যজনিত এমন বহু কাজ রয়েছে, যাকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে) শব্দ দ্বারা বিশ্লেষিত করা হয়েছে। যে হাদিসটি দ্বারা বিশেষভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে) দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে সে হাদিসটি আবু দাউদ, আহমদ এবং হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি এই :

لا تحل الصدقة لغنى الا لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها او لغارم الخ

"কোনো ধনীর পক্ষে সাদকা গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবে সে যদি আল্লাহর পথের যোদ্ধা হয় কিংবা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকে অথবা ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে জায়েয আছে।"

নিঃসন্দেহে এ হাদিস দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, ফী সাবীলিল্লাহর খাত থেকে শুধুমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধাই অংশ পাবে। অন্যান্য হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. এই খাতের আওতায় হাজীদেরকে যাকাতের উট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এ কারণে হানাফি ফকিহগণের মধ্য থেকে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম হাসান 'ফী সাবীলিল্লাহ'র খাতের আওতায় হাজিদের যাতায়াত ব্যয় নির্বাহ করা জায়েয বলে রায় দিয়েছেন। শামী দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় ছাত্রদেরকেও 'ফী সাবিলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত গণ্য করা হয়েছে, চাই তারা 'সাহেবে নিসাব' হোকনা কেনো (অর্থাৎ তাদের উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকনা কেনো।) হানাফি তাফসিরকার আল্লামা আলুসী স্বীয় তাফসির রুহুল মায়ানীতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর তাফসির প্রসঙ্গে হানাফি মতামত তুলে ধরে বলেন :

"এ দ্বারা শিক্ষার্থীও বুঝানো হয়েছে। ফাতওয়ায়ে যহীরিয়াতে শুধুমাত্র ছাত্রদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'আল বাদায়ে ওয়াস সানায়ে' গ্রন্থে এর এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এমন যাবতীয় কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণমূলক কাজে যে-ই তৎপর হবে, সে এর আওতাভুক্ত হবে।"

হানাফিগণ ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণও এই খাতকে যোদ্ধাদের মধ্যে সীমিত রাখেননা। তারা এর আওতা আরো ব্যাপক বলে মনে করেন। মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনে আরাবি স্বীয় গ্রন্থ 'আহাকামুল কুরআনে' 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

"ইমাম মালেক বলেছেন, আল্লাহর পথ অনেক। আহমাদ ও ইসহাক বলেন আল্লাহর পথ দ্বারা হজ্জ বুঝানো হয়েছে। তবে আমার মতে তাদের বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য হলো, হজ্জ জিহাদের মতোই আল্লাহর পথগুলোর মধ্যে একটি পথ।"

উপমহাদেশের একাধিক আলেমও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ফী সাবীলিল্লাহ বলতে ইসলামের আওতাভুক্ত যাবতীয় তাত্ত্বিক ও বাস্তব তৎপরতা বুঝায়। সীরাতুন্নবী ৫ম খণ্ডে মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী মরহুম বলেন :

অধিকাংশ ফকীহ ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা শুধু জিহাদ বুঝিয়েছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞা সঠিক মনে হয়না। উপরে বর্ণিত আয়াত :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

"ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ যে শুধু জিহাদ নয় সে ব্যাপারে সবাই একমত। বরঞ্চ এদ্বারা যে কোনো সৎ কাজ ও ইসলামের কাজ বুঝায়।"

বিহারের ইমারাতে শরিয়াহ'র নেতা মাওলানা আব্দুস সামাদ রহমানি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল উশর ওয়ায্ যাকাত'-এ ইসলামি তৎপরতায় নিয়োজিত লোকদেরকে ফী সাবীলিল্লাহর আওতাভুক্ত করেছেন।

মাওলানা ইসলাহী ও মাওলানা আব্দুল গাফফার মাসানের পরামর্শক্রমে মাওলানা মওদূদী র. সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছিলেন যে :

"ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ, চাই তা অস্ত্র দ্বারা হোক অথবা কলম, মুখ বা হাত পায়ের শ্রম ও ছুটাছুটির মাধ্যমে হোক। প্রাচীন ইমামদের মতে এর দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি দেশসমূহের প্রতিরক্ষার জন্য পরিচালিত চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতা বুঝায়।"

জামায়াতে ইসলামির একমাত্র লক্ষ্য ইসলাম কায়েম করা। সংগঠনের ও তার কর্মীদের সকল তৎপরতা যাতে এই লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত থাকে সেজন্য জামায়াত সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত। দানশীল লোকদের নিশ্চিত হওয়া কর্তব্য, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত জামায়াতে ইসলামির যাবতীয় তৎপরতা ফী সাবীলিল্লাহর আওতায় পড়ে কিনা? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে তাদের যাকাত জামায়াতের বাইতুলমালে দিতে পারেন। আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হতে পারলে যেখানে খুশি সেখানে দিতে পারেন।

তামলীক অর্থাৎ মালিক বানিয়ে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে যে আপত্তি তোলা হয় তার জবাব হলো, আমাদের মতে, কাউকে ব্যক্তিগতভাবে মালিক বানানো যাকাত দেয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়। সাধারণত কুরআনে বর্ণিত لِلْفُقَرَاءِ শব্দটিতে 'লাম' রয়েছে, সেই 'লাম' কে মালিকানা ধরে নিয়ে মালিক বানিয়ে দেয়ার অপরিহার্যতা প্রমাণ করা হয়। কিন্তু প্রচলিত আরবি ভাষায় 'লাম' অক্ষরটি শুধুমাত্র মালিকানাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়না। বরং এটি কখনো কখনো মালিকানার পরিবর্তে নিছক ব্যবহারিক সুবিধা ভোগ করা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

"আল্লাহ পৃথিবীকে স্বীয় সৃষ্টির জন্য স্থাপন করেছেন।"

এখানে সৃষ্টিকে পৃথিবীর মালিকানা নয় বরং পৃথিবীর সুযোগ সুবিধা দেয়া বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে মালিক বানানো জরুরি শর্ত হিসেবে নিলেও সেটা কেবল সেই অবস্থায় সম্ভব ও প্রযোজ্য, যখন মুসলমানদের সমস্ত যাকাত আদায় করার যোগ্য কোনো সরকার বা সামষ্টিক সংগঠন বিদ্যমান না থাকে। কিন্তু একটি ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুলমালে যখন যাকাত শরিয়ত সম্মতভাবে ও ইপ্সিত উপায়ে আদায় করা হয়, তখন সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মালিক বানিয়ে যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাছাড়া সামষ্টিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করার পর ইসলামি সরকার

যদি তা এমন কোনো সামষ্টিক খাতে বিনিয়োগ করে, যার দ্বারা যাকাতের হকদাররা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়, তবে সেটাও যাকাত বন্টনের একটা বৈধ পন্থা হবে। ইসলামি সরকার না থাকলে মুসলমানদের কোনো ইসলামি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান যদি একই পন্থায় যাকাত আদায় ও বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করে, তবে শরিয়তের আলোকে তাতেও কোনো রকম আপত্তি তোলার অবকাশ নেই।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, জামায়াতে ইসলামির ন্যায় আরো বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ জামায়াতের মতোই ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি মনে করে, ব্যক্তিগতভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। তাই এই শর্ত পূরণের জন্য যাকাত হস্তগত হওয়ার পর সেই প্রতিষ্ঠানের নিঃস্ব ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ আবার তাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে সামষ্টিক তহবিলে জমা করা হয়। আমরা মনে করি এ কৌশল একটা অনর্থক ও অনাবশ্যক প্রহসন আগে ভাগে স্থির করা থাকে এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শনীমূলক হয়ে থাকে। প্রকৃত ও স্থায়ীভাবে মালিক বানানোর উদ্দেশ্য কখনোই সক্রিয় থাকেনা।

প্রসঙ্গত আরো একটা কথা খোলামেলা বলে দেয়া জরুরি মনে হচ্ছে। আপনার প্রশ্ন থেকে মনে হয়, আপনি শুধু এমন ব্যক্তিকেই যাকাতের হকদার মনে করেন, যার উপর যাকাত ফরয নয়। আপনার এরূপ ধারণা থেকে থাকলে তা সঠিক নয়।

প্রথম দু'টি খাত দরিদ্র ও অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে। এ শর্ত কিছুটা প্রযোজ্য বটে। কিন্তু অন্যান্য খাতে যদি এই শর্ত বাধ্যতামূলক আরোপ করা হয়, তাহলে বাদবাকী ছ'টি খাতকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার অর্থই থাকেনা। কেননা যার উপর যাকাত দেয়া ফরয নয়, সে প্রথম দুই খাত দরিদ্র ও অতি দরিদ্রের আওতাভুক্ত হয়ে যাকাতের হকদার হয়েই যাবে। তার জন্য যাকাত পাওয়ার আর কোনো যোগ্যতা উল্লেখ করার বা নজরে রাখার তেমন কোনো আবশ্যকতাই থাকেনা। একাধিক কারণে কেউ যাকাতের হকদার হলে নিঃসন্দেহে সে অধিকতর অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু দরিদ্র অতি দরিদ্র ছাড়া কুরআনে বর্ণিত অন্য কোনো খাতের আওতায় কেউ যাকাতের হকদার প্রমাণিত হলে সে ধনী হলেও এবং তার উপর যাকাত ফরয হলেও যাকাত নিতে পারবে। এ কথা একাধিক হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে একটি হাদিস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

পরিশেষে আরো একটা বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন। সেটি হলো, যাকাত জামায়াতে ইসলামির বাইতুলমালের আয়ের একমাত্র উৎস নয়। জামায়াতের আয়ের একাধিক উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে বই পুস্তক প্রকাশনার আয় রয়েছে সদস্য ও সহযোগি সদস্যদের মাসিক ও এককালীন সাহায্যও রয়েছে এবং দাতাদের দানও রয়েছে। তাই জামায়াতের ভাতাভোগি কর্মীরা যাকাত থেকেই

ভাতা নিচ্ছে, অথবা জামায়াতের যাবতীয় কাজ যাকাতের অর্থের উপর নির্ভর করেই চলছে, এরূপ ধারণা করা ভুল। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন তো অবস্থা এরূপ যে, একাধিক বড় বড় শহরে জামায়াতের জনসেবা বিভাগ ও চিকিৎসালয় কর্মরত রয়েছে এবং বেশিরভাগ যাকাত ও সদকার অর্থ তাতেই ব্যয় হচ্ছে। বাইতুলমালে যাকাত জমা হলে তার যথারীতি পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। গরিব লোকদের সাহায্য কার্যক্রমে যা কিছু ব্যয় হয় তার হিসাবও আলাদা রাখা হয়। জামায়াতের অন্যান্য ব্যয়ের খাত এতো বেশি যে, যাকাতের বাদবাকী সমুদয় অর্থও যদি তাতে ব্যয় হয়, তাহলেও তাতে তার ব্যয়ের একটা অংশমাত্র নির্বাহ হয়। কাজেই যাকাত তার যথাযথ খাতে ব্যয় হবেনা এরূপ আশংকার কোনো কারণই অবশিষ্ট থাকেনা। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪]*

[২]

প্রশ্ন : 'যাকাত সংক্রান্ত কিছু খোলামেলা কথা' এই শিরোনামে লেখা আপনার জবাব পড়েছি। আপনি যাকাতের উপর ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে দু'খানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উভয় উদ্ধৃতিতে আপনি কিছু শব্দ বাদ দিয়েছেন: 'রুহুল মায়ানী'র উদ্ধৃতিতে 'ফকির' শব্দটি বাদ দিয়েছেন এবং 'বাদায়েউস সানায়ে' থেকে দেয়া উদ্ধৃতিতে 'মহ্তাজ' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। পুনরায় নজর বুলিয়ে শুধরে দেবেন।

জবাব : পত্রলেখকের পক্ষ থেকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে তার এই অভিযোগ ভুল বুঝাবুঝি থেকে সৃষ্ট বলে মনে হয়। 'বাদায়েউস সানায়ে'র উদ্ধৃতি আমি আলাদাভাবে মূল কিতাব থেকে দেইনি। 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রুহুল মায়ানী'র লেখক যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমি আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে সেগুলো থেকে কয়েকটি তুলে দিয়েছিলাম। এসব উদ্ধৃতির মধ্যে একটি ছিলো বাদায়েউস সানায়ে থেকে নেয়া। আপনার পক্ষ থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করার পর যখন মূল 'বাদায়ে' দেখলাম, তখন নিশ্চিত হলাম যে, সেখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' কথাটার সাথে اذا كان محتاجا (যেনো সে অভাবি ও পরমুখাপেক্ষী হয়) কথাটিও ছিলো। কিন্তু রুহুল মায়ানীতে এ কথাটি আনা হয়নি। এ জন্য আমার উদ্ধৃতিতেও কথাটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শব্দ বাদ দেয়া বা লুকানোর চেষ্টা করিনি। তবে আল বাহর, আননিহায়া ও আহকামুল কুরআন থেকে নেয়া উদ্ধৃতিগুলো আমি সংক্ষেপকরণের মানসে বাদ দিয়েছি। এসব উদ্ধৃতি না দেয়ার কারণ শুধু এই যে, যে স্থানে এগুলো উল্লেখ করা হচ্ছিলো, সেখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো, 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ শুধু আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম, না অন্যান্য সৎ কাজ এবং

কল্যাণমূলক কাজও তার অন্তর্ভুক্ত? তাই যেসব উদ্ধৃতি সরাসরি তার সাথে সম্পৃক্ত, তার মধ্য থেকে কয়েকটি তুলে দেয়া হয় এবং অন্যগুলো বাদ দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, আমি পত্র লেখককে আরো একটি কথা জানিয়ে দেয়া জরুরি মনে করছি। হানাফি ফকিহগণ ফকির (দরিদ্র) ও মিসকিন (অতিশয় দরিদ্র) এই দুটি খাত ছাড়া যাকাতের অন্যান্য খাতের সাথেও ঢালাওভাবে দরিদ্র ও অভাবের যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, তার অর্থ যদি এই মনে করা হয় যে, কেউ 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অধীন কোনো সৎ কাজ অথবা হজ্জ কিংবা জিহাদ ইত্যাদি করতে চাইলে তার যাকাতের হকদার হওয়ার জন্যও তার উপর যাকাত ফরয না হওয়া জরুরি, তাহলে আমরা এর সাথে একমত নই। এ কথা সত্য যে, হানাফি মতের কিতাবসমূহ পড়লে আপাত দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা জন্মে যে, এ ব্যাপারে হানাফি ও শাফেয়ীদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ীগণ 'আল্লাহর পথ' ও 'পথিক' ইত্যাদি খাত থেকে ধনী ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয মনে করেন, আর হানাফিগণ অভাব ও দারিদ্রকে জরুরি শর্তরূপে গণ্য করেন। কিন্তু হানাফি ফকীহগণের মতামত গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে স্পষ্টতই মনে হয় যে, যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য যে ধরনের অস্বচ্ছলতা ও পরমুখাপেক্ষিতাকে তারা ফকির ও মিসকিন ছাড়া অন্যান্যদের বেলায়ও শর্তরূপে গণ্য করেন, সেই পরমুখাপেক্ষিতা অবিকল ফকির মিসকিনের মতো নয়। ফকির মিসকিনরা ঘরে বসেও পরমুখাপেক্ষী ও অভাবে জর্জরিত থাকে। কিন্তু অন্যরা কেবল 'আল্লাহর পথে' নেমেই অভাবে পড়ে ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি বাড়িতে বেশ খায় দায়। কোনো অভাব বোধ করেনা, কারো মুখাপেক্ষীও হয়না। তার সকল প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি জিহাদে যেতে চায়, হজ্জে যেতে চায়, কিংবা আল্লাহর পথে বা সৎ কর্মশীলতার পথে চেষ্টাসাধন করতে চায়, তাহলে এসব কাজ সম্পন্ন করতে যেসব উপায় উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার, তা হয়তো সে নিজে যোগাড় করতে পারেনা। এ ধরনের ব্যক্তিকে হানাফি ফকীহগণও যাকাতের হকদার মনে করেন। আসলে এ ধরনের লোক এক হিসেবে স্বচ্ছল, আর এক হিসেবে পরমুখাপেক্ষী। এ কারণেই হানাফিগণ তাকে অভাবি আখ্যা দিয়ে যাকাতের হকদার মনে করেন। আর শাফেয়ীগণ তাকে ধনী মেনে নিয়েও যাকাতের উপযুক্ত মনে করেন। এদিক বিবেচনা করলে ফকীহদের মতভেদ নিছক শাব্দিক মতভেদ হিসেবে বহাল থাকে এবং হানাফি ও অন্যান্য ফকীহদের মধ্যে সত্যিকার কোনো মতভেদ অবশিষ্ট থাকেনা।

পুনরায় দীর্ঘসূত্রিতার আশংকা না থাকলে আহকামুল কুরআন থেকে এবং বিশেষভাবে বদায়েউস সানায়ে থেকে পুরো আলোচনা উদ্ধৃত করে দেখাতাম যে, আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনায় সমর্থিত হয়েছে। মোটকথা,

আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, হানাফি মাযহাবে ফকির ও মিসকিন ছাড়া অন্যান্য খাতের সাথে পরমুখাপেক্ষিতার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা এটাই। এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা যদি করা হয় তবে তা নিম্নোক্ত হাদিসের বিরুদ্ধে যাবে :

لا تحل الصدقة لغنى الالغاز فى سبيل الله   الخ

"কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যে যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়, তবে আল্লাহর পথের সৈনিক ...।" *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৪]*

৪১. নগদ পুঁজির যাকাত ও তার নিসাব

প্রশ্ন : যাকাত সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে নগদ অর্থের যাকাত সম্পর্কে আমার মনে কিছু সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, যার কোনো সন্তোষজনক জবাব পাইনি। তাই সেগুলো নিরসনের জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার আপত্তিগুলোর সারসংক্ষেপ হলো, আজকাল সোনা, রূপার আকারে কোনো নিসাবধারীর হাতে নগদ অর্থ থাকেনা। বলা হয়, নগদ অর্থের বিনিময়ে সোনা কোষাগারে রক্ষিত আছে। কিন্তু আমাদের হাতে মুদ্রা নোট ছাড়া আর কিছু থাকেনা এবং চাহিবামাত্র প্রদানের ওয়াদা লেখা থাকে। প্রশ্ন হলো, এইসব কাগজে মুদ্রার উপর কিসের ভিত্তিতে যাকাত আরোপ করা হবে? তবু যদি ধরে নেই যে, এইসব কাগজের মুদ্রাকে সোনা রূপার সমতুল্য মেনে নিয়ে তার উপর যাকাত ফরয হবে, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে যে, এসব কাগজে নোটের নিসাব সোনার ভিত্তিতে ধার্য হবে, না রূপার ভিত্তিতে? উপমহাদেশের আলেম সমাজ সাধারণত নোটগুলোকে রূপার সমতুল্য মনে করেন এবং রূপার নিসাব পঞ্চাশ টাকাকে নগদ অর্থের নিসাব (ন্যূনতম যাকাতযোগ্য পরিমাণ) গণ্য করেন। সোনাকে বাদ দিয়ে মুদ্রাকে রূপার সমকক্ষ আখ্যায়িত করা আমাদের আলেমদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি না পূর্বতন আলেমদেরও এরূপ ফতোয়া ছিলো, আমার জানা নেই। মুদ্রা যদি রূপার হতো অথবা তাতে রূপার উপকরণ বেশি থাকতো, তাহলেও একে রূপার অধীন আনা ঠিক হতো। কিন্তু রূপাই যখন উধাও হয়ে গেছে, তখন মুদ্রাকে রূপার সাথে যুক্ত করার যুক্তি দুর্বোধ্য। এ ক্ষেত্রে রূপার পরিবর্তে সোনাকে নিসাবের ভিত্তি ধরলে ক্ষতি কি?

জবাব : নগদ অর্থ সোনা রূপার পরিবর্তে কাগজে নোটে রূপান্তরিত হলে তার উপর যাকাত আরোপিত হওয়া সন্দেহজনক হয়ে পড়বে-এ বক্তব্য এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। এটা একটা স্বীকৃত সত্য কথা যে, সোনা ও রূপার উপর যাকাত আরোপিত হওয়ার মূল কারণ হলো, তার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত ও সঞ্চিত সম্পদ যেমন সংরক্ষণ করতে পারে এবং যখন যেখানে ইচ্ছে, তা দ্বারা নিজের কিংবা অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। পবিত্র

কুরআনের وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا এই আয়াতটিতে সোনা ও রূপা সম্পর্কে يَكْنِزُوْنَ [জমা করে রাখে] । এবং يُنْفِقُوْنَ (খরচ করে) এ শব্দ দু'টি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই দুটো জিনিসকে পুঁজির আকারে সঞ্চিত করেও রাখা যায় এবং তার দ্বারা জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনও পূরণ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে সোনা রূপা বা সোনা রূপার তৈরি মুদ্রার সাহায্যে এই দুটো কাজ সম্পন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু আজ কাগজে মুদ্রা তার স্থান দখল করেছে। আপনি তা সঞ্চয়ও করতে পারেন, আবার তা খরচ করে আগের কালে যেসব প্রয়োজন পূরণ করতে সোনা রূপার দরকার হতো, সেসব প্রয়োজনও পূরণ করতে পারেন। আজ আপনি কাগজে নোট নিয়ে যদি কোনো দোকানদারের কাছে যান অথবা এমন কোনো লোককে দেন যার টাকার প্রয়োজন, তবে সে একথা বলবেনা যে, এতো শুধু কাগজে ওয়াদা, আমাকে এর বদলে সোনা দাও কিংবা রূপা দাও। বরঞ্চ কাগজে নোটের পরিবর্তে যদি তাকে সোনা বা রূপা দিতে চান, তাহলে সে হতোবুদ্ধি হয়ে পড়বে। মোদ্দাকথা, যে মুদ্রার মূল্যমান আছে এবং বাজারে চালু আছে, তা সর্বোতভাবেই সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত, চাই সে মুদ্রা লোহার হোক, চামড়ার হোক কিংবা কাগজের হোক। সোনা রূপার উপরও যেমন যাকাত ফরয, এই কাগজে নোটের উপর ঠিক তেমনিভাবেই তা ফরয।

এ প্রশ্ন অবশ্য ভেবে দেখার মতো যে, যে মুদ্রানোট সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরি নয় তার ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব কিভাবে নির্ণয় করা হবে। এ কথা তো সুবিদিত যে, এ ধরণের মুদ্রা যেহেতু সোনা ও রূপার পর্যায়ভুক্ত, তাই নিসাবের ব্যাপারেও তাকে সোনা ও রূপার সমতুল্যই মনে করতে হবে। মুসলিম ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, যে মুদ্রা সোনার তৈরি অথবা অন্ততপক্ষে তাতে সোনার উপাদান বেশি, তার নিসাব তো সোনার নিসাবেরই সমান অর্থাৎ ২০ মিসকাল বা ২০ দীনার (সাড়ে সাত ভরি) হবে, আর অন্যান্য যাবতীয় মুদ্রায় রূপার নিসাব অর্থাৎ ২০০ দিরহার বা তার সম ওজনের রূপার মূল্যের সমপরিমাণ সাড়ে ৫২ তোলা হবে। এটা আমাদের ফকীহগণের বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও ইজতিহাদী প্রজ্ঞার নিদর্শন যে, সোনার ক্ষেত্রে তো তারা বিভিন্ন হাদিসে যে সোনার নিসাব উল্লেখিত হয়েছে, সেটাই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সোনা ছাড়া আর যতো সম্পদ রয়েছে, যার নিসাব কুরআন বা হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলোকে রূপার সমতুল্য ধরেছেন। সোনার তৈরি নয় এমন মুদ্রাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে :

"দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) যদি মিশ্র ধাতুর তৈরি হয় কিন্তু রূপাই তার প্রধান উপাদান হয় তবে তাকে নির্ভেজাল রূপার মুদ্রা ধরা হবে। অর্থাৎ তাতে ওজনের দিক দিয়ে রূপার যাকাত ধার্য হবে। আর যদি ভেজাল উপাদানের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তা

রূপার মতো হবেনা। সুতরাং দেখতে হবে, তা যদি চালু মুদ্রা হয় অথবা তা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়, তবে তার মূল্য ধর্তব্য হবে। যদি তার মূল্য যাকাতযোগ্য দিরহামের সর্বনিম্ন পরিমাণের সমান হয়ে যায়, তাহলে এইসব ভেজাল মুদ্রারও যাকাত দিতে হবে।"

কাগজে নোটসহ আজকালকার সকল চালু মুদ্রা, ভেজাল রৌপ্য মুদ্রার সংজ্ঞার আওতায় আসতে পারে। তাই তার আইনানুগ মূল্যের বিচারে তার উপর যাকাত ধার্য হবে এবং তার নিসাব হবে রূপার নিসাবের মতো। এগুলোতে সোনার পরিবর্তে রূপার নিসাব গ্রহণ করার একাধিক যুক্তি রয়েছে। প্রথম যুক্তি হলো, বাণিজ্যিক পণ্যে যাকাতের নিসাব যে ২০০ দিরহাম রূপার নিসাবের সমপরিমাণ, সে কথা বিভিন্ন হাদিস ও সাহাবিদের আচরণ থেকে জানা গেছে। আর নগদ অর্থ ও বাণিজ্যিক পণ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ জন্য বাণিজ্যিক পণ্যের নিসাবে যদি সোনার পরিবর্তে রূপাকে মানদণ্ড ধরা হয়, তাহলে নগদ অর্থের ক্ষেত্রে সেটাই আপনা আপনি প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, সনদ ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে রূপার নিসাব সম্বলিত হাদিসগুলোর মান অত্যন্ত উঁচু। এমনকি বুখারি ও মুসলিমে যেখানে পাঁচ উকিয়ার নিসাবের উল্লেখ রয়েছে। সেখানেও হাদিস বিশারদদের সর্বসম্মত রায় এই যে, পাঁচ উকিয়া দ্বারা ২০০ দিরহার বুঝানো হয়েছে। যে হাদিসগুলোতে সোনার নিসাব বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ বৈশিষ্ট অনুপস্থিত। আরো একটা যুক্তি এই যে, যেসব জিনিসের নিসাব বর্ণিত হয়নি এবং সোনা ও রূপার উভয়ের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে, তাতে রূপাকে নিসাব নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা এ জন্য উত্তম বিবেচিত হয় যে, তা দ্বারা যাকাতের হকদাররা অধিকতর উপকৃত হবে।

মোদ্দাকথা, ইমাম ও ফকীহগণ যে নগদ অর্থে যাকাত দেয়া জরুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর নিসাব নির্ণয়ে সোনার পরিবর্তে রূপাকে মানদণ্ড ধরেছেন। এর সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে এবং এটা উপমহাদেশের আলেমদের মনগড়া কোনো ব্যাপারে নয়। উপমহাদেশের আলেমগণ স্থায়ীভাবে ৫০ রুপিয়া নগদ অর্থের যাকাতের নিসাব ধার্য করেছেন- এ কথা ঠিক নয়। এ উক্তি ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যে যুগে আলেমগণ এই নিসাব ধার্য করেছিলেন, তখন রুপিয়া ছিলো রূপার তৈরি মুদ্রা, অবশ্য রূপা তার প্রধান উপাদান ছিলো। সেই মুদ্রার ওজন ছিলো এক তোলা। এ হিসেবে তৎকালে ৫০ বা ৫২ রুপিয়া প্রায় ২০০ দিরহাম (সাড়ে ৫২ তোলা) সম ওজনের এ সমমূল্যের ছিলো। তাই জনসাধারণ যাতে সহজে বুঝতে পারে, সে জন্য এভাবে মাসয়ালা প্রচার করা হলো যে, ৫০ রুপিয়ার উপর যাকাত হবে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি একদম পাল্টে গেছে। এখন সেই রূপার মুদ্রাও নেই। পঞ্চাশ তোলা রূপার মূল্যও ৫০ রুপিয়া নেই। তাই এখন নগদ অর্থের নিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার

প্রচলিত বাজারমূল্যকে মানদণ্ড ধরতে হবে এবং তা প্রতিদিনের সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। যার কাছে সারা বছর এই পরিমাণ নগদ অর্থ থাকবে সে যাকাত দেবে। *[তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৬৮]*

৪২. বাইয়ে সালাম

প্রশ্ন : আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রিম বেচাকেনার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অর্থাৎ কোনো কোনো পণ্যের মূল্য আগে ঠিক করা হয় এবং লেনদেন পরে হয়। কোনো কোনো আলেম এটাকে 'বাইয়ে সালাম' বলেন এবং জায়েয বলে রায় দেন। কিন্তু আসলে বাইয়ে সালাম কি তা সাধারণভাবে জানা নেই। অনুগ্রহপূর্বক এর সংজ্ঞা ও শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে জানাবেন যাতে কেনাবেচার সময় কোন্‌টা জায়েয এবং কোন্‌টা জায়েয নয়, তা নির্ণয় করা সহজ হয় এবং অজ্ঞতাবশত কোনো ভ্রান্ত নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়তে না হয়।

জবাব : শরিয়তে বাইয়ে সালাম, এমন কেনাবেচাকে বলা হয়, যাতে মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া হয়, কিন্তু তার বিনিময়ে পণ্য একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে আদায় করা হয়। এটি জায়েয ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হাদিস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলোকে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রায় সর্ববাদীসম্মত শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. পণ্য দ্রব্য ও তার মূল্য সঠিকভাবে ও সুস্পষ্টভাবে নির্ণিত হওয়া চাই। দ্রব্যের ওজন, মান, শ্রেণী ইত্যাদি এমনভাবে চিহ্নিত হতে হবে, যাতে পরবর্তী সময় কোনো প্রকার সন্দেহ, বিরোধ বা বিতর্কের অবকাশ না থাকে।

২. পণ্য দ্রব্যটি এমন হওয়া চাই যে, বেচাকেনা স্থির করার সময় তা বাজারে সহজলভ্য হয় অথবা নিকট ভবিষ্যতেই সহজলভ্য হবে বলে আশা করা যায়।

৩. পণ্য দ্রব্যটি কতোদিন পর ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হবে, তা সঠিকভাবে নির্ণিত হওয়া চাই।

৪. মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই এবং স্থির করণের সময় তা অগ্রীম দেওয়া চাই।

৫. পণ্য দ্রব্য ফেরত দেয়া এবং বিক্রয় বাতিলের শর্ত না থাকা চাই।

৬. পণ্য দ্রব্যটির পরিবহন ও স্থানান্তর যদি ব্যয় সাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য হয়, তবে কোন জায়গায় তা ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে, তা চিহ্নিত হওয়া চাই। *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৫৮]*

৪৩. হযরত আলী রা.-এর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়ার ঘটনা কি সত্য?

প্রশ্ন : অক্টোবর, ১৯৬৩ সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে তাফহীমুল কুরআনের টীকা ৩৫-এ সূর্য ফিরিয়ে আনার ঘটনা সম্বলিত হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আলী রা.-এর আসরের নামায ছুটে যায়। রসূল সা. দোয়া করলে সূর্য যথাস্থানে ফিরে আসে এবং তিনি নামায পড়ে

নেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে জাওযীর মতে এটি মনগড়া এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এটি ভিত্তিহীন হাদিস।

এ হাদিস সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে আমি নিম্নরূপ তথ্য পেয়েছি :

আবু জাফর তাহাবী আহমদ বিন মুহাম্মদ মিসরি হানাফি 'মুসকিলুল আসার' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১২শ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এই ঘটনাকে হযরত ইউশা ইবনে নূনের জন্য সূর্যকে থামিয়ে দেয়ার ঘটনার সাথে তুলনীয় বলেছেন।

এই হাদিসের সনদে মুহাম্মদ বিন মাওলা নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন– محمود فى الرواية অর্থাৎ প্রশংসিত বর্ণনাকারী। অপর বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আওন ও উম্মে জা'ফর রসূল সা.-এর পরিবার থেকে উদ্ভূত। তারা সত্যভাষী এবং তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। হাদিস বিশারদগণ এ হাদিসকে নবুওয়াতের অন্যতম প্রধান নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (মুসকিলুল আসার, দ্বিতীয় খণ্ড, সূর্যের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ ইত্যাদি) অনুরূপভাবে হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহতাবীতে (নূরুল ইযাহর ব্যাখ্যা) নামাযের ওয়াক্ত সংক্রান্ত আলোচনায় এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে :

ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت ؟ الظاهر نعم كما فى الدرر الخ

এর প্রমাণ দর্শাতে গিয়ে গ্রন্থকার আলী সংক্রান্ত সেই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন, অত:পর মন্তব্য করেছেন যে:

نقله الطبرانى بسند حسن وصححه الطحاوى والقاضى عياض واخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزى كما فى الشهر – طحطاوى –

অনুরূপভাবে নূরুল আনোয়ারের আলোচনা প্রসঙ্গে এই হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ হাদিস মনগড়াও নয়, ভিত্তিহীনও নয়।

সকল পাঠকের জন্য উপকারি মনে করলে এর জবাব তরজমানে ছেপে দেবেন।

জবাব সূর্যের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপারে শুধুমাত্র তাহতাবীর মুশকিলুল আসার ও নূরুল আনোয়ারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পড়েই যদি আপনি মনে করে থাকেন যে, অনুসন্ধানের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, হাদিসের বক্তব্য ও তার সনদের ব্যাপারে সকল জটিলতার নিরসন হয়ে গেছে এবং এই হাদিসগুলো নিখুঁত ও নির্ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে, তাহলে আপনার এই ধারণা ঠিক নয়। উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আপনার এই সিদ্ধান্তে আসাও ঠিক নয় যে, ইবনে জাউযী বা অন্য এক-আধজন মুহাদ্দিস এ হাদিসগুলোকে দুর্বল বা মনগড়া আখ্যায়িত করেছেন এবং অন্য সবার কাছে তা সহীহ ও নিখুঁত। প্রকৃত

ব্যাপার হলো, হযরত আলীর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত সকল হাদিস হাদিসবিশারদগণ ও সনদ বিশেষজ্ঞগণের মতে শুধু অত্যাধিক দুর্বলই নয়, বরং মনগড়া ও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এসব হাদিসের সনদের কোনো একটি ধারাও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই হাদিসগুলো সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন তা তাঁর গ্রন্থ মিনহাজুস্ সুন্নাহতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মিনহাজুস সুন্নাহর প্রচলিত সংস্করণটি ইমাম যাহাবী কর্তৃক সংক্ষেপিত এবং মুনতাকায়ে মিনহাজুস্ সুন্নাহ নামে পরিচিত। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দু'জন উঁচুদরের হাদিস বিশারদের যাঁচাই বাছাই-এ উত্তির্ণ ও সত্যায়িত। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৫২৪-৫২৮ পৃষ্ঠায় 'সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হযরত আলীর জন্য তার দুইবার প্রত্যাবর্তনের আজগুবি কাহিনী' শিরোনামে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই হাদিসগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের একাধিক ধারাক্রম তুলে ধরেছেন। ইমাম তাহাবী মুশকিলুল আসার গ্রন্থে যে কয়টি ধারাক্রম বর্ণনা করেছেন, ইবনে তাইমিয়ার পর্যালোচনায় তাও বাদ যায়নি। প্রতিটি ধারাক্রমের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া পৃথকভাবে তুলে ধরেছেন। ইবনে হাব্বান, আবু হাতিম, ইবনে আদী, দারুকুতনী এবং শু'বা প্রমুখ হাদিস বিশারদের কঠোর সমালোচনা। পরিশেষে নিজের রায় দিয়েছেন এভাবে :

"হযরত আলীর মহত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের যে নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে, তার উপস্থিতিতে তিনি এ ধরণের মিথ্যাচারের মুখাপেক্ষী নন। রসূল সা.-এর আমলে তাঁর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি তাহাবী, কাযী ইয়ায কতিপয় গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে রসূল সা.-এর মু'জিযা হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু হাদিস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ জানেন যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।"

এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো নিয়ে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন হাফেয ইবনে কাছির আলবিদায়া ওয়ান নিহায়ার ৬ষ্ঠ খণ্ডে। এই খণ্ডের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে রসূল সা.-এর মু'জিযা বিষয়ক আলোচনা। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট সকল হাদিস এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। 'নবুওয়তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শনাবলী' শিরোনামে ৭৬ থেকে ৮৭- এই এগারো পৃষ্ঠা জুড়ে অত্যন্ত তৃপ্তিকর ও বিস্তৃত সমালোচনা ও পর্যালোচনা চালিয়েছেন সূর্যকে ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত সব ক'টি বর্ণনা সম্পর্কে। হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবন ও চরিত্র বিষয়ক শাস্ত্র 'আসমাউর রিজালের' বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিত্ব এই হাদিসগুলোর সনদের সবক'টি ধারাকে দুর্বল এমনকি মনগড়া আখ্যায়িত করেছেন, তাদের মধ্যে যাহাবি দারুকুতনী, ইবনে হাব্বান, ইবনে আদী, ইয়াহিয়া বিন মঈন, ইবনে আসাকির, ইবনে নাসের বাগদাদী, শু'বা ইবনে যানজুয়াই, দারমী, নাসায়ী, আবু হাতেম, রাযী, আলমাসী,

ইবনে হাযম, ইবনে জাওযী, ইবনে মুবারক, ইবনে মাহদী, আবু যারয়া, বুখারি আবু দাউদ, জাউযেজানী প্রমুখ উঁচুদরের ইমাম রয়েছেন। এ সুদীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে ইবনে কাছির এ বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

"ইমাম মালেক, ছয়টি প্রধান সহীহ হাদিস গ্রন্থের সংকলকগণ, অন্যান্য মুসনাদ, সুনান এবং সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদিস সংকলনসমূহের গ্রন্থকারগণ সূর্যের প্রত্যাবর্তন সম্বলিত এই হাদিসটিকে বর্জন করেছেন এবং তাদের গ্রন্থসমূহে এটি উদ্ধৃত করেননি। তাদের সকলের কাছে যে এটি একটি ভিত্তিহীন ও মনগড়া মিথ্যা হাদিস, হাদিসটির ঐসব গ্রন্থে স্থান না পাওয়াই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ইমাম নাসায়ীর কথাই ধরা যাক, যিনি শুধুমাত্র হযরত আলীর রা. মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্কে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু তিনিও এ হাদিস উল্লেখ করেননি। হাকেমও স্বীয় গ্রন্থ মুসতাদরাকে এটি বর্ণনা করেননি। অথচ উল্লেখিত দু'জনকেই কিছুটা শিয়াঘেঁষা মনে করা হয়ে থাকে। নির্ভরযোগ্য হাদিস শাস্ত্রবিদদের মধ্যে যিনিই এ হাদিস বর্ণনা করেছেন নিছক বিস্ময় প্রকাশের খাতিরেই করেছেন। সকল যুগের হাদিস শাস্ত্রীয় ইমামগণ এ হাদিসের সত্যতা অস্বীকার করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উষ্মা ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা বেশ কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের উচ্চারিত নিন্দা ও সমালোচনা উদ্ধৃত করেছি।"

ইমাম তাহাবীর গৃহীত হাদিসগুলোর মধ্যে যে কয়টি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাছির উভয়ে সেগুলোতেও বিবিধ খুঁত চিহ্নিত করেছেন। ইবনে কাছির আরো লিখেছেন :

"যদিও ইমাম তাহাবী এ হাদিস সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সংশয়ে ভুগেছেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার পক্ষ থেকে এ হাদিসকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান এবং এর বর্ণনাকারীদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে।"

ইমাম তাহাবী সম্পর্কে ইমাম তাইমিয়ার একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ইবনে কাছিরও তা উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হলো "যাচাই বাছাই করার যোগ্য বিচক্ষণ মুহাদ্দিসদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো উত্তম ধারাবাহিক সনদ তার করায়ত্ত ছিলনা।"

ইমাম আবু হানিফা যে এই হাদিসের উপর আপত্তি তুলেছেন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা সূত্র সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাছির বলেন :

"ইনি সেই আবু হানিফা, যিনি একজন মান্যগণ্য ইমাম। কুফাবাসী হওয়ায় হযরত আলীর প্রতি তাঁর মুহাব্বত এবং আল্লাহ ও রসূলের স্বীকৃত তাঁর যথার্থ মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে কেউ কোনো অভিযোগ তোলেনি। তথাপি তিনি এই হাদিসের বর্ণনাকারীর প্রতি আপত্তি তুলেছেন।"

ইমাম তাহাবী প্রমুখ এ সংক্রান্ত যে কয়টি হাদিসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তার সনদ বা বর্ণনা সূত্রের ব্যাপারে উপরোক্ত পর্যালোচনা ছাড়াও তার ভাষা ও বক্তব্যটাও যুক্তির আলোকে বিচার বিবেচনার দাবি রাখে। এ ব্যাপারে নিজের ভাষায় কিছু বলার চেয়ে ইবনে কাছীর ও ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করাই অধিকতর সমীচীন মনে হচ্ছে। ইবনে তাইমিয়া তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন :

"কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতো বড় ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেলো, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পুনরায় উঠলো, অথচ যে বিপুল সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছিল, তারা এ ঘটনা বর্ণনা করলো না–এটা কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া সূর্য ডুবলেই তো আসরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। এ ঘটনার পর নামাযীর নামায সময়মত পড়া সম্ভব নয়, চাই সূর্য ডোবার পর পুনরায় ফিরে আসুক না কেন। সূর্যাস্তের পর রোযাদার ইফতার করে ফেলতে পারে এবং মাগরিবের নামায পড়া হয়ে যেয়ে থাকতে পারে। পুনরায় সুর্যোদয়ে সেই রোযা ও নামায কি বাতিল হয়ে গেলো? বস্তুত এটা একটা অসম্ভব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।"

এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরামের অংশগ্রহণে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং তখন ঘুম অথবা প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল তার প্রসঙ্গ তুলেছেন। এসব যুদ্ধে রসূল সা. এবং হযরত আলী রা. থাকা সত্ত্বেও সেখানে আল্লাহ্ সূর্যকে ফিরিয়ে এনে দিনকে রাত এবং রাতকে দিনে রূপান্তরিত করেননি। বরং ছুটে যাওয়া নামায কাযা পড়া হয়েছে। ইবনে কাছিরও এ যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন। সেই সাথে ইবনে কাছির এ কথাও বলেছেন, যেসব সাহাবিকে রসূল সা. একবার বনু কুরায়যার বস্তিতে গিয়ে আসরের নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাঁর আদেশের হুবহু আনুগত্য করতে গিয়ে তারা পথিমধ্যে নামায পড়েননি। পথিমধ্যেই সূর্য ডুবে যায় এবং তারা বনু কুরায়যায় পৌছে মাগরিবের নামাযের পর আসরের নামায পড়েন। তাঁদের জন্য যদি সূর্য ফিরে না এসে থাকে তাহলে হযরত আলীর জন্য কিভাবে এটা ঘটলো? হাফেয ইবনে কাছির আরো বলেন :

"শরিয়তে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির কাছে এটা কিভাবে বোধগম্য হতে পারে যে, হযরত আলী এ হাদিসের প্রথম বর্ণনাকারী হবেন, অথচ এতে তাঁর অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং রসূল সা.-এর এক চাঞ্চল্যকর মুজিযার বিবরণ রয়েছে, আর এতদসত্ত্বেও এমন সনদের মাধ্যমে তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব যে, প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনা সংঘটিত হলো এবং এটি অন্যদের কাছে পৌছাবার পর্যাপ্ত উপায় উপকরণ ও বহু প্রেরণাদায়ক উপাদান এতে ছিলো, অথচ তা সত্ত্বেও এ ঘটনা বর্ণনার সব কয়টি ধারা দুর্বল ও অপরিচিত, এমন কি অধিকাংশ বানোয়াট ও মনগড়া?"

পরবর্তীতে এক জায়গায় তিনি বলেন : সূর্য অস্ত যাবার পর পুনরায় উদিত হওয়া কেয়ামত আসন্ন হওয়ার একটা বড় রকমের আলামত। এটা তো কোনো মামুলি ঘটনা নয় যে, সংঘটিত হয়েই মিলিয়ে যাবে এবং কেউ টেরও পাবেনা? *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৫]*

৪৪. কুরাইশের ১২ জন খলিফা ও 'ফিতনায়ে আহলাস'

প্রশ্ন : মিশকাত শরীফ ও আবু দাউদ শরীফের 'কিতাবুল ফিতান' (কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়কার অরাজকতা সংক্রান্ত অধ্যায়) অধ্যয়ন করতে গিয়ে এমন কয়েকটি হাদিস নজরে পড়লো যার সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনিও যদি কিছু সাহায্য করেন, তবে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত ও কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

উদাহরণস্বরূপ, এতে একটি হাদিস এরূপ রয়েছে যে, রসূল সা. বলেছেন "খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, অত:পর আসবে রাজতন্ত্র।"

এ হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত সফীনা রা. অত:পর বলেন 'আবু বকরের খিলাফত দুই বছর আর আলীর ছয় বছর।' অর্থাৎ এ হাদিসে ত্রিশ বছরব্যাপী খিলাফত ও চারজন খলিফা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদিসের পাশাপাশি মুসলিম শরিফ এবং সহীহ হাদিস গ্রন্থসমূহে এরূপ আরো কিছু হাদিস রয়েছে, যাতে ১২ জন খলিফার কথা বলা হয়েছে। তারা সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবেন এবং তাদের দ্বারা ইসলামের বিপুল জাঁকজমক ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দুই ধরনের হাদিসের সমন্বয় কিভাবে হতে পারে, তা আমার যথাযথভাবে বুঝে আসছে না। হাদিস অমান্যকারী গোষ্ঠি কিংবা প্রাচ্যবাদী ফযলুর রহমান ও তার দোসররা এখানে একথা বলার সুযোগ পেতে পারে যে, শীয়া ও সুন্নীরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও নিজেদের বদ্ধমূল মতবাদগুলোর আলোকে এ ধরনের হাদিস বানিয়ে নিয়েছে এবং হাদিস গ্রন্থসমূহে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

অপর হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত। এতে রসূল সা. 'ফিতনায়ে আহলাসের' উল্লেখ করেছেন। এ ফিতনা দ্বারা কি বুঝায় জানিনা। রসূল সা. বলেন এরপর সুখসমৃদ্ধি এবং যুদ্ধ ও মারামারির ফিতনা দেখা দেবে। এ হাদিসের ভাষা দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূল সা.-এর বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি এমন হবে যেনো তার বুক ও উরু একত্রে যুক্ত হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি কে হতে পারে এবং এই উপমার তাৎপর্য কি? ইয়াযিদ ও বনু উমাইয়ার সমর্থকদের কেউ কেউ বলেন যে, কারো কারো মতে এর দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অথবা ইমাম হাসান বা ইমাম হুসাইনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা খিলাফত ও ইমারত লাভের জন্য তাদের সংগ্রাম সফল হয়নি এবং অরাজকতা ও অনাচার অব্যাহত থাকে।

এ হাদিসের ঠিক বিপরীত হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিস মিশকাতের কিতাবুল ফিতনেই বুখারি শরিফ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। রসূল সা. বলেছেন, কুরাইশের এক যুবকের হাতে আমার উম্মতের ধ্বংস ও পতন ঘটবে। অন্য কয়েকটি হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. বখাটে তরুণদের নেতৃত্ব থেকে পানাহ চেয়েছেন।

কেউ কেউ এ দ্বারা বনু উমাইয়ার শাসকদের বুঝিয়েছেন। এমন নিকৃষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বনু উমাইয়াকে বুঝানো কতো দূর সঙ্গত।

জবাব : আপনি যে কয়টি হাদিসের উদ্ধৃত দিয়েছেন, তার সবই সত্য ও সঠিক। এ হাদিসগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার পূর্বাভাস দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের পরম সত্যভাষী রসূল সা.-কে মহাজ্ঞানি আল্লাহ আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ ধরনের ঘটনাবলী সংঘটিত হবে। যেসব হাদিসে খিলাফতের স্থিতিকাল ৩০ বছর বলা হয়েছে এবং যেসব হাদিসে ১২ জন কুরাইশ খলিফার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই ধরনের হাদিসে কোনো বিরোধ নেই। প্রথমোক্ত হাদিসগুলোতে নবুওয়াতের অনুসারী খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ হাদিসগুলো অত্যন্ত সুবিদিত ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এর দ্বারা চার খলিফার রা. খিলাফতের পক্ষে অকাট্য দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনি প্রথম যে হাদিসটির উল্লেখ করেছেন, তাতে হযরত সাফীনা রা. বলেন :

امسك خلافة ابى بكر سنتين وخلافة عمر عشرة وعثمان اثنى عشرة وعلى سنة ۰

“আবু বকরের খিলাফত দুই বছর ধরো আর উমরের দশ বছর, উসমানের বার বছর এবং আলীর ছয় বছর।”

এ হাদিসে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীর রা. খিলাফতের স্থিতিকাল যথাক্রমে ২ বছর, ১০ বছর, ১২ বছর ও ৬ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রথম দুই খিলাফতের মেয়াদে কয়েক মাস কম এবং শেষোক্ত দুই খিলাফতে কিছু বেশি রয়েছে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই কম বেশিতে তেমন কোনো পার্থক্য হয়না। কেননা হযরত আলীর রা. শাহাদাত রসূল সা.-এর ইন্তিকালের ৩০ বছর পর ৪০ হিজরিতে সংঘটিত হয়। রসূলের জনৈক সাহাবি রসূল সা.-এর উক্তির ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছে যে, তা দ্বারা আহলে সুন্নাতের আকীদা ও মতবাদ আপনা আপনি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য হাদিসে خلافة। শব্দটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ হাদিসে যে খিলাফতের বর্ণনা দেয়া প্রকৃত অর্থে সেটাই সত্যিকার খিলাফত।

মিশকাত শরিফের কিতাবুল ফিতানের অব্যবহিত পূর্বে ‘কিতাবুর রিকাক’ নামক অধ্যায়ের শেষে হযরত নুমান বিন বশীরের বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। রসূল সা. বলেছেন :

تكون النبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى' ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون' ثم يرفعها الله تعالى ' ثم تكون ملكا عارضا فيكون ماشاء الله ان يكون' ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت •

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে যতোদিন আল্লাহ চাইবেন, অত:পর আল্লাহ তা তুলে নেবেন। তারপর নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতোদিন আল্লাহ চাইবেন টিকে থাকবে, তারপর আল্লাহ তা তুলে নেবেন। অতপর রক্তচোষা রাজতন্ত্র আসবে এবং যতোদিন আল্লাহ চাইবেন টিকে থাকবে। তারপর আল্লাহ তাও তুলে নেবেন। এরপর প্রতিষ্ঠিত হতে স্বৈরাচার, একনায়কত্ব ও ঔদ্ধত্যের শাসন এবং যতোদিন আল্লাহ চাইবেন তা টিকে থাকবে। এরপর আল্লাহ তা তুলে নেবেন। অতপর পুনরায় নবুওয়তের পদাংক অনুসারী খিলাফত কায়েম হবে। এরপর রসূল সা. নিরব হয়ে গেলেন।"

এ হাদিসটি মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম বায়হাকীর দালায়েলুন নবুওয়ত থেকে মিশকাতে উদ্ধৃত হয়েছে। এর একজন বর্ণনাকারী হাবীব বিন সালের হযরত উমার বিন আব্দুল আযীযের সমসাময়িক। তিনি জানান, হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয যখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন আমি তাকে এ হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লিখে পাঠাই। সেই সাথে আমি লিখি :

ارجوان تكون اميرالمؤمنين بعد الملك للعاض والجبرية فسربه واعجبه

"দাঁত দিয়ে চর্বণকারী রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসনের পর আমি আশা করি আপনিই সেই আমীরুল মুমিনীন হবেন (যার সুসংবাদ এই হাদিসে দেয়া হয়েছে এবং যিনি নতুন করে নবুওয়তের আদর্শে খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন) এতে হযরত দ্বিতীয় ওমর খুবই খুশি হলেন।"

এ হাদিস দ্বারা খিলাফত আমল ও ফিতনার (অরাজকতার) যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা যায় এবং এও জানা যায় যে, খিলাফতে রাশেদার পর ملك عاض দাঁত দিয়ে চর্বণকারী অর্থাৎ অত্যাচারী রাজকীয় শাসন (অন্য হাদিসে বলা হয়েছে ملك عضوض যার অর্থ অত্যধিক চর্বণকারী অর্থাৎ ভীষণ অত্যাচারী রাজতন্ত্র) অতপর বলপ্রয়োগমূলক তথ্য স্বৈরাচারী শাসন এবং তারপর পুনরায় নবুওয়তের আদর্শবাহী খিলাফত চালু হবে।[১] এ হাদিসে একাধারে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য আনন্দদায়ক সুসংবাদ এবং তার বংশের

---

১. হযরত মুয়ায বিন জাবালের বর্ণনা মতে রসূল সা. বলেন "এই ব্যবহার সূচনা হলো নবুওয়তে ও রহমত দিয়ে। এরপর আসবে খিলাফত ও রহমতের যুগ। তারপর ভীষণ অত্যাচারী রাজকীয় শাসন আসবে এবং পৃথিবী যুলুম ও অত্যাচারে ভরে উঠবে...."

পূর্বতন শাসকদের জন্য কঠোর নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে। তিনি একজন নি:স্বার্থ ও খোদাভীরু মানুষ ছিলেন বলে নিজেকে এই পরম সুসংবাদের যোগ্য পাত্রে পরিণত করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন। বনু উমাইয়া শাসকদের যুলুম অত্যাচারের প্রতিকারের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি কেউ ইয়াযীদকে আমীরুল মুমিনীন বললে তাকে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করেছেন।

অপর যে হাদিসগুলোতে খলিফাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলোও নি:সন্দেহে সহীহ হাদিস। তবে তার মর্ম ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব হাদিসে সাধারণভাবে ১২ জন খলিফার কথা বলা হয়েছে। এ হাদিসগুলো থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, কুরাইশ বংশ থেকে এমন ১২ জন নামকরা শাসক জন্ম নেবে, যাদের শাসনামলে ইসলাম ও মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি মোটামুটি বজায় থাকবে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বেনা এবং অরাজকতা দেখা দেবেনা। এসব শাসকের নামধাম চিহ্নিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তা করতে গেলে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তথাপি হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ নাম পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ চারজন খোলাফায়ে রাশেদীনকেও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাদের দ্বারা শুরু করে আরো আটটি নাম উল্লেখ করেন। কেউ কেউ খোলাফায়ে রাশেদীন ছাড়া অন্য ১২ জন শাসকের নাম গণনা করে থাকেন। আমার জানামতে সুন্নি আলেমদের মধ্য থেকে কেউ এসব হাদিসকে অনির্ভরযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলেননি। তবে তারা কেউ এগুলো দ্বারা রসূল সা.-এর বংশোদ্ভুত ১২ জন ইমামকেও বুঝাননি। সঠিক কথাও তাই। এর অর্থ ১২ ইমাম তো হতেই পারেনা। কারণ এসব হাদিস দ্বারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য বুঝায়, তা ঐ ১২ ইমাম কখনো অর্জন করতে পারেননি। বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য ইমাম সুনানে আবু দাউদ থেকে সংশ্লিষ্ট দুটো হাদিস তুলে ধরছি। এ দু'টি হাদিস দ্বারা বিষয়টা আরো সহজে বুঝে আসবে।

আবু দাউদের কিয়ামতের নিকটবর্তী অরাজকতা সংক্রান্ত হাদিসগুচ্ছে একটি হাদিস হযরত জাবের বিন সামুরা কর্তৃক রসূল সা. থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত :

لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشرة خليفة كلهم تجمع عليه االامة كلهم من قريش

"সমগ্র উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধকারী ১২ জন কুরাইশ বংশোদ্ভূত খলিফা মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই 'দীন' অক্ষুন্ন থাকবে।"

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ আল মুনযিরী 'মুখতাসারে সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে এই হাদিস সম্পর্কে একটি বিস্তারিত মন্তব্য যুক্ত করেছেন। এখানে 'দীন' শব্দের অর্থ

শাসন ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য। ১২ খলিফা অতিবাহিত হওয়ার পর শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে। এ হাদিসে শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নিছক প্রশংসাসূচক বক্তব্য দেয়া হয়নি। এরপর কারো কারো মতানুসারে ইয়াযীদ থেকে শুরু করে ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ ও মারওয়ান বিন মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর আরো কয়েকটি মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। তবে এসবই অনুমানসর্বস্ব ও কাল্পনিক। তাই ঐসব মতামত এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

একই গ্রন্থে উক্ত হযরত জাবের বিন সামুরা রা. থেকে অপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি :

لا يزال الدين عزيزا الى اثنا عشرة خليفة كلهم من قريش –

"১২ জন খলিফা পর্যন্ত এ দীন বিজয়ী থাকবে... তারা সবাই কুরাইশী হবে।"

'তাহযীবে সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে লেখক হাফেজ ইবনে কাইয়েম এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, এ হাদিসে খলিফা শব্দটি সাধারণ শাসক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে আছে :

سيكون من بعدى خلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون مالايؤمرون

"আমার পরে অচিরেই এমন খলিফারা আসবে, যারা মুখে যা বলবে কাজেও তাই করবে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হবে তাই করবে। আবার তাদের পরে এমন খলিফারা আসবে যাদের কাজ হবে তাদের কথার বিপরীত এবং তাদের কার্যকলাপ শরিয়তের বিধিসম্মত হবেনা।"

এ হাদিসে যাদের কথা ও কাজে মিল থাকবেনা এবং শরিয়তবিরোধী কাজ করবে তাদেরকেও খলিফা বলা হয়েছে।

মোট কথা, নবুওয়তের আদর্শবাহী খিলাফত এবং সাধারণ খিলাফত ও শাসন সম্পর্কে উক্ত দু'ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ দু'ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তারা ঐতিহাসিক ও গুণগত মানের দিক দিয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিরোধী হতে পারে, কিংবা তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এতোটুকু প্রভেদ থাকতে পারে যে, কেউ সাধারণ ধরণের শাসক এবং কেউ বিশেষ ধরণের শাসক। তবে উক্ত দু'ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আদৌ এমন কোনো তাৎপর্যগত বিরোধ নেই, যার দরুণ কোনো জটিলতার উদ্ভব হতে পারে এবং কুচক্রী ও কুটতার্কিক মহল কোনো স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে, কিংবা শিয়া খারেজী বা অন্য কোনো ভ্রান্ত মতের প্রবক্তারা একে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে। এখানে এক জায়গায়

সুনির্দিষ্টভাবে চার খোলাফায়ে রাশেদীনকে বুঝানো হয়েছে, আর এক জায়গায় সাধারণভাবে ১২ জন খলিফার কথা বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এর প্রকৃত মর্ম কি তা সুনির্দিষ্টভাবে একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এবার 'ফিতনায়ে আহলাস' সংক্রান্ত হাদিসগুলোর আলোচনায় আসা যাক। মিশকাতে এ হাদিসের ভাষা নিম্নরূপ :

كنا قعودا عند النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فاكثر فى ذكرها حتى ذكر فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس؟ قال هى هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها تحت قدمى رجل من اهل بيتى يزعم انه منى وليس منى انما اوليائى المتقون ثم يصطاح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدا من هذه الامة الالطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا حتى اليسير الناس الى فسطاطين فسطاط الايمان لانفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذالك فانتظروا الرجال من يومه اومن غده •

"আমরা রসূল সা.-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বহুসংখ্যক ফিতনার (অরাজকতা ও দুর্যোগ) উল্লেখ করলেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি ফিতনায়ে আহলাসের কথা বললেন। একজনে বললো, ফিতনায়ে আহলাস কি জিনিস?[১] রসূল সা. বললেন এটা পলায়ন ও মারামারি কাটাকাটি। এরপর আরেক ফিতনার উদ্ভব ঘটবে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য থেকে। আমার বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তির পদতল থেকে তা ফুটে বেরুবে। সে আমার লোক বলে দাবি করবে, অথচ তার সাতে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবেনা। আমার বন্ধু তো কেবল খোদাভীরু লোকেরা। এরপর জনগণ এমন এক ব্যক্তিকে মেনে নেবে, যার বুকের সাথে যেনো উরু যুক্ত হয়ে গেছে। এরপর আর একটা ঘোরতর দুর্যোগ আসবে, যা আমার উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তিকে একটা না একটা চাঁটি মারবে। এরপর যখন জানানো হবে যে, এ দুর্যোগ কেটে গেছে, তখন তা আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। মানুষ সকালে মুমিন ও বিকেলে কাফের হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি হবে ঈমানদারীর শিবির, যেখানে মুনাফেকির চিহ্নও থাকবে না। আরেকটি হবে মুনাফেকীর শিবির, যেখানে ঈমানের নাম গন্ধও থাকবেনা। যখন এমন পরিস্থিতি দেখা দেবে, তখন দাজ্জালের অপেক্ষায় থাকবে। আজ না হোক, কাল তার আবির্ভাব ঘটবে।"

---

১. 'হাল্স' এর বহুবচন আহলাস। আহলাস এক ধরনের কালো আবরণকে বলা হয় যা জন্তুর দেহে জড়ানো হয় কিংবা মেঝেতে বিছানো হয়। এ দ্বারা অব্যাহতভাবে ঘটতে থাকা ভয়ংকর ও আতংকজনক ঘটনাবলীকে বুঝানো হয়েছে, যার ফলে মানুষ ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হয়।

সন্দেহ নেই, এ হাদিসে একাধিক্রমে দু'তিনটি দুর্যোগ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে আমাদের আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি ফিতনা বা দুর্যোগ এমন যে, মনে হয় তাতে চারদিকে ভয়ংকর লুটতরাজ মারামারি হুড়োহুড়ি ও চরম অরাজকতা বিরাজ করবে। এরপর আবার এক প্রাচুর্য ও বিলাসী জীবন আসবে আরেক দুর্যোগের আকারে। যার তত্ত্বাবধানে এর আবির্ভাব ঘটবে সে রসূল সা.-এর বংশোদ্ভূত হলেও হযরত নূহের ছেলের মতো মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য পাত্র হবেনা। কেননা, রসূল সা. বলেছেন, খোদাভীরু লোকেরাই তাঁর বন্ধু ও আপনজন হয়ে থাকে।

'ফিতনায়ে আহলাস' দ্বারা আসলে কি বুঝানো হয়েছে, সেটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু যে মুসলমানের মনে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে, সে এ কথা কল্পনাও করতে পারবেনা যে, নবীর বংশোদ্ভূত যে ব্যক্তির কথা রসূল সা. এই হাদিসে বলেছেন, তা দ্বারা সামান্যতম ইঙ্গিতও হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইনের দিকে করা হয়ে থাকতে পারে। (নাউজুবিল্লাহ) তাদেরকে তো হাদিসে سيدا شباب اهل الجنة (বেহেশতের যুবকদের নেতা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এহেন পুন্যাত্মা হাসান ও হুসাইনের রা. খোদাভীরুতা, চরিত্রের নির্মলতার কথা অস্বীকার করার সাহস কার হতে পারে এবং কিভাবে হতে পারে? অনুরূপভাবে رجل كورك على ضلع বুক ও উরু একাকার হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো শব্দটি যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কেও এমন ধারণা করার আদৌ কোনো অবকাশ নেই যে, রসূল সা. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের মতো মর্যাদাবান সাহাবিকে এরূপ শব্দ দ্বারা চিত্রিত করবেন। একথা সত্য যে, খেলাফতের পদটি তাঁর করায়ত্ত হয়নি এবং তাঁর শাহাদাতের আগেই তাঁর সন্তানরা পর্যন্ত মারওয়ানের দলে ভিড়ে গিয়েছিল, কিন্তু রসূল সা.-এর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবি হযরত যুবাইর এবং যাতুন নিকাতাইন উপাধিতে ভূষিত আবু বকর কন্যা হযরত আসমার কলিজার টুকরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর সম্পর্কে তিনি এমন অপমানজনক শব্দ কিভাবে প্রয়োগ করতে পারেন? বুক ও উরু একাকার হওয়া কথাটা ইংরেজি ও উর্দুতে 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া' অথবা 'গোলাকার ছিদ্রে চুতষ্কোণ পেরেক' বলার সমতুল্য অর্থাৎ অযোগ্য ও অপাংক্তেয়। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি কোনো পদের যোগ্য বিবেচিত হলে আরবিতে বলা হয় : هو ككف فى ساعد او كساعد فى ذراع

অর্থাৎ 'হাতের সাথে বাহুযুক্ত' বা 'বাহুর সাথে কনুই যুক্ত।'

কোনো কোনো বিজ্ঞজন হাদিসের এই প্রবচনগুলোকে বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যেমন হেজাযের শাসনকর্তা শরিফ হুসাইন যখন তুর্কীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন জানান, তখন সে যুগের কতিপয় আলেম ভেবেছিলেন যে, এই ব্যক্তিই হয়তো হাদিসের সেই ورك على ضلع অর্থাৎ বুকের সাথে উরুযুক্ত ব্যক্তি।

কিন্তু আমার নগণ্য মতে, মুসলিম উম্মাহ এখনো এমন ভয়াবহ দুর্যোগের শিকার হয়নি। কেননা পরবর্তী বাক্য থেকে জানা যায় যে, এ দুর্যোগ ক্রমান্বয়ে তার পক্ষপুট বিস্তার করতেই থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া নির্ভেজাল ঈমানদারী ও নির্ভেজাল মুনাফিকীর পতাকাবাহী দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। এরপর দাজ্জাল ও হযরত ঈসার আবির্ভাব ঘটবে এবং সম্ভবত কিয়ামতও ঘনিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করুন এবং এই সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

কুরাইশের যে বখাটে তরুণদের হাতে মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস সাধিত হবে বলে রসূল সা. পূর্বাভাস দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। সহীহ বুখারি ও মুসলিমে এ হাদিসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। একথা সত্য যে, একাধিক সাহাবি ও তাবেঈন এবং বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস ও প্রাচীন আলেম বনু মারওয়ান ও বনু উমাইয়ার স্বৈরাচারি জালেম, রগচটা শাসক ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র বলে অভিহিত করেছেন। এটা তিক্ত হলেও এমন এক অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাসের পাতা থেকে এই কালিমা মোচন কিংবা এর উপর প্রলেপ দিয়ে বা সাদা রং লাগিয়ে এর কুৎসিত দৃশ্য ধামাচাপা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। ঐতিহাসিক, হাদিসবেত্তা, ফেকাহ শাস্ত্রকার বা আকীদা বিশারদ যিনিই হোন, আহলে সুন্নাহ ও প্রাচীন ন্যায়নিষ্ঠ আলেমগণের নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির অনুসারি হলে কেউ ইতিহাসের এই কলংকময় ও রক্তমাখা অধ্যায়গুলোকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করতে পারবেনা।

এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধু সুনান তিরমিযির একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি। ফিতনা সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযি হিশাম বিন হাসসানের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্তিটি এই :

احصوا ما قتل الحجاج صبرًا فبلغ مائة الف وعشرين الف قتيل

“গণনাকারীরা যখন হিসাব করেছেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কতজনকে বেঁধে হত্যা করেছে। তখন তাদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।”

এটা ইমাম আবু ঈসা তিরমিযির বর্ণনা, যিনি ইমাম বুখারির সুযোগ্য শিষ্য এবং যার কাছ থেকে স্বয়ং ইমাম বুখারি ও হাদিস সংগ্রহ করেছেন। *[তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯]*

৪৫. আল্লাহ ও রসূলের কোনো উক্তি কি মানুষকে কর্মবিমুখ করতে পারে?

প্রশ্ন : আমি ইসলামি জ্ঞানান্বেষী ও দীনি প্রেরণাসম্পন্ন একজন মুসলমান। কিন্তু কিছু দিন যাবত একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি, যার সমাধান এখনো হয়নি। কয়েকজন আলেমের কাছেও গিয়েছি, কিন্তু সন্তোষজনক জবাব পাইনি। প্রশ্ন

হলো, কুরআন ও হাদিস গ্রন্থসমূহে কি এমন আয়াত ও হাদিস আছে, যা দ্বারা নামায, রোযা ও অন্যান্য সৎকর্মের গুরুত্ব কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ সহীহ মুসলিম তিরমিযি প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে, আশূরার রোযা বিগত বছরের গুনাহর কাফফারাস্বরূপ। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের রোযা সম্পর্কে হাদিসে আছে, প্রতি দিনের রোযা পুরো এক বছরের রোযার সমান। হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন যে, এতে দু'বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আরাফার দিনে রোযার সওয়াবও তদ্রুপ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হয়, তাহলে এর দ্বারা কি গুনাহের অবাধ স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়না? এরপর আর বেশি নামায, রোযা করা ও গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার দরকার কি? হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করেছে, সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে। মিশকাতে সালাতুত তাসবীহর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে বলা হয়েছে, চাশত নামায দ্বারা সারা জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মিশকাতে বলা হয়েছে, 'এরপর গুনাহ থেকে কে আত্মরক্ষা করবে, আর কেইবা কষ্ট করে নেক কাজ করতে পারে?' সূরা আর রহমানে বলা হয়েছে :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"আর যে তার প্রভূর সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি জান্নাত।"

প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে কিন্তু কোনো ভালো কাজ করেনা সে কি দু'টো বেহেশত লাভ করবে? সূরা হা-মীম সিজদায় বলা হয়েছে? "যারা বলবে যে, আমাদের রব আল্লাহ অতপর তার উপর অবিচল থাকবে ফেরেশতারা তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন।" এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে, যা আপনার নিকট সুবিদিত। এসব দ্বারা যে ভুল বুঝাবুঝি ও শৈথিল্য জন্ম নেয়ার আশংকা রয়েছে, তা কিভাবে রোধ করা সম্ভব? এ ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন ও আপত্তি উঠে তার কি জবাব দেয়া যাবে?

জবাব : আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে বেশ দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। আপাতত সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ যেনো এতেই আপনাকে তৃপ্তি দান করেন। আপনি কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করতে গিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তাতে একটা মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। আপনি শুধু একটা দিকের উপরই দৃষ্টি রেখেছেন এবং যেসব আয়াত ও হাদিসে কোনো কোনো নেক আমলের সুফল বর্ণনা করা হয়েছে, কেবল সেগুলোর প্রতিই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন। আর যেসব আয়াত ও হাদিসে খারাপ কাজের অশুভ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর দিকে নজর দিচ্ছেননা। একজন মুমিনের প্রকৃত অবস্থান হলো আশা ও ভীতির

মাঝখানে। আল্লাহ ও রসূল সা.-এর এই দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্য থেকে মাত্র একটির উপরই যে ব্যক্তি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে সে অনিবার্যভাবে হয় অত্যাধিক আশাবাদী হয়ে উঠবে নচেত হতাশার শিকার হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এই দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ ও বৈপরিত্য খুঁজতে চেষ্টা করবে তার কপালে গোমরাহী ও হতবুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু জুটবেনা।

উপরন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা.-এর বক্তব্যের সঠিক মর্ম ও উপলব্ধি করা ও প্রকৃত নিগুঢ় সত্য উদঘাটনের জন্য সেইসব স্বীকৃত প্রাথমিক মূলনীতিগুলোও নজরে রাখা প্রয়োজন, যা কুরআন ও হাদিসেই বর্ণিত বা কুরআন হাদিস থেকেই সংগৃহীত এবং যা প্রাচীন আলেমগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। যেমন ফরয কাজগুলোর প্রতিদান ও সওয়াব সর্বাবস্থায়ই নফলের চেয়ে বেশি। নফল কাজ কখনো ফরযের স্থলাভিষিক্ত বা তার ক্ষতিপূরণে সক্ষম নয় এবং ফরয কাজ বাদ দিলে নফল কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়না। যে ব্যক্তি ফরয নামায পরিত্যাগ করতে অভ্যস্ত, তার নফল নামাযে কি লাভ হবে? যে ব্যক্তি যাকাত ও উশর দেয়না, তার নফল দান সদকার কোনো স্বার্থকতা নেই। যে ব্যক্তি ফরয রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাখেনা, তার আশূরা, জিলহজ্জ বা আরাফার দিনের রোযা সারা বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া দূরে থাক, তা নিজেই বৃথা ও নিস্ফল হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাবে। ফরয নামায আদায়ের সৌভাগ্য যার হয়না, তার সালাতুত তাসবীহ অন্যান্য সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকেও রেহাই দিতে পারবেনা। নামায ও যাকাত ত্যাগ করার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে মারাত্মক পরিণামের কথা জানানো হয়েছে তা কারো অজানা নয়। রসূল সা. ফরয তরককারীগণের বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদের জন্য কুরআন ও হাদিসে জাহান্নামের আযাবের কঠোর হুশিয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে এবং দুনিয়াতে সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম পরিত্যাগকারীদের ন্যায় সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। এরপরও কি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে যে, ফরয তরককারীদের জন্য নফল ইবাদত কাফফারা হয়না এবং নফল কাজের জন্য যে সুসংবাদ এসেছে, তা কেবল যারা ফরয যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাদেরই জন্য? নফল কাজের ফযীলত সম্পর্কে এসব উক্তির উদ্দেশ্য এটা ছিলনা যে, লোকেরা ফরযের ব্যাপারে গড়িমসি করুক, শৈথিল্য প্রদর্শন করুক এবং নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ করার ব্যাপারে দু:সাহসী হয়ে উঠুক। যে সাহাবিদের উদ্দেশ্যে এসব বক্তব্য প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমরা এমন একটি দৃষ্টান্ত পাইনা যে, তারা এসব সুসংবাদ শুনে তার উপর নির্ভর করে থাকার ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং শরিয়তের আদেশ নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঢিলেমি ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল।

কুরআন ও হাদিসে মানুষের কর্মফল সম্পর্কে আরো মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। সেটি এই যে, আল্লাহর কাছে সকল ভালো কাজ ও মন্দ কাজের হিসেব ও পরিমাণ সামগ্রিকভাবে করা হবে। ভালো কাজের পাল্লা যার ভারি হবে সে বেহেশতের অধিকারী হবে। আর যে মুসলমানের ভালো কাজের পাল্লা হাল্‌কা হবে সে দোযখের অধিবাসী হবে। এভাবে হিসেব-নিকেশ ও পরিমাপের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হালকা পাল্লার অধিকারী মুসলমানকে আল্লাহ ইচ্ছে করলে মাফ করে দেবেন, আর ইচ্ছে করলে মাফ করার আগে তাকে সাজা ভোগ করার জন্য দোযখে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে কৃতকর্মের বাহ্যিক আকার ও আয়তন দেখা হবেনা। বরং দেখা হবে তার অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তি, নিয়ত বা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। সহীহ্ হাদিসে বলা হয়েছে, কিছু কিছু নামাযী ও রোযাদার কেবলমাত্র রাত জাগরণ ও উপবাস ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেনা। ফরয ও নফল নির্বিশেষে সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই একথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কোনো কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে নফল তো দূরের কথা ফরয নামায রোযাও প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। ফরয কাজ করার দরকার হবেনা এবং কবীরা গুনাহ্ অবাধে করা জায়েয, এই মনোভাব এ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ নফল ইবাদত ও সদকায় তৎপর হয়, তা হলে এ ধরনের নেক আমল শুধু যে অগ্রাহ্য হবে তা নয়, বরং এ ধরনের অন্যায় ধারণা পোষণহেতু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এছাড়া কুরআন ও হাদিসে এমন বহু পুণ্যবিনাশী কাজের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। যা অন্যান্য বহু সৎ কাজকে বিনষ্ট ও পণ্ড করে দেয়। রিয়াকারী বা লোক দেখানোর ইচ্ছে ছোট শিরক নামে আখ্যায়িত হয়েছে এবং এর দ্বারা আর্থিক দান সদকা, আল্লাহর পথে লড়াই এবং অন্যান্য সৎ কাজ নিস্ফল ও বৃথা হয়ে যায়। খিয়ানত ও আত্মসাৎ দ্বারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতিদান বিনষ্ট হয় এবং এসব কাজ যারা করে, তারা বরঞ্চ দোযখে যায়। এক হাদিসে আছে যে, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি বহু সৎ কাজ সাথে নিয়ে আসবে, কিন্তু তার পাশাপাশি সে অনেক বান্দাহর হক নষ্ট করে আসবে। কারো সম্পদ ছিনতাই, কাউকে গালাগাল বর্ষণ, কিংবা অন্য কোনোভাবে আল্লাহর সৃষ্টির উপর জুলুম নির্যাতন চালানোর দায়ে দোষী হয়ে আসবে। এই ব্যক্তির কৃত যাবতীয় নেক কাজ ঐসব মজলুমের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে এবং মজলুমদের কৃত পাপগুলো ঐ জালেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে।"

এ ধরনের অসংখ্য দু:সংবাদ আপনার চোখে পড়লোনা তার কারণ কি? রসূল সা. যদি বলে না থাকেন যে, আমার শাফায়াত কবীরা গুনাহর আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, তবে তা দ্বারা এ কথা কিভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক কবীরা গুনাহকারী অবশ্যই শাফায়াত লাভ করবে এবং বিনা হিসেবে ক্ষমা পেয়ে যাবে? শাফায়েত তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত ব্যক্তিই পাবে। অনেক ঈমানদার

ব্যক্তিও একবার দোযখে যাবে –এ কথা সহীহ্ হাদিসে ঘোষিত হয়েছে। তারা হয় শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে, নচেত শাস্তি ভোগ করার পর তা পাবে স্বয়ং রসূল সা. বলেছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আমার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। কোনো কোনো অপরাধী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে অভিযোগ দায়ের করবো। এটা ভেবে দেখার মতো এবং শিক্ষা গ্রহণ করার মতো বিষয় যে, প্রিয় নবী সা.-এর যেখানে হাশরের মাঠে শাফায়াতকারী হওয়ার কথা, সেখানে তিনি যার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে আসবেন, তার জন্য আর কে হতে পারে শাফায়াতকারী এবং সে কিভাবে শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে।

সর্বশেষ আমি একটা সহজবোধ্য উদাহরণ দিয়ে জবাব শেষ করছি। মনে করুন, একজন দক্ষ চিকিৎসক তার একটা ব্যবস্থাপত্রে শরীরের জন্য কয়েকটি শক্তিবর্ধক ওষুধের নাম লিখে দিলেন। পরে কোনো একটি বৈঠকে কতিপয় খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার কিছু মূলনীতি বর্ণনা করলেন। আবার অন্য একটি বৈঠকে কতিপয় ক্ষতিকর ও বিষাক্ত জিনিসের নাম জানিয়ে দিলেন এবং তা খেলে মানুষ রোগ ও মৃত্যুর কবলে পড়তে পারে বলে সাবধান করে দিলেন। এই সমস্ত কথা যথাস্থানে সঠিক ও সঙ্গত ছিলো। কিন্তু কোনো বেকুফ যদি শক্তিবর্ধক ওষুধের সাথে সাথে বিষাক্ত খাদ্যগুলো খায় এবং এরপর সুস্থ সবল না হয়ে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে কি এ কথা বলা যাবে যে, চিকিৎসক দক্ষ ছিলনা, কিংবা তার কিছু কথা ঠিক এবং কিছু কথা ভ্রান্ত ছিলো। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী লিখিত তাফহীমাত প্রথম খণ্ডে। [বাংলায় নির্বাচিত রচনাবলী-১' নামে প্রকাশিত] 'মুক্তির জন্য কি শুধু কালেমায়ে তাইয়েবা যথেষ্ট' শীর্ষক লেখাটি অধ্যয়ন করলে ভালো হয়।

আল্লাহ ও রসূল সা.-এর প্রতিটি কথা যথাস্থানে অকাট্য ও নির্ভুল। কিন্তু সমস্যা হলো, আজকাল মুসলমানরা শুধু সহজ ও সুবিধাজনক পন্থা খুঁজে বেড়ায় এবং সস্তা মুক্তি লাভের অভিলাষ পোষণ করে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেমন বলে যে, سَيُغْفَرُ لَنَا 'আমাদের গুনাহ মাফ করা হবে' তেমনি মুসলমানরাও ভেবে বসে আছে যে, কোনো সৎ কাজ না করলেও, এমনকি সব রকমের পাপ ও অসৎ কাজ করেও তারা বিনা হিসেবে সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে। শরিয়তের আদেশ লংঘন ও নাফরমানী করার জন্য কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। কিন্তু এটা একটা সর্বনাশা ভুল ধারণা, বরঞ্চ ধ্বংসাত্মক ভ্রষ্টতা। এ ভ্রষ্টতার জন্য তাদের নিজস্ব ভ্রান্ত আচরণ ও বাঁকা বুদ্ধিই দায়ি। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. এ জন্য দায়ি নন। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিদার, আমরা তো তাকে অবশ্যই মুসলমান বলবো। কেননা এখানে বাহ্যিক হাবভাব ও চালচলনের উপরই শরিয়তের যাবতীয় বিধি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ মানুষের ভেতর ও বাহির

উভয়ের সঠিক অবস্থা অবগত আছেন এবং তার কাছে যে কোনো মৌখিক দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তা যদি হতো তাহলে তিনি একথা কেন বলবেন যে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الاخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

"এমন অনেক লোক রয়েছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি। অথচ তারা মুমিন নয়।" *(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ০৮)*

আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি বাণী শ্রবণ ও তার সর্বোত্তম অনুসরণের তাওফিক দিন। আমীন। *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৭৪]*

৪৬. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও দৈন্যদশার কারণ কি?

প্রশ্ন : আমি আজকাল ভীষণ মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত। অন্য কথায় বলা যায়, ঈমানের সংকটে ভুগছি। শয়তানের হামলার কবলে পড়েছি। আল্লাহর রহমতে আমার জীবন ইসলামের বাস্তব অনুসারী। ইসলামকে সচেতনভাবে গ্রহণ করার পর থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল হারাম ও জায়েয নাজায়েয বাছবিচার করে চলছি। আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে আমার অর্থনৈতিক জীবন ভীষণ সংকটাপন্ন ছিলো। পরে আল্লাহর মেহেরবাণীতে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে উন্নতি হতে থাকে এবং আমি যাকাত দেয়ার যোগ্য হই। চার পাঁচ বছর আগের কথা, আমি প্রায় এক হাজার রুপিয়া যাকাত দিতে সক্ষম হই। এরপর বিগত তিন বছর ধরে ব্যবসায়ে অবনতি, ছেলেমেয়ের অসুখ বিসুখ ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকি। এ পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রহমতে ঈমান অক্ষুন্ন থেকেছে এবং এখনও আছে। আমি ব্যবসায়ের সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য কোনো অবৈধ কৌশল অবলম্বন করা থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে বিরত থেকেছি।

এ বছর আমি যখন যাকাতের হিসেব করলাম, তখন দেখলাম গত তিন বছর ধরে কমতে কমতে এখন তা এক হাজার থেকে নেমে পাঁচশতে দাঁড়িয়েছে। কিছু পুঁজি লোকসানের শিকার হয়ে এবং কিছু ব্যবসায়িক সংকট ও অন্যান্য ব্যয়ের কারণে অর্ধেকে এসে ঠেকেছে। যাকাত ছাড়াও শরিয়তের বিধি মোতাবেক অন্যান্য যাবতীয় আর্থিক দায় দায়িত্ব যথারীতি সমাধা করে থাকি স্বভাব চরিত্রেও ঈমানদারীর মান বজায় রেখেছি। আমার বুঝে আসেনা এবং এ রহস্যের কিনারা খুঁজে পাইনা যে, আমার লোকসান কেন হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যারা কৃতজ্ঞতার আচরণ (অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দান ও তার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার) করবে, আমি তাকে আরো বেশি নিয়ামত দেবো। আমি তো আল্লাহর মেহেরবাণীতে কৃতজ্ঞতার আচরণ বজায় রেখেছি। আমার প্রশ্ন হলো, আমার অর্থ সম্পদের এই ঘাটতিতে কি আল্লাহর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে এবং আমি যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছি তা কি আল্লাহর কোনো বিধানের আওতাধীন? আমার আশেপাশে হালাল হারামের বাছবিচার করেনা এবং

যেসব অর্থলোলুপ নিরেট দুনিয়াদার লোকেরা রয়েছে তাদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। তারা বেশ ফুলেফেঁপে উঠছে। আমার দেড়শ সদস্যবিশিষ্ট খান্দানের সবাই স্বচ্ছল এবং ক্রমাগত আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। আর আমি তাদের মধ্যে একাই একনাগাড়ে দৈন্যদশায় ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিতে ভারাক্রান্ত। অথচ আল্লাহর শোকর, গোটা খান্দানে আমি একাই দীনদার। এহেন পরিস্থিতিতে শয়তান আমার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং আমার ঈমান ও আকীদাকে বিচলিত করার চেষ্টা করছে। সে এরূপ প্ররোচণা দিচ্ছে যে, আল্লাহর রাহে আমি যে যাকাত দিচ্ছি, তাতে আল্লাহ আমার সম্পদ কমিয়ে দিচ্ছেন। যাকাত সম্পর্কে তো এ কথাই বলা হয় যে, এতে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। তাহলে আমি সুখ সমৃদ্ধির পরিবর্তে দৈন্যদশার শিকার হলাম কেনো?

জবাব আপনার মানসিক উদ্বেগের কথা জেনে দু:খ পেলাম। যেরূপ বিস্তারিতভাবে আপনি নিজের সমস্যা বর্ণনা করেছেন, সেরূপ বিস্তারিতভাবে ও যুক্তি প্রমাণ সহকারে আপনাকে জবাব দিতে পারবো কিনা জানিনা। তবু সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি এবং এই জবাবই যাতে আপনার কাছে সন্তোষজনক হয়, সে জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

আমার মনে হয়, আপনার অস্থিরতার আসল কারণ, আপনি কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেননা। আর এর কোনো একটি অংশকে বিবেচনা করার সময়ও তার সঠিক পটভূমি ও তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে তার একটা সংকীর্ণ অর্থ তৈরি করে নেন। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, যাকাত ও আল্লাহর পথে দান প্রশ্নেই আপনার অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। আপনার মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তি যাকাত দেয়, তার সম্পদ দুনিয়াতে সবসময় কেবল বাড়তেই থাকবে, আর যে যাকাত দেয় না তার সম্পদ কমতেই থাকবে। কুরআন ও হাদিসের কোনো জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ ধরনের গ্যারান্টি যদি আল্লাহ ও রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে দেয়া হতো এবং দেয়া হলে নিশ্চয়ই তা কার্যকরও হতো, তাহলে যাকাত দিতোনা এবং সম্পদ বৃদ্ধির এমন অব্যর্থ উপায় প্রয়োগ করতোনা এমন কে আছে? তেমন হলে তো আল্লাহর পথে অর্থ দান করায় ত্যাগ, কুরবানি ও পরীক্ষার কোনো ব্যাপারই থাকতোনা। আপনি যে যুক্তি অবলম্বন করেছেন তা আরো একটু প্রসারিত করলে এটাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, যে মুসলমান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে, দুনিয়াতে তার কোনো দু:খ কষ্ট থাকবেনা এবং সে সব সময় কেবল আনন্দেই মেতে থাকবে। পার্থিব সহায় সম্পদ ও আরাম আয়েশে সে সর্বদা টইটম্বুর থাকবে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবেনা এবং কেবল সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যই তার পদচুম্বন করতে থাকবে। আপনি নিজেই ভাবুন এবং তারপর আমাকে বলুন, রসূল সা. ও তাঁর সাহাবিদের চেয়ে আল্লাহর হুকুমের বেশি অনুগত কে হতে পারে এবং

যাকাত সদকা দেয়ার ব্যাপারে তাদের চেয়ে বেশি তৎপর আর কে ছিলো? তথাপি তারা কি অভাব, ক্ষুধা, আর্থিক দৈন্যদশা এবং অন্যান্য বিপদ মুসিবতে ভোগেননি? তাদেরকে কি বলা হয়নি যে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো সন্ত্রাস, ক্ষুধা, সম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। যারা এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করে এবং বিপদ এলে বলে, আমরা কেবল আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।" *(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)*

পরীক্ষা তো সকল মানুষের জন্যই অবধারিত। তবে তা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কাউকে আল্লাহ সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কাউকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করেন। কাউকে ফরমাবরদারী ও আনুগত্য করা সত্ত্বেও দু:খ কষ্ট ভোগ করান, আবার কাউকে নাফরমানি করা সত্ত্বেও দেন অঢেল সুখ। বলাবাহুল্য যে, সর্বশেষ পন্থাটাই পরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন পন্থা।

আপনি পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটির বরাত দিয়েছেন, সেটি সূরা ইবরাহীমের ৭ নং আয়াত। এতে কোনো এক বা কতিপয় ব্যক্তিকে নয় বরং সমগ্র বনী ইসরাইল জাতিকে (কৃতজ্ঞতার আচরণের বিনিময়ে সম্পদ বৃদ্ধির) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর এ ধরনের আরো বহু ওয়াদা আছে, যা ব্যক্তি বিশেষকে নয় বরং সমাজ বা জাতিকে দেয়া হয়েছে। কখনো কখনো এসব ওয়াদা এমন অনির্দিষ্টভাবে করা হয়েছে যে, শত শত বছর পরে তা পূর্ণ হয়। কোনো কোনো প্রতিশ্রুতি ইহকালে নয় বরং পরকালে পূর্ণ হয়। এ কথা সত্য যে, যাকাত শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে পবিত্র করে তাকে বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু এ দ্বারা সর্বাবস্থায় সম্পদের বস্তুগত পরিমাণের বৃদ্ধি বুঝায়না। এর সম্পর্ক মূলত আখেরাতের পুরস্কার ও প্রতিদানের সাথে। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা নি:শেষ হয়ে যায় আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা চিরস্থায়ী।" *(সূরা নাহল, আয়াত : ৯৬)*

এ কথাও সত্য যে, যাকাত দ্বারা পৃথিবীতে আর্থিক স্বচ্ছলতার সৃষ্টি হয়। তবে সেটা ব্যক্তিগত জীবনের সাথে নয় বরং গোটা সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। সমগ্র সমাজ যদি যাকাত প্রদানে তৎপর হয় তবে সম্পদ ধনীদের দিক থেকে গরিবদের দিকে সঞ্চালিত হয়। ফলে সকলেই স্বচ্ছলতা ভোগ করে। কিন্তু শত

লোক বা হাজার লোকের মধ্য থেকে একজন যদি যাকাত দেয়, আর অন্যরা যাকাত না দেয়, বরং সুদ খায়, তা হলে গোটা সমাজ কিভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে, যাকাত সদকার ফলে সমৃদ্ধি আসবে এ ওয়াদার পাশাপাশি আল্লাহ তো এও বলেছেন যে, সুদী কারবার সমাজের ধ্বংস ও পতন ঘটায়। লিখলে অনেক কথাই লেখা যায়। কিন্তু আর বেশি বিস্তারিত লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংক্ষিপ্ত জবাবেই আল্লাহ আপনাকে স্বস্তি দিন এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করুন এই কামনাই করছি। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৭৫]*

৪৭. হযরত আলী রা.-এর বর্ম চুরি-১

প্রশ্ন হযরত আলী রা.-এর খেলাফত আমলে কিরূপ ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের প্রধান্য ছিলো, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে সচরাচর একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জনৈক ইহুদির বিরুদ্ধে তিনি আদালতে মামলা রুজু করেন যে, সে তাঁর বর্ম চুরি করে নিয়েছে। এই মামলায় তিনি নিজের ছেলে ও ভৃত্যকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। বিচারক তাঁর উভয় সাক্ষীকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, আইনত ছেলের সাক্ষ্য বাপের জন্য এবং ভৃত্যের সাক্ষ্য মনিবের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১. আমি প্রথমত জানতে চাই যে, এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ কি?

২. ঘটনাটা যদি এ রকমই হয়ে থাকে, তাহলে জিজ্ঞেস এই যে, হযরত আলীর মতো অমন উঁচু দরের একজন ফকীহ কি জানতেন না যে, ছেলে ও ভৃত্যকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা চলেনা।

অনুগ্রহপূর্ব এ ঘটনার বিশদ বিবরণ এবং এর উপর যে প্রশ্ন জাগে তার জবাব কি হবে জানালে উপকৃত হবো।

জবাব : আমিও হযরত আলীর এ ঘটনা শুনেছি এবং বোধহয় কোথাও পড়েছিও যে, তিনি বিচারপতি শুরাইহের আদালতে নিজের বর্ম চুরির মামলা দায়ের করেছিলেন এবং নিজের ছেলে হযরত ইমাম হাসানকে এবং ভৃত্য কিম্বরকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনার এই বিবরণ অনুসন্ধান করেও কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে খুঁজে পেলামনা। তবে ইমাম বায়হাকী স্বীয় গ্রন্থ সুনানে কুবরার দশম খণ্ডে ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'আদালতের কার্যবিধি' সংক্রান্ত অধ্যায়ে সনদ সহকারে ঘটনাটি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ :

"ইমাম শাবীর বর্ণনা এই যে, একদিন হযরত আলী বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খৃস্টান একটা বর্ম বিক্রি করছে। হযরত আলী তৎক্ষণাৎ বর্মটি চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম তো আমার। চল, ইসলামি আদালতে তোমার ও আমার মধ্যে ফায়সালা হবে। আদালতের বিচারক ছিলেন শুরাইহ। আমীরুল মুমিনীন বিচারপতি শুরাইহকে বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে দিন।

শুরাইহ বললেন : আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য কি? হযরত আলী বললেন : এই বর্মটি আমার। অনেক দিন যাবত এটি নিখোঁজ রয়েছে। শুরাইহ বললেন ওহে খৃস্টান! তুমি কি বলতে চাও? সে বললো, 'আমীরুল মু'মিনীন কেমন একটা মিথ্যা কথা বললেন। এ বর্ম তো আমার। বিচারপতি শুরাইহ বললেন, বর্মটি এই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। কোনো প্রমাণ ছাড়া তা তার কাছ থেকে নেয়া যায় বলে আমি মনে করিনা। আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? হযরত আলী বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন। এ কথা শুনে খৃস্টান লোকটি বলে উঠলো আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, এটা নবীদের বিধান ও শিক্ষাই বটে। আমীরুল মুমিনীন নিজের দাবি বিচারকের সামনে পেশ করছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমীরুল মুমিনীন! এটা আপনারই বর্ম। আমি এটি আপনার কাছে বিক্রী করেছিলাম। পরে তা আপনার মেটে রং-এর উটটির উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলে আমি ওটি তুলে নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল। হযরত আলী বললেন। তুমি যখন মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম এখন থেকে তোমার। অতপর হযরত আলী তাকে ভালো দেখে একটা ঘোড়াও দিলেন এবং তাতে চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন। ইমাম শা'বী বলেন, আমি এই নওমুসলিমকে পরবর্তীকালে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি।"

অপর এক সনদে ইমাম শা'বী বলেন, "হযরত আলী রা. এছাড়া তার জন্য দু'হাজার দিরহাম ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। অবশেষে এই ব্যক্তি সিফফীন যুদ্ধে আলীর রা. পক্ষে লড়াই করে শহীদ হন।"

'নাইলুল আওতার' ও অন্যান্য গ্রন্থেও এ ঘটনা সুনানে বায়হাকীর বরাত দিয়ে এরকমই বর্ণিত হয়েছে।

উপরে যে বিবরণ দেয়া হলো, ঘটনা যদি এতোটুকুই হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্নে যে আপত্তি তোলা হয়েছে, তা আর এখানে উঠেনা। তবুও যদি ধরে নেই যে, হযরত আলীর পক্ষে তার ছেলে ও ভৃত্য সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহলে সেটা এমন কোনো নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ হয়নি যে, তা নিয়ে এই সম্মানিত পিতাপুত্রকে অভিযুক্ত করতে হবে। আমি মনে করি এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনাটার এ দিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, হযরত আলী কিসের দাবি জানিয়েছিলেন এবং তার ব্যাপারে কে কি সাক্ষ্য দিলো বা দিলোনা। বরং এর কেন্দ্রীয় বিষয়টা হলো, আমীরুল মুমিনীন একজন সুনিশ্চিত সত্যভাষী হয়েও নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হলেন। আর আদালত একদিকে রসূল সা.-এর একজন সাহাবি এবং খলিফায়ে রাশেদ রয়েছেন আর অপরদিকে একজন অমুসলিম নাগরিক। আদালত সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে এমন রায় দিলো, যা ছিলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইনসাফভিত্তিক ও সন্দেহাতীত।

একথা ঠিক যে, নিকটাত্মীয় বা পরিবারের সদস্যদের সাক্ষ্য পরস্পরের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এই মর্মে রসূল সা. উক্তি একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত এটা অসম্ভব নয় যে, রসূল সা.-এর এ উক্তি হযরত আলী ও হযরত হাসানের অজানাও থাকতে পারে। এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোনো কোনো সাহাবির এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনেরও রসূল সা.-এর কোনো কোনো উক্তি জানা থাকতোনা এবং ঘোষণা দেয়া হতো যে, রসূল সা.-এর অমুক বিষয়ে কোনো কথা ও কাজ কারো জানা থাকলে সে যেনো এসে তা অবহিত করে। সাহাবায়ে কেরামের কোনো জানা কথা ভুলে যাওয়া বিচিত্র ছিলনা। হযরত ওমর রা.-এর এ ঘটনা সুবিদিত যে, তায়াম্মুম সম্পর্কে রসূল সা.-এর একটা উক্তি তাঁর মনে ছিলনা, হযরত আম্মার রা.-এর মনে ছিলো। অথচ উভয়ের সামনেই রসূল সা. কথাটা বলেছিলেন।

এছাড়া ফরিয়াদির কাছে যদি নিজ পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কোনো সাক্ষী না থাকে, অথবা একেবারেই কোনো সাক্ষী না থাকে, কিন্তু নিজের সুনিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের বলে সে নিজের দাবিকে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ বলে জানে, তাহলে সে নিজের দাবিকে যথাযথভাবে বিচারকের সামনে উত্থাপন করতে পারে। ফরিয়াদি যদি অবাস্তব বক্তব্য না রাখে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির না করে, তাহলে আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। তবে দুনিয়ায় তার দাবি ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, সেটা বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। বিচারক যদি দাবিকে প্রমাণযোগ্য ও সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তাহলেও আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ করা তার কর্তব্য। সে অপরাধের স্বীকারোক্তিও করতে পারে। কিন্তু যদি সে অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য বা আদৌ সাক্ষ্য না থাকে, তাহলে বিচারক তাকে শপথ করে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করবেন। এছাড়া সে অব্যাহতি পেতে পারেনা। হাদিসেই বলা হয়েছে :

البينة على المدعى واليمين على من انكر-

"সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা ফরিয়াদির দায়িত্ব আর বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করলে তার কর্তব্য কসম খাওয়া।"

এ হাদিস থেকে স্বত:সিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে যে, বাদীর কাছে সাক্ষ্য নেই কিংবা আদালতের কাছে তার দাবি প্রমাণযোগ্য হচ্ছেনা। কিন্তু বাদীর দাবি বা সাক্ষ্য আসলে সত্য। এরূপ ক্ষেত্রে তার আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা এবং যে ধরনের সাক্ষ্যই পাওয়া যায় তা হুবহু পেশ করা দোষের নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির শপথ করার প্রশ্ন এ ক্ষেত্রেই উঠে। নচেৎ বাদী যদি ইপ্সিত সাক্ষ্য হাজির করে, তাহলে সেই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে। সাক্ষ্য যদি বাঞ্ছিত মানের হয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে

আসামীর অব্যাহতি লাভের জন্য কসম খাওয়ার প্রশ্ন উঠবেনা। হযরত আলীর কাছে সাক্ষ্য ছিলো কি ছিলনা, আর থাকলে তা কতোটা গ্রহণযোগ্য ছিলো, তার পরিবর্তে লক্ষ্যণীয় ও শিক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তিনি নিজে আপন অমুসলিম প্রজার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আদালতের শরণাপন্ন হন এবং নিজের বিরুদ্ধে দেয়া আদালতের রায়কে সন্তুষ্টচিত্তে ও হাসিমুখে মেনে নেন। আমি মনে করি, তিনি যদি নিজের পুত্র বা চাকরকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করে থাকেন এবং আদালত সেই সাক্ষীকে অগ্রাহ্য করে থাকে, তবে সেটাও ইসলামি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমীরুল মুমিনীন নিজের পরিবারের সদস্যকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করছেন কেনো, এমন আপত্তি কোনো খৃস্টান আদালতে তোলেনি। বরং ক্ষমতাসীন খলিফা যে বাদী হয়ে আদালতে এলেন, আদালত তার বিরুদ্ধে একজন অমুসলিমের পক্ষে রায় দিলো, আর তিনি সে রায় নির্বিবাদে মেনে নিলেন, শুধুমাত্র এ ব্যাপারটাই অমুসলিম ব্যক্তিটির উপর এমন প্রচণ্ড নৈতিক প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আজীবন হযরত আলীর রা. আনুগত্য ও তাঁর জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার সংকল্প অটুট রেখেছেন। একজন অমুসলিম যেখানে ঘটনার এই উজ্জ্বল দিকটা বিবেচনায় রাখলেন, সেখানে আমরা মুসলমান হয়েও যদি তার ভেতরে আপত্তিকর জিনিসই খোঁজার চেষ্টা করি, তাহলে সেটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হবে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো, তা এ ঘটনার প্রকৃত ধরণ ও বিস্তৃত রূপ বুঝার জন্য যথেষ্ট। ইসলামি সাক্ষ্য আইনের ব্যাপারে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ এই নীতিই অবলম্বন করেছে যে, নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ স্বজনদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে এটা প্রায় ইজমায় (সর্বসম্মত নীতিতে) পরিণত হয়েছে এবং সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাই আমি এই নীতিকে সঠিক ও অগ্রগণ্য মনে করি। তবে এ ব্যাপারে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। তিরমিযী শরিফের সাক্ষ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের 'যাদের সাক্ষ্য বৈধ নয়' শীর্ষক হাদিসগুচ্ছে যে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, তার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী নিজেই মন্তব্য করেন যে :

"এটি একটি বিরল হাদিস। একমাত্র ইয়াযীদ বিন যিয়াদ দামেস্কীর মাধ্যমেই আমরা এটি জানতে পারি। ইয়াযীদ একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকেও একই মর্মে অন্য একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তবে তার বক্তব্য দুর্বোধ্য এবং আমার মতে তার সনদ বিশুদ্ধ নয়।" বিজ্ঞজনদের মতে সাধারণ আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষ্য বৈধ। কেবল পিতাপুত্রের সাক্ষ্য পরস্পরের জন্য অধিকাংশ আলেমের মতে জায়েয নয়। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে সাক্ষী সৎ লোক হলে পিতা ও পুত্রের জন্যও জায়েয। ভাইয়ের সাক্ষ্য যে ভাইয়ের জন্য

জায়েয, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারেও এই নীতি প্রযোজ্য।

ইমাম তিরমিযী স্বীয় বর্ণিত হাদিসের উপর যে বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন, তা থেকে বুঝা যায়, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়ও যদি সৎ ও সত্যবাদী হয় এবং সে নিজের আত্মীয়ের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেয়, তবে সেটা গুনাহ বা অপরাধের কাজ নয়। তবে সাবধানতা ও সন্দেহ সংশয় বোধের খাতিরে তা এড়িয়ে চলার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আসামী যদি এ ধরনের সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় তবে তার আপত্তি গ্রহণ করা হবে।

ইমাম বায়হাকীর একটি বিস্তৃত হাদিস তো আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সাক্ষ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়' শিরোনামে তিনি আরো একটি হাদিস এনেছেন। সেটি তিরমিযী শরিফের বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। তবে সেই সাথে তিনি বলেন : "এ বিষয়ে রসূল সা. থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়নি।"

এ মন্তব্য থেকেও এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে যে হাদিসই উদ্ধৃত হয়েছে, তার সনদ তো বেশি সবল নয়, তবে অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামের নিকট গৃহীত হওয়ার কারণে এটি অনুসরণযোগ্য ও প্রচলিত হয়ে গেছে। *[তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৭৯]*

৪৮. হযরত আলী রা.-এর বর্ম চুরি-২

তরজমানুল কুরআনের জুন সংখ্যায় হযরত আলীর বর্ম চুরির ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম যে, হযরত আলী রা. এ ব্যাপারে হযরত ইমাম হাসান রা. ও স্বীয় ভৃত্য কিম্বরকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেছিলেন একথা আমি কোনো কিতাবে পাইনি। আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু জনাব রিয়াযুল হাসান নূরী আমার জবাব পড়ে কয়েকখানা গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। ঐ গ্রন্থগুলোতে এ ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে এবং এ বিষয়ে আরো আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের উপকার হবে বিবেচনা করে এর জরুরি সারাংশ দিচ্ছি।

১. 'আখবারুল কুয়াত' (কাযীদের ইতিহাস) মুহাম্মদ বিন খালফ বিন হাইয়ানের রচিত একখানা বিশাল আরবি গ্রন্থ। এর কয়েকটি খণ্ড রয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

"হযরত আলী রা. যখন হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন নিজের বর্ম খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পেলেননা। ফেরার পথে দেখলেন জনৈক ইহুদি কুফার বাজারে বর্মটি বিক্রি করছে। হযরত আলী বললেন : ওহে ইহুদি এই বর্মটি তো আমার। এটা আমি তোমার কাছে বিক্রিও করিনি দানও করিনি। ইহুদি

বললো   বর্মটি তো আমার। এটা আমার দখলেও রয়েছে। হযরত আলী রা. বললেন   বেশ, তোমার ও আমার এ বিরোধ কাযীর দরবারে নিষ্পত্তি হবে। বিচারপতি শুরাইহ উভয়কে স্বীয় আদালতে হাজির হতে বললেন। ইহুদি বললো : বর্মটি তো আমার এবং আমার দখলে আছে। শুরাইহ জিজ্ঞেস করলেন : আমীরুল মুমিনীন। আপনার কাছে কি কোনো সাক্ষ্য আছে? তিনি বললেন   আমার ছেলে হাসান সাক্ষী। শুরাইহ বললেন আমীরুল মুমিনীন! পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য জায়েয নয়। হযরত আলী বললেন   সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি জান্নাতবাসী তার সাক্ষ্যও জায়েয নয়। আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যে, হাসান ও হুসাইন বেহেশতের তরুণদের নেতা। ইহুদি বলে উঠলো   আমীরুল মুমিনীন আমাকে কাযীর দরবারে নিয়ে গেছেন এবং কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ইসলামই সত্য ধর্ম। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দাহ ও রসূল। আমীরুল মুমিনীন! এ বর্ম আপনারই। রাতের বেলা আপনার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এর পর এই নওমুসলিম নাহরোয়ানের যুদ্ধে অংশ নেয় ও শহীদ হয়।"

আযমগড়ের 'দারুল মুসাননিফীন' থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'তাবেঈন'-এর ১৯৩ ও ১৯৪ পৃষ্ঠায় এই ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট হাদিস সম্পর্কে নিম্নরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে:

নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধি

হাদিসে নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্যদানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই এক আত্মীয়ের মামলায় অপর সৎ ও সত্যবাদী আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণেও কোনো আইনগত বাধা নেই। ইবনে আবি শায়বা জানান, বিচারপতি শুরাইহ আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন এবং এরূপ বিধি প্রবর্তন করেন যে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর সাক্ষ্য, ভৃত্যের জন্য মনিবের ও মনিবের জন্য ভৃত্যের সাক্ষ্য এবং নিয়োগকারীর পক্ষে কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবেনা। এই নীতি তিনি এতো কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন যে, হযরত আলীর পক্ষে ইমাম হাসানের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন।[১] ঘটনাটি এই যে   একবার হযরত আলীর বর্ম কোথাও পড়ে যায় এবং জনৈক অমুসলিম নাগরিকের হস্তগত হয়। হযরত আলী শুরাইহের আদালতে মামলা দায়ের করেন। শুরাইহ উক্ত অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন : 'তোমার বক্তব্য কি?' সে বললো   "বর্মটি আমার দখলে থাকা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমিই এটির মালিক।" শুরাইহ হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করেন যে, "আপনার কাছে কোনো সাক্ষ্য আছে যে, বর্ম পড়ে গিয়েছিল?" তিনি হযরত হাসান ও কিম্বরের

১. শাযারাতুয্ যাহাব, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সাক্ষ্য হাজির করলেন। শুরাইহ্ বললেন : "কিম্বরের সাক্ষ্য তো মেনে নিচ্ছি। কিন্তু হাসানের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছি।" হযরত আলী রা. বললেন : আপনি শোনেননি যে, রসূল সা. বলেছেন :

الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة

শুরাইহ্ বললেন : "শুনেছি, কিন্তু আমি বাপের পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করি না।"

এ রায় হযরত আলী মেনে নেন এবং বর্ম ইহুদির কাছেই থাকতে দেন। এ ঘটনায় ইহুদি এতো অভিভূত হয় যে, সে নিজেই স্বীকারোক্তি করে যে, বর্ম আপনার এবং আপনার ধর্ম সঠিক। মুসলমানদের কাযী আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন এবং তিনি নির্বিবাদে তা মেনে নেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সত্য রসূল। তার ইসলাম গ্রহণে হযরত আলী রা. এতো খুশি হন যে, তিনি স্মৃতি হিসেবে বর্মটি তাকে দিয়ে দেন। ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে হাদিসের বরাত দিয়ে এই বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'নাসবুর রায়া' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, এটা হাদিস নয় বরং শুরাইহের উক্তি।

রিয়াযুল হাসান সাহেব যে গ্রন্থাবলীর সন্ধান আমাকে দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী রা. স্বীয় বর্ম ফেরত পাওয়ার জন্য বিচারপতি শুরাইহের আদালতে যে মামলা দায়ের করেন, তাতে তিনি স্বীয় পুত্র হযরত হাসানকে বা হযরত হুসাইনকে এবং স্বীয় ভৃত্য কিম্বরকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন। তথাপি এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি তরজমানুল কুরআনের জুন সংখ্যায় যা কিছু লিখেছি উক্ত গ্রন্থাবলীর এসব উদ্ধৃতি সামগ্রিকভাবে তার সমর্থক। আমার অভিমত এই যে, হযরত আলী যদি উক্ত দু'জনকে বা তাদের একজনকে সত্য সাক্ষী জেনে পেশ করে থাকেন, তবে তিনি, খোদা না করুন, কোনো নিষিদ্ধ বা অবৈধ কাজ করেননি। বিচারপতি শুরাইহ্ যে এতে আপত্তি করেছিলেন, সেটাও এজন্য নয় যে, এ ব্যাপারে রসূল সা.-এর কোনো উক্তি বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে। তিনি শুধু সাবধানতার খাতিরে এবং আদালতের ন্যায় বিচারকে সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই এ ধরণের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই রায়কে হযরত আলী রা. সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। এটা ছিলো খেলাফাতে রাশেদার একটা সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তকে তিনি নিজের উপর কার্যকর করেন। তাই এটা পরবর্তীকালের জন্যও একটা অনুকরণীয় ইসলামি কার্যধারায় পরিণত হয়েছে। কেননা রসূল সা. বলেছেন :

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين

"আমার সুন্নত (অনুসৃত রীতিনীতি) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়।" *[তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৭৯]*

৪৯. ইসলামের দৃষ্টিতে গানবাজনা ও নারী পুরুষের মেলামেশা

প্রশ্ন : গানবাদ্য, বিশেষত বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানবাজনা আজকাল চিত্তবিনোদনের একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। এতে যতোক্ষণ নারী ও নারীকণ্ঠ যুক্ত না হয়, ততোক্ষণ একে বিস্বাদ ও অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। ঘরে ঘরে রেডিও টেলিভিশন রয়েছে এবং তার আসল উদ্দেশ্য গানবাজনা ও নাচ উপভোগ করা। বাড়ির লোকজন যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাক, অথবা অবসর কাটাক, বিশ্রাম নিক, আলাপ আলোচনায় রত থাক, সর্বাবস্থায় কানে গান বাজনার বিষ ঢালা চলতেই থাকে। বাসে, ট্রেনে, দোকানে, হোটেলে, বিয়েশাদীতে গান বাজনা যেনো না থাকলে চলেই না। অমুসলিমদের সমাজে যেমন, মুসলমানদের সমাজেও তেমন এর অবাধ প্রচলন।

ইসলামে যে নাচ গান নিষিদ্ধ, অনেক মুসলমানের সে অনুভূতি পর্যন্ত নেই। কেউ কেউ যুক্তি দেয়, গান বাজনা ও তাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ হারাম এ কথা কুরআনে নেই। এটা কেবল মোল্লাগিরি এবং মৌলবীদের মনগড়া। বিস্ময়ের ব্যাপার, এহেন নোংরামিকে সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক-কালে রমযান মাসেও রেডিও, টিভি ও সিনেমার এই কদাচার অপ্রতিহতভাবে চলেছে। শুধু তাই নয়, দেশের বাইরেও নারীপুরুষের মিলিত দল পাঠানো হয়েছে ইসলাম ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মুখে কলংক লেপনের জন্য। এর পাশাপাশি আবার আল্লাহ ও রসূলের ফরমাবরদারী ও ব্যয় সংকোচনের সদুপদেশ দেয়াও অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নীতি কি তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত কর্তব্য সমাধা করা ও এই অপকর্মের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জবাব : গান বাজনার ললিত সুর ও রাগ উৎপন্নকারী যাবতীয় সুর ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার ইসলামে অবৈধ। এগুলোর ব্যবহার তো দূরের কথা, এগুলো তৈরি করা, বিক্রি করা এবং খরিদ করাও নাজায়েয। কেবল বিয়ে শাদীতে বা খুশির উৎসবাদিতে ঢোল বাজানো জায়েয আছে। এ বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস নিম্নে দেয়া গেলো :

عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرني ربي عزوجل بمحق المعازف والمزامير والاوثان الصلب وامر الجاهلية — لا يحل بيعهن ولا شراهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثمنهن-

১. হযরত আবু উমামা জানান, রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণাস্বরূপ এবং পথনির্দেশকস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেনো আমি গানবাজনার যন্ত্রপাতি নিশ্চিহ্ন করে দিই, চাই তা মুখ দিয়ে,

হাত দিয়ে কিংবা আঘাত করে বাজানো হোক, আর আমি যেনো, দেবদেবীর মূর্তি, ঈসার প্রতিকৃতি, এবং যাবতীয় অনৈসলামিক জিনিস বিলুপ্ত করে দিই। এসব জিনিসের বেচাকেনা এবং মূল্য লেনদেন করা, এগুলো ব্যবহার করা ও শিখানো হারাম।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على امتى الخمر والميسر والمبرز والقنين ° قال يزيد القنين البرابط (مسند احمد)

২. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর মদ, জুয়া, জবের মদ, তবলা ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র হারাম করে দিয়েছেন।"

عن نافع ان ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع اصبعيه فى اذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع اتسمع فاقول نعم فيمضى حتى قلت لا — فوضع يديه واعاد راحلته الى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا - (مسند احمد)

৩. 'হযরত নাফে' বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এক রাখালের বাঁশির আওয়ায শুনে কানে আংগুল দিলেন এবং নিজের সওয়ারী জন্তুটিকে সড়ক থেকে সরিয়ে চলতে লাগলেন (যাতে আওয়ায থেকে দূরে থাকা যায়) এবং কিছুক্ষণ পরপরই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন ওহে নাফে, বাঁশির আওয়ায কি শুনতে পাচ্ছো? আমি বলে যাচ্ছিলাম যে, হ্যাঁ, আর তিনি চলছিলেন। এক সময় বললাম : আওয়ায শোনা যাচ্ছেনা। তখন তিনি কান থেকে আংগুল সরিয়ে নিলেন এবং সওয়ারী জন্তু সড়কে ফিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন : আমি রসূল সা.-কে এক রাখালের বাঁশির আওয়ায শুনে এরূপ করতে দেখেছি।

গানবাজনা, বিশেষত: নারীকণ্ঠের গান হারাম হওয়ার উল্লেখ কুরআনে নেই –এ যুক্তি দুই কারণে অচল। প্রথমত ইসলামের ব্যাপারে আদেশ নিষেধের উৎস শুধু কুরআন একথা বলার অধিকার কোনো মুসলমানের আছে বলে আমরা স্বীকার করিনা। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভ। কিন্তু এর কোনো একটিরও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধিবিধান কুরআনে নেই। প্রত্যেকটির ব্যাপারে রসূল সা.-এর হাদিস অনুসন্ধান ও তা থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পানি পাওয়া গেলে সুস্থ মানুষের পক্ষে অযু করে পবিত্র হওয়া ছাড়া নামায পড়া শুধু নাজায়েযই নয় বরং কবীরা গুনাহ। কুরআনে অযুর প্রধান প্রধান বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কিসে কিসে অযু ভাঙ্গে, তার সব ক'টি উল্লেখ করা হয়নি। যে ব্যক্তি হাদিসকে ইসলামি বিধিবিধানের উৎস মনে করেনা, তার অযু, নামায বা তওয়াফ চলাকালে ভঙ্গ হলে এবং সেই অবস্থাতেই নামায বা তওয়াফ চালিয়ে

গেলে সে সওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা, আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে। ঠিক এরূপ পরিস্থিতি শরিয়তের আরো বহু বিধিতে দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কুরআনের অনুসরণের দাবিদার, সে শূকরের গোশত খাবেনা বটে। কিন্তু কুকুর বা পালিত গাধার গোশত খাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকবে বা খেতে রাজি হবেনা এমন কোনো কারণ নেই। কেননা এসব জন্তুর হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নয়, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়, এ যুক্তি এরূপ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, পবিত্র কুরআনে নাচ গান ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বাজনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়নি। নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এ ধরণের কথা বলা আজকাল রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তিই গভীর চিন্তাভাবনা ও খোদাভীতি সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করবে, সে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে শরিয়তে অধিকাংশ বিধির ব্যাপারে হাদিসে যেটুকু বর্ণিত হয়েছে, তার মূল তত্ত্ব কুরআনেও রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, কুরআনে যেটা সংক্ষেপে বা সাধারণ তত্ত্বকথার আকারে বলা হয়েছে, হাদিসে সেটা সবিস্তারে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন কুরআনের সূরা নূরে ৩১ নং আয়াতের প্রথমদিকে বলা হয়েছে :

"হে রসূল! মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেনো দৃষ্টি নীচু বা সংযত রাখে, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে এবং আপন রূপ জৌলুস প্রকাশ না করে, তবে আপনা আপনি যেটুকু বেরিয়ে পড়ে সেটুকুর কথা ভিন্ন। এরপর আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে :

"আর নারীরা মাটির উপর এরূপ জোরে জোরে পদাঘাত করতে করতে যেনো না চলে যার দরুন তাদের লুকানো সৌন্দর্য বা অলংকারাদি মানুষের গোচরে এসে যায়।"

এখন প্রশ্ন হলো, হাটাচলার সময় নারীর অলংকার, আর তাও গায়ের অলংকারের ঝংকার সৃষ্টি বা কর্ণগোচর হওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নারীর কণ্ঠের সুললিত সুর বাদ্যযন্ত্র সহকারে ধ্বনিত করা তার নাচা গাওয়া কুরআনের দৃষ্টিতে কিভাবে জায়েয হতে পারে? রসূল সা. সাহাবায়ে কিরাম এবং প্রাচীন থেকে আধুনিক মুসলিম মনীষীদের আমলে কখনো কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক আযান দেয়া, মসজিদে তাকবীর বলা এবং উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার কোনো নজির বা দৃষ্টান্ত নেই। তাহলে মুসলিম নারীর পক্ষে কোনো সমাবেশে, রেডিও বা টেলিভিশনে গানবাজনা করা এবং প্রেমের শিক্ষা দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে? সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে রসূল সা.-এর সহধর্মিনীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সকল মুসলিম মহিলার উপর তা প্রযোজ্য যে :

"তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তা হলে এমন কোমল স্বরে কথা বলোনা যাতে কোনো মানসিক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে লালসা জন্মে। তোমরা সরল স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।"

রসূল সা.-এর সহধর্মিনীদের জন্য যদি সাহাবাদের সাথে কোমল স্বরে কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে থাকে– অথচ তাঁরা উম্মুল মুমিনীন (তথা সমগ্র মুসলিম জাতির মাতা) এবং তারা বিধবা হওয়ার পর তাদের বিয়ে করা মুসলমানদের উপর চিরতরে হারাম, তাহলে বর্তমান সর্বব্যাপী গোমরাহী এবং চরম নৈতিক অধপতন ও অবনতির যুগে নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশে বেপর্দা হয়ে অবাধ মেলামেশা, নাচানাচি, ঢলাঢলি করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? ইমাম যদি নামাযে ভুল করে বসে, তবে পুরুষ মুক্তাদীকে সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহু আকবার বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলা মুক্তাদীকে হাতে তালি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর কোনো খোদাভীরু মুসলমান আজকালকার তথাকথিত বিচিত্রানুষ্ঠান বা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বৈধতার কথা কল্পনা করার ধৃষ্ঠতা কিভাবে দেখাতে পারে? সাংস্কৃতিক দল শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও পাঠানো এবং দেশে দেশে ঘুরানোর অভিরুচি কিভাবে হয় এবং এর দায়দায়িত্ব বহনের সাহস কিভাবে জন্মে?

উপসংহারের তাফহীমুল কুরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন মনে হচ্ছে :

"এটা একটু ভেবে দেখার ব্যাপার, যে দীন নারীকে পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময়ও লাস্যময় ও মোহনীয় পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দেয়না এবং তাকে পুরুষদের সামনে বিনা প্রয়োজনে শব্দ করতেও নিষেধ করে, সেই দীন কি কখনো এটা পছন্দ করতে পারে যে, নারীরা মঞ্চে এসে নাচবে, গাইবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপাবে, ঝাঁকাবে, ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করবে প্রীতি প্রণয় দেখাবে? রেডিওতে প্রেমের গান গাইবে, মিহি সূরে অশ্লীল বক্তব্য সম্বলিত সঙ্গীত শুনিয়ে যৌন আবেগে আগুন ধরাবে? নাট্যমঞ্চে নারীর কারো স্ত্রী বা প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করা কিংবা নারীকে বিমানবালা বানিয়ে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া, ক্লাবে, উৎসব অনুষ্ঠানে, মিশ্র সভাসমিতিতে নারীর সেজেগুজে আসা ও পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে কথাবার্তা বলা ও হাসি তামাশা করার অনুমতি কী করে ইসলাম দিতে পারে? এই সংস্কৃতি কোনো কুরআন থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে? আল্লাহ যে কুরআন নাযিল করেছেন, তাতো সবার চোখের সামনে রয়েছে। সেই কুরআনে যে ধরনের সংস্কৃতির অবকাশ কোথাও পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে সেই স্থানটা দেখিয়ে দেয়া হোক।" *[তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৪৭ শেষ অনুচ্ছেদ]।*

৫০. আবদুল্লাহ বিন উবাইর জানাযা

প্রশ্ন : সূরা তাওবার ৮৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

"ভবিষ্যতে এদের যে কেউ মারা যাক, তুমি কিছুতেই তার জানাযা পড়বেনা, তার কবরেও দাঁড়াবেনা। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি কুফরি করেছে এবং ফাসিক হয়ে মরেছে।"

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন :

"তবুক থেকে ফিরে আসার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা যায়। তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং কাফনের সাথে যুক্ত করার জন্য রসূল সা.-এর জামা চাইলেন। তিনি পরম মহানুভবতার সাথে তা দিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রসূল সা.-কে পিতার জানাযা পাড়াতেও অনুরোধ করলেন। রসূল সা. সে জন্যও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত ওমর অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি অমুক অমুক কাজ করেছিল, আপনি কি তার জানাযা পড়াবেন? কিন্তু তিনি এসব কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন এবং শত্রু ও বন্ধু সবার জন্য তিনি যে সর্বব্যাপী সহৃদয়তা ও মহানুভবতা পোষণ করতেন, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের এই নিকৃষ্টতম দুশমনের জন্যেও মাগফিরাতের দোয়া করতে কুণ্ঠিত হলেননা। অবশেষে তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়েই গেলেন, তৎক্ষণাত এই আয়াত নাযিল হলো এবং সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে নিবৃত্ত করা হলো। কেননা এসময় চিরস্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সমাজ ও সংগঠনে মুনাফিকদেরকে কিছুতেই টিকে থাকতে দেয়া হবেনা এবং মুনাফিকদের উৎসাহ বাড়ে এমন কোনো কাজ করা যাবেনা।"

তাফহীমুল কুরআনের তাফসির তো দেখলেন। কিন্তু মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানীর তাফসিরে বলা হয়েছে "রসূল সা. আব্দুল্লাহ বিন উবাইর জানাযাও পড়িয়েছিলেন, তাঁর মুখে নিজের পবিত্র লালাও দিয়েছিলেন এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করেছিলেন।"

অনুরূপভাবে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ স্বীয় তাফসির তরজমানুল কুরআনে লিখেছেন : "যখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা গেলো, তখন তার ছেলে কাফনের জন্য রসূল সা.-এর জামা চাইলেন ও জানাযা পড়ানোর আবেদন জানালেন। রসূল সা. তার আবেদন মঞ্জুর করেন।"

তবে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি যে, রসূল সা.শুধু আবেদন মঞ্জুর করলেন, না জানাযার নামাযও পড়ালেন। পক্ষান্তরে মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী লিখেছেন যে, তিনি জানাযা নামায পড়ান, নিজের পবিত্র লালা তার মুখে দেন এবং মাগফিরাতের দোয়াও করেন। আর মাওলানা মওদূদী বলেন, নামায পড়ানোর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে যান, কিন্তু আল্লাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশ দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করে রাখা হয়।

আমার জিজ্ঞেস, আসল ব্যাপারটা কি? রসূল সা. কি আব্দুল্লাহ বিন উবাইর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়াতে নিষেধ করা হয়? না কি, তাঁকে জানাযা পড়ানোর আগেই নিবৃত্ত করা হয় এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর জানাযা পড়াননি?

জবাব : সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ সনদ সম্বলিত হাদিসসমূহ থেকে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, রসূল সা. আব্দুল্লাহ বিন উবাইর জানাযা পড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁকে সূরা তাওবার ৮৪ নং আয়াতের মাধ্যমে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়াতে বারণ করা হয়। ফলে রসূল সা. পরবর্তীকালে আর কখনো এমন কোনো লোকের জানাযা নামায পড়াননি, যার মুনাফিক হওয়া একেবারেই স্পষ্ট ছিলো এবং তা রসূল সা.-এর জানা ছিলো। কিন্তু কিছু কিছু হাদিস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইর জানাযা পড়াননি। তিনি পড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ওহী দ্বারা তাঁকে নিষেধ করা হয়। যেসব হাদিসে রসূল সা. কর্তৃক জানাযা পড়ানোর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো বুখারি, মুসলিম ও অন্য ছয়টি সহীহ হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বুখারি ও মুসলিমের জানাযা অধ্যায়ে এ ধরণের একাধিক হাদিস রয়েছে। বুখারিতে 'জামা দ্বারা কাফন দেয়া।' শিরোনামে হযরত ইবনে ওমর বর্ণিত প্রথম হাদিসের বক্তব্য এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর ছেলে পিতা মারা যাওয়ার পর রসূল সা.-এর নিকট আবেদন জানালেন, "আপনার জামাটা দিন এবং জানাযা পড়িয়ে দিন।" তিনি রাজি হয়ে গেলে হযরত ওমর রা. বললেন "আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়াতে নিষেধ করেননি।" রসূল সা. বললেন "আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, পড়াতেও পারি, নাও পড়াতে পারি।" অবশেষে তিনি জানাযা পড়ালেন। পড়ানোর পর এ আয়াত নাযিল হয়।

কিন্তু এ অধ্যায়ে হযরত জাবির বর্ণিত অপর হাদিসটি এরূপ :

اتى النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابى بعد ما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقة والبسه قميصه

"আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি তার লাশ উঠালেন, তার উপর নিজের পবিত্র লালা দিলেন এবং নিজের জামাটি তার কাফনে জড়িয়ে দিলেন।"

এ হাদিসে রসূল সা. কর্তৃক জানাযা পড়ানোর উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচনা সাপেক্ষ। প্রতীয়মান হয় যে, রসূল সা.-এর পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় লাশ দাফন সম্পন্ন হয়, কিংবা কমেরপক্ষে তাকে কবরে নামানোর পর তিনি পৌঁছেন। জানাযা দাফনের আগেই হয়তো পড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে রসূল সা. তার পুত্র ও গোত্রের মনসন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য নিজের মুখের লালা ও জামা দিয়ে কৃতার্থ করেন। এটা ছিলো রসূল সা.-এর সর্বোচ্চ মানের মহানুভবতা ও ক্ষমার বহি:প্রকাশ। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে কখনো কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়াতে এমনকি তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া বা শোক প্রকাশ করতেও নিষেধ করে দেয়া হয়। হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ হযরত জাবিরের বর্ণিত এই হাদিস এবং অন্যান্য হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তারা বলেছেন, রসূল সা. যখন লাশ বের করে এমন অসাধারণ অনুকম্পার মনোভাব অবলম্বন করেছেন, তখন নামাযও হয়তো পড়িয়েছেন। কিন্তু হযরত জাবির এ কথার উল্লেখ করেননি। বস্তুত: রসূল সা.-এর আগমনের আগে যে দাফনক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল, সেটা জানাযা বাদ দিয়ে হওয়ার কথা নয়। কেননা জানাযা আগে হয় এবং দাফনের পালা পরে আসে।

দ্বিতীয় হাদিসটি হযরত আনাস থেকে বর্ণিত। এ হাদিস থেকে জানা যায়, সূরা তাওবার ৮৪ নং আয়াত জানাযা পড়ার আগেই নাযিল হয়ে গিয়েছিল এবং এর কারণে রসূল সা. জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকেন। 'মাজমায়ুয্ যাওয়াইদ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠায় 'মুনাফিকদের জানাযায় নিষেধাজ্ঞা' শিরোনামের অধীনে হাদিসটির বিবরণ এরূপ :

عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلى على عبد الله بن ابى فاخذ جبريل بثوبه فقال لا تصل على احد منهم ولا تقم على قبره- رواه ابو يعلى وفيه يزيد الرقاشى وفيه كلام وقد وثق -

"হযরত আনাস বিন মালিক জানান, রসূল সা. আব্দুল্লাহ বিন উবাইর জানাযা পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিবরীল তাঁকে থামালেন এবং এই ওহী শোনালেন 'ওদের কারো জানাযা পড়োনা এবং কারো কবরেও দাঁড়িওনা।' মুসনাদে আবু ইয়ালাতে এ হাদিস বর্ণিত। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন রয়েছেন ইয়াযীদ রাক্কাশী। কোনো কোনো হাদিসশাস্ত্রবিদ তাঁর সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।"

হাদিসটির বর্ণনাকারীদের সকলের নামসহ পুরো সনদ ইমাম ইবনে জারীর স্বীয় সূরা তাওবার তফসীরে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا ابواحمد قال حدثنا سلمة عن يزيد الرقاشي عن انس ان

হযরত জাবির থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি ইতিপূর্বে বুখারি শরিফ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি অল্পবিস্তর শাব্দিক পার্থক্যসহ মুসনাদে আহমদ এবং অন্যান্য হাদিসগ্রন্থেও লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সে সব গ্রন্থেও হযরত জাবির বলেননি যে, রসূল সা. জানাযা পড়িয়েছেন। মুসনাদে আহমাদ তৃতীয় খণ্ড, ৩৭১৬ পৃষ্ঠায় একটি বর্ণনা এরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে :

"আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা গেলে তার ছেলে রসূল সা.-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি যদি জানাযায় না আসেন, তবে সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর ব্যাপার হবে। তাই রসূল সা. উপস্থিত হলেন, কিন্তু ততোক্ষণে লাশ কবরে নামানো হয়ে গেছে। রসূল সা. বললেন : তোমরা দাফনের আগে আমাকে জানালে না কেন? অত:পর তিনি কবর থেকে লাশ বের করলেন, তার সমগ্র শরীরে নিজের লালা মেখে দিলেন এবং নিজের জামা পরিয়ে দিলেন।"

যাই হোক, রসূল সা. জানাযা হয়তো পড়াননি। হয়তো তিনি শুধু লালা ও জামা দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। এমনও হতে পারে যে, জানাযা পড়াবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু পড়ানোর আগেই ওহী নাযিল হয়ে যায়। এ সম্ভাবনার কথা আমরা আগেও বলেছি। তবে বিশুদ্ধতর হাদিসে জানাযা পড়ানোর উল্লেখ রয়েছে এবং তাতেও কোনো জটিলতা নেই। কেননা এ জানাযার আগে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছিল শুধু কাফের ও মুশরিকদের জন্য। মুনাফিকদের ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র। বাহ্যত তারা মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা মুসলমানদের মতোই ভোগ করতো। তাই রসূল সা.-কে অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষেধ না করা পর্যন্ত মুনাফিকদের জানাযা পড়া না পড়ার ব্যাপারে তিনি স্বাধীন ছিলেন।

তবে আসল লক্ষ্যণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়টি এখানে এই যে, মুনাফিকের জন্য আল্লাহর রসূলের মাগফিরাতের দোয়াও গ্রহণযোগ্য নয় এবং মুনাফিকের কবরে যদি আল্লাহর নবীর মুখের লালা এবং গায়ের জামাও রেখে দেয়া হয়, তবু এই বরকতময় জিনিস মুনাফিককে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবেনা। আল্লাহ প্রত্যেক কলেমা বলা মুসলমানকে শির্ক ও নিফাকের পংকিলতা থেকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ ও রসূল সা.-এর অনুগত্যের তাওফীক দিন। আমীন! *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৭৯]*

৫১. ইমাম ইবনে জারির তাবারি কি শিয়া ছিলেন?

প্রশ্ন সাইয়ারা ডাইজেষ্টের 'সাইয়েদ মওদূদী সংখ্যায়' সাবের কালওয়ারদী লিখিত 'সাইয়েদ মওদূদী ও ইকবাল' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধে মরহুম মাওলানার সাথে আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে জিলানী সাহেব এবং আপনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সাবের সাহেব মাওলানা মওদূদীকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন, তার মধ্যে একটি ছিলো এই যে, ইবনে জারির তাবারি কি শিয়া বা শিয়া মতের সমর্থক ছিলেন? মাওলানা এর জবাবে বলেন, এ রকম ধারণা করা ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি উদাহরণও দেন। কিন্তু সাবের সাহেব লিখেছেন "দু:খের বিষয়, এখন সেই উদাহরণগুলো আমার যথাযথভাবে মনে নেই।"

'খিলাফাত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের উপর আপত্তির পর্যালোচনা' নামক পুস্তকেও আপনি কথা প্রসঙ্গে ইবনে জারির তাবারির বিরুদ্ধে এ অভিযোগের উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো মহল তাঁকে শিয়া আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু আপনি তার জবাবে শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন যে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইবনে জারির যেসব কথা লিখেছেন তা অন্যান্য লেখক ও ঐতিহাসিকও লিখেছেন। কিন্তু এতোটুকু জবাব দ্বারা ইবনে জারিরের শিয়া মতাবলম্বী বা তার সমর্থক হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ পুরোপুরি খণ্ডিত হয়না। আপনি যদি ঐ বৈঠকে উপস্থিত থেকে থাকেন এবং মাওলানা যা বলেছিলেন তা আপনার মনে থেকে থাকে, তাহলে তার বিস্তারিত বিবরণ অথবা অন্ততপক্ষে সংক্ষিপ্তসার তরজমানুল কুরআনে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কেননা এ অভিযোগ এখনো কোনো কোনো মহলে পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে।

জবাব : মাওলানা মওদূদী রহ.-এর যে আলাপ আলোচনার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা এখন আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত নেই। আমার স্মৃতি শক্তি রোগজনিত কারণে আগেই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি মাওলানার ইন্তিকালের শোক আমার স্মরণশক্তিকে একেবারেই খতম করে দিয়েছে। সত্য বলতে কি, তাঁর তিরোধান আমার উপর প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি মনে করি, 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' পুস্তকের পরিশিষ্টে উৎস নির্দেশিকা শিরোনামের অধীন ইবনে জারির তাবারি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা যথেষ্ট এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যে সমৃদ্ধ। এ অংশটা আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানিনা। সেখানে ইমাম ইবনে জারির সম্পর্কে বিভিন্ন সুন্নি ইমামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। টীকায় এ তথ্যও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইবনে জারির নামের একজন শিয়া গ্রন্থকারও ছিলেন এবং মুসলিম বিদ্বানদের জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পৃথকভাবে লিখেছেন। আমি যখন তরজমানুল

কুরআনে ইবনে জারির তাবারির বিরুদ্ধে কথিত শিয়াপন্থী হওয়ার অভিযোগ উল্লেখ করেছিলাম, তখন জনৈক ভারতীয় আলেম (যিনি তখন লিবিয়ায় বসবাস করতেন এবং তাঁর নাম আমার এখন মনে নেই) এই অভিযোগের জবাবে একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ 'ফারান' পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। আরো বহু বিজ্ঞ আলেম এ অভিযোগ খণ্ডন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, ইবনে জারির তাবারি শিয়া ছিলেননা বরং তিনি ছিলেন তাফসির, ইতিহাস, ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজন উঁচুদরের সুন্নি ইমাম। এতদসত্ত্বেও আমি নমুনাস্বরূপ ইবনে জারির সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির ও স্বয়ং তাবারির কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকবৃন্দের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করছি!

তফসীরে ইবনে জারিরের ১৩২৩ হিজরীতে প্রকাশিত মিসরীয় সংস্করণের ভূমিকায় 'আল ইতাকান' থেকে আল্লামা জালালুদ্দীন সায়ুতীর অভিমত তুলে ধরা হয়েছে যে :

"ইবনে জারির তাবারির তাফসির সবচেয়ে উন্নতমানের ও সবচেয়ে মর্যাদাবান তাফসির। তাতে বিভিন্ন মতামতের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার পর একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং আয়াতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দান ও তা থেকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান প্রণয়ন করা হয়। এদিক থেকে এটি সকল প্রাচীন তফসীরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম মহিউদ্দীন নবীব বলেন "মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদী সম্মত মত হলো, তফসীরে তাবারীর মতো কোনো গ্রন্থ এখন পর্যন্ত লিখিত হয়নি।"

ইমাম আবু হামেদ ইস্ফারাইনী লিখেছেন "শুধুমাত্র তাফসিরে ইবনে জারির সংগ্রহ করতে কাউকে যদি চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হয়, তবে সেটা তেমন গুরুতর ব্যাপার হবেনা।"

এবার খোদ ইমাম ইবনে জারির তাবারির তাফসির থেকে দু'একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। স্বীয় তাফসিরের শুরুতেই সূরা ফাতিহার আয়াত اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -এ দেখুন যে তিনি 'সিরাতুল মুস্তাকীম' শব্দের ব্যাখ্যা কিভাবে করেন। প্রথমত, তিনি এই বক্তব্যকেই অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করেন যে, সিরাতুল মুস্তাকীম বলে পার্থিব জীবন যাপনের সোজা ও সঠিক পথই বুঝানো হয়েছে। এর পর তিনি বলেন :

"আমার দৃষ্টিতে আয়াত اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক ব্যাখ্যা হলো, এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই কথা ও আচরণ অব্যাহত রাখার ক্ষমতা দাও, যা তোমার মনোনীত, যার তাওফীক তুমি তোমার অনুগৃহীত বান্দাহদেরকে দিয়েছ। এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম। কেননা

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীগণ, সিদ্দীকগণ (নবী সা.-কে সর্বান্তকরণে, শর্তহীনভাবে ও অবিচলভাবে সমর্থন দানকারী) ও শহীদগণকে যে কাজের তাওফীক দেয়া হয়েছে, সেই কাজের তাওফীক অন্য যে ব্যক্তিই লাভ করেছে, সে অন্য কথায়, ইসলাম গ্রহণ, নবীদেরকে সমর্থন, আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহ যার আদেশ করেছেন তা করা ও যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, সে নবী সা.-এর নীতি, আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী রা. এবং প্রত্যেক পুণ্যবান ও সৎ লোকের নীতি অনুসরণের সুযোগ পেয়েছে। বস্তুত এ সবই সিরাতুল মুস্তাকীমের অন্তর্ভুক্ত।"

এর কিছু পরে তিনি পূর্ণ সনদ সহকারে আসেমের মাধ্যমে আবুল আলিয়া[১] থেকে সিরাতুল মুস্তাকীমের তাফসির নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছেন :

"আসেম জানান, আবুল আলিয়া বলেছেন সোজা ও সঠিক পথের অনুসারী যে ব্যক্তিবর্গের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে তারা হচ্ছেন রসূল সা. এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর দুই সহচর হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. আসেম আরো বলেন, আমি যখন আবুল আলিয়ার এই উক্তি হযরত হাসান বসরীর নিকট বিবৃত করি, তখন তিনি বলেন : আবুল আলিয়া সত্য কথাই বলেছেন এবং প্রকৃত হীতাকাঙ্ক্ষীর মতোই কথা বলেছেন।"

এখন প্রশ্ন হলো, শিয়া মতবাদের প্রতি যার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক থাকে, সে কি নিজের তফসীরের সূচনা এভাবে করতে পারে? সিরাতুল মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ইবনে জারির যা লিখেছেন, তাতে কি প্রাচীন সুন্নি ইমামগণের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চুল পরিমাণও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? ইবনে জারির সুস্পষ্ট ভাষায় খোলাফায়ে রাশেদীনকে রসূল সা.-এর সহচরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদদের দলভুক্ত করেছেন। তাছাড়া সুন্নি মুসলমানদের কাছে স্বীকৃত ও প্রচলিত ধারাক্রম অনুসারেই চার খলিফার নাম উল্লেখ করেছেন এবং হযরত আলীর উল্লেখ সবার শেষে করেছেন। যে ব্যক্তি এই আকীদা ও মতবাদের অনুসারী, তার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় যখন সে সঠিক পথের সন্ধান চাইবে, তখন তার মনমস্তিষ্কে রসূল সা.-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনেরই নীতি ও আদর্শ এবং তাঁদেরই সুন্নতের ছবি ভাসতে থাকবে। এমন ব্যক্তিও যদি শিয়া হয়, তাহলে সুন্নির সংজ্ঞা কি এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে আমি জানিনা।

---

১. আবুল আলিয়া বিন মাহরান এবং আসেম বিন সুলায়মান উভয়ে বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং উভয়ের সততা ও বিশ্বস্ততা তর্কাতীত।

এরপর যে বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকে তা হলো, ইবনে জারিরের তাফসির ও ইতিহাসের কিছু বক্তব্য বিতর্কিত। এ সম্পর্কে আমাদের কথা, আমরা কখনো তাঁকে নিষ্পাপ ইমাম বলিনি এবং তার প্রতিটি কথা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে এমন মতও ব্যক্ত করিনি। ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থে বাছাই করা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। তথাপি তাঁর গ্রন্থাবলীতেও কি প্রতিটি বক্তব্য গ্রহণযোগ্য? আমাদের প্রাচীন মনীষীগণের চিন্তা-গবেষণালব্ধ যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার সম্পর্কে আমাদেরকে خذ ما صفى ودع ما كدر "যা সঠিক তা গ্রহণ করো এবং যা ত্রুটিপূর্ণ তা বর্জন করো।" এই নীতি অবলম্বন করতে হবে। যে জিনিস আল্লাহর কিতাব ও রসূলের প্রামাণ্য সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিশীল, তা নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য আর যা সঙ্গতিশীল নয় তা বর্জনীয়। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৮০]*

৫২. ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আপোস নিষ্পত্তির অধিকার

প্রশ্ন : প্রচলিত আইনগত পরিভাষা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ সাধারণত দেওয়ানী ও ফৌজদারি এই দুই ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানী মোকদ্দমা সমূহে সাধারণত আর্থিক জরিমানা বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর ফৌজদারি মোকদ্দামায় উক্ত দুই ধরণের দণ্ড ছাড়াও গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ইসলামি আইনের পরিভাষায় 'হুদুদ ও কিসাস' সংক্রান্ত মামলা ফৌজদারি শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসেনা। এই শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি ফৌজদারি অপরাধ সরকারি হস্তক্ষেপযোগ্য কিনা এবং মামলা দায়ের হওয়ার পর প্রতিটি ফৌজদারি মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তিযোগ্য কিনা? অনেকে বলেন, এ জাতীয় প্রত্যেক মামলাতেই সেই দুই পক্ষের ঐকমত্যে আপোসে মীমাংসা করা যায়। খুনের মামলায় খুনি ও নিহতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আপোস করা চলে। তবে এ মামলায় বাদী ও কিসাস আদায় করার অধিকারী কে? বাদী ও বিবাদী যদি আপোস ও সমঝোতা করে নেয় তাহলে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কি রাষ্ট্র বা সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনা? যদি না পারে, তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে হত্যাকাণ্ড বিচার থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং বিত্তশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী মজলুমের মুখ বন্ধ করতে পারবে। যেসব উত্তরাধিকারী খুনের বদলা দাবি করার হকদার তাদের কোনো নির্দিষ্ট তালিকা আছে কি না, যে কোনো আত্মীয় বা পরিবারের যে কোনো সদস্য কি এর অধিকার রাখে?

জবাব : ইসলামি আইন অনুসারে কোনো কোনো ফৌজদারি অপরাধ এমন আছে, যাতে আসামীর বিরুদ্ধে সরকার বা প্রত্যেক নাগরিক বাদী বা মামলার পক্ষ হয়ে মামলা দায়ের করতে পারে। যেমন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও ব্যভিচার। এগুলোকে 'হুদুদ' সংক্রান্ত অপরাধ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোতে

আপোস মীমাংসার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, কতোক অপরাধ এমনও রয়েছে, যাতে নির্যাতিত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বাদী হতে পারে। আর ক্ষতিগ্রস্ত বা নির্যাতিত ব্যক্তি যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে শুধু তার অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীই বাদী হতে পারে। তবে কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে শাসক ও বিচারক তার অভিভাবক হবে। এছাড়া অন্য কেউ বাদী হতে পারেনা। এসব অপরাধকে 'কিসাস' সংক্রান্ত অপরাধ বলা হয়। হত্যার অপরাধও কিসাস সংক্রান্ত অপরাধ। এটি হুদুদের অপরাধ নয়। সূরা বনী ইসরাইলের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا ـ

"ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত কাউকে হত্যা করোনা। যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার অভিভাবককে কিসাস দাবি করার অধিকার দিয়েছি।"

এখানে কুরআনে অভিভাবকের অধিকার বুঝাতে সুলতান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীকৃত বা প্রদত্ত ক্ষমতা (Locus standi) যার বলে সে কিসাসের দাবি জানাতে পারে। আল্লাহর এই উক্তি থেকে ইসলামি আইনের এই মৌল তত্ত্ব উদগত হয় যে, খুনের মামলায় আসল বাদী সরকার নয় নিহতের অভিভাবক। আর নিহতের অভিভাবক বলতে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে যারা নিহতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায় তাদেরকেই বুঝায়।

ইমাম কাসানী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'আলবাদায়ে ওয়াস্ সানায়ে' এর ৭ম খণ্ডে

بيان من يستحق القصاص

"কিসাস বা খুনের বদলা চাওয়ার অধিকারী কে কে" শিরোনামে বলেন :

"নিহত ব্যক্তির হয় উত্তরাধিকারী থাকবে, না হয় থাকবে না। যদি তার উত্তরাধিকারী থেকে থাকে, তাহলে সেই উত্তরাধিকারী কিসাস দাবি করার হকদার, ঠিক যেমন সে সম্পত্তির হকদার। উত্তরাধিকারীই নিহত ব্যক্তির প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারী নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে খুনের বদলা ও ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে বাদী হয়ে থাকে।"

এই মৌল বিধান ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থেও লেখা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হিদায়ার হত্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

"উত্তরাধিকার যেভাবে অর্জন করা যায় কিসাসও সেইভাবে আদায় করতে হয়। উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তার পরিত্যাক্ত সম্পদের প্রাপ্য অংশ ও ঋণ যেভাবে পায়, কিসাসও সেভাবেই পাবে। কেননা কিসাস হচ্ছে প্রাণের বদলা। অন্যান্য আর্থিক প্রাপ্য ও রক্তপণে মালিকানা ও অধিকার যার প্রাপ্য, কিসাসেও মালিকানা ও অধিকার তারই প্রাপ্য হবে।"

হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ইনায়া'তে এবং অপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল ক্বাদীরে' উপরোক্ত মৌল বিধান উল্লেখ করার পর আরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে : "ইমাম আবু হানিফার মতে মূল তত্ত্ব এই যে, কিসাস আদায় করা উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারাধীন।"

ইমাম আবু হানিফার দুই শিষ্য ও সহচর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের যুক্তি ফাতহুল ক্বাদীরে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে :

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে কিসাস আদায় করা প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা নির্যাতিত ব্যক্তির স্বত:সিদ্ধ অধিকার। (সে জীবিত থাকলে নিজেই আদায় করবে, যেমন কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তার কিসাস বা ক্ষতিপূরণ অর্জন করবে, আর মারা গিয়ে থাকলে) এ অধিকার সর্বোতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরাধিকারীর প্রতি হস্তান্তরিত হবে, ঠিক যেমন মৃত ব্যক্তির অন্যান্য সহায়সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়ে থাকে।"

ইসলামি শরিয়তের আরো একটি বিধান এই যে, দায়িত্বশীল পর্যায়ে লোকদের ভুলত্রুটি হলে তাদের অধিকতর কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয় এবং সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের সাথে নম্র ও সদয় আচরণের পরিবর্তে অধিকতর কঠোর আচরণ করা হয়। সূরা আহযাবের ৩০ নম্বর আয়াতে উম্মুল মুমিনীনদেরকে বলা হয়েছে :

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ .

"হে নবী সহধর্মিনীগণ তোমাদের কেউ কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।"

এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের দ্বারা এ ধরণের কিছু ঘটার আশংকা ছিলো। বরং এ কথার উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা যে, ইসলামি সমাজে তাদের মর্যাদা যতো উচুঁ, সে অনুপাতে তাদের দায়িত্ব ততোই কঠোর। হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আলবাহরুর বায়েকের' বরাত দিয়ে মাওলানা আব্দুস শাকুর লাখনোভী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ 'ইলমুল ফিকাহ'র তৃতীয় খণ্ডে 'রোযার কাযা ও কাফফারা' শিরোনামে লিখেছেন :

"কোনো রাজার উপর কাফফারা ওয়াজিব হলে তাকে দাসমুক্ত করা বা ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানোর নির্দেশ দেয়া উচিত নয়। কারণ এটা তার পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়। এতে তার কোনো শিক্ষা হবেনা। তাকে বরং ৬০টি রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া উচিত। এটা তার জন্য কঠিন কাজ হবে এবং এতে হয়তো পরবর্তী রমযানের রোযা এভাবে নষ্ট করবেনা।"

শাস্তিদানের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারেরও বিশেষ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান আলজাযরী স্বীয় গ্রন্থ 'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়ার' ৫ম খণ্ডে ২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট অনুভব করে যে তাকে মাফ করলে জননিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশংকা রয়েছে, তাহলে তিনি ঐ ক্ষমার পরেও হত্যাকারীকে যে শাস্তি দিতে চান দিতে পারেন।"

এখন উল্লেখিত বিধানের আলোকে ইসলামি আদালতে গৃহীত কার্যক্রমের একটি দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করুন।

গুজরাটের শাসনকর্তা প্রথম আহমাদ শাহর (মৃত্যু ১৪৩২ খৃস্টাব্দ) জামাতা তারুণ্য ও রাজকীয় আত্মীয়তার সুবাদে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের বশে এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করে। সুলতান প্রথম আহমাদ শাহ যখন ঘটনা জানতে পারলেন, তখন স্বীয় জামাতাকে বেঁধে কাযীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। কাযী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে দুশো উট দিয়ে আপোস করিয়ে জামাতাকে সুলতানের কাছে হাজির করলেন। সুলতান বললেন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করতে রাজি হয়ে গেলেও আমি স্বয়ং এটা মানতে রাজি নই। কারণ এভাবে বিত্তশালী লোকেরা অবৈধ হত্যাকাণ্ডে দু:সাহসী হয়ে উঠবে। অবশেষে সুলতানের জামাতাকে হত্যা করা হয়। সুলতানের আদেশে তার লাশ একদিন ফাঁসিতে ঝুলতে থাকে, যাতে জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করে। (মিরয়াতে সেকেন্দারী, পৃ. ৪৫-৪৬ ও 'হিন্দুস্থান কে আহদে রফতা সাচ্চি কাহানিয়া' উপমহাদেশের অতীত যুগের সত্য ঘটনাবলী আযম গড় থেকে মুদ্রিত, পৃ. ১৫৫) *[তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০]*

৫৩. ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে অভিযোগ

প্রশ্ন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগের একজন ছাত্র। মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আন্দোলনের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি। অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের জনৈক অধ্যাপক সম্প্রতি মন্তব্য করেন, ভূমি এতো ছোট টুকরোয় বিভক্ত হওয়া উচিত নয়। এতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তা অলাভজনক (uneconomic) হয়ে যায়। এরপর আলোচনা ইসলামের দিকে মোড় নেয় এবং তিনি বলেন, ইসলামের উত্তরাধিকার আইনও ভূমির খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অভিযোগের কোনো সন্তোষজনক জবাব তৎক্ষণিকভাবে আমার মাথায় আসেনি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক বুঝিয়ে দিন, এই যুক্তি ও অভিযোগ কতোখানি সঠিক এবং তা কিভাবে নিরসন করা যায়? কেউ কেউ যুক্তি দেখান, এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমি এবং উৎপাদনের উৎসকে ব্যক্তিমালিকানা থেকে সরিয়ে নিয়ে গোটা সমাজের মালিকানায় অর্পণ করা হয়। আমি যদিও ইসলামি আকীদা বিশ্বাসে অটল এবং ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ ও বিধানকে নির্বিবাদে সমর্থন করি, তথাপি মনের তৃপ্তি এবং আপত্তি উত্থাপনকারী ও বিরোধিতাকারী মহলের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে অধিকতর নির্দেশনা ও নিশ্চয়তা কামনা করি।

জবাব : আপনার চিঠি পড়ে খুবই অবাক হলাম। প্রথমত, এ জন্য অবাক হলাম যে, ইসলাম বিরোধী মহলের আপত্তি অভিযোগ কতো সহজে আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করে। দ্বিতীয়ত, এ জন্য যে, এ ধরণের আপত্তি ও অভিযোগের কোনো সঠিক ও সমুচিত জবাব দেয়া হয়না। অথচ একজন মুসলমান সামান্য একটু চিন্তা করলে নিজে নিজেই এর জবাব খুঁজে পেতে পারে এবং অন্যদেরকেও দিতে পারে।

আলোচ্য অভিযোগটাই ধরা যাক। বলা হচ্ছে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন ভূমিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে করতে এতো ছোট করে ফেলে যে, অভিযোগকারীদের ভাষায় তা অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রথম জবাব এই যে, পৃথিবীতে যেখানেই একজন মানুষের বৈধ উপায়ে ভূমি কিংবা অন্যান্য উৎপাদনের উৎসের মালিক হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হবে, সেখানে এই মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি থেকেই আপনা আপনি এ কথাও প্রমাণিত হবে যে, সে নিজের মালিকানাধীন সম্পত্তির যতোটুকু আপন জীবদ্দশায় বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারে। আর মৃত্যুর পর ওসীয়ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে তার সম্পত্তি এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তরিত হতে পারে। এটা মেনে নেয়া না হলে এমন নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে যে, কারো কাছে যতোখানি ভূমি বা সম্পত্তি থাক, তা পুরোপুরিভাবে অন্যের নিকট হস্তান্তরিত হতে হবে। কোনো রকম খন্ডিত হওয়া চলবেনা। নচেত এভাবে খণ্ডিত হতে হতে এক সময় তার পরিমাণ এতো কম হয়ে যাবে যে, এইসব অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের মতানুসারে তা অলাভজনকে (uneconomic) পরিণত হবে।

অন্যকথায় এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অলাভজনক হওয়ার কল্পিত আশংকা থেকে নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির ব্যবহার ও হস্তান্তরের অধিকার সীমিত রাখতে হবে এবং উত্তরাধিকারের প্রচলিত ধারা বদলে দিতে হবে। যার কাছে দশ একর জমি আছে, সে তা বিক্রি করতে বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে চাইলে পুরো জমিটাই হস্তান্তর করতে হবে। আর সে মারা গেলে তার স্ত্রী ও একাধিক সন্তান থাকলেও তাদের কোনো একজনকেই উত্তরাধিকার দিতে হবে এবং বাদবাকী সবাইকে বঞ্চিত করতে হবে। অন্যথায় একাধিক পুত্র থাকলে এবং তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন করা হলে পুনরায় সেই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পাশ্চাত্য সমাজে দীর্ঘকাল ধরে এবং কোথাও কোথাও এখনো প্রথম সন্তানের উত্তরাধিকার লাভের আইন (Law of phimo Beniture) চালু আছে। এ আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে বাদবাকী সবাইকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের দৃষ্টিতে ন্যায়নীতি, সাম্য, ধর্ম ও নৈতিকতার দাবি যেনো এটাই যে, সমান সমান অংশের হকদারদের মধ্যে থেকে কেবল একজনকে গোটা সম্পত্তি দিয়ে

দেয়া হবে আর অন্যদেরকে শুধু এ জন্য বঞ্চিত রাখা হবে, যেনো সম্পত্তি ক্রমান্বয়ে ভাগ হতে না থাকে।

এর বিকল্প আর একটা সমাধান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সেটি হলো, জাতীয় মালিকানার প্রতারণাপূর্ণ ধুয়া তুলে প্রতিটি মানুষের মালিকানা হরণ করার চেষ্টা করা হয় এবং জাতির কতিপয় পরাক্রমশালী ব্যক্তির হাতে সমগ্র জাতির যাবতীয় সম্পদ ও উপায় উপকরণ দিয়ে দেয়া হয়। এটা কি সত্য নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের কৃষক শ্রমিকের অবস্থা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মেহনতী মানুষের তুলনায় বহুগুণ বেশি শোচনীয়। লাখ লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে ও জেল জুলুমের শিকার করা হয়েছে। কৃষি খামারগুলোতে কর্মরত শ্রমিকরা নিজেরা না খেয়ে মরলেও যে পরিমাণ ফসল উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে হাজির করতে বলা হয়, তা ঠিকমতই হাজির করা হয়। কখনো কখনো যৌথ খামারে কর্মরত মায়েদের শিশু সন্তান পর্যন্ত পুরো খোরাক পায়না। এটা কেবল পুঁজিবাদের অভিযোগ নয়, সারা দুনিয়ায় প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক পুস্তকাদিতেও এসব বাস্তব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর ইসলামি কিংবা অন্য কোনো উত্তরাধিকার আইনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার সোজা ও সহজ জবাব হলো, এ সম্পত্তি বিভাজ্য নয় কিংবা ভাগ করলে লাভজনক হয়না, তাকে তার মালিকগণ যৌথ মালিকানায় বহাল রেখেও লাভবান হতে পারে। দশ একর জমিতে দশজন মালিকের সত্ত্ব অক্ষুন্ন রেখেও তাকে কাজে লাগানো যায়। জমিকে খণ্ডবিখণ্ড না করে তার ফসল ভাগ করে নেয়া যায়। একজন উত্তরাধিকারী ইচ্ছে করলে নিজের অংশ বিক্রি করে দিতে পারে এবং অপর ব্যক্তি তা কিনে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে সকলে মিলে গোটা জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়ে মূল্য পরস্পরে বন্টন করে নিতে পারে। এই কর্মপন্থা ঘরোয়া সম্পত্তি, বাড়ি, দোকান, বাণিজ্য পণ্য, এক কথায় সব রকমের সম্পত্তির বেলায় অবলম্বন করা চলে।

বহু কারখানা ও যৌথ ব্যবসা সংস্থা এমন রয়েছে যাতে ব্যক্তি মালিকানা ও উত্তরাধিকারের সকল নীতি বজায় রাখা হয়, অথচ এসব সংস্থা তার নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে পুরুষানুক্রমিকভাবে টিকে থাকে। সমবায় খামার সমবায় নীতির ভিত্তিতে একাধিক মালিক নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে সম্মিলিতভাবে লাভবান হতে পারেন।

উত্তরাধিকারের অর্থ এটা নয় যে, সম্পত্তির খণ্ডিত বন্টন হতেই হবে। এর অর্থ শুধু এই যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশ স্বীকৃত ও সংরক্ষিত থাকা চাই। একাধিক মালিক বা উত্তরাধিকারী ইচ্ছে করলে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বড় বড় ভূ-সম্পত্তিকে একত্রে যৌথ পরিচালনাধীন রেখে তা থেকে সব রকমের ফসলাদি লাভ করতে পারে।

৫৪. শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াকফের সংজ্ঞা ও বিধান

প্রশ্ন : ওয়াকফ সম্পর্কে একটা প্রশ্নপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছিল। মূল প্রশ্নপত্রটি এই মুহূর্তে পাওয়া গেলনা। তবে তার জবাবের কপি নথিবদ্ধ রয়েছে। এই জবাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ ছিলো :

১. ওয়াকফের শরিয়তসম্মত সংজ্ঞা কি?

২. মুসলিম আলেমগণ এর জন্য কি কি নিয়ম ও বিধি রচনা করেছেন?

৩. কোনো ভূসম্পত্তি বা তার উৎপন্ন ফসল পুরোপুরি বা আংশিকভাবে আল্লাহর পথে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়িত হতে থাকলেই ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে ওয়াকফ করার পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকলেও কি তা আপনা আপনি ওয়াকফ সম্পত্তিতে পরিণত হবে?

৪. কারো মালিকানাধীন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিকে জোরপূর্বক ওয়াকফ সম্পত্তিতে পরিণত করা বা জবরদখল করা সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা কি বৈধ? ইসলামে কি কোনো ব্যক্তি বা সরকারের এ ধরণের অধিকার আছে?

জবাব : ওয়াকফ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের একটা বিশেষ পরিভাষা। কোনো সম্পত্তির মালিক নিজ সম্পত্তিকে নিজের মালিকানা বহির্ভূত করে আল্লাহর সম্পত্তি ঘোষণা করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জনকল্যাণ বা জনসেবার খাতিরে উৎসর্গ করলে সেই উৎসর্গ করার কাজটিকে ওয়াকফ বলা হয়। এ ধরণের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সব সময় তার আসল অবস্থায় বহাল থাকে। এ সম্পত্তি অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। ওয়াকফকারী যে যে খাত বা ব্যক্তিবর্গকে উপযুক্ত বলে স্থির করবে, সেই খাতে বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এর আয় বা উৎপন্ন দ্রব্য ব্যয়িত বা বন্টিত হতে থাকবে। একাধিক হাদিসে ওয়াকফ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্য থেকে একটা অতি প্রামাণ্য হাদিস এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। বুখারি শরিফে ওয়াকফের শর্তাবলী শিরোনামে একটি হাদিস রয়েছে, যার ভাষান্তর নিম্নরূপ :

"খায়বার বিজয়ের পর যখন হযরত ওমর কিছু জমি পেলেন, তখন সে সম্পর্কে পরামর্শ নেয়ার জন্য তিনি রসূল সা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমি খায়বারে কিছু জমি পেয়েছি। অমন ভালো জমি আমার আর নেই। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিতে চান? রসূল সা. বললেন : যদি ইচ্ছে হয়, আসল সম্পত্তি (জমি) ওয়াকফ করে দাও, আর তার ফসল সদকা করে দাও। হযরত ওমর তা ওয়াকফ করে দিলেন। কেননা মূল সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয় করা, দান ও উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর অবৈধ। لا يباع ولا يوهب ولا يورث এর উৎপন্ন ফসল, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর পথের পথিক ও বিদেশী অতিথিদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। যে ব্যক্তি এ জমির তদারকী ও তত্ত্বাবধানের

দায়িত্বে থাকবে, সে নিজের ভরণপোষণের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, ততোটুকু এ থেকে নিতে পারে। তবে এ দ্বারা বিত্তশালী হবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

সহীহ বুখারিতে ওয়াকফের শর্তাবলীর পরেই রয়েছে ওসীয়ত সংক্রান্ত অধ্যায়। সেখানে নিম্নোক্ত হাদিস বর্ণিত রয়েছে :

"হযরত ওমর রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় নিজের একটি বাগান সদকায়ে জারিয়া হিসেবে ওয়াকফ করেন। তিনি রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি একটি উৎকৃষ্ট জমি পেয়েছি। এই জমি সদকা করতে চাই। রসূল সা. বললেন জমিটি ওয়াকফ করে দাও। এটি বিক্রি বা দান করা চলবেনা, উত্তরাধিকার সূত্রেও হস্তান্তরিত হবেনা। (এ হাদিসে অবিকল পূর্ববর্তী হাদিসের لا يباع ولا يوهب ولا يورث শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে)। তবে তার ফলমূল সদকা করা হবে। হযরত ওমর রা. বাগানটি সদকা করে দিলেন এবং এর উৎপন্ন ফলমূল আল্লাহর পথে, দাসদের মুক্তিতে, মিসকীন, অতিথি, পথিক ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করা হতো।"

মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতেও একই বক্তব্য সম্বলিত একাধিক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। এসব হাদিস থেকে ওয়াকফ সংক্রান্ত যেসব মৌলিক নীতি ও বিধি রচিত হয় এবং যার ব্যাপারে সকল মুসলিম আলেম ও ফেকাহবিদ একমত, তা নিম্নরূপ :

১. কোনো জমিকে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করা নিরংকুশভাবে একমাত্র জমির মালিকের এখতিয়ারাধীন। অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের ক্ষমতা নেই যে অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়। রসূল সা. শুধু আল্লাহর রসূলই ছিলেননা, বরং মুসলমানদের নেতা এবং শাসকও ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর যে জমি নিজেই ওয়াকফ করতে চাইলেন, তাও তিনি নিজের দখলে নেয়ার পরিবর্তে হযরত ওমরকেই এখতিয়ার দিলেন যে, তুমি ইচ্ছে করলে তা ওয়াকফ করে দাও এবং তার ফসল দরিদ্র প্রভৃতির মধ্যে বন্টন করে দিও।

২. ওয়াকফকারী যে সম্পত্তি স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে ওয়াকফ করে দেবে, সেই মূল সম্পত্তিটা যেমন ছিলো, তেমনই থাকবে এবং অন্যান্য সম্পত্তিকে যেমন ক্রয় বিক্রয়, দান, উত্তরাধিকার বা বিনিময় সূত্রে হস্তান্তর করা চলে, ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে তা চলবেনা।

৩. যে জমি কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকবে, তা ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আপন মালিকানা থেকে বের করে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া না যায়, বরং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত জমিতে ঐ ব্যক্তির পূর্ণ স্বত্বাধিকার রয়েছে, সে তা ভোগ ও প্রয়োগ করছে এবং এই স্বত্বাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনো বৈধসূত্রে অন্যদের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তরিতও হচ্ছে, তাহলে

সেই সম্পত্তিকে কেউ কোনো অজুহাতে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করতে পারেনা। উপরোল্লিখিত হাদিসগুলোতে ওয়াকফের যেসব উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, সেই সব উদ্দেশ্যে জমির উৎপন্ন ফসল সার্বিক অথবা আংশিকভাবে ব্যয়িত হলেও তা ওয়াকফ বলে গণ্য হবেনা, কিংবা কোনো সরকার বা সরকার নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা নিজেও ইচ্ছেমত বা নিজের সুবিবেচনা অনুসারে তাকে তার মালিকের স্বত্বাধিকার থেকে বের করে নিজের দখলে নিতে পারবেনা।

৪. ওয়াকফ সম্পত্তির বৈধভাবে ওয়াকফ সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া বা ওয়াকফ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য সেটি কার্যত ওয়াকফকারীর বৈধ মালিকানাধীন থাকা জরুরি। ফিকাহবিদগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, মালিকানা স্বত্ব অর্জনের আগেই যদি কেউ সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয় এবং মালিকানা পরে অর্জিত হয়, অথবা সম্পত্তিকে যদি সে জোরপূর্বক দখল করে এবং তা ওয়াকফ করে দেয়, চাই তার মূল্য মালিককে দিয়ে দিক কিংবা তার সাথে আপোস করে নিক, তাহলেও সেই জবরদখলকারী বা জবরদখলের পরে ক্রয় বিক্রয়কারীর পক্ষে ঐ সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ হবেনা এবং ওয়াকফ শুদ্ধ হবেনা। কেননা ওয়াকফ ঘোষণার সময় সে ঐ সম্পত্তির বৈধ মালিক ছিলনা।

প্রামাণ্য ফিকাহ গ্রন্থাবলী থেকেও উল্লিখিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর ওয়াকফ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফার মতে শরিয়তে ওয়াকফের সংজ্ঞা এই যে, ওয়াকফকারী মূল ওয়াকফ সম্পত্তিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখবে এবং তার লব্ধ সম্পদ বা উপকারিতাকে দরিদ্র লোকদের মধ্যে সদকা করে দেবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে সংজ্ঞা হলো, ওয়াকফকারী মূল সম্পত্তিকে আল্লাহর মালিকানায় হস্তান্তরিত ঘোষণা করার পর নিজের কাছে রাখবে এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে তা থেকে উপকৃত হবার সুযোগ দেবে। এটা করলেই ওয়াকফ শুদ্ধ হবে এবং সকলের জন্য তা মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক হবে। এ জিনিস বিক্রি হবেনা, দান করা যাবেনা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রেও হস্তান্তর করা চলবেনা।

ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে ওয়াকফ শুদ্ধ হবার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা রয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াকফকারীর বিবেকবুদ্ধি সুস্থ হওয়া চাই, (অর্থাৎ পাগল হলে চলবেনা) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া চাই এবং আল্লাহ নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হওয়া চাই। (সুতরাং গির্জা বা মন্দিরের জন্য ওয়াকফ শুদ্ধ হবেনা) এরপর বলা হয়েছে :

"ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো, যে ব্যক্তি ওয়াকফ করছে, ওয়াকফ করার সময় সম্পত্তি তার মালিকানাধীন থাকতে হবে। সে যদি কোনো জমি জবরদখল করে ওয়াকফ করে দেয়। অতএব মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে দাম

পরিশোধ করে দেয়। অথবা কোনো কিছুর বিনিময়ে আপোস করে, তাহলে সেটা ওয়াকফ হবে না।"

ইসলামি শরিয়তে এরূপ বিধানও রয়েছে যে, সে ইসলামের ফরয কাজগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করতে চায়। এ জন্য কখনো কখনো সে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ এবং জোর জবরদস্তিও করে। যেমন যাকাত ও উশর আদায় করা আইনত বাধ্যতামূলক। কিন্তু নফল ইবাদত ও দান সদকার জন্য মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হয়না, যাতে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা নির্জীব হয়ে না যায়। ওয়াকফও একটা নফল তথা ইচ্ছাধীন সদকা। এর জন্য যদি জোর জবরদস্তি করে সম্পত্তি আদায় করা হয় তাহলে তা পূণ্যকর্ম না হয়ে একটা অকল্যাণকর কাজে পরিণত হবে এবং আল্লাহর পথে ওয়াকফ করার আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সম্পত্তির মালিক স্বয়ং ওয়াকফ ঘোষণা না করা বা ঘোষণা করেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো পক্ষ বা কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ বলে ঘোষণা করলে এবং তা নিজের ব্যবহারে ও দখলে নিলে সেটা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটা অবৈধ কাজ বিবেচিত হবে এবং তা বাতিল, অচল এ অকার্যকর হবে। *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৮০]*

৫৫. আত্মাহননকারীর জানাযা নামায

প্রশ্ন জনৈক মৌলবী সাহেব খুবই জোর দিয়ে বলে থাকেন, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া হারাম। তিনি এ কথা নিয়ে সর্বত্র সোচ্চার। তাকে জানানো হলো যে, এ বিষয়ে আপনার সাথে চিঠির আদান প্রদান হয়েছে এবং আপনি সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিয়েছেন যে, রসূল সা. আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়তে বা পড়াতে নিষেধ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ হাদিসে পাওয়া যায়না। কেবল এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি নিজে জানাযা পড়াননি, কিংবা বলেছেন যে আমি তো পড়াবো না এতে ঐ মৌলবী সাহেব বলেন, আপনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে দায় সেরেছেন এবং এ জবাব অজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি যথারীতি জোর দিয়েই বলে যাচ্ছেন, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া অকাট্যভাবে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। তিনি আরো বলেন, আবু দাউদ শরিফ, নাসায়ী শরিফ, ফাতওয়ায়ে আযীযিয়া প্রথম খণ্ড, ফাতওয়ায়ে নূরুল হুদা, তাহাবী, জামেয়ূর রুমুয, বুলুগুল মুরাম, নবম শ্রেণীর ইসলামিয়াত এই সমস্ত পুস্তকে আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিষিদ্ধ লেখা রয়েছে এবং এসব গ্রন্থের লেখকগণ এটা অবৈধ মনে করেন। তিনি 'কাশফুল গুম্মা' নামক গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। তার ধারণা, আপনি এসব কিতাব দেখেননি অথবা পড়তে পারেননা।

অনুগ্রহপূর্বক বিশদভাবে জানাবেন, এ ধরনের লোকের জানাযা পড়া জায়েয আছে কিনা? যিনি জানাযা পড়বেন বা পড়াবেন তিনি কি গুনাহগার হবেন? মৌলবী সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী তো তিনি গুনাহগার হবেন। আমাদের আশংকা, এ জিনিসটা বেশ বড় রকমের কোন্দলের জন্ম দিতে পারে এবং সুস্পষ্ট জবাব না দেয়া পর্যন্ত সে কোন্দল হয়তো থামবেনা।

জবাব আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়ার ব্যাপারটা ফিকাহ শাস্ত্রকারগণ ও হাদিসবেত্তাগণের মধ্যে বিতর্কিত এবং খোদ হানাফি ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে আমার মতে অগ্রগণ্য মত হলো, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া জায়েয। কিন্তু মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছে করলে নামাযে অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন। কোনো মুসলমান কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবার কারণে কাফের হয়ে যায়না। সুন্নি মুসলমানরা এ ব্যাপারে একমত। যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের চৌহদ্দী থেকে বেরিয়ে যায়না, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা যেমন জায়েয, জানাযা পড়াও তেমনি জায়েয বলে আমি মনে করি। কেননা, জানাযাও এক ধরনের মাগফিরাতের দোয়া ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাইতে নিষেধ করা হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তির মুনাফেকী সর্বজনবিদিত ছিলো এবং রসূল সা.-কে জানানোও হয়েছিল, সেরূপ ব্যক্তির জানাযা পড়া থেকে তাঁকে বিরত রাখা হয়েছিল। এছাড়া আর কোনো গুনাহগার বা পাপাচারীর জানাযা যদি রসূল সা. নিজে না পড়িয়ে থাকেন, তবে আমার মতে, সেটা কোনো এক ধরনের তিরস্কার ভৎর্সনা ছিলো এবং তা অনেক সময় নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার বলে গণ্য হতো। এ দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি যে, এ ধরনের লোকের জানাযা অন্য কেউ পড়তে পারবেনা। বরঞ্চ কোনো কোনো সময় তিনি তার জানাযা পড়ার জন্য সাহাবিগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা। কোনো সাহাবি ইন্তিকাল করলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এই ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত নয় তো? যদি হতো, তাহলে তিনি নিজে জানাযা পড়াতেননা, তবে অন্যান্য সাহাবিকে পড়তে আদেশ দিতেন। পরবর্তীকালে এরূপ ব্যবস্থাও হয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিতো কিংবা যদি বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হতো তবেই রসূল সা. জানাযা পড়িয়ে দিতেন। আত্মহত্যাকারীর ব্যাপার তদ্রুপ। আমার জানামতে রসূল সা. আত্মহত্যার জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তাকে বিনা জানাযায় দাফন করা হয়েছে –এমন কথা কোনো সহীহ হাদিসে নেই। যে অপরাধের সংঘটকের জানাযা নামায পড়ানোর সদয় অনুমতি স্বয়ং রসূল সা. দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম যার জানাযা পড়েছেন তার জানাযা এখন সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ করা কিভাবে জায়েয হয়, আমার বুঝে আসেনা। এটা আমার বিলক্ষণ জানা আছে যে, কতোক ফকিহ আত্মহত্যা ও অন্যান্য কবিরা গুনাহে লিপ্ত

ব্যক্তির জানাযা না পড়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু আমি এই ফতোয়া সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ ঠিক মনে করিনা। ইমাম ইবনে হাযমের মতে অতি বড় গুনাহগার ব্যক্তিও মাগফিরাতের দোয়া ও জানাযা নামাযের মুখাপেক্ষী। তার এই মতটি আমার কাছে অগ্রগণ্য। আমি আগেই বলেছি, রসূল সা. স্বয়ং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়াননি। হাদিসে শুধু এতোটুকুই পাওয়া যায়। মুসলিম শরিফের জানাযা সংক্রান্ত অধ্যায়ের শেষের দিকে হযরত জাবির বিন সামুরা থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে :

اتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه

"রসূল সা.-এর নিকট তীর বা বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করেছে এমন এক ব্যক্তির লাশ আনা হয়। তিনি তার জানাযা পড়াননি।"

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয ও ইমাম আওযায়ীর মতে এরূপ ব্যক্তির জানাযা জায়েয নেই। তবে ইমাম হাসান বসরী, ইমাম নাখয়ী, কাতাদা, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে তার জানাযা পড়া যাবে। এ হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন, রসূল সা.-এর জানাযা না পড়ানোর উদ্দেশ্য ছিলো কেবল জনগণকে সাবধান করা, যেনো তারা এই গুনাহর কাজ না করে। সাহাবায়ের কিরাম তার জানাযা পড়েছেন। এরপর ইমাম নববী সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন এবং কাযী ইয়াযের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জানাযা পড়া উচিত এটাই সকল আলেমের অভিমত, চাই তার উপর শরিয়তের দণ্ড কার্যকর হয়ে থাক, পাথর নিক্ষেপে মারা যাক কিংবা আত্মহত্যা করুক। আবু দাউদের জানাযা সংক্রান্ত অধ্যায়েও এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে এবং তাতে রসূল সা.-এর শুধুমাত্র এই কথাটির উদ্ধৃতি রয়েছে যে, আমি এ ব্যক্তির জানাযা পড়াবোনা। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম খাত্তাবী বলেন, অধিকাংশ ফকীহর মত, এরূপ ব্যক্তির জানাযা নামায পড়া হবে। হাফেয মুনযিরীও বলেছেন, রসূল সা.-এর জানাযা না পড়ানোর উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে হুশিয়ার করা। তিরমিযী শরিফের জানাযা সংক্রান্ত অধ্যায়েও এই মর্মে একটি হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে। হাদিসটি নিম্নরূপ :

عن جابر بن سمرة ان رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم

"হযরত জাবের বিন সামুরা জানান, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছিল, রসূল সা. তার জানাযা পড়াননি।"

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী বলেন যে, আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে, প্রত্যেক মুসলমানের এমনকি আত্মহত্যাকারীরও জানাযা নামায জায়েয। ইমাম আহমাদের মত হলো, নেতা ও শাসকের জানাযা

পড়ানো ঠিক নয়। তবে অন্যদের পড়া উচিত। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী স্বীয় গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'তে প্রথমে ইমাম নববীর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। অতপর 'নাইলুল আওতার' এর বরাত দিয়ে ইমাম শওকানীর উক্তি তুলে ধরেছেন যে, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের মতে ঘোরতর পাপিরও জানাযা নামায পড়া জায়েয। আত্মহত্যাকারীর জানাযা যদিও রসূল সা. পড়াননি, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম পড়িয়েছেন। সুনানে নাসায়ী থেকেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। কেননা হাদিসে রসূল সা.-এর কেবল এতোটুকু কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, اما انا فلا صلى عليه 'তার জানাযা আমি তো পড়াবোনা।' এর তাৎপর্য অন্য কথায় এই দাঁড়ায় যে, রসূল সা. শুধু নিজেই জানাযা নামায থেকে বিরত থেকেছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন।

আমি শুরুতেই বলেছি, হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতামতও দু'রকমের পাওয়া যায়। তবে আমি মনে করি, জায়েয হওয়ার মতটিই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও অগ্রগণ্য। দুররে মুখতারে বলা হয়েছে :

من قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه وبه يفتى

"সজ্ঞানেও যদি কেউ আত্মহত্যা করে তবে তাকে গোসল দিতে হবে ও জানাযা পড়তে হবে। এটাই কার্যকর বিধান বা ফতোয়া।"

এই উক্তির ব্যাখ্যা দিতে দিয়ে ইমাম ইবনে আবেদীন 'রদ্দুল মুখতারে' বলেন "যেসব আলেম রসূল সা.-এর জানাযা না পড়ানোকে জানাযা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করেছেন, তাদের যুক্তির পক্ষে হাদিস থেকে সমর্থন পাওয়া যায়না। হাদিসে শুধু বলা হয়েছে যে, রসূল সা. জানাযা পড়াননি। শুধু শিক্ষা দেয়াই এর উদ্দেশ্য ছিলো। এমন কথা বলা হয়নি যে, সাহাবায়ে কিরামও জানাযা পড়েননি। রসূল সা.-এর জানাযা পড়ানো এবং অন্যদের জানাযা পড়ানো এক কথা নয়। এরূপ ব্যক্তি তওবা করেনি বা তার তওবা কবুল হয়নি, এমন কথা বলা কঠিন। কেননা তওবা তো যে কোনো গুনাহগারের কবুল হতে পারে, এমনকি কাফেরেরও হতে পারে।"

'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থকারের উপরোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। যে ব্যক্তিকে সবাই মুসলমান বলে জানে এবং কাফের আখ্যায়িত করার মতো যথেষ্ট অকাট্য যুক্তি নেই, তাকে জানাযার নামায ও দোয়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার অবাধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়না। কেননা হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা এ অধিকার প্রত্যেক মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। হাদিসে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রাপ্য যে কয়টি অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে, জানাযা পড়া তার অন্যতম। তাছাড়া যে সমাজে আমরা বসবাস করছি, তাও দৃষ্টিপথে রাখতে হবে।

এখানে অসংখ্য লোক এমন রয়েছে, যারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয তরক করে চলছে এবং নরহত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার ও অন্যান্য কবিরা গুনাহে লিপ্ত। তাদের সবার জানাযা পড়া হবে, আর কেবল আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া হবেনা এবং অন্যদেরকেও পড়তে নিষেধ করা হবে– এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আল্লাহ ও রসূল সা. যদি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন যে, আত্মহত্যাকারী বা অমুক কবিরা গুনাহকারীর জানাযা কোনো মুসলমান পড়তে পারবেনা, তাহলে আমরা কখনো এ হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাতাম না। কিন্তু এ ধরনের সুস্পষ্ট নির্দেশ যখন নেই, তখন সঠিক তথ্যনির্ভর মত এবং সতর্ক কর্মপন্থা এটাই হতে পারে যে, আমরা কোনো ব্যক্তির জানাযা পড়তে না চাইলে নাই পড়লাম, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের নয় এবং ইসলামের গণ্ডির বাইরে নয়, তার জানাযা পড়া নিষেধ বলে ফতোয়া দেয়া উচিত নয় এবং অন্যদেরকেও জানাযা পড়া থেকে বিরত রাখা উচিত নয়।

যে মুসলমান কাফেরদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়, তার সম্পর্কেও হানাফি মাযহাবের মত হলো, তার জানাযা ওয়াজিব। কিন্তু বহু ইমাম ফকীহ ও মুহাদ্দিস বলেন, তার জানাযা পড়া হবেনা এবং তাকে গোসলও দেয়া হবেনা। এ ধরনের শহীদকে রক্তমাখা কাপড়সহই দাফন করতে হবে। আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি যে, এই দ্বিতীয় মতের সপক্ষে অধিকতর বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। তবে হানাফি মতের সপক্ষেও নির্ভরযোগ্য হাদিস রয়েছে। যা হোক, শহীদের ব্যাপার স্বতন্ত্র এবং তার সাথে অন্য কোনো মৃত ব্যক্তিকে তুলনা করা যায়না, আত্মহত্যাকারীকে তো নয়ই। হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, রক্তের প্রথম ফোটা গড়ানো মাত্রই শহীদের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হতে পারে, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে এবং তাঁর গুনাহ মাফ হওয়ার সুনিশ্চিত ও অকাট্য প্রতিশ্রুতির কারণে তাঁর জানাযা বাদ দেয়ার বিধান রয়েছে।

আমার এ আলোচনার এরূপ অর্থ করা ঠিক হবেনা যে, আমি আত্মহত্যাকে নগণ্য পদস্খলন মনে করি। আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে এক সাংঘাতিক ও গুরুত্বর মহাপাপ। সহীহ হাদিসে এর পরিণতি জাহান্নাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং রসূল সা. বলেছেন যে অস্ত্র দ্বারা কোনো ব্যক্তি আপন প্রাণ সংহার করে দোযখে সেই অস্ত্রই চিরস্থায়ী নির্যাতন যন্ত্র হিসেবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং সে তা দ্বারা নিরন্তর আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে থাকবে। এ কাজ চরম কাপুরুষতা ও আল্লাহর প্রতি কুধারণা, হতাশা ও অকৃতজ্ঞতা পোষণের প্রমাণ বহন করে। তাই এ কাজ কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কোনো মানুষ নিজের প্রাণের স্রষ্টাও নয়, মালিকও নয় যে, যখন ইচ্ছে এবং যেভাবে ইচ্ছে, তাকে ধ্বংস করবে। তথাপি এমন হতভাগা মানুষ যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তবে

তার জানাযা পড়া আমার মতে জায়েয। হয়তো বা আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতেও পারেন, চাই সেটা শাস্তি ভোগের পরেই হোক। *[তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৭৫]*

৫৬. হারূত মারূত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে এক ভিত্তিহীন অলীক কাহিনী

প্রশ্ন : বেশ কিছু দিন আগের কথা। ইসলামিয়াতের ঘন্টায় আমরা শ্রেণীতে বসে তাফহীমুল কুরআন পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে সূরা বাকারা ১০১ নং আয়াতে উপনীত হলাম। এর পরবর্তী আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের শাসনামলের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছে "এবং তারা অনুসরণ করলো বাবেলে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর যা নাযিল করা হয়েছিল তার। ফেরেশতাদ্বয় আগেভাগে এ কথা না বলে কাউকে তা শেখাতো না যে, আমরা কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়োনা"। ১০৩ নং আয়াত পর্যন্ত। হারূত ও মারূতের নাম শুনেই আমরা চমকে উঠলাম। অধ্যাপক বললেন, "এটা একেবারেই একটা মনগড়া কাহিনী যে, হারূত ও মারূত যোহরা নাম্নী এক মহিলার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এ গল্প ঘরোয়া পরিবেশে অধিকতর প্রচলিত। কাজেই তোমরা বাড়িতে জানাবে যে, ফেরেশতারা নিষ্পাপ এবং তারা কোনো গুনাহর কাজ করতে পারেনা।"

একথা শুনে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। কেননা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি, বাবেল শহরে এক কুয়ায় দু'জন ফেরেশতা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তারা যোহরা নাম্নী এক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তাদেরকে বাবেল শহরের এক কুয়ায় ঝুলিয়ে রেখেছেন।

আমি সেই দিনের পর প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকি। কিন্তু কোথাও সন্তোষজনক জবাব পাইনি। কেউ বলে, এটা সত্য ঘটনা। আবার কেউ বলে মিথ্যা। ইতিমধ্যে আমার এক আত্মীয় ইরাক থেকে দেশে ফিরলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, হ্যা, এ ঘটনা সত্য। কেননা ইরাকের বাবেল শহরে একটা কুয়া রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ঐ কুয়ায় ফেরেশতাদ্বয় অধোমুখী হয়ে ঝুলে আছে। কিন্তু বাইরে থেকে তালা দেয়া। দেখার অনুমতি নেই।

অবশেষে আমি তাফহীমুল কুরআনে অনুসন্ধান চালাই। কিন্তু ব্যর্থ হই, কেননা তাফহীমুল কুরআনে এই ঘটনার প্রতি সামান্য ইংগিতও নেই। সূরা বাকারা ১০১ থেকে ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। আমি তাফহীমূল কুরআনের প্রথম খণ্ডে খুঁজেছি। অন্য কোনো খণ্ডে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকলে অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন। আপনি হয়তো ইরাক সফর করেছেন এবং সেখান থেকে এ ব্যাপারে তথ্য অবগত হয়েছেন। আপনি কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে ঘটনাটা সত্য কি মিথ্যা

জানাবেন। মুসলমান হিসেবে আমার বিশ্বাস হয়না। কারণ আমি মনে করি, ফেরেশতারা নিষ্পাপ। তাদের গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

জবাব : হারূত ও মারূত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যতোটুকু আলোচিত হয়েছে, মাওলানা মওদূদী তার একটা সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কুরআন বা হাদিসে এর চেয়ে বেশি কিছু নেই।

উক্ত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে যে কিসসার উল্লেখ আপনি করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার অধ্যাপক সাহেব সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেছেন। এ গল্পটি কিছু পুস্তকে লেখা থাকলেও সরাসরি রসূল সা.-এর মুখ থেকে কেউ শুনেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় না। হাফেয ইবনে কাসীর, অধ্যাপক আহমদ মুহাম্মদ শাকের, সাইয়েদ রশীদ রেজা এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এর বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। আসলে এ কিসসাটি প্রধানত কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক ইহুদি কল্পকাহিনী আমাদের ইতিহাস ও তফসীরের গ্রন্থাবলীতে ঢুকে গেছে। অথচ এ সবের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। এ কিসসা তাওরাত বা অন্যান্য লিখিত ইহুদি সাহিত্যেও নেই।

পবিত্র কুরআন থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কোনো হুকুম লংঘন করতে পারেননা। একথা সত্য যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিতে পারেন, যা মানুষের জন্য শাস্তি বা পরীক্ষার রূপ ধারণ করে। কিন্তু তারা আল্লাহর কোনো আদেশের বিরুদ্ধাচরণ বা নৈতিক দিক দিয়ে কোনো অশালীন কাজ করতে পারেন– এটা অকল্পনীয় কেননা তারা প্রকৃতিগত ভাবেই নিষ্পাপ এবং যৌন আবেদন থেকে মুক্ত। তাদের মধ্যে সন্তান প্রজনন বা বংশ বিস্তারের ধারাও চালু নেই। তবু যদি ধরে নেয়া যায় যে, খোদা না করুন, তাদের কারো দ্বারা এমন গুরুতর নাফরমানী হতো এবং সে জন্য এমন কঠিন সাজা দেয়া হতো, তাহলে কুরআনে তার উল্লেখও থাকতো।

শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, তারা এমন কোনো বিদ্যা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন যাতে মানুষের জন্য লাভজনক ও ক্ষতিকর উভয় রকমের উপকরণ ছিলো। এজন্য তারা মানুষকে ঐ বিদ্যার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। এরপর যে ব্যক্তি তার অপব্যবহার করতো সে নিজেই তার জন্য দায়ি হতো।

ইরাকের কোনো কুয়ায় ফেরেশতারা ঝুলে রয়েছে বলে জনশ্রুতি থাকলেই এ কিসসা সত্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। সেখানে তো মাছের পেট থেকে মানুষ বের হবার দৃশ্য সম্বলিত একটা ছবিও অংকিত রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষটি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম। তাই বলে কি একথা মেনে নেয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ঐ জায়গাতেই এবং ঐভাবেই হযরত ইউনুস মাছের পেট থেকে বেরিয়েছিলেন? *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৮০]*

৫৭. 'চাটান' সম্পাদকের নিকট দুটো চিঠি

[১]

লাহোর, ২৬ জুন ১৯৫৪

জনাব আগা শোরেশ কাশ্মীরী সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

চাটানের বিগত সংখ্যায় হাদিস অস্বীকারকারী জনৈক ভদ্রলোকের একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে তিনি দাসত্ব প্রথা সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেছেন। দাসত্ব সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে শরিয়তের বিধানের যেরূপ বিশদ বিবরণ রয়েছে, সাধারণ মুসলমানদের তা জানা নেই। এর ফলে যে মহলটি ইসলামের উৎস হিসেবে হাদিসকে মানেনা এবং অন্য যারা পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামীতে লিপ্ত ও প্রাচ্যবাদীদের বই পুস্তক পড়ে নিদারুণভাবে প্রভাবিত ও দিশেহারা, তারা বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি দাসত্বের বিষয়টাকেও ছুতা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই ছুতা ধরে সাধারণ মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে দাসত্ব সম্পর্কে ইসলামের বিস্তারিত বিধান তুলে ধরা ও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগের জবাব দেয়া তো সম্ভব নয়। তথাপি পত্রলেখক যেহেতু নিজের ধারণা মোতাবেক চরম আপত্তিকর হাদিস বাছাই করে উল্লেখ করেছেন, তাই সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। পত্রলেখক বুখারি শরিফের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন لا باس ان يصيب من جاريته الحامل مادون الفرج তিনি এর অনুবাদ করেছেন এভাবে যে, 'গর্ভবতী দাসির যোনি ব্যতিত অন্য কোথাও সহবাস করলে আপত্তি নেই।' দু:খের বিষয়, তিনি বুখারির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের নাম উল্লেখ করেননি। তা যদি করতেন তা হলে জানা যেতো যে, এই উক্তিটি কোন হাদিসের অংশ, না হাদিস বর্ণনাকারীর বক্তব্য। আর এটা হাদিসের অংশ হয়ে থাকলে তা সরাসরি রসূল সা. পর্যন্ত তার সনদের ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত কিনা। যেহেতু ইমাম বুখারি নিছক হাদিস সংগ্রাহক নন, বরং সেই সাথে একজন ফেকাহবিদও, তাই তিনি বহু জায়গায় নিজস্ব ফেকাহ শাস্ত্রীয় যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। আর সেই যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাহাবি বা বর্ণনাকারীর মতামত উদ্ধৃত করেছেন। এ ধরনের যুক্তি বা মতামত আর যাই হোক, তার সংগৃহিত হাদিসের সমমানের নয়।

উদ্ধৃত কথাটি যদি কোনো সহীহ হাদিসের অংশ হয়ে থাকে, তাহলে এর যে অনুবাদ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। যে ব্যক্তি আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা জেনে শুনে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও বীতশ্রদ্ধ করতে চায়, কেবলমাত্র তার পক্ষেই এ রকম অনুবাদ করা সম্ভব। এ

হাদিসের সঠিক অনুবাদ হলো 'গর্ভবতী দাসীর যোনি ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করা জায়েয।' এর তাৎপর্য এই যে, গর্ভবতী দাসীর সাথে মেলামেশা ও স্পর্শ করা জায়েয আছে। কিন্তু সহবাস করা জায়েয নেই। একাধিক হাদিসে বলা হয়েছে, দাসীদের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু ও শেষ হওয়ার মাধ্যমে জরায়ু পরিষ্কার হয়ে সন্তান সম্ভবা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তাদের সাথে সহবাস করা যাবে, তার আগে নয়। আর গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবেনা। কেননা এতে করে সন্তানের পিতৃপরিচয় সন্দেহজনক হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদিসেও গর্ভবর্তী দাসীর সাথে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র শরীরের বাদবাকী অংশ স্পর্শ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে يصيب শব্দের অর্থ স্পর্শ করার পরিবর্তে সহবাস করা লিখে প্রকারান্তরে প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় শব্দটিকে তার আসল অর্থের পরিবর্তে একটা অবাঞ্ছিত অর্থের বাহন করা হয়েছে। অথচ অভিধানে ও আরবদের চলতি কথাবার্তায় এ শব্দটি কখনো সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বস্তুত, এ বাক্যটির এরূপ অনুবাদ করা যে যোনি ব্যতিত অন্য জায়গায় সহবাস করতে আপত্তি নেই' কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইবনে আসীর প্রণীত নিহায়া হাদিসের অভিধান বিষয়ে একটি বিস্তৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতেও اصاب শব্দটির অর্থ সহবাস বলা হয়নি। এমনকি এ শব্দের কর্মবাচক পদে যদি স্ত্রীলোক থেকে থাকে তাহলেও তার অর্থ চুম্বন করা লেখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা দরকার যে, স্ত্রীলোক ও যৌন বিষয়ক হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রীয় মাসয়ালাগুলো নিয়ে অতিশয় আলোচনা ও মাতামাতি করা হাদিস অস্বীকারকারী মহলের একটা প্রিয় নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এর দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, যারা এসব বিষয় নিজ নিজ কিতাবে লিখেছেন, তারা যৌন বিকৃতির শিকার। অথচ এ রোগে তারাই আক্রান্ত, যারা হাজারো বিষয়ের হাদিস, ফেকাহ শাস্ত্রীয় হাজারো মাসয়ালা থাকতে এই ক'টা হাতে গোনা বিষয়কে বেছে নিয়ে এগুলোর চর্চায় মুখর থাকে। নচেৎ এ কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মানুষের সমস্যাবলী নিয়ে যখনই ব্যাপক ও সার্বিক আলোচনা করা হবে, তখন যৌন বিষয়কে তা থেকে বাদ দেয়া যাবেনা। এমনকি কুরআনেও যৌন ও দাম্পত্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ বিষয় সংক্রান্ত হাদিসগুলো সম্পর্কে এই মহলটি আরো একটি আপত্তি তুলে থাকে। সেটি হলো, রসূল সা. ও তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষে এটা শোভনীয় হতে পারেনা যে, নিজেদের ঘরোয়া ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য বিষয়গুলো মানুষের কাছে বলে বেড়াবেন। এ ধরনের যাবতীয় হাদিস রসূল সা.-এর দুর্নাম রটানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই আপত্তিটা যারা তোলেন, তারা ভুলে যান যে, আল্লাহর নবী ও দুনিয়ার সাধারণ সংস্কারকদের মধ্যে একটা

মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়ার সাধারণ সংস্কারকরা এসব বিষয়কে বাহ্যত গুরুত্বহীন ও অশালীন মনে করে এড়িয়ে যান। কিন্তু নবী রসূলগণ যেহেতু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সংস্কার ও সংশোধণের নিমিত্তে পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন, তাই জীবনের কোনো দিককে তারা উপেক্ষা করতে পারেননা। কিছু কিছু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রসূল সা. মানব জীবনের এই অপরিহার্য দিক সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাও সংরক্ষণ করতে পারা মুসলমানদের এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। নচেৎ পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও কৃষ্টির দাবিদাররা আজো সুস্পষ্টভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতেও শিখেনি।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে বিকৃত ও বিরূপ মানসিকতা নিয়ে এ জাতীয় আপত্তি ও অভিযোগ আজকাল মুসলিম নামধারী লোকেরা তুলছে, ঠিক একই ধরনের আপত্তি রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় ইহুদি ও খৃস্টানরাও মুসলমানদের কাছে তুলতো। হাদিসে আছে, একবার জনৈক ইহুদি হযরত সালমান ফারসী রা. কে উপহাসচ্ছলে বলে "তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব কাজ, এমনকি পেশাব করাও শেখায়।" হযরত সালমান একজন বয়োবৃদ্ধ, বহুদর্শী ও পরিপক্কি ঈমান আকীদাসম্পন্ন সাহাবি ছিলেন। তিনি দুনিয়ার বেশ কয়েকটি ধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের পর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাই স্বীয় রসূল সা.-এর সুমহান মর্যাদা তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতেন। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে এবং কিছুমাত্র ইতস্তত ও বিব্রত বোধ না করে ঝটপট্ বলে দিলেন ঠিকই তো, আমাদের নবী সা. আমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, 'পেশাব পায়খানা করতে নরম ও ঢাকা- ঘেরা জায়গা সন্ধান কর, মানুষের চলাচলের পথ ও ছায়াশীতল জায়গা এড়িয়ে চল, কেবলা সামনে বা পেছনে রেখে বসোনা, পরিষ্কার ঢিলা ব্যবহার করো এবং নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ব্যবহার করোনা।' প্রশ্নটি শুনে হযরত সালমান রা. কোনো রকম ঘাবড়ে যাননি। বরঞ্চ তিনি রসূল সা.-এর শিক্ষা হুবহু বর্ণনা করে দিলেন। একটুও ভাবলেন না যে, এসব জিনিস শেখানো একজন নবীর মর্যাদার সাথে বেমানান এবং তা বর্ণনা করা একজন সাহাবির পক্ষে অশোভন কিনা।

বস্তুত, রসূল সা. প্রত্যেক ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন যেমন একজন স্নেহশীল পিতা নিজের সন্তানদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিছু বলার সময় রসূল সা. বলতেন, আমি তোমাদের জন্য পিতৃস্থানীয়। পিতা যেভাবে পুত্রকে শিক্ষা দেয়, আমি সেভাবেই তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। সাহাবায়ে কিরাম এবং মহিলা সাহাবিগণও রসূল সা.-এর নিকট সেভাবেই প্রতিটি সমস্যা নিয়ে যেতেন, যেমন সন্তানরা সকল ব্যাপারে পিতার কাছে যায়। অনুরূপভাবে রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় এবং বিশেষত

তাঁর ইন্তিকালের পর মুসলিম পুরুষ ও মহিলারা এ ধরনের গোপনীয় বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা জানার জন্য উম্মুল মুমিনীনদের কাছে যেতেন। একটু ভাবলে বুঝা যাবে যে, রসূল সা. এবং উম্মুল মুমিনীনগণের এটা কতো বড় ত্যাগ যে, তাঁরা শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের খাতিরে নিজেদের ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য বিষয়ও উম্মতের সামনে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। অথচ সাধারণ পিতামাতা নিজের সন্তানদের কাছে এসব বিষয় প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে।

বস্তুত, রসূল সা. ও তাঁর পরিজনদের এ এক অনুপম ও মহৎ কোরবানি যে, তারা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকে শরিয়তের কল্যাণের জন্য অকাতরে 'বিসর্জন দিয়েছেন এবং নিজেদের কোনো কিছুতেই গোপন রাখেননি, বরং সবকিছুই প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু আজকাল মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, কবির ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় : "বুদ্ধিমত্তাই হয়ে গেছে পাগলামী, আর পাগলামির নাম হয়েছে বুদ্ধিমত্তা।"

[২]

জনাব,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ।

আমি ইতিপূর্বে হাদিস অস্বীকারকারী গোষ্ঠির নেতা চৌধুরী গোলাম আহমাদ পারভেজের জনৈক শিষ্যের বক্তব্যের জবাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সে চিঠি চাটানে ছাপা হয়েছে। ঐ চিঠিতে আমি উল্লেখিত পত্রলেখকের উদ্ধৃত আরবি কথাটির প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ করেছিলাম। তিনি ওটিকে হাদিস হিসেবে পেশ করে বলেছিলেন, কুরআনের পর যে কিতাবকে বিশুদ্ধতম কিতাব বলা হয়, সেই বুখারিতে বলা হয়েছে, এটি রসূল সা.-এর উক্তি, গর্ভবতী দাসির সাথে সহবাস সংক্রান্ত ঐ উক্তিটির সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার সাথে সাথেই আমি একথাও বলেছিলাম যে, এটা রসূল সা.-এর উক্তি, না কোনো সাহাবির বক্তব্য, না কোনো ফেকাহ শাস্ত্রবিদের অভিমত, তা বুখারির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বরাত উল্লেখ করা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। সম্প্রতি এক বন্ধু আমাকে 'ইদারায়ে তুলূয়ে ইসলাম' থেকে প্রকাশিত দু'খানা পুস্তিকা 'কুরআনি ফায়সালে' (কুরআনি সিদ্ধান্ত) এবং 'মিযাজ শিনাসে রসূল' (রসূলের স্বভাব সম্পর্কে অবগতি) এনে আমাকে দেন এবং বলেন, বিতর্কিত উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেয়া হয়েছে, তা এই পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পুস্তিকা দু'টি পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, পারভেজ সাহেব অথবা তার প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে তুলূয়ে ইসলামের' অন্য কোনো হোমরা-চোমরা ব্যক্তি অনেক আগেই তুলূয়ে ইসলাম পত্রিকায় ঐ উক্তিটিকে হাদিস আখ্যায়িত করেছিলেন। পরে সেই লেখাটিই এবং সেই সাথে উক্তিটিও আলোচ্য বই দুটিতে পুন:মুদ্রণ করা হয়েছে। সম্ভবত চাটানের পত্রলেখক ঐ লেখাটি পড়ে তা থেকে কথিত 'হাদিসটি

পরম সমাদরে নোট করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। অতপর চাটানে নিজের চিঠিতে তা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

যা হোক উল্লেখিত বই দুটিতে উক্তিটির উৎসের সন্ধান পাওয়ার পর যখন আমি বুখারির সংশ্লিষ্ট স্থান খুঁজে বের করলাম, দেখলাম উক্তিটির শুরুতেই লেখা রয়েছে قال عطاء অর্থাৎ আতা বলেছেন...... । অর্থাৎ কিনা, যে উক্তিকে হাদিস আখ্যায়িত করে মনগড়া অর্থ করা হয়েছে, তা রসূল সা.-এর উক্তি তো নয়ই, কোনো সাহাবির উক্তিও নয়। বরং ওটা আতা বিন আবি রাবাহের ব্যক্তিগত অভিমত। যে কথা নবী সা. বলেননি, তাকে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়া যে একটি বিরাট ধৃষ্টতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ধৃষ্টতা দেখে আমি মর্মাহত হলেও অবাক হইনি। কারণ হাদিস অস্বীকারকারীদের একাধিক লেখা পড়ে আমি বুঝেছি, তারা বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎসের বরাত দিতে গিয়ে ওলটপালট ও হেরফের করতে এবং যেনতেন প্রকারে তাকে নিজের মতলবসিদ্ধির সহায়ক বানাতে এতো সিদ্ধহস্ত যে, তা দেখে নিবন্ধকারের উদ্দেশ্যের সততা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তার বিশ্বস্ততায় আস্থাবান হওয়া যায়না। আমি এই মহলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারের লোকদের বাদ দিয়ে তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে মাত্র একজনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ইনি হাফেয মুহাম্মদ আসলাম জীরাজপুরী মরহুম। তিনি 'তারীখে নাজ্‌দ' (নাজদের ইতিহাস) এবং 'তারীখুল উম্মাত' (মুসলিম জাতির ইতিহাস) নামক দু'খানা বই লিখেছেন। এ দু'খানা বই জীরাজপুরী সাহেবের নিজের মৌলিক রচনা নয়, বরং প্রথমটি মুহাম্মদ শুকরী আলূসী লিখিত 'তারীখে নাজ্‌দ' এবং দ্বিতীয়টি শেখ মুহাম্মদ বেগ আল হাজরামীর লেখা 'মুহাদারাতুল উমামিল ইসলামিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ। জ্ঞান চর্চা ও পুস্তক রচনার জগতে একটি সর্বস্বীকৃত নৈতিক রীতি চালু রয়েছে যে, কোনো লেখক যদি কোনো পূর্বসূরী বা সমকালীন লেখকের রচিত কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ, সারসংক্ষেপ বা উদ্ধৃতি দেয়, তবে সে যে মূল গ্রন্থ থেকে তা গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখ করেও স্বীকৃতি দেয়। এই রীতির লংঘনকে বিজ্ঞ মহলে নিকৃষ্টতম চুরি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ চালু আছে, "লেখা চুরি করা কাফন চুরি করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।" অথচ এখানে বিশালকায় গ্রন্থের অনুবাদ করে তাকে নিজস্ব কীর্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, একদিকে গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল গোছের এইসব পণ্ডিত নিজেদেরকে পণ্ডিতকুল শিরোমনি হিসেবে জাহির করতে উদগ্রীব এবং মুসলমানদের সর্বজনমান্য আলেমদের মাথার উপরে গদা ঘুরাতে সদা ব্যস্ত। অপরদিকে সেইসব আলেমেরই বড় বড় গ্রন্থকে চুরি করে বেচে খেতে তাদের বিবেকে কিছুমাত্র বাধেনা। এখন জীরাজপুরী সাহেবের সতীর্থদের ঔদ্ধত্য এতোদুর বেড়ে গেছে যে, রসূল সা. ব্যতিত অন্য মানুষের বক্তব্যকে দোর্দণ্ড

প্রতাপে রসূলের হাদিস বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং একবার নয়, বারবার চালানো হচ্ছে। অথচ রসূল সা. দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, "আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা সাধারণ মানুষের উপর মিথ্যা আরোপ করার সমান নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেনো দোযখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" এটা বিচিত্র নয় যে, হাদিস অমান্যকারী গোষ্ঠির কেউ হয়তো রসূল সা.-এর এই হুশিয়ারীকেও মনগড়া হাদিস বলে অবলীলায় অগ্রাহ্য করবে। কিন্তু আমাদের কাছে এ হাদিস এমন সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, কোনো মুসলমানের সাধ্য নেই একে অস্বীকার করার। এসব অপকৌশল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ মহলটি হাদিস বিশারদগণের বিরুদ্ধে এতো সহজে বিষোদগার করা শুরু করেছে কেন? সম্ভবত তারা অন্যদেরকেও নিজেদের সাথে তুলনা করে এবং মনে করে, যে কোনো ছলিমুদ্দীনের কথাকে মনগড়া আখ্যায়িত করা আর যে কোনো কলিমুদ্দীনের কথাকে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়া তাদের কাছে যেমন সহজ, তাদের ধারণামতে হাদিস বর্ণনার কালজয়ী শাস্ত্রটিও বোধ হয় সেই ধরণের কোনো কারসাজি।

প্রসঙ্গত, আরো একটি মজার ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত লেখাগুলো পড়ে বুঝা যায়, তথাকথিত উক্ত হাদিসটি যখন প্রথমে 'তুলূয়ে ইসলাম' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, তখন তার চরম অরুচিকর মনগড়া কদর্থ করার পর টীকায় লেখা হয়েছে যে, "তুলূয়ে ইসলামের জন্য এটা বড়ই মর্মন্তুদ ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত, যখন এর পাতায় এমন কোনো কথা লিখতে বাধ্য হতে হয়, যা দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের মাথা হেট হয়ে যায়....।" কিন্তু পরক্ষণেই পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ নিজেদের মনটাকে শক্ত করে এতোটা হিম্মত ও সাহস সঞ্চয় করে ফেলেন যে, সেই মাথা হেট করা বক্তব্য সম্বলিত লেখাটি নিজেদের প্রকাশিত দুই-দু'টো পুস্তকে একই সময় ছেপে দিতে কুণ্ঠিত হননি। আর 'মেযাজে শিনাসে রসূল' নামক বইটিতে তো এই তথাকথিত হাদিসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উপর 'অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া' উপ শিরোনামও ছুড়ে দেয়া হয়েছে। এরপর এখন 'তুলূয়ে ইসলাম' এর সংশ্লিষ্ট মহলের স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা এই তথাকথিত হাদিস ও শিরোনামকে গোটা হাদিস শাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি যুৎসই কার্যকর হাতিয়ার ভেবে তাকে নিজেদের মস্তিষ্কের অস্ত্রাগারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন এবং এসব 'লড়াকু সিপাই' এই হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে যত্রতত্র লড়াই করতে নেমে পড়েছেন।

যাহোক, এই উক্তি সম্পর্কে যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা হাদিসও নয়, কোনো সাহাবির উক্তিও নয়, তখন এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই উক্তি আমাদের জন্য শরিয়তের কোনো দলিল হতে পারেনা, আর তার এমন কোনো গুরুত্ব থাকেনা যে, তার প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য উদ্ধার করতে কিংবা তার সমর্থন ও প্রতিবাদে

বেশি গলদঘর্ম হবার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে। তথাপি যেহেতু এই উক্তিটি অত্যন্ত জঘণ্য ও বিভ্রান্তিকরভাবে কদর্থ করে বেশ খানিকটা প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং যেহেতু এর এমন ন্যক্কারজনক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যা আরবি ভাষারই শুধু পরিপন্থী নয় বরং একাধিক হাদিসেরও সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই আমি এ সম্পর্কে আরো একটুখানি ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমার পূর্ববর্তী চিঠিতে আমি ইবনুল আসীরের গ্রন্থ 'নিহায়া'র বক্তব্য তুলে ধরেছি। পরে আমি হাদিসের শব্দার্থ সম্বলিত আরো একখানা বিস্তৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মাজমায়ু বিহারিল আনোয়ার' (শেখ আলী বিন তাহের ফিতনী সংকলিত) দেখার সুযোগ পেয়েছি। এতেও اصاب من এর অর্থ করা হয়েছে 'চুম্বন ও মেলামেশা'। সেই সাথে এ ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়েকটি হাদিসের উদ্ধৃতিও দেয়া হয়েছে। যেমন :

كان النبى صلى الله عليه وسلم يصيب من رأس بعض نساءه وهو صائم

"রসূল সা. রোযা থাকা অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীগণের কারো কারো মাথায় চুমু খেতেন।"

এখন ভাববার বিষয়, এখানে يصيب من শব্দের অর্থ যদি হাদিস অস্বীকারকারীদের কথামত 'সহবাস' গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ হাদিসের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম– "রসূল সা. রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীগণের মাথায় সহবাস করতেন।" নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের এমন প্রলাপ বকা থেকে রক্ষা করুন! কি বাজে ও কুৎসিত অর্থ দাঁড়ায় তাদের অনুবাদ মেনে নিলে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। রূপক অর্থে যদি اصاب কে সহবাস অর্থে গ্রহণ করার অবকাশ থেকেও থাকে, তবুও من এর صله বা অব্যয় প্রয়োগ করার পর এর অর্থ স্পর্শ বা মেলামেশা ও ঢলাঢলির অতিরিক্ত কিছু হতে পারেনা। আমি বুখারির কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থও দেখেছি। সেগুলোতেও এ কথাটার অর্থ আমার প্রথম চিঠিতে বর্ণিত অর্থের অনুরূপই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সাথে আমি এ কথাও উল্লেখ করতে চাই যে, আতার উক্তিতে গর্ভবতী দাসীর সাথে যে ধরণের যৌন সম্ভোগের বৈধতার কথা বলা হয়েছে, মুজতাহিদ ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের মতে তাও অবৈধ ও অবাঞ্ছিত। কেননা এ ধরণের ব্যতিক্রম কোনো সহীহ হাদিস বা সাহাবির উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়না। খোদ ইমাম বুখারি যে ব্যাপারে শুধুমাত্র আতার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর মতেও আর কেউ এ বক্তব্য সমর্থন করেনি। আমি যে চিঠির জবাবে আমার প্রথম চিঠিটা লিখেছিলাম, তাতে যেহেতু এই অস্বাভাবিক সহবাসের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিলনা, তাই আমার কাছেও এটা রুচিকর মনে হয়নি, পত্রলেখক এসব কথা বলেছেন ধরে নিয়ে খামাখা এই বিশ্রী বিষয়ে আলোচনা চালাই। আমি শুধু আভাসে ইঙ্গিতে এবং সংক্ষিপ্তভাবে এতোটুকু বলেই ক্ষান্ত থেকেছিলাম যে, ঐ অনুবাদ দ্বারা অন্যায়ভাবে কথাটার একটা ঘৃণ্য অর্থ বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখন এই চিঠির উৎস দেখে আমি নিশ্চিত

হয়েছি যে, এই কথাটা দ্বারা স্পষ্ট অস্বাভাবিক সহবাসই বুঝানো হচ্ছে, তাই আমি সর্বশেষে এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে– এ ব্যাপারে রসূল সা.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এবং সে অনুসারে এ কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অবৈধ। সকল সুন্নি আলেম ও চার মাযহাব এ কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি, যা দ্বারা এ কাজ সুস্পষ্টভাবে হারাম বলে প্রমাণিত হয় :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة فى دبرها — (رواه احمد ' النسائى ' ابوداود (البزاز)

"হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে তার উপর অভিসম্পাত।"

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من اتى رجلا او امرأة فى الدبر — (ترمذى ' نسائى ' ابن حبان)

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক পন্থায় যৌনক্রিয়া করবে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।"

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة فى دبرها او كاهنا فصدقه فقد كفربما انزل على محمد (احمد' ترمذى ' ابوداود' بيهقى)

"হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করে অথবা কোনো জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করে।"

عن على قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء فى استاههن فان الله لا يستحى من الحق (احمد' ترمذى' بيهقى)

"হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. বলেছেন তোমরা স্ত্রীদের সাথে অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করোনা। আর আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পাননা।"

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ আয়াতটি আনসারদের কয়েকজন সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা রসূল সা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন : স্ত্রীর সাথে সকল পন্থায় সহবাস করা যায় যদি তা যোনিতে হয়।" *[মুসনাদে আহমদ]*

عن خزيمة ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يأتى الرجل امرأته فى دبرها – (احمد – ابن ماجه)

"হযরত খুযায়মা বিন সাবেত থেকে বর্ণিত, রসূল সা. স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন।"

আমার বুঝে আসেনা, উল্লেখিত হাদিসসমূহ থাকতে রসূল সা. বলেননি এমন একটা কথাকে বুখারির হাদিস আখ্যায়িত করে হৈ চৈ করা, তার সঠিক ও স্বাভাবিক অর্থ বিকৃত করে মনগড়া অস্বাভাবিক অর্থ করা এবং কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাবে এমন কথা রসূলের হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকাশ করতে গিয়ে মাথা হেট হয়ে যায়– এই বলে ঢাকঢোল পিটানো কি ধরনের সততা এবং কোথাকার সুবিচার। আমি এই মহলের কাছে জানতে চাই :

اَلَيْس منكُمْ رَجُلُ الرَّشِيْدُ

"তোমাদের মাঝে কি একজনও বিবেকবান মানুষ নেই?"

বিচিত্র নয় যে, উপরোক্ত হাদিসগুলো সম্পর্কেও হয়তো এসব লোক অবলীলাক্রমে বলে বসবেন, একজন নবী কিভাবে এ ধরণের অশালীন কথাবার্তা বলে নিজের মুখকে কলংকিত করতে পারেন? এ জাতীয় আপত্তি ও অভিযোগের একটা জবাব তো আমি চিঠিতেই দিয়েছি। আর একটা জবাব এখানে এই বলে সংযোজন করতে চাই, যেহেতু আল্লাহ অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের খবর জানেন এবং সেই সুবাদে তাঁর এটা পূর্বাহ্নে জানা ছিলো যে, কিছু বিকৃত রুচিসম্পন্ন ও নির্বোধ মানুষ কিছু কিছু মানুষের উক্তির ভ্রান্ত ও বিকৃত অর্থ করে তাকে রসূলের হাদিস বলে চালাবার চেষ্টা করবে, তাই আল্লাহ স্বীয় রসূলের মুখ দিয়ে এমন বক্তব্য পেশ করিয়েছেন, যা দ্বারা এ ধরনের অপচেষ্টা আগে থেকেই রোধ করা সম্ভব হয়।

৫৮. হাদিস অস্বীকার করা ও স্বীকার করা

প্রশ্ন রসূল সা.-এর পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত ও মহৎ চরিত্রের যে বিস্তৃত বিবরণ হাদিসের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উপকারিতা ও গুরুত্ব কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারেনা। আর এই সুবিশাল হাদিস ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তা বাদ দেয়া বা পাইকারিভাবে অস্বীকার করাও কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটি মহলের বক্তব্য হলো, আমরা শুধু সহীহ বিশুদ্ধ হাদিসগুলোই মানি। সহীহ হাদিসের মাপকাঠি তাদের কাছে এই যে, তা যেনো কুরআনের পরিপন্থী ও সাধারণ বিবেকবুদ্ধির বিরোধী না হয়। তারা আরো বলেন, রসূল সা. এক দিক দিয়ে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ছিলেন, আবার আর এক হিসেবে তিনি জাতির নেতা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর রসূল

হিসেবে তাঁর যে মহৎ চরিত্র ও আদর্শ কার্যধারা আবশ্যিকভাবে চিরদিনের জন্য অনুকরণীয়, তা কুরআনে সংরক্ষিত হয়েছে। সুন্নত বলতে যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা কুরআনে সন্নিবেশিত রসূলের এই আদর্শ কার্যধারা ও চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়া তাঁর আর যেসব কথা ও কাজের বিবরণ পাওয়া যায়, তা সমাজ নেতা ও সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের কথা ও কাজের চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্ব রাখেনা। সমাজ নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর আদেশ নিষেধ শুধুমাত্র তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁর অনুসারী তথা সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাঁদের জন্যই অবশ্য পালনীয়। পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য তাঁর নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্ত সমূহ নিছক ইসলামের দৃষ্টান্তস্বরূপ। তার হুবহু আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য নয়। মূলত যে আনুগত্য ইসলামের দৃষ্টিতে কাংখিত, তা হচ্ছে কুরআনী বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত সমসাময়িক সরকার ও প্রশাসকমণ্ডলীর আনুগত্য। এসব শাসক ও প্রশাসকের এখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছে হলে হুবহু রসূল সা.-এর নির্দেশ নিজেরাও মেনে চলবেন এবং দেশবাসীকেও মানতে বাধ্য করবেন, নতুবা তাতে রদবদল করে নতুন নির্দেশমালা প্রণয়ন করবেন।

রসূল সা.-এর কথা ও কাজের যে অংশের বিবরণ কুরআনে নেই, সে অংশটি শুধুমাত্র রসূল সা.-এর আমলেই অনুকরণযোগ্য, তার পরে নয়। এ বক্তব্যের সপক্ষে এই মহলটি বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সা. স্বয়ং নিজের মানবীয় দিক ও নবীসুলভ দিককে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বলেছিলেন যে, একজন মানুষ হিসেবে তিনি যা কিছু বলেন বা করেন, তা অনুসরণ করা জরুরি নয়। খোলাফায়ে রাশেদীনও বহু ব্যাপারে রসূল সা.-এর কার্যধারার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। বিশেষত হযরত ওমর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি সিদ্ধান্ত এমন কার্যকর করেন, যা রসূল সা. করেননি। শোনা যায়, ইমাম আবু হানিফাও ফেকাহ শাস্ত্র রচনায় হাদিসের সাহায্য নেননি। তাঁকে সহীহ হাদিস অবহিত করলেও তিনি হয় রহিত, নচেৎ অচল বলে অগ্রাহ্য করতেন এবং বলতেন, এসব নির্দেশ রসূল সা.-এর আমলে আরব জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এগুলো হুবহু কার্যকরী করা অন্যদের জন্য জরুরি নয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহও এরূপ নীতি অনুসরণ করতেন বলে জানা যায়। এ মহলটি কুরআনী চিন্তাধারার ধারক বাহক বলে পরিচিত এবং তাদের মতামত আমি সংক্ষেপে আপনাকে অবহিত করলাম। আমার জিজ্ঞেস এই যে, এই মতামত ও চিন্তাধারা হাদিস অমান্য করার সমর্থক কিনা? রসূলের নির্দেশাবলীকে শুধুমাত্র রসূলের জীবনকালেই অনুকরণীয় মনে করা এবং উল্লেখিত প্রাচীন মুসলিম মনীষীগণও এরূপ মনে করতেন বলে বিশ্বাস করা সঠিক কিনা?

জবাব : আপনি স্বীয় চিঠিতে যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, সেগুলো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত আলোচনা করা সংক্ষিপ্ত চিঠির আকারে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন

সুদীর্ঘ নিবন্ধ অথবা সুপরিসর গ্রন্থ রচনা। আল্লাহর শোকর যে, বিশিষ্ট আলেমগণ বিস্তৃত নিবন্ধ ও বই পুস্তক লিখে প্রয়োজন অনেকাংশে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই আমি শুধু আপনার চিঠির দাবি অনুসারে এ সংক্রান্ত কিছু নীতি বক্তব্য পেশ করবো। সর্বপ্রথম কথা এই যে, যারা মনে করেন, রসূল সা. স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা কুরআনের অতিরিক্ত হয়ে থাকলে তার অনুকরণ করা কেবল তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবাদের জন্যই বাধ্যতামূলক। এর অর্থ দাঁড়ায় তাদের মতে হাদিস স্বীকার করা আর অস্বীকার করা একই কথা। তারা নিজেদের মনগড়া মাপকাঠিতে যাচাই করে যদি কোনো হাদিসকে সহীহ এবং কুরআন ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেনও, তবে তার বাস্তব ফল এর চেয়ে বেশি কিছু হবেনা যে, তাঁরা ঐ হাদিসকে কেবল বিশুদ্ধ মেনে নিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন। তারা বড়জোর এই বলে একটি বাস্তবতার স্বীকৃতি দেবেন যে, অমুক হাদিস যথার্থই রসূল সা.-এর একটি তৎপরতার স্বাক্ষর বহন করে। এতোটুকু স্বীকৃতি দিয়েই তাদের কাজ শেষ। এ ব্যাপারটা অবিকল এ রকম যে, 'দি ক্যাপিটাল' কার্লমার্কসের লেখা বই, বা 'আরমাগানে হিজায' ইকবালের একটি কাব্য গ্রন্থ বলে কেউ একটি বাস্তবতার স্বীকৃতি দিলো। এরপর প্রশ্ন ওঠে যে, একটা জিনিসকে সত্য ও সঠিক বলে মেনে নেয়ার পর তার বাস্তব অনুসরণ করা হবে কিনা, এ প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই অবান্তর। বড়জোর তারা ততোদূরও যেতে পারেন যে, 'রাষ্ট্রনায়ক' বা 'জাতির নেতা' যদি হাদিসটিকে কার্যোপযোগী মনে করে তার বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহলে হাদিসটি অনুসারে তারা কাজও করতে ইচ্ছুক হবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও হাদিসের আনুগত্য এ জন্য করা হবেনা যে, ওটা রসূলের কথা বা কাজের বাহন। বরং 'রাষ্ট্রনায়ক' তার মঞ্জুরি দিয়েছেন ও আমলযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন বলেই তার আনুগত্য করা হবে। রাষ্ট্রনায়ক যদি হাদিসকে না-মঞ্জুর কিংবা সংশোধনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহলে তারা বড়জোর এতোটুকু করবেন যে, সহীহ হাদিসটিকেও একটা ঐতিহাসিক কীর্তি হিসেবে মেনে নিয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিক কীর্তির ন্যায় নির্দিষ্ট সংরক্ষণাগারে রেখে দেবেন। কেননা ইতিহাস চাই আলেকজান্ডার কিংবা নেপোলিয়নের হোক, চাই আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ সা.-এর হোক, তা ইতিহাসই। তার অনুসরণ করার তো কোনো বাধ্যবাধকতা থাকেনা।

আমার মতে, এই মহান তত্ত্বের প্রবক্তাদের হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করার জন্য তাত্ত্বিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠি সংগ্রহ করার এতো ঝামেলা পোহানোর কোনো প্রয়োজন ছিলনা। তারা বরঞ্চ একটা কথার উপরই অনড় হয়ে থাকলে পারতেন। সে কথাটি হলো, তাদের কথিত 'কুরআনি সরকার' যে হাদিসকে স্বীকৃতি দেবে, সেটাই চলবে। আর যে হাদিসকে সেই সরকার সমকালীন পরিস্থিতি ও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করবে, সে হাদিস অচল মুদ্রার মতো

টাকশালের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। তবে যদি মতলবখানা এই হয়ে থাকে যে, হাদিস অমান্য করার গুরুতর দায় এড়ানো এবং মুসলিম গণরোধ থেকে বাঁচার জন্য তারা মুখে হাদিসের স্বীকৃতি দান এবং কাজে তা অস্বীকার করার ফন্দি এঁটে থাকেন, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

রসূল সা.-এর আদেশ ও নিষেধ, তাঁর ফরমান ও সিদ্ধান্ত এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে দেয়া তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার বাধ্যবাধকতাকে শুধুমাত্র রসূল সা.-এর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমিত করার জন্য এ মহলটি রসূলের রিসালাত ও শাসকসূলভ মর্যাদার মধ্যে বিভেদ রেখা টানার পক্ষে যে বক্তব্য দিয়েছে, সেটাও একটা নিরর্থক ভাওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। এ কথা তো অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, রসূল সা. মুসলমানদের শাসক এবং রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন, বিচারকও ছিলেন, সেনাপতিও ছিলেন এবং আরো বহু দিক দিয়ে তিনি মুসলমানদের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু নবী ব্যক্তিত্বের এইসব দিকগুলো আসলে তার রসূলসূলভ পদমর্যাদারই বিভিন্ন দিক ও বিভাগ। এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা এবং একটিকে চিরস্থায়ী ও অপরটিকে অস্থায়ী আখ্যায়িত করার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বাতিল ও অযৌক্তিক। এসব রকমারি মর্যাদা ও ভূমিকার মধ্য দিয়েই রিসালাতের দায়িত্ব ও রসূলসূলভ তৎপরতার বিকাশ ও স্ফূরণ ঘটেছে। প্রতিটি ভূমিকায় রিসালাতের মাহাত্ম্য প্রতিফলিত এবং নবুওয়তের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। এগুলোর কোনোটিকে নবুওয়ত ও রিসালাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নবুওয়াত ও রিসালাত কাকে বলে, সেটাই বুঝা মুশকিল হয়ে পড়বে। এসকল ভূমিকায় রসূল সা. যেসব উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, তার সবই প্রকৃতপক্ষে রিসালাতের দায়িত্ব পালনেরই বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় বিশেষ। এ সমস্ত তৎপরতা ও ভূমিকাকে কুরআন ও হাদিস উভয়টিতেই এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি অপরটির সাথে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য, তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সেখানে রিসালাত ও রাষ্ট্রনায়কত্বের মাঝে কোনো বিভক্তি রেখা যেমন টানা হয়নি, তেমনি এমন তত্ত্বও উপস্থাপন করা হয়নি যে, মুহাম্মদ সা.-এর যেসব কথা ও কাজ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কেবল সেগুলোই তাঁর সুন্নত ও অনুকরণীয় আদর্শ এবং কেবলমাত্র সেগুলোরই আনুগত্য করা চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। কুরআনের বাইরে যদি রসূল সা.-এর কোনো কথা ও কাজের বিবরণ থেকে থাকে, তবে তাকে তাঁর সুন্নত ও আদর্শ বলা যাবেনা, বরং সেটা কেবল একজন নেতা ও শাসকের কথা ও কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং তা তার শাসনামল অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর অনুকরণযোগ্য থাকবেনা। এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, শুধু কুরআনকেও যদি মানা হয়, তাহলে এতেও রসূল সা.-এর অনুকরণীয় জীবনাদর্শের এমন বহু দিক আলোচিত হয়েছে, যা তাঁর শাসকসূলভ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বলা যায়। এখন যদি রসূল সা.-এর শাসকসূলভ

পদমর্যাদার কর্তব্য ও অধিকারকে রসূলসূলভ পদমর্যাদা থেকে আলাদা করে পূর্বোক্তগুলোকে সাময়িক ও অস্থায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে একথা না মেনে উপায় থাকেনা যে, নবী জীবনের নেতৃত্ব– কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত যেসব শিক্ষা খোদ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তাও মেনে চলার কোনো চিরস্থায়ী বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ এ ধারণা একেবারেই বাতিল, অন্যায় এবং স্বয়ং কুরআনেরই সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী। যারা এই বিভেদ নীতির প্রবক্তা, এটা তাদেরও সেই চিন্তাধারার বিরোধী, যার আওতায় তারা অনুগ্রহ করে কুরআন বর্ণিত নবী জীবনের আদর্শকে 'সুন্নতে রসূল' বলে মানেন এবং নিজেরাও তা মেনে চলতে চান।

এবার যেসব যুক্তি প্রমাণের আলোকে তারা রসূল সা.-এর রসূলসূলভ ও শাসকসূলভ ভূমিকায় পার্থক্য করেন, সেই যুক্তি প্রমাণগুলো কতদূর ধোপে টেকে, তা খতিয়ে দেখা যাক্ তাঁরা একটি যুক্তি দেখান এই যে, হাদিসে রসূল সা. স্বয়ং তার মানবসূলভ ও নবীসূলভ মর্যাদায় পার্থক্যের কথা বলে কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন ও স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে, তারা এ সংক্রান্ত দু'একটা হাদিসকে অন্তত সহীহ মেনে নিয়ে তা দ্বারা ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে অক্ষম, এসব হাদিস দ্বারা রসূল সা.-এর রিসালাত ও রাষ্ট্রনায়কত্বের মাঝে বিভাজন রেখা টেনে একটিকে স্থায়ী ও অপরটিকে সাময়িক আখ্যায়িত করার তত্ত্বটি কিভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, রসূল সা.-এর মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পথপ্রদর্শক সূলভ ও শাসকসূলভ দায়িত্ব পালনকালে ঘোষিত নির্দেশাবলী ও উক্তিসমূহ কি একই ধরণের? একথা সত্য যে, রসূল সা. দ্বারা কখনো কখনো কিছু একান্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রমধর্মী স্বভাবসূলভ কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে, যার আনুগত্য করা আমাদের জন্য শরিয়ত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীর আলোকে এরূপ সাধারণ মূলনীতি উদ্ভাবন করা কি কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব যে, রসূল সা. মুসলমানদের নেতা, পথপ্রদর্শক, শিক্ষাগুরু ও শাসক হিসেবে সমগ্র জীবনব্যাপী যে অবদান ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তার কোনো কিছুই আর আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়? অথচ তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ শুধু সাহাবায়ে কিরামকে নয় বরং অনাগত কালের সকল মুসলমানকেই দেয়া হয়েছে।[১]

---

১. এ ধরনের নির্দেশ সম্বলিত হাদিস অনেক রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, "তোমরা আমার মৃত্যুর পর অমুক অমুক ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে অমুক অমুক কর্মপন্থা অবলম্বন করবে।" যেসব হাদিস গ্রন্থ থেকে রসূলের নবীসূলভ মর্যাদা ও মানবসূলভ মর্যাদা সংক্রান্ত হাদিসগুলোর উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে, এসব হাদিস সেইসব গ্রন্থেই রয়েছে। এসব হাদিসের 'গুরুত্ব ও উপকারিতা' সম্পর্কে হাদিস অমান্যকারী মহলের অভিমত কি, তা অবশ্য জানা যায়নি।

রসূল সা.-এর নির্দেশাবলীকে অস্থায়ী ও সাময়িক প্রমাণ করার জন্য আরো একটা যুক্তি দেয়া হয়েছে এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন বহু ক্ষেত্রে রসূল সা.-এর আদেশের পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে হযরত ওমরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও আমাকে দু:খের সাথে বলতে হচ্ছে, এ অভিযোগ আরোপ করার সময়ও ঘটনাবলীর একপেশে ও বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরে একটা ব্যতিক্রমী বিষয়কে সাধারণ নিয়ম হিসেবে বড় করে দেখানো হয়েছে। কতিপয় অভিজ্ঞ আলেম এ ধরনের ঘটনাবলীকে একত্র করে ও সেগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়ে এ অভিযোগের রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীন রসূল সা.-এর সুন্নত থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। যে বিষয়গুলোকে হযরত ওমরের নতুন উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে হয় কুরআন ও হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিলনা, নচেত থাকলেও তাতে এতো প্রশস্ততা ছিলো যে, তার বাস্তবায়নে একাধিক কর্মপন্থা অবলম্বনের অবকাশ ছিলো।

এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ আমি দিতে চাইনা। তার পরিবর্তে আমি আশা করবো যে, আপনি তথাকথিত কুরআনি চিন্তাধারার প্রবক্তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করবেন, যেসব গ্রন্থে তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের এইসব কল্পিত সুন্নত বিরোধী তৎপরতা খুঁজে হিমসিম খাচ্ছেন, সেখানে কি তারা এমন তথ্যও দেখতে পাননি যে, এই খোলাফায়ে রাশেদীনই খেলাফাতের বাইয়াত তথা অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় এই বলে অঙ্গীকার করতেন সব সময় আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নত অনুসারে পদক্ষেপ নেবো? শুধু তাই নয়, খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের প্রত্যেকে প্রকাশ্য জনসমাবেশে মুসলমানদেরকে বলতেন :

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا اعصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم

"তোমরা কেবল ততোক্ষণ আমার কথামত চলবে যতোক্ষণ আমি আল্লাহ ও রসূলের অনুগত থাকবো। যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবো, তখন আর আমার কথামত চলতে তোমরা বাধ্য থাকবেনা।"

এসব খলিফার সামনে যখনই কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতো। তারা প্রথমে আল্লাহর কিতাবের এবং তার পরে নিজেদের জানামতে রসূলের হাদিসের শরণাপন্ন হতেন। নিজের জ্ঞানে না কুলালে মজলিসে শূরার সদস্যদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন যে, আপনাদের কারো কাছে রসূল সা.-এর এমন কোনো উক্তি জানা আছে কিনা, যার আলোকে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। সেখানেও যদি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না পাওয়া যেতো, তাহলে সর্বস্তরের মুসলিম জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয়া হতো যে, অমুক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূল সা.-এর কোনো ফরমান কারো জানা থাকলে সে যেনো

তা অবিলম্বে জানায়। এভাবে কারো কাছে রসূল সা.-এর কোনো ফরমান পাওয়া গেলে খলিফা তৎক্ষণাৎ বলে উঠতেন :

الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ علينا ديننا

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রেখেছেন, যিনি ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর।"
সেই সাথে সত্যনিষ্ঠ খলিফা নিজের অজ্ঞতার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে বলতেন : الهانى الصفق بالاسواق

"ব্যবসায়ের ব্যস্ততা আমাকে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রেখেছে।"[১]

এমনকি ক্ষমতাসীন খলিফা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন এবং তারপর রসূল সা.-এর কোনো দৃষ্টান্ত অবগত হতেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করতেন যে, অজ্ঞতাবশত রসূল সা.-এর একটি নির্দেশ লংঘন থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। প্রাদেশিক গভর্ণর, বিচারক ও শিক্ষকগণকে এই মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দায়িত্বে নিয়োগ করা হতো যে, প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে করণীয় খুঁজে নেবে। সেখানে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনার সন্ধান না পেলে বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া মূলনীতি ও চেতনার আলোকে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা উদ্ভাবন (এক কথায় 'ইজতিহাদ') করবে। এ ধরনের বর্ণনা হাদিসগ্রন্থ, সীরাতগ্রন্থ ও ইসলামি ইতিহাস গ্রন্থসমূহে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং একই গ্রন্থে বারংবার রয়েছে। এগুলোকে উপেক্ষা করে কেউ যদি কেবল নিজের মতলব সিদ্ধির সহায়ক ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলোকেই খুঁজে বেড়ায় তবে তার তুলনা এমন ব্যক্তির সাথেই করা যায়, যে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে রক্ষিত মাইলফলক দেখতে পায়না, অথচ অন্ধকার কক্ষে কোনো ক্ষুদ্র কণিকাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। সত্যানুসন্ধানীদের রীতি এটা নয় যে, তারা প্রথমে নিজেদের ইচ্ছেমত একটা মতবাদ বানিয়ে নেবে, অতপর তার সপক্ষে কোথাও একটা তিল পাওয়া গেলেও তাকে তাল বানিয়ে দেখবে আর বিপক্ষে পাহাড় সমান প্রমাণ পাওয়া গেলেও তার অস্তিত্বই অস্বীকার করবে। যারা বড় গলায় দাবি করেন, কুরআনের দলিল ছাড়া আমরা মুখে গ্রাস তোলারও সাহস করিনা। তাদের আপন দাবির কিছুটা তো সম্মান রাখা উচিত।

যাহোক, যে ব্যক্তি বাস্তব ঘটনাকে নিজের মর্জি মোতাবেক সাজানোর রোগে আক্রান্ত নয়, সে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে কখনো এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনা যে, এসব খলিফা নিজেদেরকে রসূলের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও

---

১. এটি হযরত ওমরের উক্তি।

তথা সুন্নাহ অনুসরণে বাধ্য মনে করতেননা, বা তার বিরুদ্ধে চলার এখতিয়ার রাখেন বলে মনে করতেন। এ অভিযোগটা বিশেষভাবে হযরত ওমরের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয় এবং তাঁর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা সিদ্ধান্তকে এর প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। অথচ হযরত ওমরের শাসনামল প্রায় দশ বছর ছিলো এবং এই মেয়াদকালে তিনি শত শত কেনো হাজার হাজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বলবৎ করেছেন বললে অত্যুক্তি হবেনা। এর মধ্য থেকে মাত্র চল্লিশ বা পঞ্চাশটা সিদ্ধান্ত যদি এমন পাওয়া যায়, যা আপাত দৃষ্টিতে রসূলের সুন্নাহের পরিপন্থী বলে মনে হয়। তাহলে প্রথমত এটা এই অভিযোগের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। উপরন্ত যখন দেখা যায়, এ কয়টা উদাহরণ দ্বারাও বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য অস্বাভাবিক রকমের ঘুরপ্যাচের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং জেনেশুনে তার সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বা ঘটনাকে বিকৃত করে সুন্নাহর আনুগত্যের বিরুদ্ধাচরণ বানিয়ে দেখানো হয়েছে, তখন তথাকথিত এই সব 'কুরআনী চিন্তাধারা'র প্রবক্তাদের সততার প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মে। আমি এখানে নমুনাস্বরূপ মাত্র একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। হযরত ওমর সম্পর্কে এই মহলটি বলে থাকে, তিনি তওয়াফের সময় ঘাড় দুলিয়ে চলা জরুরি মনে করতেননা। কেননা রসূল সা. তো শুধুমাত্র প্রতাপ ও বিক্রম প্রদর্শন ও কাফেরদেরকে শংকিত করার উদ্দেশ্যেই এ নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলাম বিজয়ী হয়ে যাওয়ার পর তার আর দরকার নেই।

এখন দেখুন, সহীহ হাদিসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেটা এই যে, হযরত ওমর 'রামাল' অর্থাৎ ঘাড় দোলানো পরিত্যাগ করার ইচ্ছে করেছিলেন সত্য। কেননা বাহ্যত তার প্রয়োজন অবশিষ্ট ছিলনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে ভিন্ন চিন্তার উদয় হলো এবং তিনি বললেন :

شيئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه

"রসূল সা. যে কাজ করেছেন, তা ত্যাগ করা আমরা পছন্দ করিনা।"

বুখারির হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে হাদিস অস্বীকারকারী মহল অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারণা চালিয়ে থাকে যে, তিনিও নাকি হাদিস মানতেন না এবং তাঁর গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা থেকে তারা হাদিসের অগ্রাহ্যতার পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ যোগাড় করার চেষ্টা করতে অভ্যস্ত। অথচ সেই শাহ ওয়ালিউল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে এই ঘটনা উদ্ধৃত করার পর তিনি লেখেন : "হযরত ওমর রামাল ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, ওটা যে কারণে প্রবর্তিত হয়েছিল তা আর অবশিষ্ট ছিলনা। কিন্তু ثم خشى عمران يكون له سبب اخر পরক্ষণেই ওমর ভয় পেয়ে গেলেন এবং ভাবলেন, এর পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে, যা তাঁর জানা নেই।"

ভাবতে অবাক লাগে, যে ওমর রা. সুন্নতের ব্যাপারে এতো সতর্ক ও সচেতন ছিলেন যে, দৌড়ানোর সময় বিশেষ ধরণের ঘাড় দোলানোকে পর্যন্ত বদলাতে সাহস পাননি এবং শংকিত ছিলেন যে, খোদা না করুন, এতে রসূল সা.-এর বিরুদ্ধাচারণের দায়ে দোষী হয়ে যেতে হয় কিনা, সেই ওমর রা.-এর উপর সুন্নত পরিত্যাগ এবং সুন্নতের রদবদল বা রহিতকরণের অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে![১]

হযরত ওমর রা. ও অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে সুন্নাহ বর্জন ও হাদিস অগ্রাহ্য করার যে দোষারোপ করা হয়, তার অবস্থাও তদ্রুপ। সত্য ও বাস্তবতার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। আলেম সমাজ এ অভিযোগের বিশদ জবাব দিয়ে তা খণ্ডন করেছেন। আমি এ ব্যাপারে শুধু এতোটুকু কথাই বলবো, ইমাম আবু হানিফা ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন ও প্রণয়নে যে অবদান রেখে গেছেন এবং হাদিস সম্পর্কে তাঁর যে অবস্থান ছিলো, তা ইতিহাসের কোনো হারানো অধ্যায় নয় যে, ইতিহাস ও কাব্য গ্রন্থে নতুন করে তার সন্ধান চালানোর চেষ্টা করতে হবে। উপরন্তু কোনো ব্যক্তির মতামত জানার এটা কোনো সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা নয় যে, সেই ব্যক্তি নিজে এবং তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা তাঁর মতামতকে যেভাবে তুলে ধরেন, তা উপেক্ষা করে যারা তাঁর বিরোধিতার মনোভাব বা তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে এবং সঠিকভাবে তাঁর মতামত জানেওনা, তাদের কাছ থেকে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ কথা সত্য, ইমাম সাহেবের ইজতিহাদী কর্মে হাদিসের দুর্বলতা ও বিশুদ্ধতা যাঁচাই এবং হাদিসের স্বল্পতা ও কিয়াসের আধিক্য সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিতর্ক আগেও ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু তাঁর কোনো কট্টর বিরোধী ব্যক্তিও ইনসাফের সাথে বিবেচনা করলে তাঁকে হাদিস অস্বীকারের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেনা, কিংবা এমন অপবাদও তাঁর উপর আরোপ করতে পারেনা যে, সহীহ হাদিসকেও তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করতেন যে, এর প্রয়োগের সময় বাসি হয়ে গেছে। যে ইমামের ঘোষণা ছিলো : "যখন কোনো ব্যাপারে সহীহ হাদিস পাওয়া যাবে তখন সেটাই হবে আমার নীতি" এবং যিনি বলতেন যে :

"لو لا السنة ما فهم احد منا القران"

"হাদিস যদি না থাকতো তবে আমরা কেউ কুরআন বুঝতে পারতাম না।"

এবং "لولا الحديث لقلت بالقياس"

---

১. এটা হযরত ওমরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের কারসাজিও হতে পারে। কেননা তিনি হাদিস অমান্য করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আগাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করে গেছেন। সুনানে দারামীতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন : কিছু লোক আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এ ধরনের ঝগড়াটে লোকদেরকে হাদিস দ্বারা রুখে দাঁড়িও। কেননা যারা হাদিসের চর্চা করে, তারাই কুরআনে অধিক পারদর্শী।

"হাদিস যদি না থাকতো তবে আমি কিয়াসের সাহায্য নিতাম।"

যিনি অন্যান্য মাযহাবের বিপরীত এবং কিয়াসের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও নামাযে অট্টহাসি করলে অযু ভেঙ্গে যাবে বলে রায় দেন শুধু এ জন্য যে, হাদিসে এরূপ বিধান বর্জিত হয়েছে, যে ইমামের অনুসারীরা তাদের অনুসৃত কোনো নীতি বা বিধির সপক্ষে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় বিশুদ্ধতর হাদিস না থাকলেও অন্তত সমমানের শুদ্ধ ও সহীহ হাদিস যেনো থাকে, সেজন্য সর্বাত্মক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতেন এবং সর্বোপরি যে ইমাম একটি দুর্বল হাদিস থাকতেও কিয়াসের আশ্রয় নেয়ার পক্ষপাতী নন, বরং দুর্বল হাদিসটিকেই অগ্রগণ্য মনে করেন, সেই ইমামের বিরুদ্ধে হাদিস অমান্য করার অপবাদ রটানো এক নিদারুণ অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। *[তরজানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫৮]*

৫৯. হাদিস বিরোধী গোষ্ঠির বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উম্মত তার সমগ্র ইতিহাসে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত দু'টো বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত ছিলো। প্রথমত, এই উম্মতের ইতিহাসে এমন কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যায়না যে, কোনো নবুওয়তের দাবিদার নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে নিজের মিথ্যে নবুওয়তের প্রচারের সুযোগ পেয়েছে এবং এর সুবাদে একটা আলাদা দল বা গোষ্ঠি গড়ে উঠতে পেরেছে। আর সেই দল অবাধে নিজের মতবাদের প্রচার ও চিন্তাধারার বিস্তার ঘটিয়ে এবং স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে এই উম্মতেরই ক্রোড়ে বিকাশ লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম উম্মাহ কখনো নিজের সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে এমন কোনো গোষ্ঠিকে গড়ে উঠা ও বিকাশ লাভ করার সুযোগ দেয়নি, যে কুরআন ব্যতীত ইসলামি আইনও বিধানের দ্বিতীয় কোনো উৎসর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা এবং মুসলমানদের উপর সেই উৎসের আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে করেনা। এ কথা সত্য, মুসলিম উম্মাহর ভেতরে এযাবত বেশ কয়েকজন মিথ্যা নবী আবির্ভুত হয়েছে। তবে তাদের প্রত্যেকের এতোদসংক্রান্ত প্রচারণাকে প্রথম সুযোগেই এমনভাবে নির্মুল করে দেয়া হয়েছে যে, ইতিহাসের পাতায় সেটা নিছক একটা শিক্ষামূলক ঘটনা হয়ে রয়েছে। অনুরূপভাবে দু'একটা গোষ্ঠি রসূল সা.-এর কথা ও কাজকে শরিয়তের উৎস হিসেবে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে তাদের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও আকীদা শাস্ত্রীয় মতবাদকে খণ্ডন করে এমন হাদিসগুলোকেই তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। কিন্তু উম্মাহর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনতিবিলম্বেই তাদেরকে বয়কট করেছে এবং তারপর মুসলিম জাতি শত শত বছরব্যাপী এ ধরণের লোকদের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত থেকেছে। আসলে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর হৃদয়ে স্বীয় নবীর প্রতি এমন নজীরবিহীন ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তার সামষ্টিক

বিবেক সব সময় এ ধরনের লোকদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার ও চুলচেরা তত্ত্বকথা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছে এবং কখনো তাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সার্বজনীন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে দেয়নি। গভীর নবীপ্রেমে উজ্জীবিত এই মুসলিম উম্মাহ স্বীয় নেতা ও পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতিটি পদক্ষেপকে আপন জীবন পথের অভিযাত্রায় একমাত্র দিকনির্দেশক হিসেবে বহাল রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যজনক উদাসীনতার কুফলস্বরূপ বিগত শতাব্দীতে মিথ্যা নবুওয়ত ও হাদিস অমান্য করা– এই উভয় গোমরাহী আমাদের সমাজে জন্ম নিয়েছে এবং আমাদের মধ্যে তার বিকাশ ও বিস্তার অব্যাহত রয়েছে। একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মিথ্যা নবুওয়তের তুলনায় হাদিস অমান্য করার ভ্রষ্টতা অনেক বেশি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। এর কারণ, প্রথমোক্ত গোষ্ঠির আহ্বান এক বিকৃত ব্যক্তিত্ব ও তার অবাঞ্ছিত দাবিদাওয়ার প্রতি এবং তা স্বভাবতই কোনো মুসলমানের মধ্যে আকর্ষণ ও সম্মোহন সৃষ্টি করতে অক্ষম। এ গোষ্ঠির দাওয়াত ও প্রচারণা যে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর নামান্তর, তা অনেকটা স্পষ্ট। কিন্তু শেষোক্ত গোষ্ঠির দাওয়াত আপাত দৃষ্টিতে খুবই নির্দোষ ও চমকপ্রদ মনে হয়। বাহ্যত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এরা শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবের দিকেই মানুষকে ডাকে এবং কুরআনকেই মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বানাতে তৎপর। এজন্য একজন মুসলমানের পক্ষে সহজেই তাদের প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সে এটা টেরই পায়না যে, এই গোষ্ঠির আসল লক্ষ্য হলো কুরআন ও হাদিসের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি এবং অবশেষে কুরআনকে তার বাহকের মৌখিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মনগড়া রকমারি ব্যাখ্যার খেলনা পুতুলে পরিণত করা।

হাদিস অস্বীকার করার কুটীল মতবাদের প্রবক্তারা যেহেতু ভালো করেই জানে, রসূল সা.-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের সাথে মুসলমানদের কি অটুট ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি তাঁরা কতো প্রবলভাবে আকৃষ্ট ও নিবেদিত, তাই রসূল সা.-এর সুন্নত ও হাদিসের মর্যাদা তাদের মন থেকে নি:শেষ করা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বীতশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার মনোভাব জন্মানোর জন্য তারা হাদিসের বিরুদ্ধে নানা রকমের সন্দেহ সংশয়, আপত্তি, অভিযোগ ও কুপ্ররোচনা ছড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। এর ভেতরে যেসব অভিযোগ কিছুটা গুরুত্বের দাবিদার, তার অধিকাংশেরই জবাব আলেম সমাজের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। তথাপি অভিযোগকারীরা সেগুলোকে বিভিন্নভাবে নতুন করে তুলছে। তাই বিভিন্নভাবে সেগুলোর জবাব দেয়া এবং এইসব অভিযোগের যৌক্তিক বিভ্রান্তিগুলোর প্রতিটি দিক স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যাতে মুসলিম জনগণ এগুলোর অসারতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং চিন্তাভাবনা না করেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার খপ্পড়ে না পড়ে। এই দিকটা বিবেচনা করেই এখানে এই মহলের কয়েকটি মৌলিক অভিযোগের উদ্ধৃতি ও তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

আমি আপাতত, হাদিস বিরোধী গোষ্ঠির প্রধান প্রধান তিনটি অভিযোগের জবাব দিচ্ছি। এ তিনটি অভিযোগকে তারা খুবই জোরেশোরে বারবার উল্লেখ করে থাকে। প্রথম অভিযোগ এই যে, ইসলামে যদি হাদিসের তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকতো এবং তা যদি ইসলামি বিধানের চিরন্তন ও উচ্চতর কোনো সনদ বা উৎস হতো, তাহলে রসূল সা. যতোটা গুরুত্ব সহকারে কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে লিখিয়ে নিতেন, ঠিক ততোটা গুরুত্ব দিয়েই প্রতিটি হাদিসকে লিখিয়ে রেখে যেতেন। যে জিনিসকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করে অন্যদের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়নি, সেটা একটা চিরন্তন ও অবশ্য পালনীয় আইনের মর্যাদা কিভাবে পায়?

দ্বিতীয় অভিযোগটা হলো, হাদিস যদি কুরআনের মতোই ইসলামি বিধানের উৎস হয়ে থাকে, তাহলে হাদিসের একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ থাকা উচিত ছিলো, যাতে যাবতীয় হাদিস লিপিবদ্ধ থাকতো এবং জোর দিয়ে দাবি করা যেতো যে, কোনো হাদিস এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। নচেত ইসলামের উৎস অসম্পূর্ণ থাকলে স্বয়ং ইসলামের ও ঈমানের অসম্পূর্ণ থাকা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের তৃতীয় আপত্তি হলো, যেসব হাদিস গ্রন্থ আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে বহুসংখ্যক হাদিসের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা বিতর্কিত। কিছু হাদিস দুর্বল এবং কিছু হাদিস মনগড়া কৃত্রিম। অথচ কুরআনের ব্যাপারে এ ধরনের কোনো বিতর্ক বা বিভ্রাট নেই এবং তার কোনো আয়াত দুর্বল বা কৃত্রিম নয়। যে জিনিস ইসলামের মৌলিক দলিল ও উৎস হবে, তার সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভেজাল হওয়া আবশ্যক।

এই ক'টা আপত্তি ও অভিযোগের ভিত্তিতে হাদিসবিরোধী গোষ্ঠি যুক্তি দর্শায় যে, একমাত্র কুরআনকেই ইসলামের চূড়ান্ত সনদ ও উৎস বানানো আল্লাহর ইচ্ছে ছিলো বিধায় রসূল সা. কুরআনকে নিজের তত্ত্বাবধানে পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাকে সর্ব প্রকারের বিকৃতি ও খুঁত থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু হাদিসকে ইসলামের উৎস বানানো আল্লাহর ইচ্ছে ছিলনা। তাই আল্লাহ ও রসূল সা. তার সংরক্ষণের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করেননি।

উপরোক্ত আপত্তি ও অভিযোগ কয়টি যে বহুসংখ্যক বিভ্রান্তি ও প্রতারণার সমষ্টি, তা একটু চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম আপত্তিটির মধ্য দিয়ে পাঠককে একটা মরাত্মক ভুল ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটি হলো, আজকাল কোনো শাসক বা আইন প্রণেতা যেমন সচরাচর নিজের জারিকৃত নির্দেশ বা আইন লিখিত বা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ও বাধ্য থাকে, তেমনিভাবে আল্লাহ এবং তাঁর নবীগণও হয়তো নিজের নির্দেশনাবলীকে নির্ভরযোগ্য ও কার্যোপযোগী বানানোর জন্য তা যথারীতি লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য।

বিশেষত, যেসব বিধানকে পুরুষানুক্রমিকভাবে চিরদিনের জন্য অবশ্য পালনীয় করা প্রয়োজন। সেগুলোকে তো একটা গেজেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করতেই হবে। নচেত পৃথিবীতে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

এই ধারণা ও চিন্তাধারা সর্বোতভাবে বাতিল, অযৌক্তিক ও অচল। এ ধারণা যদি সঠিক হতো, তাহলে আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠানোর পর তাকে সর্বপ্রথম লেখা শেখাতেন। তারপর প্রত্যেক নবীর উপর হয় লিখিত নির্দেশ নাযিল করতেন, নতুবা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নেয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক করে দিতেন। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা এ ধরনের কোনো চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন– এই মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না এবং এর সপক্ষে কোনো যুক্তিও নেই। কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের লোকেরা সকল যুগেই লিখতে জানতো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রতিটি নির্দেশকে লিখিতভাবে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ ও অন্যদের কাছে হস্তানতর করতো। পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম আ. এর পূর্বে কোনো নবী কোনো কিতাব বা সহীফা (পুস্তিকা) পেয়েছেন বলে উল্লেখ নেই। হযরত ইবরাহীমের যুগ খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর বা তার চেয়েও আগে ছিলো বলে মনে করা হয়। কুরআনের পর অন্য যে জিনিসটি হাদিসবিরোধী মহলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য। সেই ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে, মানুষ তার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই লেখাপড়া শিখে ফেলেছিল। এ যাবতকার নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকেও এ কথাই জানা যায় যে, বর্ণমালা সদৃশ্য কিছু প্রতিকী নিদর্শনাবলী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের আদিমতম কৌশলটিও চার হাজার বছরের আগেকার মানুষের আয়ত্তে আসেনি। এখন প্রশ্ন জাগে, লিখিত হওয়াটাই যদি আল্লাহর ওহীর সংরক্ষণ ও বিশ্বাসযোগ্যতার একমাত্র ও অনিবার্য উপায় হয়ে থাকে, তাহলে যে যুগে মানুষ এ কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো, তখন কি নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের কাছে আল্লাহর বিধানের সংরক্ষিত থাকা ও অন্যদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপায় আদৌ ছিলনা?

তাছাড়া এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নয় যে, কোনো যুগে কোনো এক বা একাধিক মানবগোষ্ঠি লেখাপড়া শিখে ফেলেছিল, কিন্তু সামাজিক ও পরিবেশগত যোগাযোগের অসুবিধার কারণে অন্যান্য জাতি তৎকালে বা তার পরবর্তী অবধি সেটা শিখতে পারেনি। অথচ কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে, প্রত্যেক মানব গোষ্ঠির কাছে পথপ্রদর্শক ও নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, দুনিয়ার যে অংশের মানুষ লেখাপড়া জানতো এবং আল্লাহ তায়ালার ওহী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল, তাদের কাছে এবং তাদের বংশধরদের কাছেই শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধান পৌছানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে

প্রতিপালিত হয়েছিল, আর যে অঞ্চলের মানুষ এবং যেখানকার নবী ও তাঁর অনুসারীরা নিরক্ষর ছিলো বিধায় ওহীকে লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি, সেসব জাতি ও তাদের পরবর্তী বংশধরের কাছে নবী আসা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালিত হয়নি?

এ দিকটা বিচার বিবেচনা করলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে, রসূলের হাদিস তো দূরের কথা, খোদ আল্লাহর বাণীর বিশ্বাসযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য হওয়ার জন্যও তার লিখিত হওয়া জরুরি নয়। বরঞ্চ রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে তা লিপিবদ্ধ হবে, কি হবেনা, সেটা নির্ভর করে উক্ত নবী বা রসূলের আমলে বিরাজমান সুবিধা অসুবিধা এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি যদি আল্লাহর কালাম ও রসূলের বাণী তথা হাদিসকে লিপিবদ্ধ করে রাখার সহায়ক ও অনুকূল না হয়, তাহলে লিপিবদ্ধ নাহলেও কোনো দোষ নেই। যতোক্ষণ ওহীকে কাগজের পাতায় সংরক্ষনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, ততোক্ষণ আল্লাহ তাকে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। কুরআনের সব ওহী তো লিখিতভাবে নয়, বরং মৌখিকভাবেই নাযিল হতো। নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা রসূল সা.-এর মুখস্থ হয়ে যেতো। তারপর তিনি স্মৃতি থেকেই তা লিখাতেন। লেখার আগে ও পরে তা স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকতো।

এবার দ্বিতীয় অভিযোগের প্রসঙ্গে আসা যাক। অভিযোগটা হলো, হাদিসের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ হাদিস শাস্ত্রকে যদি ইসলামি বিধানের উৎস গণ্য করা হয়, তাহলে তাতে ইসলামই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর পয়লা জবাব হলো, হাদিসের যে সংকলন সংগ্রহ বর্তমানে আমাদের কাছে রয়েছে, কোনো জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই গোটা শাস্ত্রকে যদি ভক্তি শ্রদ্ধার মনোভাব ছাড়াই কেবল নিরপেক্ষ ও সুবিচারপূর্ণ দৃষ্টিতেও অধ্যায়ন করে, তাহলে এর অসম্পূর্ণতার অভিযোগ করাতো দূরের কথা, সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, পৃথিবীর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনবৃত্তান্ত, কথাবার্তা ও কার্যকলাপ এতো সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে, এতো বিস্তারিত, নিখুঁত ও নিপূণভাবে কখনো সংকলন করা যায়নি, করা সম্ভবও নয়। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, ও মুহাদ্দিসগণ রসূল সা.-এর জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে এতো বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে রেখে গেছেন যে, মানুষ তাকে অসম্পূর্ণ ভাবা তো দূরের কথা, অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে, এতো বেশি পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা কিভাবে সম্ভব হলো। এইসব মহান ব্যক্তিবর্গ এক একটি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য অথবা শুধুমাত্র তার সত্যতা যাচাই করার জন্য শত শত মাইল পথ ভ্রমণ করেছেন, নিজেদের গোটা জীবন এই কাজে নিয়োজিত করেছেন, এমনকি মৃত্যুর সময়ও এমন কোনো কোনো হাদিস বর্ণনা করে গেছেন, যার সম্পর্কে ধারণা ছিলো যে, হয়তো এটা আগে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি এবং তা

মানুষকে না জানিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে হয়তো গুনাহ্ হবে। এমতাবস্থায় এ কথা কারো কল্পনা করা কঠিন যে, রসূল সা.-এর কথা ও কাজের কোনো অংশ হাদিস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হতে বাদ পড়ে যেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, কোনো কথা ও কাজ যদি বর্ণনা থেকে বাদ পড়েও যেয়ে থাকে, তবে তাতে সামগ্রিকভাবে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয়না। আল্লাহ্ কোনো প্রাণীকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেননা এবং তার যাবতীয় কাজের ভিত্তি তার নিয়ত তথা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। আমরা রসূল সা.-এর সুন্নত তথা তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ ও আচরণকে ইসলামের উৎস মনে করার পরও যদি ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার কোনো অংশকে উপেক্ষা করি বা বাদ দেই, তাহলে আমাদের এ কাজটি যে আমাদের ঈমান ও দীনদারীর পরিপন্থী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রসূল সা.-এর কোনো কথা বা কাজ যদি অনিচ্ছাবশত: বাদ পড়ে যায় তবে তাতে আমাদের ঈমানদারি ও দীনদারীর কোনো ক্ষতি হয়না। তবে সে জন্য শর্ত হলো, যেটুকু আমাদের কাছে সংগৃহীত রয়েছে, তাকেও যেনো অসম্পূর্ণতার অজুহাত দিয়ে বর্জন না করি। কথাটা একটা উদাহরণ দিয়ে আরো পরিস্কার করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তো কোনো কথাই ওঠেনা। কারণ তার কোনো অংশ নষ্ট হয়নি এবং হবেওনা। কিন্তু পূর্বতন আসমানী কিতাবগুলোর ব্যাপার ভিন্ন। বেশ কয়েকটি আসমানী গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে হারিয়ে গেছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বনী ইসরাইল এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের যে ইতিহাস আমরা জানি, তা থেকেও এ তথ্য অবগত হওয়া যায় যে, আসমানী গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে তার অনুসারীদের শৈথিল্য ও উদাসিনতায় অমুসলিম হানাদারদের আগ্রাসন ও লুটতরাজ, অথবা যুগযুগান্তের আবর্তন বিবর্তন ও উত্থান পতনে সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানেও সেই একই প্রশ্ন জাগে। যাদের কাছে এইসব অসম্পূর্ণ ওহী বিদ্যমান ছিলো এবং এইসব দুর্যোগের পর যে সকল জাতির কাছে নতুন কোনো নবী আসেননি, নতুন আসমানী কিতাব আসেনি কিংবা ওহীর আলোকে সাবেক গ্রন্থের হারানো শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়নি, সেসব জাতির হেদায়াত প্রাপ্তির উপায় কি ছিলো? এর পরিষ্কার জবাব এই যে, সেইসব জাতির কাছে কালের আবর্তন থেকে রক্ষা পাওয়া আসমানী কিতাবের যে অংশটুকু অবশিষ্ট ছিলো, সেটুকুই মেনে চলতে তারা আর্দিষ্ট ছিলো এবং সেটুকুই তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি ও মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট ছিলো। তারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তার আনুগত্য করতে যদি কোনো ক্রটি না করে থাকে তবে তাদের ঈমান ও দীনদারীতে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই।

এখানে এ কথাও ভেবে দেখার মতো, কুরআনের আগে যে কিতাবগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর শুধু যে অংশবিশেষ হারিয়ে গেছে তা নয়। বরং তাতে ব্যাখ্যা,

নবীর কথা ও কাজের বর্ণনা নবী ও তাঁর সহচরদের জীবনেতিহাস, সমকালীন ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত এবং শরিয়তের বিধান ইত্যাদি যত্রতত্র সংযুক্ত ও মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে গেছে। যে ভাষায় সেই সব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল এবং লিখিত হয়েছিল, তার মূল লিপি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সময় সময় কেবলমাত্র অনুবাদ ও তথ্য অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এভাবে ঐসব আসমানী কিতাব শুধু অসম্পূর্ণই থেকে যায়নি, বরং একেবারেই বিকৃত হয়ে গেছে। এমনকি তার অনুসারীদের কাছে তা শোধরানোর কোনো উপায়ও ছিলনা। মুহাম্মদ সা. নবুয়ত লাভের অব্যবহিত পূর্বে ইহুদি ও খৃষ্টানরা যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসরণ করে চলছিল, তাতে কুরআনের বর্ণনা এবং আহলে কিতাব গোষ্ঠিদ্বয়ের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অত্যন্ত নৈরাজ্যজনক পর্যায়ে বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। এমনকি ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছেই এ রহস্য দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে এবং হযরত মুসা ও হযরত ঈসার জীবদ্দশাতেই তাদের উপর নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তাতে হযরত মুসার ইন্তিকাল ও হযরত ঈসার শূলে চড়ার বিবরণ কিভাবে স্থান পেলো? কিন্তু তবুও একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা যে, রসূল সা.-এর নবুওয়ত লাভ ও কুরআন নাযিল হওয়ার আগে এই গ্রন্থ দু'টিই তাদের জন্য আল্লাহর বিধান ও হেদায়াত লাভের একমাত্র উৎস ছিলো। আল্লাহর কথা, রসূলের কথা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তা ও গবেষণাপ্রসূত শরিয়তবিধি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে –এই অজুহাতে তখন ঐ দুইখানা আসমানী গ্রন্থকে শরিয়তের উৎস বলে কেউ অস্বীকার করেনি। আমাদের তো আল্লাহর লাখ লাখ শোকর আদায় করা উচিত যে, আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমাদের ক্ষেত্রে এমন উদ্বেগজনক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। আমাদের সমাজে শুরু থেকেই কুরআন, তাফসির, হাদিস ফিকাহ সবকিছুই পৃথক পৃথকভাবে আসল ও অবিকৃত অবস্থায় বহাল রয়েছে।

হাদিস বিরোধী মহলের মনে রসূল সা.-এর হাদিস ও সুন্নতের প্রতি যে অন্ধ বিদ্বেষ বিরাজমান, তারা যদি কিছুক্ষণের জন্য তার উর্দ্ধে উঠতে পারেন এবং উপরোক্ত তথ্যগুলো বিবেচনা করেন, তাহলে তারা তার ভেতরেই তাদের তৃতীয় ও সর্বশেষ অভিযোগের জবাবও পেয়ে যেতে পারেন। তথাপি আমি এই তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। এ কথা সত্য, বিদ্যমান হাদিস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের হাদিসের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেগুলোর ভেতরে পার্থক্য করা কষ্টকর হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে, তার কাছে এটা সুবিদিত যে, হাদিস শাস্ত্রবিদগণ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস দুর্বল ও কৃত্রিম হাদিস থেকে বাছাই করে পৃথক করে দিয়েছেন। এমনকি দুর্বল হাদিসের গ্রন্থই তারা আলাদাভাবে তৈরি করেছেন। সেই সাথে তারা হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ বাছবিচারের নীতিমালা এবং বিধিসমূহও রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো জাতি এমন সুক্ষ্ম তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও যাঁচাই বাছাইর উদাহরণ পেশ করতে পারবেনা। এসব বিধির আলোকে প্রত্যেক হাদিস শিক্ষার্থী বুঝে নিতে পারে যে, হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ কোন কোন যুক্তিপ্রমাণের কষ্টিপাথরে নিরূপণ করা হয়েছে এবং তা কতোখানি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী। হাদিস শাস্ত্রকারদের এমন বিস্ময়কর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য ছাড়াই যদি গোটা হাদিস সংকলন জগাখিচুড়ি আকারে আমাদের হাতে আসতো এবং আমাদের কাছে শুদ্ধ হাদিসকে অশুদ্ধ হাদিস থেকে বাছাই করার কোনো নিক্তি না থাকতো, তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা উদ্বেগজনক হতে পারতো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বিচলিত হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আরো আনন্দের ব্যাপার, যেসব হাদিসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে মুসলিম জাতির সংখ্যাগুরু সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তার সংখ্যা বিতর্কিত হাদিসগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। এমতাবস্থায় কেউ যদি একটি ক্ষুদ্র অংশকে সন্দেহজনক মনে করে সমগ্র হাদিস শাস্ত্রকে অবিশ্বাসযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে তার এ কাজটা হবে গুটিকয় অচল বা জাল মুদ্রা থাকার কারণে সমগ্র কোষাগারে বা দেশে যতো মুদ্রা চালু রয়েছে, তার সবগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা বা অচল ঘোষণা করার ন্যায়। কোনো বুদ্ধিমান ও সুস্থ্য মস্তিষ্কের মানুষ কি এমন অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা কল্পনাও করতে পারে? *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৬৪]*

৬০. একটি হাদিস সম্পর্কে আপত্তি ও তার জবাব

প্রশ্ন : বুখারি শরিফ অধ্যয়ন করার সময় তালাক সংক্রান্ত অধ্যায়ের একটি হাদিস জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু বুঝতে পারিনি। তাই মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য আপনার সাহায্য নেয়া জরুরি মনে করেছি। আশা করি, আপনি ব্যস্ততা সত্ত্বেও জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন। হাদিসটি তালাক সংক্রান্ত অধ্যায়ে "কোন্ কারণে তালাক দিলে তা বৈধ। তালাক দেয়ার সময় স্বামীর কি স্ত্রীর মুখোমুখী হওয়া জরুরি?" শিরোণামে বর্ণিত হয়েছে। করাচিস্থ নূর মুহাম্মদ প্রকাশনীর প্রকাশিত বুখারি শরিফের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত এ হাদিসের ক্রমিক নম্বর ২৪ এবং বর্ণনাকারী সাহাবি আবু উসাইদ রা.। হাদিসের বক্তব্য হলো, রসূল সা. জনৈক 'জাওনিয়া' নামের মহিলার সাথে একাকী এক বাগানে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে রসূল সা. বলেন : "তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করো।" এর জবাবে মহিলা অত্যন্ত অশ্রাব্য কথাবার্তা বলে। এ হাদিস থেকে আমার মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জন্ম নিয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক ভালোভাবে বুঝিয়ে এর ব্যাখ্যা করবেন :

১. রসূল সা. উক্ত মহিলা জাওনীয়ার কাছে বাগানে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন এবং কি উদ্দেশ্যে?

২. প্রথমে তাঁর সাথে দু'জন সাহাবি ছিলেন। পরে তিনি একাকী মহিলার কাছে গেলেন। এর কারণ কি?

৩. রসূল সা. মহিলাকে বললেন, "তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করো।" এর ব্যাখ্যা কি?

৪. জাওনীয়া বললো : "কোনো রাণী কি বাজারী লোকদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে?" [অর্থাৎ পারেনা।] সে এ কথা কেন বললো?

৫. রসূল সা. কি মহিলাকে এ ধরণের কথা বলেছিলেন? রসূল সা. কর্তৃক এ ধরনের কথা বলা তো যারপর নাই অশোভন আচরণ। ইমাম বুখারি সাহেব এ ধরণের হাদিস তাঁর গ্রন্থে কেনো লিখলেন! এটা কি রসূল সা.-এর সাথে বেয়াদবি নয়?

৬. জাওনীয়া যদি রসূল সা.-এর স্ত্রী হতো, তাহলে রসূল সা. একাকী বাগানে যেতেন না, সেও তাঁর সাথে এরকম ভাষায় কথা বলতোনা এবং তিনি তাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার গায়ের উপর হাত বুলাতেন না। এই হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা কি?

৭. জাওনীয়া আল্লাহর আশ্রয় চাইলে রসূল সা. তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিলেন। এর উদ্দেশ্যটা কি?

৮. হাদিসের শেষে বলা হয়েছে, রসূল সা. জাওনীয়াকে দু'খানা সাদা কাপড় ও কিছু জিনিসপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। এর অর্থ কি?

৯. হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুবাদক বলেছেন, জাওনীয়া রসূল সা.-এর স্ত্রী ছিলো। কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল তার অজান্তে কেবল তার অভিভাবকের উদ্যোগে। এটা কি সম্ভব হতে পারে? এখানে এ কথাটাও ভেবে দেখার মতো যে, জাওনীয়া যদি স্ত্রী হতো, তাহলে তিনি তাকে নিজের গৃহেই নিয়ে যেতেন। বাগানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আর তাকে আত্মসমর্পণ করতেই বা বলবেন কেনো? তাছাড়া এটাও জানাবেন যে, জাওনীয়ার সাথে রসূল সা.-এর বিয়ে কখন কোথায় হয়েছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি সাক্ষী ছিলো।

সর্বশেষ কথা হলো, ইমাম বুখারি এই হাদিস নিজের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলেন কেন? এতে মুসলিম উম্মাহর কি লাভ হয়েছে? আশা করি এ হাদিসের সকল দিক সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবেন, যাতে অপপ্রচারকারীদের সমুচিত জবাব দিতে পারি।

জবাব : বুখারির যে হাদিসের বিবরণ আপনি চিঠিতে দিয়েছেন, তাতে অবাক হবার বা আপত্তি তোলার মতো কোনো ব্যাপারই নেই। ব্যাপার শুধু এতোটুকুই, যে মহিলার কথা এ হাদিসে বলা হয়েছে, সে এবং তার পিতা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তার পিতার ইচ্ছে অনুসারে তিনি তাকে বিয়ে করেন। প্রতীয়মান হয় যে, এই মহিলা নিজের পিতার ইচ্ছেকে সম্মান দেখাতে বিয়েতে রাজি হলেও বিয়েটা তার মনোপুত ছিলনা। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, রসূল সা. যখন তার সাথে একান্তে মিলিত হতে গেলেন, তখন এই হতভাগী তার অশোভন কথাবার্তা

দ্বারা জানিয়ে দিলো, সে এই বিয়ের বন্ধন বহাল রাখতে ইচ্ছুক নয়। রসূল সা. যখন তার প্রকৃত মনোভাব জানতে পারলেন, তখন কালবিলম্ব না করে তার সাথে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে বিদায় করে দিলেন। যে ঘটনা নিয়ে আপনার এই সুদীর্ঘ প্রশ্নপত্রের অবতারণা, এই হলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আপনি বুখারির যে অনুবাদ পড়েছেন, তার টীকায় যদি এ কথা লেখা থেকে থাকে যে, জাওনীয়ার পিতা তার অজান্তেই তার বিয়ে দিয়েছিল, তবে সেটা ভুল। কেননা সাবালিকা মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া হতে পারেনা। উপরে আমি যে বিবরণ দিয়েছি, সেটাই প্রকৃত ঘটনা। রসূল সা. এই মহিলার কাছে বিয়ের আগেই গিয়েছিলেন –এ ধারণাও ভুল। যে হাদিসটির উপর আপনি নিজের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করেছেন, তার আগের ও পরের হাদিসগুলোও যদি আপনি পড়তেন তাহলে বোধ হয় আপনার মনে এতো প্রশ্ন জন্ম নিতোনা। পূর্ববর্তী হাদিসে বলা হয়েছে, "রসূল সা. যখন স্বীয় স্ত্রীদের একজনের কাছে গেলেন, তখন সে আল্লাহর আশ্রয় চাইলো।" এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, এ ঘটনা বিয়ের পরেই ঘটেছিল। আপনি যে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, তাতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "রসূল সা. উমাইমা বিনতে শারাহীনকে বিয়ে করেন। অত:পর যখন তার সাথে একান্তে মিলিত হন তখন....।" আসলে যে মহিলাকে অন্যান্য হাদিসে জাওনীয়া বা ইবনাতুল জাওন (জাওনের মেয়ে) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারই নাম হলো উমাইমা। এই মহিলার গোত্রের নাম ছিলো বনু জাওনা।

এই ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে বাড়িতে বা বাগানে রসূল সা.-এর একাকী যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা আসলে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী উমাইমারই বাসস্থান ছিলো। এরপর আপনার এসব প্রশ্নের আর কোনো অবকাশ থাকেনা যে, এই বাগানটা কেমন ছিলো, সেখানে রসূল সা.-এর একাকী যাওয়া এবং ঐ মহিলার সাথে তাঁর এ রকম বাক্যালাপের উদ্দেশ্য কি ছিলো? একজন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে অবাধে যেতে পারে এবং তার সাথে সব রকমের কথাবার্তা বলতে পারে।

আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, মহিলা এভাবে জবাব দিলো কেন যে, "একজন রানী বাজারী লোকদের কাছে নিজেকে কিভাবে সমর্পণ করতে পারে?" এর সহজ ও সরল জবাব হলো, যে হতভাগা আল্লাহর নবীর মর্যাদা বোঝেনা, সে যদি নবীকে যাদুকর, জ্যোতিষী, মিথ্যাবাদী, পাগল, কবি ইত্যাদি বলতে পারে, তবে সে তাঁকে 'বাজারী' বলতে পারবেনা কেন? মুনাফিকরা নিজেদেরকে 'সম্ভ্রান্ত' আর রসূল সা. এবং হিজরত করে আসা নিষ্ঠাবান সাহাবিগণকে 'ছোট লোক' বলতো। এ ধরনের প্রলাপোক্তিতে অবাক হবার কিছু নেই এবং এতে রসূল সা.-এর মর্যাদাও খাটো হয়না। এখানে এ কথাও উল্লেখ্য যে, এই মহিলা যে শব্দটি ব্যবহার করেছিল তা

ছিলো 'সূফা'। এর অনুবাদ 'বাজারী' করা শুদ্ধ নয়। কেননা 'বাজারী' কথাটার ভেতরে যে তাচ্ছিল্যের ভাব বিদ্যমান 'সূফা' শব্দটিতে তা নেই। আরবিতে 'সূফা' শব্দের অর্থ 'সাধারণ মানুষ'। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো Commoner।

আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, ইমাম বুখারি এ হাদিসটি বর্ণনা করলেন কেন এবং এ দ্বারা আমাদের কি লাভ হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, রসূল সা.-এর ব্যক্তিত্ব আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কিরাম পরবর্তী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ থেকে শিক্ষা লাভ করতে এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দিতে। এ ব্যাপারে তিনি এতো ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন যে, নিজের ঘরোয়া জীবনের সম্পর্ক এবং দাম্পত্য জীবনের খুটিনাটি বিষয়ও গোপন রাখেননি। সবকিছুই তিনি সাহাবিদের সামনে তুলে ধরেছেন। অত:পর সাহাবিগণও প্রতিটি বিষয় অকুণ্ঠচিত্তে এবং কোনো নিন্দা সমালোচনার তোয়াক্কা না করে পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম যদি চাইতেন, তাঁর একটা কৃত্রিম ও আংশিক ভাবমূর্তি মানুষের সামনে প্রতিফলিত হোক, তাহলে হয়তো এ ধরণের গোপন বিষয় প্রকাশ পেতোনা। কিন্তু প্রতিটি জিনিস অবিকলভাবে ব্যক্ত করে সাহাবায়ে কিরাম তাবেঈন ও হাদিস সংগ্রাহকগণ তাদের সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত এভাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটিই রসূল সা.-এর মর্যাদা খাটো করেনা।

প্রশ্নকারীর ভেবে দেখা উচিত ছিলো, যে মহিলার বিয়ে নিজের ও তার অভিভাবকের সম্মতিতে সম্পন্ন হয়েছে। সে যদি পরে সেই বিয়ে প্রত্যাখান করে এবং স্বামীর মুখের উপর বলে দেয়, আমি তোমাকে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ মনে করি, তাহলে সাধারণ অবস্থায় স্বামী তাকে জব্দ করার জন্য দাম্পত্যসুলভ সম্পর্ক স্থাপনে তো বাধ্য করবেই, অধিকন্তু উত্তম মাধ্যমও দেবে অথবা ঝুলন্ত রেখে দিয়ে এমন শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করবে যে, রানী মহারানী হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে একেবারেই বের হয়ে যাবে। কিন্তু রসূল সা. তার সাথে এই আচরণ করেননি। তিনি এই মহিলার স্বামীই শুধু ছিলেননা, বরং মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকও ছিলেন। তথাপি তিনি তার উপর কোনো জোর জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি করেননি। বরং সে যখন নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যবশত নবীর ঘর করতে অস্বীকার করলো, তখন তিনি তাকে তৎক্ষণাত আভাসে ইঙ্গিতে তালাক দিয়ে দিলেন এবং কিছু জিনিসপত্র দিয়ে বিদায় করে দিলেন। এতো ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করা কেবল একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব। ভাবতে অবাক লাগে যে কতোক লোক এ ব্যাপারেও আপত্তি তোলার চেষ্টা করে। *[তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬৬]*

৬১. সন্তান পালনে নারীর অধিকার

প্রশ্ন : কাওসার পত্রিকার ৩০ জুলাই ১৯৫২ সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "শরিয়তের বিধান অনুসারে তালাক সংঘটিত হলে সকল সন্তানকে নিজের কাছে রেখে দেয়া পিতার শুধু অধিকার নয়, বরং তার জন্য অপরিহার্য। মায়ের কোনো অধিকার নেই সন্তান কাছে রাখার।" অথচ হাদিসে এর বিপরীতে কথা বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. জনৈক মহিলা রসূল সা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : "এ আমার ছেলে। একে আমি পেটে ধারণ করেছি, দুধ খাইয়েছি এবং কোলে পিঠে করে লালন পালন করেছি। এখন ওর বাপ আমাকে তালাক দিয়েছে এবং একে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।" রসূল সা. বললেন "যতোদিন তুমি অন্য কোথাও বিয়ে না করবে, ততোদিন এ শিশুর উপর তোমার অধিকার বেশি।" *[মিশকাত, শিশুর লালন পালন ও বয়োপ্রাপ্তি]*

২. "একবার রসূল সা. এক ছেলেকে বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে পিতার কাছে থাকতে পারো আবার ইচ্ছে করলে মাতার কাছে থাকতে পারো।" *[মিশকাত, শিশুর লালন পালন ও বয়োপ্রাপ্তি]*

৩. এক মহিলা রসূল সা.-এর কাছে হাজির হয়ে বললো "আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ এই ছেলে আমাকে পানি এনে দেয় এবং আমার অনেক কাজে লাগে।" রসূল সা. ছেলেটিকে বললেন : "এই তোমার পিতা আর এই তোমার মাতা। যার হাত ধরতে চাও, ধর।" ছেলেটি মায়ের হাত ধরলো এবং সে তাকে নিয়ে চলে গেলো। *[মিশকাত, শিশুর লালন পালন ও বয়োপ্রাপ্তি]*

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে জনৈক ইরানী মহিলা এলো। তার সাথে ছিলো তার ছেলে এবং তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল। স্বামী স্ত্রী হযরত আবু হুরায়রার নিকট নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলো। স্ত্রী বললো, "আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়" হযরত আবু হুরায়রা বললেন "সন্তানের ব্যাপারে লটারি করো।" স্বামী এসে বললো "আমার ছেলের ওপর আমার অগ্রাধিকার নিয়ে কে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে?" তিনি বললেন "আমি কথাটা বলেছি এই জন্য, আমি রসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক মহিলা এসেছিল। সে বললো, আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলেটা আমার অনেক কাজ করে দেয় এবং পানি এনে দেয়। রসূল সা. বললেন : তোমরা লটারি দ্বারা নিষ্পত্তি করে নাও। পিতা বললো : আমার ছেলেকে নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। তখন রসূল সা. ছেলেকে বললেন তোমার পিতা মাতা উভয়ে এখানে রয়েছে। যার হাত ধরতে চাও ধরো। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরলো।" (ঐ)

৫. রসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তারও তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।

অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখিত হাদিস কয়টির আলোকে কাওসারের উক্তিটি শুধরে নেবেন।

জবাব : মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আলোচ্য প্রশ্নোত্তরটি যেভাবে কাওসারে ছাপা হয়েছে, তাতে আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রশ্নকর্তা নিজের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেও জানিয়েছিলেন, আবার মুখেও বলেছিলেন। তিনি বিশদ বিবরণ ও যুক্তিপ্রমাণের উল্লেখ ছাড়াই একটা সংক্ষিপ্ত ও অকাট্য জবাব দেয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। এই প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিলনা। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে তিনি প্রশ্নের একটা খাপছাড়া সারসংক্ষেপ এবং আমার সংক্ষিপ্ত জবাব ছাপানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন। যেভাবেই হোক, ছাপা যখন হয়েই গেছে এবং আপনি তার উপর আপত্তি তুলেছেন, তখন আমি পুনরায় নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি।

আপনি যে পাঁচটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, তার পঞ্চম হাদিসটি তো স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও শিশু সন্তান পালনের সাথে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়। ঐ হাদিসে মা ও সন্তান বলতে মূলত দাসি ও তার সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে মা ও সন্তানের বিচ্ছেদ দ্বারা সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে পিতার কাছে সমর্পণ করা বুঝানো হয়নি, বরং দাসি ও তার সন্তানদের আলাদা দুই ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা বা বিক্রি করা বুঝানো হয়েছে। এ কাজটা যে নিষিদ্ধ, তা আরো বহু হাদিস থেকেও প্রমাণিত। আর প্রথম চারটি হাদিস থেকে শরিয়তের নিম্নোক্ত বিধিসমূহ রচিত হয় :

১. শিশু সন্তানধারী দম্পত্তির বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলে দেখতে হবে সন্তান একেবারে অবোধ ও মাতৃস্নেহের মুখাপেক্ষী কিনা। যদি তাই হয়, তবে সন্তানকে লালন পালনে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য, যদি সে পুনরায় স্বামী গ্রহণে বিরত থাকে।

২. শিশুর যদি মা বাবার একজনকে বেছে নেয়ার মতো বয়স হয়ে থাকে, তাহলে লটারি করা হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে অথবা কোনো একজন লটারি মানতে অসম্মত হয়, তাহলে শিশুকে স্বাধীনতা দেয়া হবে পিতামাতার মধ্যে যার সাথে সে থাকতে চায় তাকে বেছে নিতে।

উপরোক্ত বিধিসমূহ স্বয়ং রসূল সা. থেকে প্রমাণিত। এতে দ্বিমত পোষণ করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আলোচ্য হাদিসগুচ্ছ এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদিসের পটভূমি ও প্রেক্ষিত বিবেচনা করে এবং পিতামাতা ও সন্তানদের পারস্পরিক শরিয়ত সম্মত অধিকার ও দায় দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিতে রেখে প্রাচীন ইমামগণ মায়ের সন্তান পালনের অগ্রাধিকারের উপর আরো কতিপয় শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, চার মাযহাবের আলেমগণ

নিম্নলিখিত দোষগুলোর উল্লেখ করে বলেছেন যে, এগুলো যদি মায়ের মধ্যে বর্তমান থাকে এবং পিতা এগুলো থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে মায়ের সন্তান পালনের অগ্রাধিকার রহিত হয়ে যাবে :

দোষগুলো হলো : (ক) ইসলাম পরিত্যাগ করা (খ) পাগল হয়ে যাওয়া (গ) নামায রোযা ত্যাগ করা বা অনুরূপ কোনো প্রকাশ্য গুণাহে লিপ্ত হওয়া (ঘ) চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে এমন পরিবেশে সন্তানকে নিয়ে বাস করা বা এতো দূরবর্তী স্থানে বসবাস করা, যেখানে সন্তানের লেখাপড়া তদারক করা পিতার পক্ষে দূরূহ হয়ে পড়ে। (ঙ) পিতার অক্ষমতা সত্ত্বেও তার কাছে সন্তানের ভরণপোষণের অর্থ দাবি করা (চ) সন্তানের লালন পালনে চরম উদাসিনতা।

অনুরূপভাবে ফেকাহবিদগণের মতে শিশু সন্তানের মায়ের কাছে লালিত পালিত হওয়ার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ থেকে ৯ বছর। এরপর পিতার অধিকার থাকবে সন্তানকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসা।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, উল্লেখিত শর্তগুলোর কোনো একটিও উপরোক্ত হাদিসসমূহ বা শরিয়তের সাধারণ নীতিমালার পরিপন্থী নয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সন্তানদের ভরণপোষণ, বৈষয়িক ও নৈতিক লালন, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং তাদের বিয়ে শাদী ইত্যাদির আসল দায়িত্ব পিতার উপরই বর্তে, মাতার উপর নয়। পরিবারে প্রধান হিসেবে নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার যে নির্দেশ কুরআনে রয়েছে, সে নির্দেশ প্রাথমিকভাবে পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, মাতাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বোতভাবে ও শর্তহীনভাবে সন্তান লালন পালনের অধিকার দেয়া হবে, পিতার ইচ্ছের তোয়াক্কা না করে সে সন্তানকে যেভাবে ইচ্ছে গড়ে তুলবে, অতঃপর তার পরিণাম ভোগ করার জন্য সন্তানদেরকে পিতার হাতে সোপর্দ করা হবে? এ জন্য সন্তান লালন পালনের মেয়াদ যৌবন প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার পক্ষে মত দেয়া সঠিক বলে মনে হয়না। কারণ সন্তানরা যৌবনে পদার্পণ করা ও স্বনির্ভর হয়ে যাওয়ার পর পিতার অভিভাবকত্বে আসার কোনো অর্থ থাকেনা। তখন আপন লাভক্ষতি ও ভালোমন্দের দায়দায়িত্ব অনেকটা তাদের নিজেদের ঘাড়েই এসে পড়ে। তাই শরিয়তের অন্তর্নিহিত সুগভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দাবি হলো, একদিকে লালন পালনের মেয়াদের একটা যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে, অপরদিকে লালন পালনে মায়ের অধিকারের উপরও যুক্তিসঙ্গত শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। মায়ের ইসলাম থেকে খারিজ না হওয়া এবং পুনরায় বিয়ে না করার শর্ত হাদিসেই উল্লেখিত হয়েছে। এই বিধিনিষেধ ও শর্তারোপের আলোকে আরো নতুন শর্ত ও বিধিনিষেধ উদ্ভাবন করা যেতে পারে। রসূল সা. যদি উল্লেখিত দুটো শর্তের অতিরিক্ত আর কোনো শর্তের উল্লেখ না করে থাকেন,

তবে তার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর কাছে যেসব বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এসেছিল, তাতে মায়ের দিক থেকে এসব আশংকা দেখা দেয়ার কোনো অবকাশ ছিলনা। নচেত পিতা চুপ থাকতোনা, বরং মায়ের কাছে লালিত পালিত হলে সন্তানের সম্ভাব্য ক্ষতির কথা ব্যক্ত করতো। সে ক্ষেত্রে নিজের অগ্রাধিকার প্রমাণ করার জন্য পিতা শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত থাকতোনা যে, পুত্রের ব্যাপারে পিতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এমন কে আছে? বরং সেই সাথে এটাও বলতো যে, সন্তানের মা ওর লালন পালন সুষ্টভাবে করতে পারবেনা। হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয়, এইসব ঘটনায় পিতা মাতার কোনো একজনের যোগ্যতা ও অপর জনের অযোগ্যতা নিরূপণের প্রশ্নই উঠেনি। কেননা যোগ্যতা ও আন্তরিকতার দিক দিয়ে পিতা মাতা উভয়েই সমান। আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো মাতৃস্নেহ ও তার মুখাপেক্ষিতার সাথে পিতৃস্নেহের। এ ক্ষেত্রে মাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, আর তা নিশ্চিতভাবে এখনও দেয়া হবে। কিন্তু এ দ্বারা প্রমাণ করা যায়না যে, মা যদি সন্তান পালনের গুরুদায়িত্ব পালনে একেবারেই অযোগ্য ও অক্ষম হয়, তবুও তার সন্তান পালনের অগ্রাধিকার বহাল থাকবে এবং সন্তানকে তার কাছেই রাখা হবে।

আমার পূর্ববর্তী জবাবে কোনো ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এখানেও আমি বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সচেতন এবং তা যে নির্ভুল, সে দাবিও আমি করিনা। প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞানের আধার একমাত্র আল্লাহ।

৬২. স্তনের দুধ পানে বিয়ে হারাম হওয়া

প্রশ্ন : দুই ভাই এর মধ্যে বড় জনের এক সন্তান হলো। এক মাস পর ছোট ভাই এর একটি ছেলে জন্ম নিলো। বড় ভাই এর ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার দু'মাসের ভেতরে তার চাচির দুধ পান করলো। ছোট ভাই এর একই স্ত্রীর পর পর আরো তিনটি ছেলে হলো এবং চতুর্থবার আট বছর পর একটা মেয়ে ভূমিষ্ট হলো। এখন প্রশ্ন হলো, বড় ভাইয়ের যে ছেলে আট বছর আগে চাচির দুধ পান করেছিল, তার সাথে ছোট ভাইয়ের এই কনিষ্ঠতমা কন্যার বিয়ে হতে পারে কিনা? এ অঞ্চলে এ ধরনের দু'তিনটি বিয়ে হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। লোকে বলে, শুধুমাত্র এক সাথে দুধ পান করা ছেলে মেয়ের বিয়ে নিষিদ্ধ। আগে পাছে জন্ম নেয়া ছেলে মেয়ের বিয়ে নাকি চলে।

জবাব : একটি ছেলে যখন কোনো মহিলার দুধ পান করে, তখন সেই মহিলা ঐ ছেলের দুধমাতা হয়ে যায়। এই দুধমায়ের সকল মেয়ে ঐ ছেলের দুধবোন হয়ে যায়। রসূল সা. বলেছেন :

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

"জন্মগত কারণে যেসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম দুধপানজনিত কারণেও সেইসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম।"

এজন্য কোনো ব্যক্তির জন্য তার সকল সহোদর বোন যেমন হারাম, সকল দুধবোনও তেমনি হারাম। শুধুমাত্র এক সাথে জন্ম নেয়া ও এক সাথে দুধ খাওয়া বোনই যেমন সহোদর বোন নয় বরং মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয়া সকল বোনই সহোদর বোন, তেমনি দুধ খাওয়ার মেয়াদের মধ্যে এক সাথে দুধ খাওয়া বোনই শুধু দুধবোন নয়, বরং দুধমায়ের গর্ভজাত সকল মেয়েই দুধবোন। যেহেতু এটা একটা স্বত:সিদ্ধ দিব্য সত্য, তাই প্রাচীন ইমামগণ এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত। এটা একেবারেই ভুল কথা, ছেলে যে মেয়ের সাথে দুধ খায়, শুধু সেই মেয়েই তার জন্য হারাম এবং ঐ মেয়ের অন্যান্য বোনকে বিয়ে করা তার জন্য জায়েয। দুধবোন হওয়ার জন্য এক মায়ের দুধ একই সাথে খাওয়া শর্ত নয়। একই মহিলা বিভিন্ন সময়ে যেসব শিশুকে দুধ খাওয়ায়, তারা সবাই দুধভাই ও দুধবোনে পরিণত হয়।

আপনার চিঠি থেকে এ কথা জেনে অবাক হয়ে গেলাম যে, এমন ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়ার দু'তিনটি দৃষ্টান্ত আপনার জানা আছে, যারা এক সাথে না হলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই মায়ের দুধ খেয়েছে। বিশ্বাস হতে চায় না যে, এমন ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকে। কিন্তু যদি এমনটি ঘটেই থাকে, তাহলে এটা একটা চরম দু:খজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতির নির্দেশ করে। এর সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমাদের মুসলমান সমাজ ইসলাম সম্পর্কে এতো অচেতন ও উদাসীন হয়ে গেছে যে, নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথেও তারা বিয়ে সম্পন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়না। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের যেমন শরিয়তের জ্ঞান নেই, তেমনি কোনো আলেমের কাছে জানতে যাওয়ারও চেষ্টা করেনা *[তরজানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৩]*।

৬৩. পারিবারিক আইন ও অর্পিত তালাক

প্রশ্ন প্রশ্নকর্তার বিয়ে ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর নয়া পারিবারিক আইন অনুসারে ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাবিননামায় সম্পন্ন হয়। বিয়ে শরিয়তের বিধান মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয়। শ্বশুর বাড়ির সাথে আমাদের সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিলো। নতুন কাবিননামায় চারটা পাতা থাকে। বিয়ের সময় মোহরানা অনাদায়ী হওয়া ছাড়া আর কোনো শর্তের উল্লেখ ছিলনা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাড়াহুড়োর কারণে স্থির করা হয় যে, বর কনে ও সাক্ষীরা শুধু স্বাক্ষর দিয়ে দিক। কাবিননামা পরে ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বিয়ের সময় বরের কাছ থেকে তালাকের কোনো অধিকার নেয়া হয়নি, বরকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি এবং সে অনুমতিও দেয়নি। নতুন কাবিননামার ১৮ নং ঘরে লেখা আছে :

"স্বামী কি স্ত্রীকে নিজে নিজে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে? করে থাকলে কোন্ কোন্ শর্তে" (উল্লেখ্য যে, এ ঘরটি বিয়ে সম্পন্ন করার সময় পূরণ করা হয়নি।)

পরে দেখা গেলো কাবিননামায় এই ঘরটি পূরণ করা হয়ে গেছে এবং লেখা হয়েছে : "স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছে।" তবে কি কি শর্তে অর্পণ করা হয়েছে তার উল্লেখ নেই এবং কাবিননামার শর্তের জায়গা শূন্য রয়েছে। কিছুদিন পর শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে কাবিননামাটি আমার হস্তগত হয়। কিন্তু মনে কোনো সন্দেহ না থাকার কারণে আমরা তা পড়ে দেখিনি। নিশ্চিত মনে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি।

বিয়ের দশ মাস পর ঘরোয়া ঝগড়ার কারণে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রীর বাপ মা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিলে তালাকের দরখাস্ত দেয় এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল বিধিসম্মত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই তিন মাস পর একতরফাভাবে তালাকের সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়।

স্বামী মোটেই তালাক দেয়নি, দিতে ইচ্ছুকও নয়, এমনকি সে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে তালাকের সার্টিফিকেটও পায়নি। এখন স্বামী স্ত্রী স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন বহাল করতে আগ্রহী। কিন্তু স্ত্রীর মা বাপ জিদ ধরে বসেছে যে, ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে যে সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে, তাতে শরিয়ত মোতাবেক তালাক হয়ে গেছে। আপনি উপরোক্ত ঘটনাবলীর আলোকে জানাবেন যে, বাস্তবিক পক্ষে শরিয়ত অনুসারে তালাক হয়ে গেছে কি হয়নি?

জবাব : প্রশ্নকর্তার বক্তব্য হলো, বিয়ের সময় তিনি স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেননি। কিন্তু তাঁর অজান্তে কাবিননামায় লেখা হয়ে গেছে যে, "স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে।" এ বক্তব্য যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহর চোখে তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর নিকট হস্তান্তরিত হয়নি এবং সে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী নয়। শুধুমাত্র কাগজে অনুমতি ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্ত্রী যদি তালাককে সঠিক প্রমাণ করতে চায়, তাহলে আল্লাহর কাছেই ঐ মহিলা ও তার অভিভাবকরা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাছাড়া সেইসব লোকও ভিষণ গুণাহগার হবে যারা নির্বিচারে প্রত্যেক কাবিননামায় গদবাধাভাবে এমন সব বিষয় ঢুকিয়ে দেয়, যার সম্পর্কে বিয়ের উভয় পক্ষ তো দূরের কথা, যিনি বিয়ে পড়ান তিনিও ভালোভাবে জানেনা যে, তা কতোখানি শরিয়তসম্মত। এর ফলে সব সময় এ আশংকা থাকে যে, এসব কাবিননামার ঘর পূরণকারী যেভাবে ইচ্ছে ঘর পূরণ করে স্বামী স্ত্রীর স্বাক্ষর বা আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে নিলেও স্বামী স্ত্রী আদৌ জানতেই পারবেনা, তারা বিয়ে ছাড়া আর কোনো শর্তাদিতে সম্মতি দিচ্ছে কিনা এবং দিয়ে থাকলে পরিণাম কি দাঁড়াবে।

যদি ধরেও নেই যে, তালাকের ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব স্বামীর উপস্থিতিতে এবং তার সম্মতিক্রমেই লেখা হয়েছিল, তাহলে এই জবাব একেবারেই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। কাবিননামার প্রশ্নটি হলো "স্বামী কি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছে? করে থাকলে কি কি শর্তে?" এর যে জবাব লেখা হয়েছে তা হলো : "স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে।"

যে ব্যক্তি এই জবাব লিখেছে, তার অপরিহার্য কর্তব্য ছিলো স্বামীর মুখ দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করানো। অতঃপর জবাবেও এ কথা বিশ্লেষণ করা উচিত ছিলো যে, ক্ষমতাটা কোনো শর্তাধীনে অর্পণ করা হচ্ছে, না বিনা শর্তে, আর যে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হচ্ছে, তা কি রজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক, না বায়েন (চূড়ান্ত) তালাক, অথবা তা এক তালাক, না দুই তালাক, না তিন তালাক। শরিয়তের দৃষ্টিতেও এসব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক ছিলো। তথাপি জবাবে এসব বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় বুঝা যায়, কাবিননামা পুরণকারী বিয়ে ও তালাকের বিধান ভালোভাবে অবহিত নয়। সে না জেনে বুঝে একটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ জবাব লিখে দিয়েছে। এ কারণে স্বামীর এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়া যায়না যে, কথাটা তার অজ্ঞাতসারে মনগড়াভাবে লিখে দেয়া হয়েছে।

অর্পিত তালাক সম্পর্কে সাহাবি ও তাবেঈনদের একটি বিরাট অংশ এবং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং আরো কতিপয় ফকীহের অভিমত হলো, স্বামী যদি বিয়ের সময় কোনো সময় বা মেয়াদের উল্লেখ না করেই তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে, তবে স্ত্রী সে ক্ষমতা কেবল সেই বিয়ের মজলিশেই প্রয়োগ করতে পারে। এরপর স্ত্রী যদি অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করে কিংবা নিরবে মজলিশ থেকে উঠে যায়, তাহলে ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে। তবে স্বামী যদি অর্পণ করার সময় এভাবে অর্পণ করে যে, তার স্ত্রী যখন চাইবে, নিজেকে তালাক দিতে পারবে, তাহলে এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী এবং স্ত্রী সেটা সব সময় প্রয়োগ করতে পারে।

অর্পিত তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় স্ত্রীকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেকে তালাক দিতে হবে। নিছক ইউনিয়ন কাউন্সিল ইত্যাদির সার্টিফিকেটে কাজ হবেনা। তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করেই যদি স্বামী সাধারণ ভাষায় তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি নিজেকে এক তালাক বা দুই তালাক দেয় কিংবা সংখ্যা উল্লেখ ছাড়াই দেয়, তবে তা ইদ্দতের ভেতরে প্রত্যাহারযোগ্য তথা রজয়ী তালাক হবে। ইদ্দতের ভেতরে তা বাতিল করা যাবে, নচেত ইদ্দতের পর বায়েন তালাক হবে, তবে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদকারী (মুগাল্লাজা) তালাক হবেনা। এরপর দ্বিতীয়বার বিয়ে করা বৈধ হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজেকে তিন তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে তা মুগাল্লাজা হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে স্বামীর নিয়ত বা ইচ্ছের উপর। তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার সময় স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে, তবেই তালাক মুগাল্লাজ হবে নচেত নয়।

অর্পিত তালাকের ব্যাপারে এ কথাও জানা দরকার যে, বিয়ে সম্পন্ন হবার আগে এ ক্ষমতা অর্পণ করা হলে তার কোনো কার্যকারিতা থাকবেনা। এ ক্ষমতা কার্যকর ও সিদ্ধ হওয়ার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে বিয়ে সম্পাদনের সময়ে অথবা তার পরে তা অর্পণ করা জরুরি। কমপক্ষে অর্পণকালে বিয়ের কথা উল্লেখ করা চাই। যেমন স্বামী বলবে, অমুক মহিলার সাথে আমার বিয়ে সম্পন্ন হলে সে তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হবে।

অর্পিত তালাকে আরো বহু খুটিনাটি বিধি রয়েছে, এখানে সেগুলোর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে নীতিগতভাবে এ কথা বলে দেয়া আবশ্যক যে, কুরআনের আলোকে তালাকের অধিকার মূলত স্বামীকে দেয়া হয়েছে, স্ত্রীকে নয়। এই অধিকারকে যখন স্ত্রীর নিকট হস্তান্তরের চেষ্টা করা হয় এবং কাবিননামায় এ ধরনের প্রশ্নাবলী আগে থেকে ছেপে দিয়ে শরিয়তের নির্ধারিত অগ্রাধিকারকে পাল্টে দেয়া ও তালাকের ক্ষমতা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বা কোনো কাউন্সিলকে দেয়ার জন্য নির্বিচারে সকল শ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করা হয়। তখন এর ফলে এতো অপ্রীতিকর ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তা আগে থেকে কল্পনা করা যায়না। যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি এ ধরনের নিয়মবিধি রচনা করেছে এবং রচনা করার পর তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব অযোগ্য লোকদের ঘাড়ে চাপিয়েছে, যদি তারা এ পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখতো এবং এর প্রতিকারে উদ্যোগী হতো তবে বড়ই ভালো হতো। *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৩]*

৬৪. ফাসিদ বিয়ে ও বাতিল বিয়ে

[১]

প্রশ্ন : এক ভদ্রলোক এক উদ্ভট মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন, যা স্পষ্টতই ভুল বলে মনে হয়। মাসয়ালাটি হলো, যেসব মেয়ের সাথে বিয়ে হওয়া শরিয়তে নাজায়েয, তাদের সাথেও যদি উভয় পক্ষে সম্মতিক্রমে যথারীতি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দান ও তা গ্রহণ, সাক্ষ্য ও মোহরানা সহকারে বিয়ে সম্পন্ন হয় তবে এ ধরনের বিয়ে কার্যকর ও সিদ্ধ হবে। তবে তা ফাসিদ অর্থাৎ অন্যায়, ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিলযোগ্য হবে। তবে সন্তান সন্ততি জারজ হবেনা, ব্যভিচারের দণ্ড কার্যকর হবেনা, তালাক ছাড়া এ ধরনের বিয়ে বাতিল হবেনা এবং অন্য কোনো পুরুষের সাথে ঐ মহিলার বিয়েও হতে পারবেনা। ভদ্রলোককে যখন এই মাসয়ালার সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, এটা ফেকাহ শাস্ত্রের একটা সাধারণ মাসয়ালা। হানাফি মাযহাবে এটা স্বীকৃত। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখ। অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন, এ মাসয়ালাটি কি সত্যিই এ রকম? যদি তাই হয়ে থাকে তবে এটা কোন্ কিতাবে আছে? যদি ভালো মনে করেন, তবে জবাব তরজমানুল কুরআনে ছেপে দেবেন।

জবাব : আসল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে এ কথা জানিয়ে দেয়া সমীচীন মনে করি যে, কোনো ফেকাহ শাস্ত্রীয় মাসয়ালা যদি সঠিকও হয় এবং কোনো কিতাবে তা লেখাও থাকে, তা বিনা প্রয়োজনে জনসাধারণের মধ্যে এভাবে প্রচার করা দায়িত্ব সচেতন ও সতর্ক লোকদের কাজ নয়, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, তারা গুণাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার আস্কারা পায়, কিংবা ফকীহ ও আলেমদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। অনুরূপভাবে কোনো মাসয়ালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়াই তার একটা সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট সার কথা সাধারণ মানুষের গোচরে আনাও ঘোরতর অশান্তি ও বিভ্রান্তি উস্কে দিতে পারে। এতে করে কেবল যে একটি বিশেষ মাযহাব ও মতের প্রবক্তাদেরই দুর্নাম রটে তা নয়, বরং সর্বব্যাপী মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার এই যুগে সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় ও মর্যাদা খাটো হয়। আর যারা দু' একটা ফেকাহ শাস্ত্রীয় মাসয়ালা ও দু' একটা হাদিসের অজুহাত দিয়ে ইসলামের গোটা সাহিত্য ভাণ্ডারকে বাতিল করে দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায় এবং আমাদের প্রাচীন ইমাম ও আলেমদের সবার বিরুদ্ধে অনাস্থা ও নিন্দা প্রস্তাব পাস করতে চায়, সেই কুচক্রী মহলেরই মনোবল বাড়ে।

এবার মূল মাসয়ালাটির প্রসঙ্গে আসা যাক। নীতিগতভাবে ইমাম ও ফকীহগণ শুধুমাত্র সেই বিয়েকেই বিশুদ্ধ ও বৈধ মনে করেন, যে বিয়ে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয় এবং যার অপরিহার্য উপাদানসমূহ ও শর্তাবলীর কোনো একটিও অনুপস্থিত থাকেনা। কিন্তু যে বিয়ে সম্পন্ন হতে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা থাকে অথবা যার কোনো অপরিহার্য উপাদান অনুপস্থিত থাকে, ফকীহগণ তাকে অশুদ্ধ বিয়ে গণ্য করেন। অবশ্য আধুনিক হানাফি ফকীহগণ আবার অশুদ্ধ বিয়েকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি বাতিল, অপরটি ফাসিদ। নিকাহে বাতিল বিয়ে হলো এমন বিয়ে, যা হওয়া না হওয়া সমান কথা, যা একেবারেই অচল ও অকার্যকর এবং যা সকল ফকীহদের সর্বসম্মত রায়ে স্পষ্টতই বাতিল। যেমন, কোনো হতভাগা যদি মুহররাম তথা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো মেয়েকে বিয়ে করে, দুই সহোদরা বোনকে একই সময়ে বিয়ে করে, কিংবা জেনেশুনে অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে বা ইদ্দত পালনরত মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে সেই বিয়ে অন্য সকল মাযহাবের ন্যায় হানাফি মাযহাবেও বাতিল ও অচল। এ ধরনের বিয়ে শরিয়তে বিয়ে হিসেবেই স্বীকৃত নয় এবং তাকে অকার্য্যকর ও অবৈধ ঘোষণা করার জন্য তালাক বা বিচ্ছিন্নকরণের অন্য কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এ বিয়ে আপনা আপনি অকার্যকর থেকে যাবে। এর জন্য ইদ্দতের প্রশ্ন উঠেনা। অধিকন্তু এতে ব্যভিচারের দণ্ড কার্যকর হবে এবং এর দ্বারা জন্ম লাভ করা সন্তান জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। হানাফি মাযহাবেও এ ধরণের বিয়ে এবং ব্যভিচারের আদৌ কোনো প্রভেদ নেই।

হানাফি মাযহাবে অশুদ্ধ বিয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো ফাসিদ বিয়ে। যে বিয়ে বৈধ না অবৈধ এবং বিয়ে হিসেবে স্বীকৃত না অস্বীকৃত সে ব্যাপারে সংশয় কিংবা মতভেদ রয়েছে, অথবা যাতে বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর কোনো একটি অনুপস্থিত বা অসম্পূর্ণ থাকে এবং এ কারণে শরিয়ত তাকে ভেঙ্গে দেয়া জরুরি বলে মনে করে, সেই বিয়েকে ফাসিদ বিয়ে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক মহিলা ইদ্দত পালন করছে কিন্তু বর তা জানেনা, অথবা ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে এই ভুল ধারণা পোষণ করে এবং বিয়ে সম্পন্ন করে, অথবা দু'জন সাক্ষীর পরিবর্তে একজন সাক্ষী থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিয়ে একেবারে অকার্যকর বা অচল হবেনা। কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে দেয়া জরুরি। এ ধরণের বিয়েতে ব্যভিচারের দণ্ড চালু হবেনা এবং এটা ভাঙ্গার জন্য তালাক অথবা স্বামী স্ত্রীর কোনো একজনের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা আবশ্যক। দম্পতি যদি বিচ্ছিন্ন হতে ইতস্তত করে, তবে কাজীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এ ধরণের বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর হানাফিদের মতে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সন্তান হলে তা বৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে।

বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের মধ্যে হানাফি মাযহাবে স্বীকৃত এই আইনগত পার্থক্য ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতেও লিখিত রয়েছে। রদ্দুল মুখতারের বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ফাসিদ বিয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

هو الذى فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود

"বিয়ের বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে সেই বিয়ে ফাসিদ বিয়ে বলে গণ্য হবে, যেমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী না থাকা কিংবা আদৌ সাক্ষী না থাকা।"

বাতিল বিয়ে সম্পর্কে তিনি বলেন :

الظاهران المراد بالباطل ما وجوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب ولا العدة ف نكاح المحارم

"যে বিয়ে হওয়া না হওয়া সমান সেটাই বাতিল বিয়ে। এজন্য নিষিদ্ধ নারী ও পুরুষের বিয়ে দ্বারা সন্তান বৈধ হয়না এবং ইদ্দত পালনের আবশ্যকতা থাকেনা।"

আল্লামা শামী এর পর বলেছেন, জেনেশুনে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা ইদ্দত পালনরতা মহিলাকে বিয়ে করলে তাও নিকাহে বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তা আদৌ বিয়েই নয় এবং এ ধরণের বিয়ে ও ব্যভিচারে কোনো পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের দণ্ডই প্রযোজ্য।

উপরোক্ত বিশদ আলোচনা মনে রেখে উল্লেখিত মাসয়ালার উপর পুনরায় দৃষ্টি বুলালে বুঝা যাবে, হানাফি মাযহাবের ফকীহগণের নামে এ মাসয়ালা বর্ণনা করা

ভিত্তিহীন অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, এটা তাদের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ যদি হানাফিদের অভিমত প্রচার করতে এতোই আগ্রহী হয়ে থাকেন, তবে তার প্রথমে এ মাসয়ালার পুরো বিবরণ জানা উচিত। অত:পর তাকে এ অভিমত হুবহু তুলে ধরতে হবে এবং বিয়ের বৈধতা ও অবৈধতার প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় হানাফিগণ বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তা পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। নচেত অস্পষ্টভাবে একটা কথা বলেই চুপ করে যাওয়া বা উভয় ধরনের বিয়ে মিলিয়ে একাকার করে ফেলার দরুন একজন সাধারণ শ্রোতার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সে ভাববে, ফকীহগণ জায়েয ও নাজায়েযের ভেদাভেদ বিলোপ করে দিয়েছেন। অথচ এ অপবাদ থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। বাতিল ও ফাসিদ বিয়ে দুটোই তাদের কাছে অবৈধ ও অশুদ্ধ বিয়ে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, বাতিল বিয়ে ভাঙ্গার জন্য কোনো তালাক বা বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন নেই এবং এতে ব্যভিচারের দণ্ড অপরিহার্যভাবে চালু হবে। কিন্তু ফাসিদ বিয়ের ক্ষেত্রে তালাক বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতেই হবে এবং এতে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা হবেনা। তবে অপরাধের ধরন ও মাত্রা বিবেচনা করে অন্য কোনো লঘু দণ্ড দেয়া যেতে পারে। *[তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]*

[২]

(জনৈক বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রশ্নের উত্তরে বাতিল বিয়ে ও নিকাহে ফাসিদ সংক্রান্ত শরিয়তের বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও নীতিগত আলোচনা ছাপা হয়েছিল। ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের একটি গোষ্ঠি বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করে থাকেন, তা কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে করেন, সেটাই উক্ত আইনজীবী জানতে চেয়েছিলেন। তিনি আরো জানতে চেয়েছিলেন যে, উভয় ধরনের বিয়ের সংজ্ঞা কি এবং কোনটির কি আইনগত ফলাফল দাঁড়ায়। বাস্তব অবস্থা হলো, যেসব ফকীহ্ নিকাহে বাতিল ও নিকাহে ফাসিদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন, তারা এ দুটো জিনিসের কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেননি। এ দুটো পরিভাষার প্রয়োগ এবং তাদের বর্ণিত উদাহরণগুলোতেও যথেষ্ট প্রশস্ততা বিদ্যমান। একই ধরনের বিয়েকে কোথাও বাতিল এবং কোথাও ফাসিদ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি কুরআন ও সুন্নাহর উক্তি এবং ফকীহদের মতামত ও ইজতিহাদকে সামগ্রিকভাবে সামনে রেখে নিকাহে বাতিল ও নিকাহে ফাসিদের আইনানুগ সংজ্ঞা আলাদা আলাদাভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। অত:পর সেই সংজ্ঞার আলোকে বিভিন্ন ধরনের অশুদ্ধ বিয়েকে এ দুই শ্রেণীতে বিন্যাস্ত করার প্রয়াস পেয়েছি। এ আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, এই মাসয়ালা সম্পর্কে অনিশ্চিয়তা ও বিভ্রান্তি দূর হোক এবং আলেম সমাজ প্রস্তাবিত এই সংজ্ঞা, তার প্রয়োগ ও বিন্যাস সম্পর্কে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত

নেবেন যে তা কতোখানি শুদ্ধ ও কার্যোপযোগী। এ কথা সবার জানা যে, আলেম সমাজের মতৈক্য অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতেই স্থির করা যেতে পারে, কোন্ মতটি ফতোয়া তথা বাস্তবায়নযোগ্য এবং তাতে কোনো রদবদল সম্ভব কিনা?

নীতিগতভাবে বিয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মতামতকে এভাবে বর্ণনা করা যায়, যে বিয়ে সম্পন্ন হতে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা থাকেনা, তাকে তারা বৈধ ও বিশুদ্ধ বিয়ে মনে করেন। আর বিয়ের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী ও মৌলিক উপাদানের কোনো একটি যে বিয়েতে অনুপস্থিত থাকে, তা ফকীহদের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অশুদ্ধ হবে। শেষোক্ত এই অশুদ্ধ ও অবৈধ বিয়ে বিভিন্ন রকমের থাকতে পারে। এসব রকমারি অশুদ্ধ ও অবৈধ বিয়ের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে ফকীহগণ, বিশেষত হানাফি ফকীহগণ এর বিবিধ প্রকারের উপর 'বাতিল' ও 'ফাসিদ' এই দুটি পৃথক পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। বাতিল ও ফাসিদের এই প্রভেদকে শরিয়তের আলোকে অনাবশ্যক ও ভিত্তিহীন বলা চলেনা। কারণ বেশ কিছু বিয়ে এমনভাবে সংঘটিত হয়ে যেতে পারে যে, তাকে একেবারে নির্ঘাত বাতিল বলা সম্ভবপর হয়না। আবার সর্বোতভাবে বিশুদ্ধ ও ইপ্সিত মানে উত্তীর্ণও বলার উপায় থাকেনা। তারই অগত্যা সেগুলোকে মধ্যবর্তী স্তরে রেখে বাতিলের পরিবর্তে ফাসিদ তথা ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণই বলতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ ও সর্বসম্মত সংজ্ঞা হানাফি ফকীহগণের কাছ থেকেও পাওয়া যায়না। তাদের আলোচনা থেকে কেবল এই ধারণা জন্মে যে, বাতিল বিয়ে বলতে তারা সেই বিয়েকে বুঝিয়েছেন, যা হওয়া না হওয়া সমান কথা, যা আদৌ সম্পন্নই হয়না, এক কথায় যা আদৌ বিয়েই নয়। বাতিল বিয়ে এতো স্পষ্টভাবে অশুদ্ধ ও অচল যে তাকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার কোনো ঘোষণা দেয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন হয়না। আর ফাসিদ বিয়ে হলো, যার বৈধ না অবৈধ শুদ্ধ হয়েছে কি হয়নি, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে, অথবা যার বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীর কোনো শর্ত অপূর্ণ বা অনুপস্থিত রয়েছে, ফলে তা একেবারেই অস্তিত্বহীন নয়, কিন্তু শরিয়তের আলোকে তার বিচ্ছেদ ঘটানো ও ভেঙ্গে দেয়া জরুরি। এতোদসত্ত্বেও আলোচনার বিস্তারিত খুঁটিনাটি পড়ে দেখলে মনে হয়, এই মাসয়ালার বিভিন্ন দিক নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন ফাসিদ হওয়া ও বাতিল হওয়া একই অর্থ এবং একই ফলাফল বহন করে, তেমনি বিয়ের ক্ষেত্রেও ফাসিদ ও বাতিলে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ কেউ মনে করেন, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে যে বিয়েকে অবৈধ মনে করেন তা 'বাতিল বিয়ে।' আর যে বিয়ের অবৈধতা সম্পর্কে মতভেদ পাওয়া যায় তাই 'ফাসিদ বিয়ে।' কিন্তু হানাফি ফকীহগণ মুসলিম উম্মাহর নিকট সর্বসম্মতভাবে অবৈধ,

এমন কিছু বিয়েকেও 'ফাসিদ' আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিয়েকে নিছক ইজতিহাদ ও কিয়াসের ভিত্তিতে নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও অকাট্য উক্তির ভিত্তিতেই সর্বসম্মতভাবে অবৈধ বলে রায় দেয়া হয়েছে।

এই মাসয়ালাটির অধিকতর জটিলতা সৃষ্টির আরো একটা কারণ হলো, ফকীহগণ যদিও সাধারণভাবে বাতিল ও ফাসিদ শব্দ দু'টিকে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আইনগত পরিভাষা হিসেবে একটিকে অপরটির মোকাবিলায় প্রয়োগ করে থাকেন এবং উভয়টির মধ্যে প্রভেধও নির্দেশ করেন, কিন্তু কখনো কখনো তারা এ দু'টিকে ব্যাপক আভিধানিক অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন এবং সে ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করার অভিপ্রায় থাকেনা। বাতিল বিয়ে শব্দটা হাদিসেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এটি কোনো নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, যেমনটি পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়ে গেছে। এক হাদিসে রসূল সা. বলেন :

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

"যে মহিলা তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল।"

এ হাদিসের মর্ম যদিও অনেকের নিকট এই যে, এ ধরনের বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল এবং না হওয়ারই সমান, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এখানে বাতিল শব্দটি নির্দিষ্ট ফেকাহ শাস্ত্রীয় পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক নীতি নির্দেশনার আলোকে রসূল সা.-এর এই উক্তির মর্মার্থ এটাই দাঁড়ায় যে, এ ধরনের বিয়ে অভিভাবকের সম্মতি দান সাপেক্ষে স্থগিত থাকবে। অভিভাবক অসম্মতি জানালে এবং যুক্তিগ্রাহ্য শরিয়তসম্মত আপত্তি উত্থাপন করলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

এই মতভেদ ও জটিলতা নিরসনের জন্যে আমাদের সমগ্র বিষয়টা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের সংজ্ঞা, বিভিন্ন ধরনের বিয়ের উপর তার প্রয়োগ এবং তার আইনগত ফলাফল নিয়ে ফেকাহ শাস্ত্রে যেসব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, শুধু সেগুলোর উপর সর্বোতভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকার পরিবর্তে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্টোক্তি এবং ফকীহগণের ইজতিহাদপ্রসূত মতামতের আলোকে গোটা মাসয়ালার বিভিন্ন দিক নিয়ে নতুন করে ভেবে চিন্তে একটা মত স্থির করতে হবে।

এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে, তা হলো বাতিল বিয়ে ও ফাসিদ বিয়ের সংজ্ঞা কি? প্রথমে বিয়ের আলোচনায় আসা যাক।

বাতিল বিয়ের সংজ্ঞা

কুরআন ও হাদিসের বিয়ে সম্পর্কে যেসব নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে এবং ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে যে বিস্তারিত বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন, তার উপর সার্বিকভাবে চিন্তা গবেষণা চালানোর পর বাতিল বিয়ের যে সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত

বিশুদ্ধ ও নির্ভুল বলে মনে হয়, তা হলো "যে বিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য উক্তি এবং মুসলিম ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়ে অবৈধ, অশুদ্ধ ও নাজায়েয সাব্যস্ত হবে অথবা যে বিয়েতে বর কনে উভয়ের বা কোনো একজনের সম্মতি নেই এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব ও সম্মতির আদান প্রদান হয়নি, সেটাই বাতিল বিয়ে।"

বাতিল বিয়ের উদাহরণ

আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও সম্মতির আদান প্রদান তথা ইজাব ও কবুল সম্পন্ন না হওয়ার ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু অবৈধ ও নিষিদ্ধ, হওয়ার বিষয়টি বুঝার সুবিধার্থে কয়েকটি উদাহরণ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। নিম্নে লক্ষ্য করুন :

১. আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খৃষ্টান মহিলা ছাড়া অন্য সকল অমুসলিম ও পৌত্তলিক নারীকে কোনো মুসলিম পুরুষের পক্ষে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াত এবং সূরা মায়েদার ৫নং আয়াত মিলিয়ে পড়লে এ কথাটা স্পষ্টভাবে জানা যায়। আর উল্লেখিত আয়াত দু'টি এবং সূরা মুমতাহিনার ১০ নং আয়াতের আলোকে মুসলিম নারীর বিয়ে সকল অমুসলিম পুরুষের সাথে নিষিদ্ধ চাই সে আহলে কিতাব হোক কিংবা মুশরিক হোক। এই উভয় ধরনের বিয়ে বাতিল হবে।

২. পিতার বিবাহিতা বর্তমান কিংবা সাবেক স্ত্রী, মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নি, দুধ মা, দুধবোন, শাশুড়ি, স্ত্রীর মেয়ে, ও পুত্র বধুকে বিয়ে করা এবং দুই সহোদরাকে একত্রে বিয়ের বন্ধনে একত্রিত করা নিষিদ্ধ এবং হারাম। সূরা নিসার ২২ ও ২৩ নং আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্টোক্তি রয়েছে। তাই এদের কাউকেও বিয়ে করলে সে বিয়েও বাতিল। জন্মসূত্রে, দুধপান সূত্রে এবং একত্র সমাবেশের যে নিষেধাজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলো, তন্মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ ব্যক্তির উর্দ্ধতন ও অধোঃস্তন আত্নীয়গণ এবং নিষেধাজ্ঞার কারণগত সাদৃশ্য বহন করে এমন আরো কিছু সংখ্যক আত্নীয়কে বিয়ে করাও হাদিসে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এবং সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব আত্মীয়তা জানা থাকা সত্বেও তাদেরকে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে।

৩. দুই সহোদরকে পর্যায়ক্রমে বিয়ে করে একত্রিত করলে দ্বিতীয় বিয়ে বাতিল হবে এবং এক সাথে বিয়ে করলে উভয় বিয়ে বাতিল হবে।

৪. সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের আলোকে অন্য পুরুষের বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম বিধায় তা বাতিল হবে। তবে কন্যার প্রথম বিয়ের কথা বরের অজানা থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

৫. পূর্ববর্তী বিয়ের ইদ্দত পালনরতা মেয়েকে বিয়ে করা দ্বিতীয় পুরুষের পক্ষে হারাম এবং সেই বিয়ে বাতিল হবে, যদি ইদ্দতের কথা বরের জানা থাকে। ভিন্ন

পুরুষের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিয়ে করা যে কারণে নিষিদ্ধ, এই বিয়েও সেই কারণেই নিষিদ্ধ। কেননা ইদ্দত চলাকালে সাবেক বিয়ের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ইদ্দতকালে বিয়ের নিষেধাজ্ঞা আরো কঠোর করা হয়েছে :

وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَه –

"ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের সংকল্প দৃঢ় করোনা।" *(সূরা আল বাকারা, আয়াত নম্বর ২৩৫)*

৬. চার স্ত্রী বর্তমান থাকতে পঞ্চম বিয়ে করা কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিষিদ্ধ। সূরা নিসার ৩নং আয়াত থেকে এ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত। কেননা সেখানে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ঐ আয়াতে চার সংখ্যাটি যে ঐ সংখ্যার সীমাবদ্ধ করা এবং এর চেয়ে বেশি থেকে নিবৃত করার উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত হয়েছে এবং এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বিয়ে যে রসূল সা. ব্যতিত আর কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে সাধারণ মুসলমানদের জন্য চারের মধ্যে বিয়েকে সীমিত রাখা বাধ্যতামূলক উল্লেখ করার সাথেই রসূল সা.-কে এই সংখ্যা সীমার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ জাহেরী মাযহাবে চারের বেশি বিয়ে বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটা ভুল। ইমাম ইবনে হাযম জাহেরী স্বীয় গ্রন্থ আল মুহল্লার বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

لا يحل لاحد ان يتزوج اكثر من اربع نسوة

"চারটির বেশি বিয়ে করা কারো জন্য হালাল নয়।"

হাদিস থেকেও জানা যায়, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে যাদের চারজনের বেশি স্ত্রী ছিলো, রসূল সা. তাদের অবশিষ্ট স্ত্রীদেরকে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে :

"গীলান বিন সালমা সাকাফী যখন মুসলমান হন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিলো। রসূল সা. তাকে বললেন এদের মধ্য থেকে চারজন রেখে দাও।"

অপর এক সাহাবি নওফেল বিন মুযাবিয়ার পাঁচজন স্ত্রী ছিলো। রসূল সা. তাকে আদেশ দিলেন, ওদের একজনকে ছেড়ে দাও।

কেউ কেউ বলেন, শুধুমাত্র চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ আত্মীয়দের সাথে বিয়ে হলে সেই বিয়েই বাতিল। এছাড়া যাদের সাথে বিয়ে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ নয়। তাদের সাথে অনুষ্ঠিত বিয়ে ফাসিদ হবে। যেমন এক বোনের মৃত্যু অথবা তালাকের ইদ্দত কেটে যাওয়ার পর তার অন্য বোন নিষিদ্ধ থাকেনা। অনুরূপভাবে চার স্ত্রীর মধ্যে

একজন মারা গেলে বা তালাক হয়ে গেলে পঞ্চম স্ত্রী বৈধ হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে বিয়ের নিষেধাজ্ঞা অস্থায়ী বিধায় চার স্ত্রী থাকতে কোনো বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল নয়, ফাসিদ। কিন্তু এ যুক্তি তেমন সবল বলে মনে হয়না। আল্লাহ বা রসূলের আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা অস্থায়ী হলেও যতোক্ষণ তা বহাল থাকে এবং বৈধতায় রূপান্তরিত না হয়, ততোক্ষণ তার অবৈধতা স্থায়ী অবৈধতার তুলনায় কম কঠোর নয়। তাই স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ মেয়েদের বিয়ে, দুইবোনের বিয়ে, অন্যের বিবাহিতা বা ইদ্দত পালনরতাকে বিয়ে এবং চার স্ত্রী থাকতে পঞ্চম স্ত্রীকে বিয়ে এ সবই একই পর্যায়ের অবৈধ ও অচল বিয়ে হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। বরের অজ্ঞতা কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও পাঁচ স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয়। কেননা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারেনা যে, আমার চারটি স্ত্রী আগেই ছিলো কিনা এবং এটা আমার পঞ্চম বিয়ে কিনা, তা আমার জানা ছিলনা।

হানাফিসহ অধিকাংশ ফকীহদের মত, অন্যের ইদ্দত পালনরতাকে জেনে শুনে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল। বিশিষ্ট হানাফি ফকীহ ইবনে হুমাম ফাতহুল ক্বাদীরে লিখেছেন, এ ধরনের বিয়ে সর্বসম্মতভাবে বাতিল। ইদ্দত যে একটা অস্থায়ী বাধা এবং তা অচিরেই সরে যেতে বাধ্য, তা সুবিদিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইদ্দতের ভেতরে সাবেক স্বামীর তালাক প্রত্যাহার বা পুন:বিবাহের অধিকার থাকেনা এবং সে কারণে স্ত্রী তার বৈবাহিক বন্ধন থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যদি ইদ্দত পালনরতাকে বিয়ে করলে তা বাতিল হয়, তাহলে অন্যের স্ত্রী, দুইবোনের সমাবেশ অথবা জেনে শুনে পঞ্চম স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে বাতিল না হয়ে কেবল ফাসিদ হবে কেন?

অনেকে এরূপ যুক্তিও দিয়েছেন যে, শরিয়তসম্মত নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও যখন বিয়ে সম্পন্ন হয়, তখন কিছুটা বিয়ের সাদৃশ্য Semblance of marriage সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্য বিয়ে ফাসিদ হবে, বাতিল হবেনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেউ যদি সজ্ঞানে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ আত্মীয়দের বিয়ে করে বসে, তাহলে কোনো সুস্থ রুচি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কি এ কথা মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে যে, এতে বিয়ের সাদৃশ্য রয়েছে এবং বিয়ে হয়ে গেছে বলে ধারণা জন্মে? ব্যাপারটা শুধু যে রুচি ও বিবেকের উপরই নির্ভরশীল তাও নয়। রসূল সা.-এর আমলে এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। এক হতভাগ্য নিজের পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। রসূল সা. তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদিসটি হলো :

"হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন যে, চলার পথে আমার মামার সাথে দেখা হলো। তার হাতে ছিলো একটা পতাকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন : আমাকে রসূল সা. পাঠিয়েছেন, এক ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যু বা তালাক দেয়ার পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তাকে হত্যা করতে ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।"

এ হাদিসে বিয়ে করা শব্দটার উল্লেখ স্পষ্ট। এ থেকে বুঝা যায়, ঐ লোকটা বিয়ে করার একটা ভেল্কী ঠিকই দেখিয়েছিল। বলা যায়, বিয়ের একটা সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রসূল সা. তার ঐ ভেল্কীর তোয়াক্কা না করে তাকে হত্যা ও তার মালক্রোক করার আদেশ দিয়েছিলেন।

ফাসিদ বিয়ের সংজ্ঞা

উপরে বাতিল বিয়ের যে সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেয়া হলো, তাতে বাতিল বিয়ে আসলে কি জিনিস, তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর নিকাহে ফাসিদের সংজ্ঞার প্রশ্ন আসে। নিকাহে ফাসিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তবে তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেয়া যেতে পারে :

"বিয়ের আকদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত রয়েছে, তার কোনো একটি যে বিয়েতে অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত থাকবে, অথবা যে বিয়ে নাজায়েয, নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়না, অথবা যে বিয়ে বৈধ কি অবৈধ বা সচল কি অচল, তা নিয়ে ফকীহ ও মুজতাহিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, অথবা যে বিয়েতে শরিয়তের দৃষ্টিতে এমন কোনো বাধা রয়েছে, যা বিয়েকে বাতিল প্রতিপন্ন করতে সক্ষম, কিন্তু দুইপক্ষের কোনো একপক্ষ সেই বাধা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং তার অজান্তে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়, সেই বিয়ে ফাসিদ বিয়ে।"

ফাসিদ বিয়ের উদাহরণ

ফাসিদ বিয়ের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেলো :

১. বিয়ের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন (ইজাব) এবং বর কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ (কবুল) সম্পর্কে দু'জন সাবালক মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্য বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এই সাক্ষ্য না থাকলে কিংবা অসম্পূর্ণ থাকলে তা ফাসিদ বিয়ে বলে গণ্য হবে।

২. যেসব কারণে বিয়ে বাতিল হয় (অর্থাৎ বিয়ে সম্পন্নই হয়না তার কোনো একটি কারণ কোনো বিয়েতে কার্যত উপস্থিত থাকলে এবং বর ও কনে বা তাদের কোনো একজনের সেটা অজানা থাকার দরুন সরল বিশ্বাসে বিয়ে করে বসলে, অজ্ঞতা প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে বিয়ে বাতিল না হয়ে ফাসিদ হবে। যেমন, তারা জানতে পারেনি যে, তারা বিয়ে অবৈধ হওয়ার মতো আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, কিংবা স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের বিবাহিতা অথবা ইদ্দত পালনরতা, সে কথা বর জানতোনা। এমতাবস্থায় যে বিয়ে হবে তা ফাসিদ বিয়ে হবে।

৩. সাবেক বিয়ে বহাল বা ইদ্দত চালু থাকা সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে হয় বৈধ হবে নচেৎ ফাসিদ হবে। তবে বাতিল হবেনা।

৪. চার স্ত্রী বর্তমান থাকতে পঞ্চমা স্ত্রী গ্রহণের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে স্ত্রীর অজ্ঞতার ওজর, গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তদন্তের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী বরের চার স্ত্রী বিদ্যমান থাকার কথা জানতোনা, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিয়ে ফাসিদ হবে।

৫. সুন্নি আলেমগণ সুন্নি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অস্থায়ী বা মেয়াদী বিয়ে সম্পাদিত হলে তাকে ফাসিদ বিয়ে বলে গণ্য করেছেন।

আইনগত ফলাফল

নিকাহে বাতিল ও নিকাহে ফাসিদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেয়ার পর উভয় ধরনের বিয়ের আইনানুগ ফলাফল কি, সেটা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

এ কথা শুরুতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নিকাহে বাতিল ও নিকাহে ফাসিদ উভয়ই শরিয়তের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ, অবৈধ ও নিন্দিত। এগুলোর তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ ঘটানো ওয়াজিব। তবে উভয়ের আইনগত ফলাফলে কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। নিকাহে বাতিলের বিলুপ্তি ঘটাতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়না। তা আপনা থেকেই অচল, নিষ্ক্রীয় ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বামী ও স্ত্রীর অবিলম্বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। নচেত, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। এ ধরণের বিয়ের পর সহবাস সংঘটিত হলে তাতে ব্যভিচারের নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হবেনা। তবে অন্য কোনো দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড দিতে হবে, যা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এতে কোনো দেনমোহর দিতে হয়না। ইদ্দতও পালন করতে হয়না। কেননা ইদ্দত শুধুমাত্র বৈধ বিয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যদি দম্পতির মিলনযোগ্য নিভৃত সাক্ষাতকারের পর বিচ্ছেদ ঘটে। বাতিল বিয়েতে সহবাস ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়। ব্যভিচারের কোনো ইদ্দত থাকেনা। তবে মহিলাকে জরায়ু নিষ্কাশিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নিকাহে বাতিলে উত্তরাধিকার নেই এবং সন্তানের সাথে পুরুষের পৈতৃক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়না। পৈতৃক বা প্রজন্মগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল ব্যক্তি বিশেষের বীর্য থেকে সন্তানের জন্মলাভ করাই যথেষ্ট নয়। ইসলামে প্রজন্মগত বা পৈতৃক সম্পর্ক স্বীকৃতি লাভ করে কেবলমাত্র বৈধ বিয়ের পরিণতিতে সন্তান জন্ম নিলে। অন্যথায় উপপত্নীর সন্তানদেরকেও বংশধর বলে স্বীকৃতি দেয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতো।

এবার নিকাহে ফাসিদের প্রসঙ্গে আসা যাক। এ বিয়ে একেবারে অচল ও অস্তিত্বহীন নয় বটে। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা ত্রুটিপূর্ণ, অশুদ্ধ এবং বিচ্ছেদযোগ্য। এ ক্ষেত্রেও স্বামী স্ত্রীর উভয়ের কর্তব্য বিয়ের ত্রুটি ও অশুদ্ধতা জানা মাত্রই আলাদা হয়ে যাওয়া এবং বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ঘোষণা দেয়া। স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকের অধিকার ও অবশ্য কর্তব্য হলো, যখনই জানতে পারবে যে বিয়ে অশুদ্ধ, তখনই বলে দেবে, আমি বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি অথবা আমার তোমার সাথে

কোনো সম্পর্ক নেই, অথবা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি। এই বিচ্ছেদের ঘোষণা একে অপরের সামনেও করতে পারে, আবার অনুপস্থিতিতেও করতে পারে। যে-ই প্রথম ঘোষণা করবে, তাতেই বিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দম্পতি যদি ইতস্তত করে, তাহলে ইসলামি আদালতের কর্তব্য বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া। নিকাহে ফাসিদে সহবাস নিষিদ্ধ। সহবাস করলে মারাত্মক গুণাহ হবে। তবে নিকাহে ফাসিদে সহবাস বা সহবাসের উপযোগী নিভৃত সাক্ষাতকার না হওয়া পর্যন্ত শরিয়তের দৃষ্টিতে তার কোনো ফলাফল দেখা দেয়না। সহবাস বা নিভৃত সাক্ষাতকার সংঘটিত হলে এবং তারপর বিচ্ছেদ ঘটলে তার নিম্নরূপ ফলাফল দেখা দেবে।

১. তালাকের ইদ্দতের ন্যায় ইদ্দত পালন করতে হবে এবং দম্পতির কোনো একজন বা আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই ইদ্দত শুরু হবে।

২. নির্ধারিত দেনমোহর ও মোহরে মেসেলের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম, তা দিতে হবে।

৩. সন্তানাদি জন্ম নিলে বংশীয় ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সন্তান জন্মদাতার বৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে এবং তার উত্তরাধিকারী হবে। *[তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬৭]*

৬৫. রসূল সা. কি হযরত সওদা রা. কে তালাক দিতে চেয়েছিলেন?

প্রশ্ন : তিরমিযী শরিফ ও সিহাহ সিত্তার অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে এই মর্মে একাধিক হাদিস রয়েছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা রা. যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন রসূল সা. তাকে তালাক দিতে মনস্থ করেছিলেন। এ কথা জানতে পেরে হযরত সওদা বলেছিলেন, আমি নিজের পালা আয়েশাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনার বিচ্ছেদ বিশেষত এই বয়সে আমার মনোপূত নয়। রসূল সা. এতে সম্মত হন এবং তালাক দেয়ার ইচ্ছে পরিত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে মনে কিছু প্রশ্ন জন্মে। রসূল সা. তালাককে 'বৈধ কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মাত্র একজন স্ত্রী থাকলে এবং সে অত্যাধিক বৃদ্ধা হয়ে গেলে তাকে তালাক দিয়ে কিংবা শুধু খোরপোষে সম্মত করে দ্বিতীয় বিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু রসূল সা.-এর অন্যান্য স্ত্রী থাকা অবস্থায় তালাক দেয়ার ইচ্ছার যৌক্তিকতা বুঝে আসেনা। 'নাইরুল আওতার' গ্রন্থের লেখক এর যে যুক্তি বর্ণনা করেছেন তাও আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। এ হাদিস কয়টি পড়লে যে কোনো ব্যক্তির মনে এ ধরনের খটকা জন্ম নিতে পারে। আশা করি আপনি তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে সন্তোষজনক জবাব দেবেন। সর্বশেষে এ কথাও নিবেদন করছি যে, প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। চিঠিতে যদি কোনো উগ্র শব্দ লেখা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমি সে জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী।

জবাব : উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা বিনতে যাময়া রা. সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে বর্ণিত যে ঘটনার ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, তার দুটো অংশ রয়েছে। প্রথমত, হযরত সওদা তাঁর পালার দিন হযরত আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং রসূল সা.-কে তাঁর পালার দিনেও হযরত আয়েশার গৃহে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অংশে হযরত সওদার নিজের প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করার কারণ বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার প্রথমাংশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক হাদিসবেত্তাদের পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। হযরত সওদা যে নিজের পালার দিন হযরত আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণিত। তবে হযরত সওদা এরূপ কেনো করলেন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে এবং এর জবাব জানতে হলে গভীর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আপনি লিখেছেন, ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে এই মর্মে একাধিক হাদিস রয়েছে যে, হযরত সওদার বার্ধক্য হেতু রসূল সা. তাকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এতে হযরত সওদা নিজের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দেন এবং তালাকের ইচ্ছে পরিত্যক্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট বর্ণনা থেকে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হয়না, বরং ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের মধ্যে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তালাক বা তালাকের ইচ্ছের কথা উল্লেখ করেননি। বুখারিতে এ হাদিস বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং 'হিবা' তথা দান সংক্রান্ত অধ্যায়ে দু'জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু উভয় জায়গায় পালার দিন ছেড়ে দেয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে تبتغى بذالك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم -এর সরল ও সোজা মর্ম এই যে, হযরত সওদা স্বেচ্ছায় রসূল সা.-এর সন্তুষ্টির খাতিরেই এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রসূল সা.-এর রুগ্ন অবস্থায় যেমন উম্মুল মুমিনীনগণের সকলে নিজ নিজ পালা ছেড়ে দিয়ে তাকে কেবল হযরত আয়েশার গৃহে অবস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে রসূল সা.-কে নিস্প্রয়োজনে ঝামেলা পোহাতে না হয়, এটাও ছিলো তেমনি। কোনো ভীতি বা হুমকির কারণে নয় বরং গভীর মমত্ববোধ ও ভক্তি শ্রদ্ধার বশেই তিনি এই ত্যাগে সম্মত হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিমের বর্ণনার ভাষা এরূপ

جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقالت يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة

"হযরত সওদা নিজের পালা হযরত আয়েশাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন "হে আল্লাহর রসূল। আমি আমার পালা আয়েশাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

অন্তত বুখারি ও মুসলিমের কোথাও যথাসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়ে আমি তালাকের কথার কোনোই উল্লেখ পাইনি। বুখারি ও মুসলিম উভয়ে এ ঘটনা সংক্রান্ত

হাদিসগুলো গ্রহণ ও বর্ণনা করলেন, অথচ তালাকের উল্লেখ সম্বলিত একটি হাদিসও গ্রহণ করলেননা, এটা খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

তবে আবু দাউদ ও তিরমিযীতে তালাকের উল্লেখ রয়েছে। আবু দাউদের বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে যে হাদিস রয়েছে, তার ভাষা নিম্নরূপ :

قالت سودة حين اسنت وفرقت ان يفارقها   يا رسول الله يومى لعائشة

"সওদা যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন এবং রসূল সা. থেকে বিচ্ছেদের আশংকা বোধ করলেন, তখন বললেন হে আল্লাহর রসূল! আমার দিনটি এখন থেকে আয়েশার।" কিন্তু উল্লেখিত হাদিসের ভাষা থেকেও এ কথা প্রতীয়মান হয়না যে, রসূল সা. তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেছিলেন। শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, স্বয়ং হযরত সওদার মনে এরূপ আশংকা জন্মে যে, আমাকে পরিত্যাগ করা হয় কিনা? এই আশংকা ভিত্তিহীন হয়ে থাকতে পারে এবং তালাকের বর্ণিত কারণটি সঠিকও না হতে পারে। এ ধরণের আশংকা তো যখন আয়েশার নামে অপবাদ রটেছিল এবং যখন উম্মুল মুমিনীনদেরকে নিজ নিজ ভবিষ্যত বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল, তখনও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া এ হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন রয়েছেন আব্দুর রহমান বিন আবু যুনাদ, যার সম্পর্কে হাফেয মুনযিরী 'সংক্ষিপ্ত আবু দাউদ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "একাধিক হাদিসবেত্তা এই ব্যক্তি সম্পর্কে বিতর্ক তুলেছেন।"

এই বর্ণনায় সওদার উদ্বেগের যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাও বিস্ময়োদ্দীপক। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, হযরত সওদার বিয়ে হযরত খাদিজার ইন্তিকালের পরে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আয়েশার সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর হিজরতের প্রাক্কালে তাঁর বিয়ে হয়। ৫ম হিজরীতে সূরা আহযাব নাযিল করে রসূল সা.-কে স্ত্রী পরিবর্তন করতে নিষেধ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে তালাকও এই নিষেধাজ্ঞার শামিল। হযরত সওদা তো আগেই বর্ষিয়সী মহিলা ছিলেন। পাঁচ বছরে তাঁর বয়সে কি এমন বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলো যে, সেই কারণে তালাকের আশংকা সৃষ্টি হবে? ব্যাপারটা দুর্বোধ্য বটে। আমরা তো দেখতে পাই উম্মুল মুমিনীনদের বেশির ভাগই নবীর গৃহিনী হয়ে আসার সময় প্রৌঢ়াই ছিলেন এবং বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা ছিলেন। অথচ তাঁদের কারো বেলায় এ আশংকা দেখা দিলনা। শুধুমাত্র হযরত সওদার বেলায়ই তালাকের প্রশ্ন উঠবে এটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। বস্তুত, রসূল সা. কোনো বিয়ে নিছক বিয়ের খাতিরেই করেননি। প্রত্যেক বিয়েতে হয় বৃহত্তর ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থ নিহিত থাকতো, নচেত এসব মহীয়সী মুসলিম রমণীর মনকে প্রবোধ দেয়া ও তাদেরকে আশ্রয় ও সহায়তা দানের উদ্দেশ্যেই এইসব বিয়ে সম্পন্ন হতো। কেননা শুধুমাত্র ইসলামের খাতিরে তারা ইতিপূর্বে বড় বড় দুর্ভোগ ভোগ করে

এসেছিলেন। কেউবা নিজের পরিবার ও গোত্র, কেউবা নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে এসেছিলেন।

হযরত সওদার অবস্থাও তদ্রুপ। তিনি নিজের সাবেক স্বামীর সাথে মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তারপর বিধবা হয়ে অসহায় অবস্থায় পতিত হন। তাঁর মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রসূল সা. তাঁকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেন। হযরত আয়েশা থাকা অবস্থায় হযরত সওদাকে বিয়ে করার আরো একটি কারণ ছিলো এই যে, হযরত খাদিজার ইন্তিকালের পর গৃহে রসূল সা.-এর কয়েকজন ছোট ছোট মেয়ে ছিলো। তিনি চেয়েছিলেন, তাদের দেখাশুনা ও লালন পালনের জন্য তাঁর একজন বয়স্কা গৃহিনী আসুক। রসূল সা.-এর সহধর্মিনীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। হাদিস থেকে জানা যায়, যেদিন যে স্ত্রীর গৃহে রসূল সা. অবস্থান করতেন, সেদিন সেই গৃহে কিছুক্ষণের জন্য সকল স্ত্রীগণের সমবেত হওয়া একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। বিশেষত হযরত আয়েশা ও হযরত সওদার সম্পর্ক খুবই গভীর ও সৌহার্দপূর্ণ ছিলো। সহীহ মুসলিম হযরত আয়েশার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে নিম্নরূপ :

ما رأيت امرأة احب الى ان اكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة

"আমি সওদা বিনতে যামরা ব্যতীত আর কোনো মহিলাকে এমন দেখিনি যার হৃদয় ও দেহের সাথে মিশে যেতে আমার ইচ্ছে হয়।"

এখন একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হযরত সওদার বিয়ের পেছনে যখন বৃহত্তর ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণের ভাবধারা সক্রিয় ছিলো এবং হযরত আয়েশার সাথে তাঁর সম্পর্ক এতো গভীর ছিলো, তখন এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, কোনো আশংকার কারণে নয় বরং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই হযরত সওদা এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং নিজের পালা হযরত আয়েশাকে অর্পণ করেছিলেন।

এ ব্যাপারে তিরমিযী শরিফে যে হাদিস রয়েছে তা নিম্নরূপ

خشيت سودة ان يطلقها النبى صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير – هذا الحديث حسن صحيح غريب .

"সওদা শংকিত হলেন, রসূল সা. তাঁকে তালাক দিতে পারেন। তাই বললেন, আমাকে তালাক দেবেন না, আমাকে বহাল রাখুন এবং আমি আমার দিন আয়েশাকে দিয়ে দিচ্ছি। রসূল সা. এতে সম্মতি দিলেন। এ উপলক্ষে আয়াত নাযিল হলো, (কোনো মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো ঔদ্ধত্য বা উপেক্ষার আশংকা করলে) সেই দম্পতি নিজেদের মধ্যে যে কোনো ধরনের আপোষ নিস্পত্তি করে নিতে পারে। আপোষই উত্তম।" *[এটি একটি ভালো ও বিরল হাদিস।]*

অস্বীকার করা যাবেনা, এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, হযরত সওদার নিজের পালা পরিত্যাগের পেছনে তালাকের আশংকা সক্রিয় ছিলো এবং সে কথা রসূল সা.-এর কাছেও বলা হয়েছিল। কিন্তু এ হাদিস সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো, ইমাম তিরমিযী এ হাদিসটি স্বীয় গ্রন্থের তাফসির অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। আর জানা কথা যে, হাদিস শাস্ত্রকারগণ তাফসির সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনায় সাধারণত উদারতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, ইমাম তিরমিযী এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না থেকে এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আবু দাউদ তারালিসী থেকে সংগ্রহ করেছেন। অথচ খোদ ইমাম তারালিসী স্বীয় হাদিস গ্রন্থ মুসনাদে হযরত আয়েশা থেকে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাতে তালাকের উল্লেখ নেই। সেই হাদিসের ভাষা এরূপ :

عن عائشة ان سودة وهبت يومها لعائشة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

"রসূলুল্লাহর নিকট হযরত আয়েশার অনন্য মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সওদা নিজের পালা তাকে দিয়ে দেন।"

বস্তুত, ইমাম বুখারির হাদিসে একটু ভিন্ন ভাষায় যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে, এ হাদিসের বক্তব্য তারই কাছাকাছি।

সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া এ ঘটনা তাবাকাতে ইবনে সা'দে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় শুধু তালাকের ইচ্ছে নয়, তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখান থেকেই তালাকের কাহিনী এতো খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু তাবাকাতের এই বর্ণনাগুলোতে বহু বিভিন্নতা ও বিভ্রাট রয়েছে। কোনো বর্ণনার সনদে বিতর্কিত অনির্ভরযোগ্য আব্দুর রহমান বিন আবু যুনাদ রয়েছেন। কোথাও তালাকের বার্তা পাঠানোর উল্লেখ রয়েছে। কোথাও তালাকের ইঙ্গিতবহ শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে। এর চেয়েও বিস্ময়কর বর্ণনা এই যে, হযরত সওদা রসূল সা.-এর যাতায়াতের রাস্তায় বসে রইলেন এবং তিনি যখন এলেন, তখন সওদা আল্লাহর দোহাই দিয়ে তালাক প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ভেবে স্তম্ভিত হতে হয় যে, তালাক যদি রজয়ী অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য হয়ে থাকে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন না হয়ে থাকে, তাহলে নবীগৃহ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেয়ে বসার কাহিনী কিভাবে সঠিক হতে পারে। এসব প্রশ্ন ছাড়াও আল্লামা ইবনে হাজার স্বীয় গ্রন্থ 'ইসাবাতে' বলেছেন, এসব বর্ণনার সনদে কোনো পুরুষ বা মহিলা সাহাবি নেই। সম্ভবত এ কারণে ইমাম বুখারি ও মুসলিম তালাকের উল্লেখ সম্বলিত হাদিসগুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। বুখারি ও মুসলিমের মোকাবিলায় তাবাকাতে ইবনে সা'দ যে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা, তা কারো অজানা নয়। তালাক সংক্রান্ত এ হাদিসের পর্যালোচনা করে ইমাম ইবনে হাযম স্বীয় গ্রন্থ 'আল মুহাল্লাতে' বলেছেন, 'এসব মিথ্যা ও মনগড়া।'

এই সমস্ত আলোচনা থেকে ঘটনার যে বিশুদ্ধ, নির্ভুল, যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যনির্ভর চিত্র পাওয়া যায়, সেটা এই যে, হযরত সওদা অবশ্যই হযরত আয়েশাকে নিজের পালা দিয়ে দিয়েছিলেন, তবে সেটা ছিলো তাঁর স্বেচ্ছায়প্রণোদিত কাজ। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতা ও আনন্দের সাথে এই ত্যাগের মহত্ব দেখিয়েছিলেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য রসূল সা. ও হযরত আয়েশাকে খুশি করা। সতর্কতা ও সত্য নিষ্ঠার দাবি এই যে, ঘটনার এই চিত্রটিকেই সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত এবং অনাবশ্যক সন্দেহ সংশয় ও দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে, এমন যে কোনো ব্যাখ্যা ও বিবরণ এড়িয়ে চলা উচিত। *[তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৬৪]*

৬৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদার বিয়ে সম্পর্কে আরো আলোচনা

প্রশ্ন তরজমানুল কুরআনের আগষ্ট সংখ্যা এইমাত্র পড়লাম। হযরত সওদা সংক্রান্ত প্রশ্নের আপনি যে উত্তর দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়।

ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে লেখকরা সাধারণ ঘটনার শূন্য স্থানকে নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে পূরণ করতে অভ্যস্ত। মুসলিম মহাপুরুষদের চরিত্রকে কাল্পনিক রং মিশিয়ে তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে নিজের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় আর অন্যদিকে পাঠকের পূজার ভাবাবেগে উস্কে দেয়া হয়। স্বভাবতই এতে অনুকরণ ও অনুসরণের প্রেরণা স্তিমিত হয়ে যায়। আপনার জবাবেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। কয়েকটি প্যারায় এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

হযরত সওদার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় রসূল সা.-এর সকল মেয়ে সাবালিকা ছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রে জানা যায়। তারা হযরত সওদার দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। হযরত সওদা ও তাঁর স্বামী প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কী জীবনে মুসলমানদের উপর যে দুর্যোগ ও নির্যাতন নেমে এসেছিল, এই দম্পতিও তাতে আক্রান্ত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর পাঁচটি সন্তানের ভার এসে পড়েছিল হযরত সওদার উপর। রসূল সা. সেই পাঁচটি সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ ও হযরত সওদার সান্ত্বনার খাতিরে তাঁকে বিয়ে করে থাকতে পারেন। এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত অনুমান বলে মনে হয়। 'রসূল সা.-এর সহধর্মিনীদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিলো।' আপনার এ বক্তব্য নিছক শ্রদ্ধাঞ্জলী ছাড়া কিছু নয়। এটা ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের বিরোধী। সব সময় এই নীতিটা মেনে চলবেন যে, সনদ সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলে 'আসমাউর রিজাল' (হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত) শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী দেখে নেবেন এবং উদ্ধৃতি দেয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

আব্দুর রহমান বিন আবু যুনাদ ওয়াকেদীর মতো পুরোপুরি বিতর্কিত নন। তাঁর সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, তিনি মদিনার

অধিবাসী ছিলেন এবং জীবনের শেষভাগে বাগদাদে এসে বসবাস করতে থাকেন। মদিনায় থাকাকালে তিনি যেসব হাদিস বর্ণনা করেন তাতে কোনো খুঁত নেই এবং তা নির্ভরযোগ্য। আর বাগদাদে আসার পর যেসব হাদিস বর্ণনা করেন, সেগুলো বিতর্কিত।

মোটকথা, তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অসতর্কতা বাঞ্ছিত নয়। আপনার নিবন্ধে যে কমতি রয়েছে, সেটা এই অসতর্কতা থেকেই উদ্ভুত।

জবাব : আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি আমার লিখিত জবাবটি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখেছেন এবং যেসব বিষয় আপনার কাছে সমালোচনার যোগ্য মনে হয়েছে তা আমাকে অবহিত করেছেন। তবে ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে শূন্যস্থানকে লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে পূরণ করা এবং মুসলিম মহাপুরুষদের চরিত্রকে কাল্পনিক রং মিশিয়ে চিত্রিত করার মাধ্যমে নিজের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করার যে তীর্যক মন্তব্যটি আপনি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আমি পুরোপুরি বুঝতে পারলামনা।

আমি আমার আগের প্রকাশিত জবাবে লিখেছিলাম, "হযরত সওদাকে বিয়ে করার আরো একটি কারণ ছিলো এই যে, হযরত খাদিজার ইন্তিকালের পর নবীগৃহে কয়েকজন ছোট ছোট মেয়ে ছিলো এবং রসূল সা. এরূপ ইচ্ছে পোষণ করছিলেন যে, তাদের দেখাশুনার জন্য একজন প্রবীণ মহিলা তাঁর গৃহিনী হয়ে আসুক।" এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে আপনি বলেছেন, নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসারে সে সময় রসূল সা.-এর সকল কন্যা সাবালিকা ছিলেন এবং হযরত সওদার দেখাশুনার মুখাপেক্ষী ছিলেননা। আমার বক্তব্যের মর্ম ছিলো এই যে, রসূল সা.-এর কন্যাদের কেউ কেউ তখন পর্যন্ত অবিবাহিতা ছিলেন। তাই নবীগৃহে একজন প্রবীণ গৃহিনী থাকা কল্যাণকর ছিলো। এ কথা সত্য যে, রসূল সা-এর কন্যাদের মধ্যে হযরত যায়নবের বিয়ে হযরত খাদিজা বেঁচে থাকতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আর হযরত রুকাইয়ার বিয়েও হযরত সওদার বিয়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে হযরত উসমানের সাথে এবং হযরত ফাতিমার বিয়ে হযরত আলীর সাথে তখনো হয়নি। এ দু'টো বিয়ে যে হযরত সওদার বিয়ে এবং হিজরতের পরে হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হযরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে ৩য় হিজরীতে এবং হযরত ফাতিমার বিয়ে বদর যুদ্ধের পরে ওহুদ যুদ্ধের আগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েরা সাবালিকা হয়ে গেলে আর দেখাশুনার মুখাপেক্ষী থাকেনা –এ ধারণা সঠিক বলে মনে হয়না। আমার মনে হয়, বয়োপ্রাপ্তা হওয়ার পরও এমন বহু বিষয় ও সমস্যা মেয়েদের থাকে, যার সম্মুখিন হয়ে মাতৃসুলভ স্নেহ তদারকি ও দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আগের চেয়েও বেশি অনুভূত হয়। আমি এই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলাম।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, রসূল সা. যখন হিজরত করেন, তখন তাঁর সাথে তার পরিবারের কেউ ছিলেননা। এই দুই বোন যতোদিন হিজরত করেননি এবং মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন হযরত সওদার তদারকি ও দেখাশুনা তাদের জন্য জরুরি ছিলো। সিরাত গ্রন্থাকারগণ এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, হিজরতের কিছুদিন পর যখন রসূল সা. নিজ পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসার জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মক্কায় পাঠান, তখন হযরত ফাতিমা ও হযরত উম্মে কুলসুম হযরত সওদার সাথেই মদিনায় আগমণ করেন। হযরত সওদাকে বিয়ে করার যে কারণটি আপনি উল্লেখ করেছেন এবং যা আপনার কাছে অধিকতর যুক্তিযুক্ত, সেটা আমিও অস্বীকার করিনা। আমি তো পূর্ববর্তী জবাবে এ কারণটিই প্রথমে উল্লেখ করেছি। তবে আমার ধারণা, দ্বিতীয় কারণটি একেবারে যুক্তি বহির্ভুত নয়।

আপনি আরো বলেছেন যে, 'রসূল সা.-এর স্ত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো এরূপ ধারণা নেহাৎ ভক্তির আতিশয্য থেকে উদ্ভুত এবং ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের বিরোধী।' আমিও অস্বীকার করিনা যে, সাহাবিগণ –তা পুরুষই হোন বা মহিলা, মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেননা। এ দুর্বলতার কারণে বাস্তবে যে ঘটনাবলী ঘটেছে, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তাঁরা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যথার্থই 'পরস্পরের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল' এবং 'পরস্পরে ভাই ভাইও' ছিলেন। বিরল ঘটনাবলী ধর্তব্য নয়। ধর্তব্য হলো সাধারণ অবস্থা। রসূল সহধর্মিনীদের জীবনী আমি যতোদূর অধ্যয়ন করেছি, তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, তাঁদের মধ্যে কখনো যদি সাময়িক মনকষাকষি হয়ে থাকে, তবে তা পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে হয়নি বা হৃদ্যতা ও ভালোবাসার অভাবের কারণে হয়নি। বরং তার পেছনে কার্যকর ছিলো রসূল সা.-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ ও ভালোবাসা। কিন্তু রসূল সা.-এর উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ নীতি এই ঈর্ষাকাতর মনোভাবকেও অনেকাংশে দূর করে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এ ঘটনাটি আপনি নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন যে, রসূল সা. যখন তার কোনো এক স্ত্রীর গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন অপর স্ত্রী তাঁর জন্য সেখানে খাবার পাঠান। যে স্ত্রীর গৃহে তিনি অবস্থান করছিলেন, তিনি উঠে গিয়ে খাবার নিয়ে আসা মেয়েটির হাত ধরে এমন জোরে টান দেন যে, খাবার পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং খাবার জিনিসটি মাটিতে মিশে যায়, তিনি মেয়েটিকে বললেন "এই খাবার পাঠানোতে তোমার মার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে।" অত:পর যে স্ত্রীর গৃহে তিনি অবস্থান করছিলেন তাকে আদেশ দিলেন, "এর চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রি আরো ভালো পাত্রে করে অপর স্ত্রীর ঘরে পাঠিয়ে দাও।" তিনি তৎক্ষণাত এ আদেশ পালন করলেন। এভাবে একটা

অপ্রীতিকর ঘটনার শুভ সমাপ্তি ঘটলো। আমি যতোদূর উপলব্ধি করতে পেরেছি, এসব সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত কলহের ঘটনা কেবল রসূল সা.-এর বেঁচে থাকাকালে সংঘটিত হতো এবং তার মীমাংসাও তিনি নিজেই করে দিতেন। কিন্তু যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন, তখন এই সব রেষারেষী ও ঈর্ষার ভাবও চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এরপর তাঁর সহধর্মিনীদের এমন অবস্থা হয় যে, তাঁরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে একে অপরের হাত মেপে দেখতেন যে, কার হাত কতো লম্বা। কেননা রসূল সা. একবার বলেছিলেন, যে স্ত্রীর হাত বেশি লম্বা।[১] সে সবার আগে আমার কাছে আসবে।

ইবনে সা'দের উদ্ধৃত একটি বর্ণনার সনদে ওয়াকেদী ও আবু যুনাদ দু'জনই রয়েছেন। অপর একটি মুরসাল (সাহাবির নাম বিহীন) বর্ণনা সাঈদ বিন মানসুর কর্তৃক আবু যুনাদ থেকে সংগ্রহীত। কিন্তু সেখানে হযরত আয়েশার নামের উল্লেখ নেই। আলোচ্য বিতর্কিত বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবু যুনাদ। আবু যুনাদের কিছু কিছু বর্ণনায় যে বিতর্ক রয়েছে, সে কথাতো আপনিও স্বীকার করেন। সেটা বাগদাদে অবস্থানকালের বর্ণনাও হতে পারে। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এটা তদন্ত করা কঠিন যে, এই বর্ণনাকারীর বর্ণিত যে হাদিসটিতে তালাকের উল্লেখ রয়েছে, সেটা তার বাগদাদের সময়কার, না মদিনার সময়কার। কিন্তু ইমাম যাকীউদ্দীন মুনযিরী যেহেতু তালাক সংক্রান্ত হাদিস প্রসঙ্গেই তাঁর বিতর্কিত হওয়ার উল্লেখ করেছেন, তাই এ হাদিস তার বাগদাদ আমলের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আপনার হয়তো এ কথাও জানা আছে যে, হাদিস বিশেষজ্ঞদের একটি দল যখন কোনো বর্ণনাকারীকে বিশ্বাসযোগ্য এবং অপর দল বিতর্কিত আখ্যা দেয়, তখন তাকে বিতর্কিত ধরে নেয়াকেই অগ্রাধিকার দিতে হয় এবং তার বর্ণনা গ্রহণে বিরত থাকাই রীতিসিদ্ধ।

যাহোক, তালাক বা তালাকের ইচ্ছা সংক্রান্ত হাদিস মেনে নিতে আমার দ্বিধা শুধু একজন বা দু'জন বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা বা অবিশ্বস্ততার কারণে নয় বরং এর বহু কারণ রয়েছে। একটি প্রধান কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেটি হলো, ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়ে হযরত সওদা কর্তৃক নিজের পালা হযরত আয়েশাকে দেয়া সংক্রান্ত হাদিস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তালাকের বর্ণনা সম্বলিত

---

১. আসলে এটা একটা রূপক শব্দ ছিলো এবং রসূল সা.-এর স্ত্রীগণ এর আভিধানিক অর্থ বুঝে নিয়েছিলেন। পরে যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা সবার আগে (রসূল সা.-এর ইন্তিকালের দুই মাস পর) ইন্তিকাল করলেন, তখন সবাই বুঝলেন হাত লম্বা হওয়ার অর্থ পরোপকার ও দানশীলতা। এ ব্যাপারে হযরত যয়নবই সবার চেয়ে অগ্রসর ছিলেন। দানশীলতার ও দুস্থ মানুষের সেবায় তার হাতই সবচেয়ে লম্বা ছিলো বিধায় তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' (গরিবদের মা) নামে খ্যাত হন। তাই রসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বানী তাঁর ব্যাপারেই সত্য হয়ে দেখা দেয়। (গোলাম আলী)

হাদিস গ্রহণ করেননি। এই সাথে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, প্রাচ্যবিদরা এই তালাকের বিষয়টির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। তাদের সংকলিত 'ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে' হযরত সওদা সম্পর্কে যে নিবন্ধ রয়েছে, তাতে বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদের হাদিসের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। অথচ ইবনে সা'দের বরাত দিয়ে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে, হযরত সওদাকে তালাক দেয়া হয়েছিল।

আপনার এ পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান ও যুক্তিসঙ্গত যে, তাত্ত্বিক ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমি আগেও এই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আরো বেশি সতর্ক থাকবো। *[তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৬৪]*

৬৭. কতোখানি দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়?

প্রশ্ন দুধ পানের কারণে যে বিয়ে হারাম হয় এবং একই মহিলার দুধ পানকারীদের মধ্যে বিয়ে হতে পারেনা, এটা সর্বজন স্বীকৃত ও অকাট্য বিধান। কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট নয় যে, কতোটুকু বা কতোবার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়। আমি একটি হাদিসে পড়েছি, একবার দু'বার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়না। অপর এক হাদিসে আছে যে, পাঁচবার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত আলেমগণ বলে থাকেন, দুধ খুব অল্প পরিমাণে একবার পান করলেও বিয়ে হারাম হয়। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্টভাবে জানাবেন যে, কতোবার ও কতোটুকু দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়।

জবাব : ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, কতোবার ও কতোটুকু দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়। চার মাযহাবের মধ্যে হানাফি ও মালেকী মাযহাবের মত হলো, দুধ পান মাত্রই বিয়ে হারাম হয়ে যায়, চাই তা একবার পান করুক এবং যতো কমই পান করুক। শাফেয়ী মাযহাবের মতে পাঁচবার এবং হাম্বলী মাযহাবে তিনবার পান করলে বিয়ে হারাম হয়।

শাফেয়ীদের মতের ভিত্তি হলো, কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, কুরআনে প্রথমে দশবার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয় এই মর্মে আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে সেই আয়াত রহিত হয়ে পাঁচবার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং এটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কেননা কুরআনের আয়াত প্রমাণিত হওয়ার জন্য কোনো বিরল বা একক বর্ণনা যথেষ্ট নয়, বরং 'মুতাওয়াতির' অর্থাৎ সর্বজনবিদিত ও পঠিত অটুট ধারাবাহিকতা সহকারে হস্তান্তরিত হওয়া অপরিহার্য। তাই যেসব হাদিসে কুরআনের কোনো বিরল ও অপ্রসিদ্ধ আয়াত বা শব্দ বা পঠনরীতির বর্ণনা রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা শরিয়তের কোনো বিধানের স্বীকৃতি দলিল বা উৎস হতে পারেনা। শাফেয়ী

মাযহাবের এই মতের উৎস যেহেতু কুরআনের একটি বিরল পঠিত অংশ এবং তার সপক্ষে কুরআন ও হাদিসের অন্য কোনো বলিষ্ঠ দলিল নেই, তাই এ মতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা চলেনা।

দ্বিতীয় মতটি হাম্বলী মাযহাবের। এ মতটির প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, তিনবার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়। কতিপয় সহীহ্ হাদিস দ্বারা এই মত সমর্থিত। তন্মধ্যে একটি হাদিসে রসূল সা. বলেন যে, একবার বা দু'বার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়না। এ হাদিস থেকে হাম্বলী ফকীহ্গণ এভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একবার ও দু'বারে যখন হারাম হয়না, তখন তিনবারে অবশ্যই হারাম হবে। তারা আরো যুক্তি দেন যে, কুরআন ও হাদিসে দুধ পানের বার ও পরিমাণ অনির্দিষ্ট ছিলো। এই হাদিস তাকে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। 'উসূলে ফেকাহ' শাস্ত্রের আলোকে এ যুক্তি শুদ্ধ এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কুরআন ও হাদিসে এক জায়গায় অনির্দিষ্টভাবে একটা বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র তা নির্দিষ্ট করা ও তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এই শেষোক্ত নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিধান অনুসারেই কাজ করার রেওয়াজ চালু রয়েছে। কিন্তু দুধ পান সংক্রান্ত যেসব হাদিস হাম্বলী মাযহাবের সিদ্ধান্তের ভিত্তি, সেই হাদিসগুলোর ব্যাপারে একটি জটিলতা রয়েছে। এই হাদিসগুলোতে এক বা দু'বার দুধ পান করলে বিয়ে হারাম হয়না বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে এই হাদিসগুলোর বক্তব্য পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। হাদিসের শব্দ এ রকম :

مصة او مصتان' رضعة او رضعتان ' املاجة او املاجتان

অর্থাৎ এক চোষা বা দুই চোষা। এখানে যে দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ একই সময়ে দুইবার চোষা কিংবা বিভিন্ন সময়ে দুইবার দুধ পান করা হতে পারে। রসূল সা. এ কথা বলে হয়তো এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, শিশু একবার এসে একটা দুটো চোষা বা চাটা দিলে তাতে বিয়ে হারাম হয়না। কেননা এতে দুধ মুখে ও পেটে নাও যেতে পারে। তবে সে দু'বারে বেশি দুধ চুষলে দুধ নিশ্চয়ই মুখে ঢুকে পেটে চলে যাবে। তথাপি হাম্বলী মাযহাবের এই হাদিস দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন পুরোপুরি জটিলতামুক্ত নয়।

এরপর হানাফি, মালেকী ও অন্যান্য ফকীহ্দের মতামত নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এসব মতানুসারে যে কোনো পরিমাণ দুধ পান দ্বারা বিয়ে হারাম হয়। তাদের যুক্তি হলো, কুরআন ও হাদিসে সর্বাবস্থায় এবং কোনো সীমা শর্ত ও পরিমাণ নির্দেশ না করেই দুধ পান দ্বারা বিয়ে হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আন নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে... এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে।"

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে :

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

"যে সব আত্মীয় জন্মসূত্রে হারাম, দুধ পান সূত্রেও তারা হারাম।"

কুরআন ও হাদিসের এসব সুস্পষ্ট ঘোষণায় অনির্দিষ্ট ও শর্তহীনভাবে দুধ পানজনিত কারণে বিয়ে হারাম করা হয়েছে। দুধ একবার পান করা হোক বা একাধিকবার পান করা হোক তা 'দুধ পান করা' বলেই অভিহিত হয়ে থাকে। এটা শুধু হানাফি ও মালেকীদের মত নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগুরু অংশেরই মত। ইমাম মুসলিম শরিফের টীকায় এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুয়াত্তার টীকায় বলেছেন, আলেম ও ফকীহদের অধিকাংশেরই অভিমত এরূপ।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনার দাবি রাখে। সেটি এই যে, আজকাল মানুষের স্বভাব এতো বেশি দুষ্কর্মপ্রবণ হয়ে গেছে যে, হাম্বলীদের মত অনুসরণের অনুমতি দিলে মানুষ তা দ্বারা অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেখানে তিনবার দুধ পান করানো হয়েছে, সেখানেও হয়তো বলা হবে যে, মাত্র একবার বা দু'বার পান করানো হয়েছে, দুধ পানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের সমস্যা এমনিতেই জটিল। তদুপরি যদি সংখ্যার প্রশ্নটাও তদন্তসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তবে অনেক ক্ষেত্রে এমন মারাত্মক বিরোধ দেখা দেবে যে, নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নেয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এসব কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অভিমতই অগ্রগণ্য ও নিরাপদ যে, যে কোনো পরিমাণ দুধ পান দ্বারাই বিয়ে হারাম হয়ে যাবে, চাই তা এক সময়ে বা একাধিক সময়ে পান করা হোক। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৬]*

৬৮. পিতামাতার আদেশে স্ত্রী তালাক দেয়া যায় কি?

প্রশ্ন : পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছিলেন, বাবা মা যদি পুত্রকে তার স্ত্রী তালাক দেবার আদেশ দেয়, তবে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই তালাক দেয়া যাবে, যে ক্ষেত্রে শরিয়ত সম্মত কোনো কারণ বর্তমান থাকে। আপনি আরো বলেছেন, হযরত ওমর রা. যে তার পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতেও শরিয়ত সঙ্গত কারণ ছিলো।

কিন্তু এ জবাবে আমার এ সংক্রান্ত সংশয় দূর হয়নি। এ প্রসঙ্গে অন্য কিছু হাদিস থেকে জানা যায়, পিতামাতা আদেশ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় স্ত্রী তালাক দিতে হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে বর্ণিত সেই বিশুদ্ধ হাদিসটি, যাতে তিনি পুত্র ইসমাঈল আ. কে তার দরজার চৌকাঠ পাল্টাবার আদেশ দেন (অর্থাৎ তা স্ত্রীকে তালাক দেবার আদেশ দেন)। পিতার আদেশ তাঁর নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এ হাদিস থেকে তো একথাই প্রমাণ হয় যে,

পিতামাতার আদেশ শোনার সাথে সাথে বিনাবাক্য ব্যয়ে স্ত্রী তালাক দিতে হবে। অন্যথায় গুণাহ্গার হবে।

জবাব : এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমি যে জবাব দিয়েছিলাম, তা পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। শরিয়াহ্ তালাককে নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই, শরিয়াহ কারণ ছাড়া তালাক প্রদান করলে আল্লাহর নিকট অবশ্যি অপরাধী গুণাহগার হতে হবে। এ ধরণের তালাকের অশুভ প্রতিক্রিয়া কেবল স্বামী পর্যন্তই সীমিত থাকেনা। বরঞ্চ এ ধরণের তালাক পিতামাতার প্রতি নি:শর্ত আনুগত্যের প্রমাণ। এ ধরণের তালাক দ্বারা স্ত্রী এবং সন্তানের অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়, তারা কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়।

রসূল সা. স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, স্রষ্টার বিধান অমান্য করে সৃষ্টির হুকুম পালন করা যাবেনা। বিনা কারণে তালাক দেয়াকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং অপরকে কষ্টে নিপতিত করাকে আল্লাহ মোটেও পছন্দ করেননা।

হযরত ওমর রা. তাঁর পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে যে সম্ভাব্য কল্যাণ বিবেচনার কথা বলেছি, সে কথা অপরাপর মুহাদ্দিসগণও স্বীকার করেছেন। যেমন, শাইখ আব্দুর রহমান আল বান্না তাঁর মুসনাদে আহমদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুর রব্বানীর তালাক অধ্যায়ে এই হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

"একথা সুস্পষ্ট, হযরত ওমর রা. এ কারণেই মহিলাটিকে অপছন্দ করেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সে তাঁর পুত্রের উপযুক্ত ছিলনা। এ নির্দেশের ক্ষেত্রে হযরত ওমর রা. -এর বিবেচনায় অবশ্যি কোনো কল্যাণ ছিলো। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামও লাভ করতেন। হযরত ওমরের নির্দেশ না হলে নবী করীম সা. ও আবদুল্লাহ রা. কে এ তালাকের অনুমতি দিতেননা, এটাও বিবেচনার বিষয়।"

মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর বিখ্যাত 'মিরকাত' গ্রন্থের 'ঈমান' অধ্যায়ের 'কবিরা গুনাহ' পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

মিশকাতের যে হাদিসটিতে বলা হয়েছে, তোমরা পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করোনা এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করোনা এমনকি তারা যদি তোমাকে পরিজন ও সম্পদ ত্যাগ করতেও বলেন। এ হাদিসটি দ্বারা পিতা পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেবার নির্দেশ দিলে তা মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েনা, এই পুত্রবধূর বর্তমানে পিতামাতার যতো কষ্টই হোকনা কেনো। কারণ এই ধরণের তালাকে পুত্র কষ্টে নিপতিত হয়। এরূপ অবস্থায় তাদের আনুগত্য করা যেতে পারেনা। তারা যদি পুত্রকে ভালোই বাসেন, তবে এই ভালোবাসার দাবি তো হলো, শরয়ী কারণ ছাড়া তারা পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলবেন না। তারা পুত্রের কষ্টের কথা অনুভব করবেন। এমতাবস্থায়, তালাক দিতে বলাটা তাদের অজ্ঞতা। অতএব এ ধরণের আদেশ গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল আ. কে তাঁর স্ত্রী তালাক দেবার যে নির্দেশ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তার পেছনে শরিয়া কারণ বর্তমান ছিলো বলে ধরে নিতে হবে। একজন নবী বিনা কারণে তাঁর পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলবেন তা কিছুতেই কল্পনা করা যায়না। একই কথা হযরত ওমরের ব্যাপারে। তিনি তাঁর এক পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রা. শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া এ ধরণের নির্দেশ দিয়ে থাকবেন বলে মেনে নেয়া যায়না।

এ কথাগুলো আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে বলছিনা। বরঞ্চ এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোতেই এর সমর্থন রয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. সংক্রান্ত হাদিস বুখারির 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এ হাদিস থেকে জানা যায়, ইসমাঈল আ. এবং তাঁর মাকে আরবের মরুভূমিতে রেখে আসার পর হযরত ইবরাহীম আ. মাঝে মধ্যে তাঁদের খোঁজ খবর নেবার জন্যে সেখানে যেতেন। ইসমাঈল আ. এর বিয়ের পর একবার তিনি সেখানে যান। তখন ঘরে কেবল ইসমাঈলের স্ত্রী ছিলেন। তিনি শ্বশুরকে চিনতেন না। হযরত ইবরাহীম আ. তার কাছে তাদের খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমরা অত্যন্ত দুরবস্থায় আছি। দারিদ্র এবং বিপদাপদে নিমজ্জিত আছি।" বধূ অভিযোগের সুরে কথাগুলো বললেন।

কিন্তু একজন নবীর স্ত্রী এবং একজন নবীর পুত্রবধূর পক্ষে এতোটা অধৈর্য হয়ে পড়া কিছুতেই ঠিক হয়নি। এতোটা লাগামহীন কথাবার্তা বলা মোটেও উচিত হয়নি। একজন বৃদ্ধ অপরিচিত মেহমান তার ঘরে এলো আর তিনি তাঁর সাথে এ ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন, নিজেদের অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরতে শুরু করলেন, এমনটি কিছুতেই তার জন্যে মানানসই হয়নি। এ কারণে হযরত ইবরাহীম আ. সিদ্ধান্ত নিলেন, এ মেয়ে আমাদের সংসারের উপযোগী নয়। তিনি তাকে বলে এলেন, "ইসমাঈল ফিরে এলে তাকে আমার সালাম বলবে এবং তার ঘরের কপাট পাল্টাতে বলবে।" ইসমাঈল ফিরে এলে বউ তাকে বললেন, এই এই ধরনের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন এবং তিনি এই এই কথা বলে গেছেন। বউ পুরো ঘটনা তাঁকে বললেন। ইসমাঈল পিতার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝে নিলেন এবং স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। হাদিস থেকে আরো জানা যায়, ইসমাঈল আবার বিয়ে করেন এবং ইবরাহীম আ. পুনরায় তাঁদের দেখতে আসেন। এবারও ইসমাঈল বাড়িতে ছিলেননা। ইবরাহীম আ. এ বউকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু এবং সৎস্বভাবের অধিকারীনি দেখতে পান। অপরিচিত বৃদ্ধকে তিনি চিনেননি। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত মর্যাদাব্যঞ্জক ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, আমরা ভালো আছি। সুন্দরভাবে আমাদের দিনাতিপাত হচ্ছে। তিনি সাথে সাথে আল্লাহর প্রশংসাও করেন। অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ

আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। পানি, দুধ, গোশত সবই পাওয়া যায়। আপনি তশরীফ রাখুন, আমি আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করছি।"

হযরত ইবরাহীম এই বউ -এর জন্যে কল্যাণের দোয়া করলেন। বললেন, "তোমার স্বামী এলে বলবে, ঘরের কপাট যেনো ঠিক রাখে।" এই বউটির চারিত্রিক সৌন্দর্য একথা থেকেও ফুটে উঠে, ইসমাঈল ঘরে ফিরে এলে তিনি তাকে বলেন, আপনি যাওয়ার পর অত্যন্ত ভালো ও সম্মানিত একজন বুযুর্গ তশরীফ এনেছিলেন। এরপর বিস্তারিত ঘটনা তিনি স্বামীকে বলেন।

এ বিস্তারিত কাহিনী থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম এমনি এমনি ঘরের কপাট (অর্থাৎ-স্ত্রী) পরিবর্তন করতে হুকুম দেননি। বরঞ্চ তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই কাজে লাগিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পুত্রকে একটি উত্তম স্ত্রী দান করলেন, যিনি সর্বদিক থেকে একজন নবীর স্ত্রী হবার উপযুক্ত।

এই বিস্তারিত আলোচনার পরও আমার মতে এই বিষয়ের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বাবা কিংবা মা যদি পুত্রের কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেবার দাবি করে, তবে এক্ষেত্রে ছেলের জন্যে করণীয় হলো তাদের দাবি বা আদেশের সপক্ষে যদি শরিয়তসম্মত যুক্তি থাকে, তবে ছেলে স্ত্রী তালাক দিয়ে দেবে, অন্যথায় ছেলের জন্যে তাদের দাবির কারণে স্ত্রী তালাক দেয়া জরুরি নয়। *[তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৪]*

৬৯. রসূল সা.-এর একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী। এখানে খৃষ্টানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। তারা বিশেষত তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের একাধিক বিয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তর্কে লিপ্ত হয়। এ জিনিসটা কিছুতেই তাদের বুঝে আসেনা। এ প্রসঙ্গে তারা আমাদের রসূল সা.-এর নয়টি বিয়ের উপর নানা রকম আপত্তি তোলে এবং বলে, তিনি হযরত আয়েশাকে অত্যন্ত অল্প বয়সে বিয়ে করেন। এর কি প্রয়োজন ছিলো তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য।

আমি এবং আমার অন্য কতোক মুসলিম বন্ধু সাধ্যমত তাদের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। তবে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাদেরকে পুরোপুরি সন্তুষ্টি করতে পারিনা। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন এবং একাধিক বিয়ে, বিশেষত রসূল সা.-এর একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় এমন তথ্যাদি ও দলিল প্রমাণ সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শন সহজতর হবে এবং আমরা ইনশাল্লাহ সকল বিষয়ে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হবো।

জবাব এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বহুবিবাহকে একটা ধর্মীয় ও সামাজিক অনাচার হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের

অনুকরণে কিছু পাশ্চাত্যমনা মুসলমানও এ নিয়ে নাক সিটকায়। অথচ আধুনিক খৃষ্টবাদের আবির্ভাবের আগে মানবেতিহাসে কখনো বহু বিবাহকে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে দুষণীয়, অনভিপ্রেত কিংবা খোদাভীরুতার পরিপন্থী মনে করা হয়নি। আপনি ঐসব খৃষ্টান আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং নিজেও বাইবেল পড়ে দেখবেন যে, তাতে হযরত ইবরাহীম আ. হযরত ইসহাক আ. হযরত ইয়াকুব আ. এবং অন্যান্য নবীগণের একাধিক স্ত্রী থাকার কথা উল্লেখ করা আছে কিনা আমাদের রসূল সা.-এর নয় বিয়ে সম্পর্কে যারা আপত্তি তোলে, ভাবতে অবাক লাগে, তাদের মনে বাইবেলে বর্ণিত এসব বহু বিবাহে কোনো আপত্তি ওঠেনা।

আসল ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিগুলোর মাথায় একদিকে চড়াও হয়ে আছে যৌন আকর্ষণ ও কামোন্মত্ততা, অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের মনমগজ। এ জন্য তারা ভাবতে বাধ্য যে, বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইসলামের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত শিক্ষা ও নীতিমালা এবং মুহাম্মদ সা.-এর জীবনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তিই নিরপেক্ষ ও খোলা মনে মনোনিবেশ সহকারে পড়বে, সে সহজেই বুঝতে পারবে, ইসলাম বিয়ের নির্দেশ দেয়ার সময় বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য সামনে রেখেছে। অধ্যয়নকারী এ কথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, রসূল সা. নিছক বিয়ের জন্যই বিয়ে করেননি, বরং প্রত্যেক বিয়েতেই কোনো না কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামের সামষ্টিক স্বার্থ নিহিত ছিলো। তিনি প্রথম বিয়ে করেন একাধিক সন্তানের জননী, বিধবা ও তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বয়জ্যেষ্ঠা হযরত খাদিজাকে। এই বিয়ে করার সময় রসূল সা.-এর বয়স পঁচিশ এবং খাদিজার রা.-এর বয়স চল্লিশ বছর ছিলো। এমন টগবগে যৌবনেও তাঁর চরিত্র এতো পবিত্র ও নিষ্কলুষ ছিলো যে, কাফেররাও তা স্বীকার করতো। তাছাড়া তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন তা থেকে তাকে থামাতে মুশরিকরা যে আপোসমূলক প্রস্তাব দেয়, তাতে এই প্রলোভনও দেয়া হয়েছিল যে, হেজাযের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত খাদিজাও তাঁর চরিত্র ও সততায় মুগ্ধ হয়ে নুবওয়াত লাভের আগেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অথচ এই বয়সে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কোনো ইচ্ছে ও প্রয়োজন ছিলনা। তিনি একজন অত্যন্ত ধনবতী মহিলা ছিলেন এবং ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। রসূল সা. ইচ্ছে করলে যে কোনো কুমারী যুবতীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি হযরত খাদিজার নির্মল ও অনমনীয় চরিত্রের জন্য তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতে অন্য কোনো বিয়ে করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, এই বিয়ে অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল। হযরত

খাদিজা রসূল সা.-এর নবুওয়াত লাভের পর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন এবং যতোদিন জীবিত ছিলেন নিজের জীবন ও সহায়সম্পদ রসূল সা.-এর জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।

হযরত খাদিজার ইন্তিকালের পর রসূল সা. আরেকজন প্রবীণ মহিলা হযরত সওদাকে বিয়ে করেন, যাতে তিনি তাঁর অল্প বয়স্কা কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করতে পারেন এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারেন। হযরত সওদাও অত্যন্ত মজবুত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারীনী ছিলেন। শুধুমাত্র ইসলামের জন্য তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং বহু কষ্ট ও বিপদ মুসিবত সহ্য করেন। চার বছর পর্যন্ত একমাত্র তিনিই ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী। এরপর তিনি এমন অল্পবয়স্কা মেয়েকে গৃহিনী করে আনার প্রয়োজন অনুভব করেন। যিনি ইসলামি পরিবেশেই জন্মেছেন এবং নবীগৃহে এসে বড় হবেন। এতে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক বিকাশ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানের হবে এবং তিনি মুসলিম নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা নির্বাচিত হলেন। তাঁর পিতামাতার গৃহ তো আগে থেকেই ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত ছিলো। আর শৈশবেই তাঁকে নবীগৃহে পাঠিয়ে দেয়া হলো, যাতে তার নির্মল মানসপটে ইসলামি আদর্শের ছবি অক্ষয়ভাবে খোদিত হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, হযরত আয়েশা সেই কৈশরেই কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানে গভীর পারদর্শী হয়ে উঠেন। রসূল সা.-এর সুমহান জীবন চরিত এবং তাঁর বাণী ও কর্মের এক বিরাট অংশকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন এবং শিক্ষাদান ও বর্ণনার মাধ্যমে তা সমগ্র উম্মাহর নিকট হস্তান্তর করেন। হযরত আয়েশার নিজস্ব উক্তি ও বাস্তব কর্মের দৃষ্টান্ত ছাড়াও দু'হাজার দু'শো দশটি (২,২১০) বিশুদ্ধ হাদিস তিনি সরাসরি রসূল সা.-এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা ব্যতীত আর কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা সাহাবি এর চেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেননি। হযরত আয়েশার কোনো সন্তান ছিলনা। তিনি বহু শিশুকে লালন পালন করেছেন এবং ইসলামি শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

রসূল সা.-এর দাওয়াত শুধুমাত্র মৌখিক প্রচার ও উপদেশ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। এটি ছিলো গোটা সমাজ জীবনের কার্যকর বিপ্লব সংঘটনের লক্ষ্যে পরিচালিত এক মরণপণ সংগ্রামের ভিত্তি ও সূচনা। এই পটভূমিতে রসূল সা. কর্তৃক তাঁর ঘনিষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ কাজ ছিলো। তাই একদিকে তিনি হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা.-এর সাথে নিজের মেয়েদের বিয়ে দেন, অপরদিকে হযরত আবু

বকর রা. ও হযরত ওমর রা.-এর মেয়েকে বিয়ে করেন। এভাবে এই চারজনের সাথেই নিজের সম্পর্ক অটুট ও চিরস্থায়ী করেন। অনুরূপভাবে কয়েকটি প্রভাবশালী নওমুসলিম গোত্রের সাথেও আত্মীয়তা স্থাপন করে তাদেরকে ইসলামের সমর্থকে পরিণত করেন এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলামের বিরোধী ছিলো, তাদের বিরোধিতার তেজ কমান। হযরত উম্মে সালমা ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধিমতী মুমিন মহিলা। কিন্তু বনু মখযুম গোত্রের যে পরিবারে আবু জেহেলের জন্ম, তিনি সেই পরিবারেরই সদস্য ছিলেন। হযরত উম্মে হাবিবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনের উপর কতো বড় ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন এবং কতো বলিষ্ঠতা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় পর্যন্ত কাফেরদের সরদার ছিলেন। এ দুই মহীয়সী মহিলাকে রসূল সা.-এর স্ত্রী হিসেবে বরণ করায় একদিকে যেমন উভয়ের ব্যক্তিগত গুণাবলী স্বীকৃতি পেয়েছিল, অপরদিকে এর ফলে এই উভয় পরিবারের চরম শত্রুসূলভ তৎপরতারও অবসান ঘটেছিল।

কয়েকজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সাহাবিকে বিয়ে করে রসূল সা. তাদের মনস্তুষ্টি সাধন করেন। দত্তক গ্রহণের জাহেলী প্রথা উচ্ছেদের খাতিরে স্বয়ং আল্লাহ রসূল সা.-কে তাঁর পালিত পুত্র হযরত যায়েদের তালাক দেয়া স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার নির্দেশ দেন। হযরত যয়নাব রসূল সা.-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি হযরত যায়েদের আগে তাঁকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে পারতেন। কিন্তু বংশগত উঁচু নিচুর ভেদাভেদ খতম করার জন্য তিনি মুক্ত গোলাম যায়েদের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এরপর যখন এই দম্পতির মধ্যে কিছুতেই বনিবণা হলোনা এবং তালাক অনিবার্য হয়ে পড়লো, তখন তিনি যয়নাবকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে একদিকে তাঁর মনের প্রবোধের ব্যবস্থা করলেন, অপরদিকে পালিত পুত্রকে আসল পুত্ররূপে গণ্য করার জাহেলী প্রথারও উচ্ছেদ ঘটালেন। একই নামের আর এক উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মাকে বিধবা হওয়ার পর বিয়ে করে রসূল সা. তার শোকাহত মনে সান্ত্বনা দেন। তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাস ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু নবীর সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের মাত্র দু'তিন মাস পর তিনি জান্নাতবাসিনী হন। এখানে উল্লেখ যে, হযরত উম্মে সালমার স্বামী আবু সালমাও ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে ইন্তিকাল করেন। রসূল সা. হযরত উম্মে সালমাকে বিয়ে করেন এবং তার চারটি এতিম শিশু সন্তানকেও নিজের অভিভাবকত্বে গ্রহণ ও লালন পালন করেন। হযরত উম্মে হাবিবার স্বামী প্রথমে মুসলমান হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় হযরত উম্মে হাবিবা নিজের শিশু কন্যা হাবিবাকে নিয়ে বিদেশে চরম অসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হন। এ কথা জানতে পেরে রসূল সা. আবিসিনিয়াতেই তাঁর কাছে বিয়ের

প্রস্তাব পাঠান। নাজ্জাশী স্বয়ং রসূল সা.-এর প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করে উম্মে হাবিবাকে রসূল সা.-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। হাবিবাও তাঁর মায়ের সাথে নবীগৃহে আসে এবং পালিত কন্যা হিসেবে রসূল সা.-এর অভিভাবকত্বে বড় হয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া ছিলেন ইহুদি গোত্র বনু মুসতালিকের সরদার হারেস বিন আবি যিরারের কন্যা। মুরাইসীর যুদ্ধে তিনি যুদ্ধবন্দিনী হয়ে সাহাবি সাবেত বিন কায়েসের হাতে অর্পিত হন। রসূল সা. তার পারিবারিক মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মুক্তিপণ নিজেই দিয়ে দেন এবং তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করেন। এর তাৎক্ষণিক সুফল দাঁড়ালো এই যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁর গোত্রের একশোরও বেশি যুদ্ধবন্দির সবাইকে মুক্তি দেন।

হযরত সুফিয়ার অবস্থাও তদ্রুপ। তিনি ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী। প্রথমে তিনি হযরত দিহইয়া কালবীর ভাগে পড়েন। কিন্তু তার পিতাও ইহুদি নেতা ও গোত্রপতি। এজন্য রসূল সা. তার পক্ষ থেকেও মুক্তিপণ পরিশোধ করেন এবং তাকে বিয়ে করেন, যাতে তার মন আহত না হয়। এ আত্মীয়তার ফলে ইহুদিদের শত্রুতার তীব্রতাও কমে যায়।

মোটকথা যতো চিন্তা গবেষণাই করা হবে, এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রসূল সা. যে কয়টি বিয়েই করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কোনো না কোনো বৃহত্তর স্বার্থ, মহত্তর কল্যাণ এবং গভীরতর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা নিহিত ছিলো। আর এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, রসূল সা.-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশাই ছিলেন কুমারি, আর সবাই বিধবা, না হয় তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীগৃহের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু যাদের স্নায়ুতে নারীর কেবল যৌনতার দিকটিই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে এবং পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই যাদের চোখে পড়েনা, তারা যদি এসব মহৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণের দিকগুলো দেখতে না পায়, যা রসূল সা.-এর প্রতিটি বিয়েতেই ছিলো, তবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রাগ-বিয়ে যৌন সম্পর্ক, বিয়ে বহির্ভুত লাম্পট্য এবং স্ত্রী থাকা অবস্থায় রক্ষিতা পোষা যাদের নৈমিত্তিক ব্যাপার, তারা কোন মুখে ইসলামের বহু বিবাহ রীতির সমালোচনা করে ভেবে পাইনা *[তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৮]*

৭০. বেলুচিস্তানের বাগদান প্রথা

প্রশ্ন সমগ্র বেলুচিস্তানে বাগদান প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এই বাগদানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত ইজাব ও কবুল এবং বিয়ের খুতবা পাঠ করা হয়। তবে নামে বাগদান হলেও এটা সমগ্র বেলুচিস্তানে এমনকি আফগাস্তিনেও সামাজিকভাবে বিয়েই মনে করা হয়। বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর প্রচলিত

প্রথা অনুসারে বাগদাতা পুরুষ বাগদত্তা মেয়ের খাদ্য ছাড়া যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে থাকে। তবে পরস্পরে পর্দাও করে এবং বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পর্দা অব্যাহত থাকে। ইদানিং মৌলবি সাহেবগণ ইজাব ও কবুল সহকারে সম্পাদিত বাগদানকে নিছক একটা ওয়াদা মনে করছেন। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত ফতোয়া গ্রন্থেও একাধিক জায়গায় এই বাগদানকে একটা প্রতিশ্রুতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ বক্তব্যের সপক্ষে এই বলে যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে যে, বিয়ের সময়ও খুতবা এবং ইজাব কবুল হয়ে থাকে। তাই বাগদানে যে ইজাব ও কবুল এবং খুতবা হয় তা ওয়াদার বেশি কিছু নয়। বেলুচিস্তান একটা উপজাতীয় অঞ্চল। এখানে যদি মেয়ের বাপ ও ভাই বাগদানকে নিছক একটা প্রতিশ্রুতি মনে করে এবং বাগদাতাকে মেয়ে না দেয় এবং অন্য কোথাও বিয়ে দেয়, তাহলে তীব্র বিবাদ বেধে যেতে পারে এবং তা খুনোখুনির পর্যায়েও পৌঁছে যেতে পারে, এই ফতোয়া সমগ্র বেলুচিস্তানে একটা অস্থিরতা ও উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। উপজাতীয় বিবাদ কলহ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং খুব ছোটখাট বিষয় নিয়ে তা প্রায়ই সংঘটিত হয়। এ জন্য বছরে একাধিক বাগদান ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তার ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। অন্যান্য এলাকার বাগদান রীতি কি রকম জানিনা। এখানকার বাগদানে যথারীতি ভোজের আয়োজন হয় এবং বহু লোক বরযাত্রী হয়ে বাগদাতার সাথে যায়। মেয়ের পিতা মেহমানদের ভোজে আপ্যায়িত করে অথবা শুধুমাত্র মিষ্টি খাওয়ায়। তারপর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যথারীতি খুতবা পড়ে ইজাব কবুল সম্পন্ন করেন। এখন আলেমগণ এতো সব আনুষ্ঠানিকতাকে ওয়াদা আখ্যা দিয়েছেন। দেওবন্দের ফতোয়াও তদ্রুপ। কিন্তু জনগণ এখনো জানেনা যে, বাগদান নিছক ওয়াদা। জনগণ এটা জেনে ফেললে উপজাতীয় কোন্দলের কারণে বহু বাগদান ভেঙ্গে যাবে এবং মারাত্মক গোলযোগ বেধে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ইজাব কবুল তথা উভয় পক্ষের সম্মতির আনুষ্ঠানিক আদান প্রদান বিয়েতে ও হয়, বাগদানেও হয়। অর্থাৎ ইজাব কবুল দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। এ রীতি নতুন কিছু নয়। এটা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। বাগদানের পর বর কনের ছাড়াছাড়ি হলে বাগদাতা আনুষ্ঠানিকভাবে তালাক দিয়ে থাকে।

জবাব : আপনি বেলুচিস্তানের বাগদান প্রথার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা আমার ভালোমত বুঝে আসেনি। তথাপি যে ইজাব কবুল বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যা দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হয় তার জরুরি বিধি নিম্নে বর্ণনা করছি :

বিয়ে সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় নিজেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারা স্বয়ং অথবা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি তাদের পক্ষ থেকে ইজাব কবুল সম্পন্ন করবে। আর যদি উভয়ে কিংবা কোনো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে তার পুরুষ অভিভাবকবৃন্দ তার পক্ষ থেকে ইজাব কবুল সম্পন্ন করবে।

ইজাব ও কবুলের অন্তত যে কোনো একটি অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা উচ্চারিত হওয়া চাই। যেমন, একজনে বলবে যে, আমি আমার মোয়াক্কেল বা মোয়াক্কেলাকে আপনার সাথে বিয়ে দিলাম। আর অপর পক্ষ বলবে, আমি কবুল করলাম বা সম্মত হলাম। বিয়ে শব্দটা যদি ব্যবহৃত না হয়, তবে তার সমর্থক বলে পরিচিত অপর কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন এভাবে বলা যেতে পারে যে, আমি তোমাকে নিজের স্বামী বা স্ত্রী বানিয়ে নিলাম। এ ধরনের অপর কোনো শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারে– যা দ্বারা বক্তা বিয়েই বুঝায় এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির কোনো উপাদান থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সেই শব্দ দ্বারা বিয়ে ছাড়া আর কিছু বুঝানো হয়নি। উপরন্তু সাক্ষীরাও সেই শব্দ দ্বারা বুঝতে পারে যে, বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ের এই অপরিহার্য উপাদান ও শর্তাবলী পূরণ না হলে কেবল প্রয়োজনীয় সামগ্রি সরবরাহ করতে থাকা, পর্দা করা বা না করা, বিয়ের খুতবা পড়া বা বিয়ের ওয়াদা করা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়না। বাগদানে যে ইজাব কবুল অনুষ্ঠিত হয় বলে আপনি উল্লেখ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। সে যাই হোক, উপরোক্ত বিবরণ অনুসারে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেবল প্রতিশ্রুতি ও কথাবার্তাকে ইজাব কবুল নামে আখ্যায়িত করলে বিয়ে হতে পারেনা। শুধুমাত্র বাগদান সম্পন্ন হওয়ার পর তালাক দেয়া অর্থহীন। বিয়ে না হলে তালাক কিভাবে হবে। *[তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৭৭]*

৭১. লটারি ও নির্বাচনী লটারি

প্রশ্ন : আমাদের অফিসের একটা পুরানো রীতি হলো, যে কর্মচারী এই অফিস থেকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করে তাকে যাতায়াতের জন্য অফিসের সাইকেল দেয়া হয়। অফিসের সাইকেল একটাই। ঘটনাক্রমে বর্তমানে এক মাইল দূরে অবস্থানকারী কর্মচারীদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচজন। আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ধারণা, লটারির মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত করতে হবে। কেননা এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, লটারি জুয়ারই শামিল এবং নাজায়েয। আপনি বলুন এটা করা জায়েয কিনা?

জবাব : আপনি যে লটারির কথা বলেছেন তাকে জুয়া বলা চলেনা। নির্বাচনী লটারি আর জুয়ার লটারি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বেশিরভাগ লটারিই জুয়ার আওতাভুক্ত এবং অবৈধ। কিন্তু নির্বাচনী লটারি শরিয়তে আপত্তিকর নয়। নিছক নির্বাচনের জন্য গৃহীত লটারি জুয়ার লটারি থেকে একেবারেই আলাদা জিনিস। অনিবার্য ক্ষেত্রে নির্বাচনী লটারি গৃহীত হয়ে থাকে। উভয়ের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পার্থক্য এই যে, জুয়ার লটারিতে সত্যিকার বা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি কোনো সমস্যা দেখা দেয়না এবং তা সমাধানের কোনো অভিপ্রায়ও থাকেনা। এতে আগে থেকে তৈরি করা একটা পরিকল্পনা বা সমঝোতার অধীনে অংশীদার ও উদ্যোক্তারা নিজ নিজ কাংখিত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পুঁজি খাটায়। অত:পর তা বন্টনের জন্য

ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় যা সাধারণত অনেকাংশেই ভাগ্যনির্ভর অন্য কথায় এটা ভাগ্যের খেলা Game of Chance। এর ফলে কিছু লোক কোনো কারণ ও প্রয়োজন ছাড়াই এবং নিজের শ্রম মেধা অনুপাতে বেশি অর্থ লাভ করে। অথচ প্রলুব্ধ হয়ে অংশগ্রহণকারী অনেকে বঞ্চিত থেকে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের জুয়ার উদ্যোক্তা ও সংগঠকরা নিজের পকেট থেকে কাউকে কিছু দেয়না, আর এমন কোনো সম্পদও বন্টন করেনা যা স্বাভাবিকভাবে সংগৃহীত হয়েছে, কেবল তার বন্টনই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বরঞ্চ তারা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। অত:পর অবৈধভাবে নিজেরা কিছু নেয় এবং অন্যদেরকেও কিছু দেয়।

পক্ষান্তরে নির্বাচনী লটারি সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে একটি বিশেষ সংখ্যার সমান সমান অংশ বিদ্যমান এবং তা ঠিক সেই সংখ্যক হকদারের মধ্যে বন্টন করা কাম্য হয় এমতাবস্থায় অংশীদার বা বন্টনকারী নিজের ইচ্ছেমত বন্টনের পরিবর্তে লটারির সাহায্যে প্রত্যেক অংশীদারকে একটা অংশ দিয়ে দেয়। এতে অবিচার বা পক্ষপাতিত্বের কোনো অবকাশ থাকেনা। এ ধরনের নির্বাচনী লটারির প্রয়োজন আরো একটা ক্ষেত্রে দেখা দেয়। সেটি হলো, যদি দেয় জিনিসটি একক ও অবিভাজ্য হয় এবং তার একাধিক হকদার থাকে। এ ক্ষেত্রে সবাইকে বঞ্চিত করলে সবার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যদি দাতা নিজের ইচ্ছেমত কাউকে বাছাই করতে চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার কাছে কাউকে অগ্রগণ্য মনে করার কোনো মানদণ্ড থাকেনা। এতে একজন বাদে আর সকলের মনেও আঘাত লাগে। এই সংকটের সমাধানের জন্য নির্বাচনী লটারি করে কোনো একজনের নাম নির্বাচন করা ও জিনিসটা তাকে দিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনা। এখন বলাবাহুল্য যে এই দুই ধরনের নির্বাচনী লটারির সাথে অন্যান্য লটারির আকাশ পাতাল পার্থক্য। উভয় ক্ষেত্রের জন্য শরিয়তের একই বিধান হতে পারেনা। জুয়ামূলক লটারিতে ইচ্ছেকৃতভাবে পুঁজি এমনভাবে সংগ্রহ ও বন্টন করা হয় যে, কারো হক নষ্ট হয় এবং কেউ অবৈধভাবে লাভবান হয়। পক্ষান্তরে নির্বাচনী লটারিতে একটা বাস্তব সংকটের এমন সমাধান করা হয়, যার কোনো বিকল্প নেই।

কুরআন ও হাদিসে যতো ধরনের জুয়াকে হারাম বা মাকরূহ ঘোষণা করা হয়েছে, তার কোনোটাই নির্বাচনী লটারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরঞ্চ বহু হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. এবং সাহাবিগণ বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত নির্বাচনী লটারি প্রয়োগ করেছেন। নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল সা. মদিনায় অবস্থানকালে কবে কোন স্ত্রীর কাছে থাকবেন, সেটা পালাক্রমে স্থির করতেন। কিন্তু সফরে যাওয়ার সময় তিনি লটারির মাধ্যমে উম্মুল মুমিনীনদের কোনো একজনকে নির্বাচন করতেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন।

একথা সত্য, যেসব খেলাধুলা ও কায়কারবারে জুয়ার মিশ্রণ ঘটে, তাতেও বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনী লটারি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সবাই জানে, তা স্বাভাবিক নির্বাচনী

লটারির থেকে ভিন্ন রকমের। সেটা জুয়াবাজিরই একটা অংশ এবং গোটা কারবার জুয়াভিত্তিক হওয়ায় এই অংশটিও নাজায়েয ও হারাম। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৩]*

৭২. সমবায় সমিতি

প্রশ্ন : আজকাল এক ধরনের সমবায় প্রক্রিয়ার অধীন বাণিজ্যিক সমিতি গঠনের রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ হয়ে মাথা প্রতি পাঁচ টাকা করে মাসিক চাঁদা দেয় এবং প্রতি মাসে কোনো একজনকে পাঁচশো টাকা পুঁজি দেয়া হয়। এভাবে প্রত্যেকে পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পনেরা টাকা বা বেশি হারে দিয়ে এককালীন পাঁচশো টাকা পায়। অথচ কারোই ক্ষতি হয়না। তবে পাঁচশো টাকা লাভকারী লোকদের মধ্যে প্রত্যেক অগ্রগামী ব্যক্তিকে পশ্চাদগামীর তুলনায় পাঁচ টাকা কম চাঁদা দিতে হয়। সমিতির সঞ্চিত পুঁজি কারবারে খাটানো থাকে। এতে লাভ হতে থাকে এবং প্রত্যেক অংশীদার নিজের প্রদত্ত চাঁদার চেয়ে যে টাকাটা বেশি পায়, তা ঐ লাভ থেকেই সংগৃহীত হয়। অনুগ্রহপূর্বক এই সমিতিগুলো জায়েয কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

জবাব যে সমিতিগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে আপনার তথ্য স্পষ্ট ও বিস্তারিত নয়। কিন্তু আপনি যেহেতু ঠিকানা লেখেননি। অথচ জবাব দেয়ার জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন, তাই আপনার কাছে আরো স্পষ্ট বিবরণ না চেয়েই সংক্ষিপ্ত নীতিগত জবাব দিচ্ছি।

আপনি যে ধরনের সমিতির কথা উল্লেখ করেছেন, সে ধরনের সমিতির কিছু তথ্য আমাদের জানা আছে। এই সমস্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিত আমার মত হলো, এইসব তথাকথিত সমবায় সমিতি বা ব্যবসায় সমিতির তৎপরতা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। বরং এগুলোর কার্যকলাপ সুদ ও জুয়ার মিশ্রন সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অংশীদারের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে চাঁদা নেয়া, সঞ্চিত পুঁজি ব্যবসায়ে খাটানো, অত:পর লাভলোকসান বা প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত অংশের বাছ বিচার না করেই তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়া কোনো মতেই সুবিচার হতে পারেনা। এর পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালের পর সঞ্চিত পুঁজিকে লাভ বা লোকসান সমেত সকল অংশীদারের মধ্যে প্রত্যেকের বিনিয়োগকৃত অংশের অনুপাতে বন্টন করা উচিত। এটা না করা হলে এই সব সমিতির কার্যকলাপ সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং তাকে সুদ ও জুয়া থেকে মুক্ত বলা যায়না। হযরত ওমর রা. বলেছেন :

فاجتنبوا الربو والريبة।[১] সুতরাং এ ধরনের কারবার থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

---

[১] এর অর্থ 'সুদ এবং সন্দেহজনক জিনিস পরিহার করো।' হযরত ওমর একবার বলেছিলেন যে, সুদ সংক্রান্ত সর্বশেষ বিধিসমূহের ব্যাখ্যা দেয়ার আগেই রসূল সা.-এর ইন্তিকাল হয়। সুতরাং তোমার সুদও ছেড়ে দাও এবং যে জিনিস সুদ বলে সন্দেহ হয় তাও ছেড়ে দাও।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত এক ধরণের সমবায় প্রথা চালু রয়েছে। সেই প্রথাটি অত্যন্ত সহজ সরল ও সন্দেহমুক্ত। সেটি এরূপ যে, ধরা যাক, ১২ জন লোক প্রতি মাসে দশ টাকা হারে চাঁদা দিলো এবং প্রতি মাসে কোনো একজন অভাবি লোককে সংগৃহীত টাকাটা দিয়ে দেয়া হলো। এভাবে সারা বছরে প্রতিটি সদস্য যতো টাকা কিস্তিতে দেয়, বছরে একবার প্রত্যেকে ততো টাকা এককালীন পায়। এই প্রক্রিয়াটাকে বৈধভাবে আরো একটু উন্নত করা যায়। এভাবে, মাসিক চাঁদাটা দুভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ প্রতি মাসে সঞ্চিত হয়ে কোনো না কোনো অভাবি লোককে পালাক্রমে দেয়া হবে। আর অন্য ভাগ সঞ্চিত হয়ে সমবায়ের নীতিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হবে। বছরশেষে লাভ ও লোকসান হিসেব করার পর এই দ্বিতীয় অংশও অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে। ধোকাবাজি, বঞ্চনা, জুয়া ও সুদের ক্লেদমুক্ত অপর কোনো পন্থা যদি বের করা যায় তবে তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মানোন্নয়নের নামে "দেখতে ব্যবসায়ের মতো অথচ আসলে জুয়া" এমন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করা হলে তাতে অংশগ্রহণ করা কোনো মুসলমানের পক্ষে কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা। এটা বাহ্যত প্রত্যেক অংশীদারের কাছে 'লাভজনক' প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু আসলে তা সকলের জন্য চরম ক্ষতিকর ব্যবসা। *[তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৩]*

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

মাওলানা মওদূদী রহ. -এর
রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমযান তাকওয়া

অধ্যাপক গোলাম আযম -এর
ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi

নঈম সিদ্দিকী -এর
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

আব্বাস আলী খান -এর
জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান -এর
নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

সাইয়েদ সাবিক -এর
ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড

আবদুস শহীদ নাসিম -এর
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
আসুন আমরা মুসলিম হই
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২